~ www.amarboi.com ~

কুমার চক্রবর্তী

অস্তিত্ব ও আত্মহত্যা

~ www.amarboi.com ~

অস্তিত্ব ও আত্মহত্যা

কুমার চক্রবর্তী

সংবেদ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অস্তিত্ব ও আত্মহত্যা

কুমার চক্রবর্তী

©

লেখক

প্রথম সংবেদ সংস্করণ

ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রকাশক

পারভেজ হোসেন

সংবেদ, ৮৫/১, ফকিরের পুল, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ

মোস্তাফিজ কারিগর

মুদ্রণ

সংবেদ প্রিন্টিং পাবলিকেশন, ৮৫/১, ফকিরের পুল, ঢাকা ১০০০

মূল্য

পাঁচশত টাকা

একমাত্র পরিবেশক

উত্তরণ, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০

ফোন : ৭১৭৫২২৭, ৭১১৯৪৬৩

ভারতে পরিবেশক

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, বি-৯, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭

অনলাইনে বই সংগ্রহ করতে

www.rokomari.com / www.porua.com.bd

ISBN 978-984-8892-86-2

OSTITTO O ATMAHATTYA (EXISTENCE AND SUICIDE) by Kumar Chakraborty. Published in February 2017 by Sangbed, 85/1, Fakirerpool, Dhaka 1000, Cover Design by Mostafiz Karigor, Price Tk. 500 .00 US$ 20.00

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন আজাদ

যিনি বলেছিলেন

''মানুষকে মরতে হবে

মিটমাট না ক'রে।''

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূ চি প ত্র

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা ৯
তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা ১০
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ১১
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ১২
প্রবেশক ১৫
জীবন ও মৃত্যু ২১
অস্তিত্ব ও নিরর্থকতা ২৯
মৃত্যু এক আত্মহত্যা! ৪৭
আত্মহত্যা: কৃষ্ণগহ্বর ও তার নিখিল উদ্ভাসন ৫৭
ইতিহাস ও পটভূমি ৭৭
ভ্রান্তি, বিবেচনা ও যুক্তিসূত্র ১০০
মাত্রামানব ও ইচ্ছামৃত্যুর কথকতা ১২৬
সংরাগ ও সৌন্দর্য ১৪৬
মাত্রামানব: ধ্রুপদি বিষণ্ণতা বা সেই চমৎকার পাগলামো ১৬১
কবি: আত্মপ্রেমী ও আত্মবিনাশী অর্ফিক ১৭৩
মৃত্যু ও যৌক্তিক আত্মহত্যা: ইভান ইলিচ ও কিরিলোভ ১৮৪
সাহিত্য ও আত্মহত্যা ১৯৬
সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও বঙ্গীয় কয়েকজন অন্ধকার ২১৮
তাঁরা কয়েকজন: ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, সিলভিয়া প্লাথ, জন বেরিম্যান,
গেয়র্গ ট্রাকল, পাউল সেলান, হার্ট ক্রেন, ভ্লাদিমির মায়াকোভ্‌স্কি ২৪৬
অন্ত্যভাষ ৩১০
গ্রন্থনির্দেশ ও টীকাটিপ্পনী ৩১৯
নির্ঘণ্ট ৩৫৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা

আত্মহত্যায় ভাবিত হয়নি এমন মানুষ খুবই কম আছে, বিশেষত সৃষ্টিশীলেরা। আমিও এ ধরনের মানুষদের মতো আত্মহত্যা-বিষয়ে ভাবিত হয়েছিলাম, জীবনের প্রস্থান অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল আমার মনে, তারপর একদিন লিখতে বসেছিলাম এ গ্রন্থখানি, লিখে যেন আত্মহত্যার তাড়না থেকে রক্ষা পেলাম। লেখার পর অনেকে মনে করেছিল আমি আত্মহত্যার বিরুদ্ধেই কামান দাগিয়েছিলাম। কিন্তু আমি লিখেছিলাম অনেকটা আত্মহত্যার পক্ষেই। যা-ই হোক, এ বইটির সর্বশেষ ২০১২ সালের সংস্করণটি এখন আর বাজারে নেই, কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকে আবারও বইটির ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়ে আসছিলেন। কথাসাহিত্যিক শহিদুল আলম তাঁদের মধ্যে অন্যতম; তিনি শুধু আগ্রহ দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, প্রকাশের ব্যাপারে কিছু তথ্য ও পরামর্শ জুগিয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছেন আপন উদারতায়। তাঁকে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ প্রকাশককেও, তাঁর সক্রিয়তা ও উদ্যোগ তুলনাহীন। বইটিতে সামান্য ছাড়া ব্যাপক কোনো সংশোধন ঘটেনি, যা ঘটেছে তা সংযোগ, কিছুমাত্রার অনুপূরণ, তবে যুক্ত হয়েছে দুটি দীর্ঘ অধ্যায়। এ দুটি অধ্যায়ের গ্রন্থনির্দেশ টীকা-টিপ্পনী দেওয়া সম্ভব হলো না, তবে যেসব গ্রন্থের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছি তা এখানে জানিয়ে রাখছি: সাইলেন্ট গ্রিফ (লেখক ক্রিস্টোফার লুকাস ও হেনরি এম. সাইডেন), ফাইনাল ড্রাফট্স (লেখক মার্ক সেইনফেল্ট), এথিক্স অব স্যুইসাইড (লেখক মার্গারেট পাবস্ট বাটিন) ও এন্ডিং লাইফ (লেখক মার্গারেট পাবস্ট বাটিন)।

স্থান ও ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে, কতিপয় ব্যতিক্রম বাদে, সংশ্লিষ্ট ভাষার উচ্চারণ অনুসরণ করে প্রতিবর্ণীকরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যদিও তা সর্বত্র মূলানুগ হয়নি। হয়নি কারণ তাতে বোধজটিলতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যেমন ভার্জিলকে ভির্গিলিয়ুস লেখা হলে তা হবে আমাদের অনেকের কাছে অবোধ্য।

এই ভূমিকা যখন লেখা হচ্ছিল, তখনই খবর পেলাম আর-একটি আত্মহত্যার, যিনি কবিতা লিখতেন, ছিলেন প্রতিশ্রুতিশীল উদ্ভিন্নমান এক তরুণী। তাঁর মৃত্যুর ঘোর কাটাতে পারিনি সুদূর বিদেশে অবস্থানকালেও। আত্মহত্যা এভাবেই অর্থহীন করে যাবে আমাদের যাবতীয় অর্থময়তাকে।

কুমার চক্রবর্তী
ধানমন্ডি, ঢাকা
জানুয়ারি, ২০১৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বইটি প্রকাশের পর কেটে গেছে বেশ সময়। বইটির ব্যাপারে অনেকের, বিশেষত তরুণ কবিদের, আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছিল সময়ে সময়ে। বিভিন্নভাবে তাঁরা আমাকে বইটির ওপর তাঁদের অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল আর-একটি সংস্করণের। এ সংস্করণে প্রবেশক অংশটি নতুনভাবে অন্তর্ভূত, এছাড়া কিছু কিছু জায়গা সামান্যমাত্রায় সংশোধিত ও সংযোজিত হয়েছে। কিছু জায়গায় পুনরুক্তি রয়ে গেছে বলে বোধ হয়, তবে আমার কাছে মনে হয়েছে এই পুনরুক্তিগুলো হয়তো বা প্রাসঙ্গিক।

একটি কথা বলা প্রয়োজন, ভারতীয় ধর্মে ও পুরাণে অতিমানবদের ক্ষেত্রে ইচ্ছামৃত্যুর এক ভিন্ন অভিভাব চোখে পড়ে। বলা হয়, কিছু মানবের ক্ষেত্রে মৃত্যু তাঁদের ইচ্ছাধীন, তাঁরা যখন মৃত্যুবরণ করতে চান তখনই মাত্র তাঁদের মৃত্যু সম্ভব। অর্থাৎ আত্মইচ্ছাতেই মৃত্যু। গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রেও বলা হয়, নিজের ইচ্ছায় তথাগতের মহানির্বাণ লাভ হয়। আরও কিছুকাল বেঁচে থাকা যায় কি না—প্রিয় শিষ্য আনন্দর এ প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ জানান যে তা আর এখন সম্ভব নয়, কারণ তাঁর মৃত্যু হলো ইচ্ছামৃত্যু, এই ইচ্ছা বারংবার প্রকাশ করা যায় না। ভক্তদের কাছে মনে হতে পারে তা ইচ্ছামৃত্যু কিন্তু আসলে তা স্বাভাবিক মৃত্যু। বুদ্ধ বুঝতে পারছিলেন, তিনি আর অধিক কাল বাঁচবেন না। কারণ তিনি টের পাচ্ছিলেন নিজ জরা ও ব্যাধির বিষয়, তাছাড়া তাঁর শেষ জীবন সত্যিই শোচনীয় ছিল বলা যায় শারীরিক ও মানসিক অর্থে। পুরাণ বা কিংবদন্তিতে সম্ভব হলেও বাস্তবিক অর্থে এ ধরনের মৃত্যু সম্ভব নয়, কেউ ইচ্ছা প্রকাশ করলেই মৃত্যু এসে হাজির হয়ে যায় না, তার বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়। ইচ্ছামৃত্যু এক ভাঁওতাবাজি; ইচ্ছামৃত্যু আসলে স্বেচ্ছামৃত্যুই। ইচ্ছা করে যখন কেউ নিজের মৃত্যু সংঘটন করেন তখনই তা ইচ্ছামৃত্যু, হয়তো আড়ালে থাকতে পারে মৃত্যু সংঘটনের উপায়। তার মানে আত্মহত্যারই আর-এক মহিমান্বিত নাম ইচ্ছামৃত্যু। সুতরাং আমি এ গ্রন্থের নামকরণে ইচ্ছামৃত্যু বলতে আত্মহত্যাকেই বুঝিয়েছি, কারণ আত্মহত্যার পেছনে কাজ করে ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছা। পৌরাণিক বা মহামানবদের ইচ্ছামৃত্যু বস্তুত এক গোপনীয় আত্মহত্যা বা স্বাভাবিক মৃত্যুর এক ভবিষ্যদ্বাণী যা কাকতালীয়ভাবে ফলে যায়।

যে কথাটি জোর দিয়ে বলা দরকার, শুদ্ধস্বর-স্বত্বাধিকারী আহমেদুর রশিদের আগ্রহ ছাড়া এ সংস্করণটির প্রকাশ সম্ভব হতো না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কুমার চক্রবর্তী
১ অক্টোবর ২০১১

~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মাত্রামানবের...দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি এই ভেবে নয় যে, খুব বাজার-চলতি, বরং এই ভেবে যে কিছু সংযুক্তি ও পরিশুদ্ধি ঘটানো গেল। এ সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হলো একটি অধ্যায়—"সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও বঙ্গীয় কয়েকজন অন্ধকার" শিরোনামে। তথ্য, পরামর্শ ও গ্রন্থ-সহযোগিতা দিয়ে যাঁরা প্লুত করেছেন—বিশেষত কবি মোহাম্মদ রফিক, কবি শরীফ শাহরিয়ার—এক্ষণে তাঁদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কেন আত্মহত্যাবিষয়ক...? অনেকেই এ প্রশ্ন করেছেন আমাকে। এর উত্তরে আমি বলতে পারি নিজ অনুভবে:

ওহে কোমর-ভাঙা সময়
তুমি এখন থমকে দাঁড়াতে পারো
কেননা অন্ধকার দিয়ে সেলাই করা পোশাক
আমরা এখন পড়ে নিই নিজস্ব অক্ষাংশে
এই জোছনা অধিকতর মায়াবী হলে
জীবন বিদায় নিতে পারে ঝুরিনামা বোধ থেকে
কেননা মৃত্যু বড়ো শারীরিক
কেননা জোছনা বড়ো সাংকেতিক

নিট্শের জরাথুস্ত্রের জবানিতে বলতে হয়, ঠিক-সময়ে মরতে হবে। আর হ্যাঁ, আত্মহত্যা-সংক্রান্ত গবেষণা ও অনুসন্ধানের এখানেই সমাপ্তি।

কুমার চক্রবর্তী
২৪ জানুয়ারি ২০০৬ ১১ মাঘ ১৪১২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ছোটোবেলায় একটি আত্মহত্যা দেখেছিলাম; মনে পড়ে, একাত্তর সালে যখন আমার বয়স বড়োজোর সাত বছর, ছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের একটি গ্রামে। একদিন শুনি যে একজন মহিলা বিষপান করেছে। কৌতূহলী অনেকের সাথে তাদের বাড়ির আঙিনায় গিয়ে দেখি, মানবমল গুলে মহিলাকে খাওয়ানো হচ্ছে। এর পেছনে কী নিদানিক কারণ ছিল জানি না, তবে সম্ভবত মলের গন্ধে যাতে আত্মহত্যাকারিণীর বমি হয় হয়তো এই উদ্দেশ্য ছিল বলে এখন মনে হয়। মহিলা কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গিয়েছিল। এরপর আরও কয়েকটি আত্মহত্যার ঘটনা শুনতে পেয়েছিলাম? পরিবারে যেটাকে অত্যন্ত ভয়ংকর ও চিন্তিত ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করতে দেখতাম; প্রতিবেশীরা একত্র হয়ে গম্ভীর-মুখে গোপনে সেটাকে নিয়ে আলোচনা করত আর অবশেষে বলত যে "অপমৃত্যু"? অনির্ণেয় মুক্তি। আত্মহত্যাকারীর পারলৌকিক ক্রিয়ায়ও হেরফের হয়ে যেত। বিষয়টি গভীরভাবে আলোড়িত করেছে আমাকে।

আমাদের ও অন্যান্য সমাজ আত্মহত্যা ব্যাপারটিকে কঠোরভাবে নিন্দনীয় ও অনুদ্ধারযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। খ্রিস্টানেরা একে ঈশ্বরের আদেশ অমান্যকারী এবং হত্যাসমতুল্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে; হিন্দুদের কাছে আত্মহত্যা মানে অপমৃত্যু যার মানে আত্মহতের আত্মার কখনও উদ্ধার নেই। আধুনিক রাষ্ট্রিক নিয়মও এর বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রাচীন গ্রিক ও রোমানদের মধ্যে ছিল আত্মহত্যার এক সৌম্য ও গ্রহণীয় রূপ—দেখা গেছে রাষ্ট্রও প্রয়োজনে আত্মহত্যার অনুমতি দিত। আদি খ্রিস্টানদের মধ্যেও একধরনের ছদ্মবেশী আত্মহত্যা ছিল গৌরবের। হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ ছিল ধর্মের কাজ; এই সতীদাহও একধরনের আত্মহত্যা। কিন্তু সময় এসেছে নতুন করে অবলোকনের। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বদলে দিতে শুরু করেছে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির। দাবি উঠেছে আত্মহত্যা-অধিকার সংরক্ষণের, পাশ্চাত্যে দেখা দিয়েছে "রাইট টু ডাই" আন্দোলন এবং ইউথেনাসিয়ার ধারণা; অনেক দেশে সংশোধিত হচ্ছে আইন। এখন আত্মহত্যা আর অ্যাটিমিয়া বা গৌরবহানি নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে গৌরবজনক ব্যাপার।

আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে যে, হুমায়ুন আজাদও আত্মহত্যাকে বলেছেন আস্তিত্বিক পাপ যা সত্যিই হাস্যকর মনে হয়। অথচ ডেভিড হিউম অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলেছেন, জীবনের ধ্বংসসাধন পাপকার্য হলে তার সংরক্ষণও পাপকাজ। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছামৃত্যুর বৈধতার কথাটিই এখানে অন্যভাবে বলেছেন। আত্মহত্যা একটি গভীর সংরাগময় কাজ যা ঘটতে পারে বিভিন্ন মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। শুরু থেকেই

~ www.amarboi.com ~

কবি-দার্শনিক-শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা গেছে এর প্রাবল্য। স্টোয়িকদের মধ্যে আত্মহত্যা সংঘটিত হতো আকছার। বিংশ শতাব্দীতে, লেখক-শিল্পীদের মধ্যে, আত্মহত্যা এক গভীর সংরাগ ও ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত—আত্মহত্যা তাঁদের কাছে এক মহত্তম ও গ্রহণীয় মৃত্যু-শৈলী।

মাত্রা শব্দটির অর্থ—মাত্রা সীমা বা পরিমাণ নির্দেশ করে; কখন কোথায় থামতে হবে বা পূর্ণচ্ছেদ টানতে হবে তার অনুজ্ঞা প্রদান করে। আমার কাছে আত্মহত্যাকারীদের মনে হয়েছে মাত্রামানব, যারা নিজ জীবনের মাত্রাকে ঠিক করে নেয়। তাদের জীবন ও মৃত্যু তাদের স্বশাসিত জীবন ও মৃত্যু; তারা আস্তিত্বিক চক্রকে পরিভ্রমণের অপেক্ষায় থাকে না বা তাড়িত হয় না আস্তিত্বিক পাপবোধে। প্রয়োজনে নিজেই নিজের অস্তিত্বের পূর্ণমাত্রা টানে। তারা প্রাকৃতিক মাত্রার অপেক্ষায় থাকে না। মাত্রাকে তারা নিয়ন্ত্রণ করে, যবনিকাপাত ঘটায় নিজ জীবনের; ফলে তারা মাত্রামানব।

এই গ্রন্থের লাইটমোটিফ আত্মহত্যা, তবে এর সাথে আলোচিত হয়েছে অন্য কিছু-সম্পর্কিত অনুষঙ্গ ও ভাবনা। সাহিত্যিকদের আত্মহত্যার ওপরও আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তু একই শুধু বিভাব ভিন্ন। বইটি একটি বিষয়ের ওপরেই লিখিত, শুধু কতিপয় শিরোনামে বিভক্ত করা হয়েছে মাত্র।

কুমার চক্রবর্তী

১ জানুয়ারি ২০০৫ ১৮ পৌষ ১৪১১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রবেশক

আত্মহত্যা তো সাধনার বিষয় হইতে পারে না,
আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি deliberetely suicide করতেই বসেছিলুম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন জানব যে আমার কষ্টের আর লাঘব হবে না,
তখন স্বইচ্ছায় জীবন থেকে সরে পড়ব।

সেনেকা

অনেক কিছুতেই মানুষ অন্য প্রাণী থেকে আলাদা, আর বোধ হয় আত্মহত্যার ক্ষেত্রেও সে আলাদা। কারণ একমাত্র মানুষই আত্মহত্যা করতে পারে। সম্প্রতি দেখা গেছে, অন্য অনেক প্রাণীর মধ্যে আত্মবধের ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়, এসব মূলত প্রবৃত্তির এক ধ্বংসযজ্ঞ, কিন্তু যাকে বলা হয় আত্মহত্যা, যার পেছনে কাজ করে মনের নিগূঢ় অভীপ্সা ও সিদ্ধান্ত এবং এক অজানা কারণ, তা বোধহয় মানুষের মধ্যেই ঘটে। প্রাণীদের মধ্যে সংঘটিত আত্মবধকে তাই কোনোভাবেই বলা যায় না আত্মহত্যা, কারণ তাতে থাকে না চৈতন্যতাড়িত প্রণোদনা। তবে ব্যাপকভাবে বললে মানুষ কেন আত্মহত্যা করে তার কারণ আজও এক অপার রহস্যে ভরা, এ এক লুক্কায়িত ব্যাকরণ, যার কারণ অনির্ণীতই থেকে যায়। টু বি অর নট টু বি—কেউ জানে না কেন এমন হয়, কেমন করেই বা হয়। কেন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন একজন তার জীবনসম্পত্তিকে এক অবহনীয় বোঝা ভাবতে শুরু করেন এবং তা অপসারণ করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন? কী এর কারণ যা ব্যক্তিকে যাবতীয় আকাঙ্ক্ষার ও প্রাপ্তির হাতছানি থেকে সরিয়ে নেওয়ার দুর্মর প্রেরণা জোগায়? তা কি কোনো হতাশা, ব্যর্থতা বা অন্য কোনো ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা, নাকি এক অরোধ্য সাহস যার বশবর্তী হয়ে ব্যক্তি প্রাপ্ত জীবন থেকে চিরকালের মতো চলে যেতে চায়! শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংঘটিত হয়েছে আত্মহত্যা—আত্মহত হয়েছেন রাজা, রানি, দার্শনিক, সৈনিক থেকে শুরু করে সব ধরনের মানুষ। নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এসব সংঘটিত ঘটনাকে, কিন্তু একেবারে মোক্ষম কারণটি হয়তো অব্যাখ্যাত রয়ে গেছে, এবং থাকবেও। বলা হয় আত্মহত্যা বরাবরই এক রহস্য সৃষ্টি করে, যার ফলে প্রকৃত কারণটি সংঘটনের পর অদৃশ্য হয়ে যায়, থাকে শুধু বিশ্লেষণনির্ভর কারণগুলো।

~ www.amarboi.com ~

আর একটি ব্যাপার, সময়ের সাথে সাথে আত্মহত্যা তার কারণকেও পরিবর্তিত করে, ফলে সময় এক্ষেত্রে ব্যাপ্তি ও রহস্য জোগায়। এ কারণেই প্রাচীন কালের আত্মহত্যা আর বর্তমান সময়ের আত্মহত্যা একই উদ্দেশ্য নিয়ে হাজির হয় না। প্রাচীন কালে যেখানে সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যর্থতা থেকে আত্মহত্যা সংঘটিত হতো, বর্তমানে একেবারেই ব্যক্তিক ব্যর্থতা থেকে ঘটে আত্মহত্যা। এজন্যই কাম্যু বলেছেন, বিংশ শতাব্দীর আত্মহত্যা মহৎ শিল্পকর্মের মতোই হৃদয়ের নীরবতায় সংঘটিত হয়। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর আত্মহত্যার ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়ে গেছে, করোটির এক গোপন-গভীর কারণেই ঘটে আত্মহত্যা। তার মানে প্রত্যেক স্বকালই আত্মহত্যার এক ধরনের কারণ নির্ধারণ করে দেয়। এজন্যই ক্লেওপাত্রার আত্মহত্যা আর ভার্জিনিয়া উল্‌ফের আত্মহত্যা একই মাত্রা বহন করে না। আর এজন্যই অন্যান্য সৃষ্টিশীল পদ্ধতির মতো আত্মহত্যাকেও দার্শনিক বিশ্লেষণের আওতায় এনে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। মনস্তত্ত্ববিদ মার্গারিট ফন অ্যানডিক্‌স আত্মহত্যার ইতিহাসকে তাই জীবনের অর্থহীনতাবিষয়ক দার্শনিক ঐতিহ্যের এক অংশ হিসেবে দাবি করেছেন। অনেকে মনে করেন, আত্মহত্যা কোনোভাবেই অর্থহীন নয়, কারণ এখানেও কাজ করে আশাবোধ, আত্মহত কাম্য জীবন পায়নি বলেই নিজের জীবনের ইতি টানে এই আশায় যে ভবিষ্যতে যেন এই কারণে কাউকে মরতে না হয়। সমাজ বা রাষ্ট্র হয়তো আত্মহত্যার ঘটনায় এসব অব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে সচেষ্ট হবে।

গ্রিক ও রোমানদের মধ্যে ধ্রুপদি আত্মহত্যা ঘটেছে প্রচুর। বহু বিখ্যাতদের আত্মহত্যায় মাত্রাপ্রাপ্ত সেই কাল, শত শত স্বেচ্ছামৃত্যুর ঘটনায় পূর্ণ প্রাচীন রোমান সাহিত্য। এবং আত্মহত্যার পক্ষেও ছিল সামাজিক এবং দার্শনিক সমর্থন। এজন্যই আত্মহত কবি লুক্রেতিয়ুস যখন বলেন, প্রতিটি মানুষই নিজের কাছ থেকে মুক্তি চায় কিন্তু পায় না, তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে কেন তিনি পরবর্তী সময়ে আত্মহত্যা করেন। আসলে আত্মহত্যা সম্ভাব্য এক রাস্তা, নিজ জীবনেরই সমাধানের এক অন্য পথ। তবে এটা ঠিক যে সে-সময়ে সামগ্রিকভাবে যে আত্মহত্যাকে গ্রহণীয় ভাবা হতো তা নয়। রাষ্ট্রীয় নীতিতে কখনও কখনও একে অগ্রহণীয়ও বিবেচনা করা হতো মারাত্মকভাবে, যদি তা রাষ্ট্রের জন্য বয়ে আনত সম্ভাব্য ক্ষতি। আবার অনেক সময় ভাবা হতো আত্মহত্যা এক হিংস্র মৃত্যু, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হতো না। কখনও কখনও আবার ইচ্ছাকৃত মৃত্যুকে অমরত্বের সাথে মিলিয়ে দেখা হতো। কিন্তু সে-সময়ে আত্মহত্যাকে প্রাকৃতিক নিয়মের বা ঈশ্বরের নিয়মের পরিপন্থি হিসেবে দেখা হতো না। গ্রিসে স্বেচ্ছামৃত্যু অন্যায় ছিল না কিন্তু এর পেছনে সুন্দর যুক্তি থাকার প্রয়োজন হতো। সব দার্শনিকই যে এর সমর্থক ছিলেন তা নয়, সোক্রাতেস ছিলেন নৈতিকভাবে এই প্রত্যাহারের পরিপন্থি। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি হলো: একটি নীতি গোপনে চুপি চুপি বলে বেড়ায় যে মানুষ হলো এক বন্দি, দরজা খুলে দৌড়ে যাবার যার কোনো অধিকার নেই: there is a doctrine whispered in secret that man is a prisoner who has no right to open the door and run away. কিন্তু তাঁর মৃত্যুকেও এক প্রচ্ছন্ন ধরনের আত্মহত্যা বলা হয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং এক্ষেত্রে প্লাতোনের অ্যাপলজিতে বর্ণিত তাঁর উক্তিকে বহুল উদ্ধৃত করা হয় it was better for me to die now and be delivered from trouble।

প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়ে যায়। খ্রিস্টধর্ম প্রভাবিত ইউরোপে আত্মহত্যা মহাপাপ হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে। এবং এই প্রবণতা ও চিন্তা দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান থাকে যতদিন-না সম্পূর্ণ চিকিৎসাগত ও সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক জায়গা থেকে এর বিশ্লেষণ শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে আত্মহত্যাসম্পর্কিত মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে শুরু করে মূলত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক নবচেতনার কারণে।

বিংশ শতাব্দীর জীবন পরিবর্তিত এক জীবন। একে বলা যায় মূলোৎপাটিত জীবন। নাগরিক জীবন এক গণ্ডগোলময় জীবন, এখানে সত্তার বিচ্ছিন্নতা আর তার কারণ এক গভীর ক্ষতের মতো। মেট্রোপলিস সৃষ্টি করেছে সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির এককাবস্থা, একে বলা যায় iron cage of modernity। বলা হয়, আধুনিক জীবন হলো full of specialist without spirit, sensualist without heart। নগরের বাসিন্দারা মেশিনের গিয়ারের চাকা।

নিট্‌শে যখন ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা করেন তখন আত্মহত্যাধারণার এক ধরনের দ্বৈতবোধের জন্ম হয় যা একদিকে এর অর্থময়তার উৎসকে হারায় আর অন্যদিকে তা প্রতিভাত হয়ে ওঠে অন্যতর অর্থময়তা হিসেবে। শুরু হয় ক্লিনিক্যাল বিষয় হিসেবে একে বিবেচনা করার, এবং ব্যক্তিকে পছন্দ করার অধিকার দেওয়ার দাবি উঠতে থাকে। একে বিবেচনা করা হয় ব্যক্তির হতাশা, অনির্দেশ্য অস্বাচ্ছন্দ্য, আত্মঘাতী অবস্থা, মৃত্যু দ্বারা তাড়িত সম্পর্কের সাথে। অনেকে একে আত্মনিয়ন্ত্রণের উদ্‌যাপন বলেও অভিহিত করেন।

আত্মহত্যার ওপর প্রথম ইংরেজি গ্রন্থটি লেখেন একজন কবি: জন ডান। বইটিতে ডান ধর্মের মধ্য থেকে এবং সেখান থেকে যুক্তি নিয়ে আত্মহত্যা যে পাপ নয়, এই প্রত্যয় উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। সমালোচকেরা তাঁর বইটিকে দুর্বোধ্য, কঠিন, দুষ্পাঠ্য ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। যা-ই হোক, ডান দেখাতে চেয়েছেন যে আত্মহত্যা সবসময় পাপ নয়। তিনি বলেছেন, প্রাকৃতিক নিয়ম আত্মহত্যাকে কোনো অবস্থায় বারিত করে না, মানুষের ভেতর মৃত্যুবরণের এক প্রাকৃতিক অভীপ্সা কাজ করতে পারে। ডানের বক্তব্যের সাথে মিল আছে ফ্রয়েডের ''বিয়ন্‌ড দ্য প্লেজার প্রিন্সিপলস''-এর। ফ্রয়েড বলতে চেয়েছেন, খাদ্যগ্রহণ বা যৌন আকাঙ্ক্ষার মতোই মানুষের মধ্যে মৃত্যু-অভীপ্সা কাজ করতে পারে যা নয় খারাপ বা পাপ। ডান জিশু খ্রিস্টের মৃত্যুবরণ করাকে বলেছেন perfect charity-র এক স্বেচ্ছামৃত্যু। তিনি বলেছেন, সব আত্মহত্যা নিরাশা, অননুতপ্ত বা অননুশোচনা থেকে হয় না, তাই তা পাপ হতে পারে না। কখনও কখনও আত্মহত্যা ঈশ্বর বা সৎ উদ্দেশ্যে হতে পারে। ডান তিন পর্বে বিভক্ত করেছেন তাঁর বইটিকে: অব ল অ্যান্ড নেচার, অব দ্য ল অফ রিজন, অব দ্য ল অফ গড। তিনি এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর আলোচনা প্রাণিত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এর পর আরও একজন বিখ্যাত লেখক লেখেন আত্মহত্যাবিষয়ক দার্শনিক সন্দর্ভ, তিনি হলেন ডেভিড হিউম। ডানের মতোই হিউমের রচনাও তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবত তিনিও বিষয়বস্তুর কারণে সমকালকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। হিউমের *এসেস অন সুইসাইড অ্যান্ড দ্য ইমমরটালিটি অব দ্য সোল* লেখা শেষ হয় ১৭৫৫ সালে এবং *ফাইভ ডিসারটেশন্স* রচনার অংশ হিসেবে তা ছাপা হয়। যখন বইটির প্রি-রিলিজ কপি প্রভাবশালী পাঠকদের মধ্যে বিতর্কের সূচনা করে, তখন হিউম ও তাঁর প্রকাশক দুটি প্রবন্ধ ছাপা কপি থেকে সরিয়ে নেন, তার পরিবর্তে ''অব দ্য স্ট্যান্ডার্ড অব টেস্ট'' নামক প্রবন্ধটি সংযুক্ত করা হয়। সরিয়ে নেওয়া প্রবন্ধগুলো পরে ফরাসি ভাষায় ১৭৭০ সালে এবং ১৭৭৭ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। ১৭৮৩ সালে হিউমের নামসহ অধিকতর প্রকাশ্যে প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়। যা-ই হোক, হিউম তাঁর ''অন সুইসাইড'' প্রবন্ধে আত্মহত্যাকে এক সমাধানের পথ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাইলেন। তিনি লিখলেন: ''যে মানুষ জীবন থেকে অবসর নেয় সে সমাজের কোনো ক্ষতি করে না: সে শুধু মঙ্গল কিছু করা থেকে নিজেকে বারিত করে...সমাজে মঙ্গল করার সবধরনের বাধ্যবাধকতাই প্রকারান্তরে পারস্পরিক কিছুকে বোঝায়। সমাজের সুবিধা আমি ভোগ করি, অতঃপর তাই সমাজের স্বার্থকে উন্নীত করতে চাই; কিন্তু যখন মোটের ওপর সমাজ থেকে আমি নিজেকে প্রত্যাহার করি, আমাকে কি কোনোভাবে ধরে রাখা সম্ভব?'' এত সব যুক্তি উপস্থাপনের পর তিনি বললেন মোক্ষম কথাটি:...''আমার নিজের জীবন ত্যাগ করা শুধু অপাপবিদ্ধই নয় বরং প্রশংসনীয় কাজ''। তারপর ''অন সুইসাইড'' প্রবন্ধের শেষে এসে তিনি বললেন

That suicide may often be consistent with interest and with our duty to ourselves, no one can question, who allows that age, sickness, or misfortune, may render life a burthen, and make it worse even than annihilation।

এটা তো ঠিক, যে জটিল ও কঠিন পদ্ধতি ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে তা যে-কোনো কারণেই হোক তার জীবনের জটিলতাগুলোর সাথে একীভূত হয়ে যায়। জীবনের বেঁচে থাকার সূত্রগুলো তখন মৃত্যুর সূত্রে পরিণত হয়। এটা হয়তো অন্যের সাথে মিলবে না। যে যুক্তি ও প্ররোচনা আত্মহতের ছিল, তা অবশ্যই ছিল বদ্ধ, অনমনীয় ও একগুঁয়ে। এটা সমাপতন নয়; বিভিন্ন সময়ে যুক্তিগুলো অচ্ছেদ্য শেকল রচনা করে এবং একসময় ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। অতএব আত্মহতের যুক্তিগুলো, বলা যায়, তারই একান্ত যুক্তি। এটা একজনেরই যুক্তি। আত্মহত্যার দার্শনিক যুক্তি দিতে চেয়েছিল স্টোয়িকেরা রোমানেরা গ্রিকেরা, কিন্তু তাকে শাশ্বত অর্থে যৌক্তিক ভাবার স্থান আছে কি না তা-ও ভেবে দেখার বিষয়, এবং তা এক মারাত্মক প্রশ্নও। যে বুদ্ধ-দর্শনকে দুঃখবাদী দর্শনের প্রতিভূ ধরা হয়, তার জনক গৌতম বুদ্ধও সাধনার এক পর্যায়ে শরীর পাতনের পথ ত্যাগ করে তাকে রক্ষা করার কথা বলেন, কারণ শরীর তাঁর কাছে মনে হয়েছে মাধ্যম যা ছাড়া সাধনা সম্ভব নয়। অতএব আত্মহত্যার যুক্তিকে অমোঘ ভাবার সুযোগ নেই বরং একে ভাবলেও ভাবা যেতে পারে ব্যক্তির রুদ্ধ ও অসংশোধিত এক যুক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অডেন বলেছেন, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কর্ক-স্ক্রুর মতোই প্যাঁচালো। অর্থাৎ আত্মহত্যার যুক্তি সরল নয় বরং অতীব জটিল। এই যুক্তি উত্তরহীন। কেউ একজন যখন নিজের জীবন নিতে মনস্থ করে, তখন তার নিজস্ব যুক্তিগুলো দানা বাঁধতে শুরু করে। এগুলো অন্য মানুষের যুক্তির সাথে কোনোভাবেই মোকাবিলা করে না। এর ফলে এগুলো হয় অনড়, নিভৃত ও হেঁয়ালিময়। তবে যুক্তিগুলো ধীরে ধীরে হয়ে পড়ে আরও শক্তিশালী এবং সংশোধনের অতীত। যুক্তিগুলো মনকে করে তোলে বদ্ধ, দুর্ভেদ্যময় ও ফলাফলমুখী। শুধু তা-ই নয়, যুক্তিগুলো ব্যক্তিকে করে তোলে সংরাগী। তবে যেহেতু এই যুক্তিগুলো অন্যের যুক্তির সাথে মোকাবিলা করে না, করে না আলাপ বা বিতর্ক, তাই এই একপেশে যুক্তিগুলোকে অনেকে বলে থাকেন অমঙ্গলময়। তবে ফ্রয়েড আত্মহত্যাকে এক তীব্র আবেগের ফলাফল হিসেবে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, বিপরীতমুখী দুটি বিষয় হলেও প্রেম ও আত্মহত্যায় অহম্ উদ্দেশ্য দ্বারা অভিভূত থাকে, যদিও তার স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নে তৎপর হয় চরমভাবে। ফ্রয়েড তাঁর বিখ্যাত লেখা *বিয়ন্ড দ্য প্লেজার প্রিন্সিপলস*-এ বলেন, অহম্-প্রবৃত্তি মৃত্যুর দিকে ধাবমান আর যৌন-প্রবৃত্তি জীবনের দিকে। অহম্-প্রবৃত্তি উৎসারিত হয়ে থাকে নির্জীব বস্তুর উজ্জীবনের সূত্রে আর এর ফলাফল হয় জীবনহীনতার সম্পাদন।

জ্ঞানতাত্ত্বিক জায়গা থেকে অনেকে স্পষ্টভাবেই আত্মহত্যার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা বলতে চেয়েছেন, সত্তার যে নিজস্ব বহমানতা তাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মানে হলো সত্তার বিরুদ্ধে কাজ করা। তাঁদের মতে অনস্তিত্বের কাছে যাওয়ার চেষ্টা হলো অস্তিত্বগামী সত্তার বিপরীত কাজ এবং এজন্যই তা অস্তিত্ব-সহায়ক নয়। ফলে তা করা বা করার চেষ্টা করা অর্থহীন। আর অর্থহীন বলেই তা আস্তিত্বিক অর্থে অনৈতিক। দার্শনিক হ্বিটগেনস্টাইন—যাঁর তিন ভাই হান্স, কুর্ট্ ও রুডলফ্ আত্মহত্যা করেছিল—অনেকটা বিরোধাভাসের ছলে যা বলেছেন তা এ চিন্তারই অপর প্রতিফলন: যদি আত্মহত্যা অনুমোদিত হয় তবে সবকিছুই অনুমোদিত If suicide is allowed then everything is allowed. If everything is not allowed then suicide is not allowed. This throws a light on the nature of ethics, for suicide is, so to speak, the elementery sin. And when one investigates it is like investigating murcury vapours in ordor to investigate the nature of vapours.

জীবনবাদীরা মনে করেন, আত্মহত্যা বা মৃত্যু জীবনের বিকল্প হতে পারে না। এমনকি যিনি বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর পর কিছুই নেই, তার জন্যও মৃত্যু বিকল্প হতে পারে না, কারণ শূন্যতা কোনোভাবেই জীবনের বিকল্প নয়। ১৯৪০ সালে আলব্যের কাম্যু যখন তাঁর বিখ্যাত *সিসিফাসের মিথ* লেখা শুরু করেন তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে অসুস্থ ও হতাশায় নিমজ্জিত, সবেমাত্র প্যারিসের পতন হয়েছে, কিন্তু তিনিও আত্মহত্যা দিয়ে শুরু করে অবশেষে তাকে সমাধান হিসেবে মেনে নেন না। প্রচণ্ড কষ্ট আর নির্যাতনে থেকে আত্মহত্যার কথা ভেবেও তাই রুশ কবি ওসিপ মান্দেলস্তাম বলেন, জীবন হলো এক উপহার যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কেন আত্মহত্যা বা কেন নয় আত্মহত্যা—এ দুটি বিষয়ের সাথেই আছে জীবনদর্শনের অন্তর্ব্যাপ্তি। অনেকে জীবনকে নেন উপহার হিসেবে, অনেকে নানা বিরুদ্ধমুখী অনুভূতির মধ্যেই খুঁজে নিতে চান জীবনের সারাৎসার। হেনরি জেমস বলেছেন—জীবন প্রকৃতপক্ষে এক যুদ্ধ, এখানে মন্দ অতি শক্তিশালী ও উদ্যত, সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর হলেও দুর্লভ; শুভত্ব যেন বাস্তবিকই দুর্বল, কাণ্ডজ্ঞানহীনতাও বেপরোয়া, সবসময়ই চাতুর্যের খেলা; আহাম্মকরাই এখানে শ্রেষ্ঠ জায়গায় অধীন, প্রকৃত বোধসম্পন্ন লোক নেই বললেই চলে; মানুষ মাত্রই অসুখী, কিন্তু তাই বলে পৃথিবী অলীক কোনো কিছু নয়, কোনো বিভ্রম নয়, রাতের কোনো খারাপ স্বপ্নও নয়; মানুষ এর মধ্যেই বেঁচে ওঠে বার বার; মানুষ না পারে একে ভুলতে, না পারে অস্বীকার করতে, না পারে পরিহার করতে। হেনরি জেমস এখানে যা বলেছেন তার সাথে মিল আছে কাম্যু-কথিত নিরর্থকতাকে নিয়ে বাঁচার উপলব্ধির বা কিয়েকেগার্দ কথিত নান্দনিক হতাশার কথার, যার মর্ম সবকিছুকে নিয়ে বেঁচে থাকার সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় জীবনকে গ্রহণ করে যেতে হয়। কিন্তু এর পেছনেও নান্দনিকতা থাকে না যখন জীবনকে বহন করার মানে দাঁড়ায় অন্তহীন কষ্টকে টেনে নিয়ে যাওয়া।

মঁতেন বলেছেন, যত ভোগান্তি তত পরিত্রাণের উপায়। অর্থাৎ জীবনে ভোগান্তি থাকলে এবং তা অনিবার্য বলে বোধ হলে যে-কেউ তার থেকে রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করতে পারবে। যুক্তি জীবনকে চালায় কিন্তু এটাই সত্য যে মানুষের যুক্তি তার মনগড়া। আর এটা আরও সত্যি যে মানুষ সিকি ভাগই যুক্তিশীল। আমরা বলতে পারি, আত্মহত্যা একান্তভাবেই ব্যক্তির এক ব্যক্তিগত কাজ, তবে সংঘটনের সাথে সাথেই তা সামাজিক প্রপঞ্চে পরিণত হয়। আত্মহত্যা হলো মুদ্রার মতো যার একদিকে মৃত্যু আর অন্যদিকে জীবন ও যাপন। যুক্তি নয়, এটা মানুষের অন্তর্গত গভীর অভীপ্সার সাথে বিজড়িত এক তাড়না যা আসে রহস্যময় অন্তঃপুর থেকে। এতে সমাজে ক্ষতের আর সভ্যতায় অভিঘাতের সৃষ্টি হয়। সম্ভবত আত্মহত্যা হচ্ছে ব্যক্তির একক মারাত্মক ও নীরব দ্রোহ যা মানুষের ইতিহাসে ছিল, আছে ও থাকবে। স্বর্গে মৃত্যু থাকবে না, এই কারণেই সম্ভবত আত্মহত্যার চেষ্টা থাকবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবন ও মৃত্যু

জীবন কী? কেউ জানে না। কেউ জানে না
কোথা হতে তা উৎসারিত, কোথায়
তা প্রজ্বলিত। জীবনের এলাকায়
কোনোকিছুই অহেতুসম্ভব নয়, অথবা অপরিপূর্ণভাবে
হেতুসম্ভব এই জায়গা থেকে; কিন্তু জীবন
নিজে কার্যনির্ণয়াত্মক ছাড়াই প্রতিভাত। যদি
জীবন সম্পর্কে কিছু বলার থাকে, তা হলো এই:
তা এমন উচ্চপর্যায়ে সুগঠিত ও উন্নীত যে এমনকি
অজৈব জগতে প্রতিভাত
কোনোকিছুই তার সাথে দূরবর্তীভাবে সম্পর্কিত
নয়।

টমাস মান

মৃত্যু হলো জীবনের প্রতি একমাত্র
যৌক্তিক অস্বীকার।

টমাস মান

অনুমতি দাও আরও কিছুকাল বাকি
বিশাল বিশ্বে, বিস্ফারি দুই আঁখি;
ডেকো না মরণে, এখনই সন্নিধানে

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"জীবন কী? কেউ জানে না।"[১]—*দ্য ম্যাজিক মাউন্টেন*-এ বলেছেন টমাস মান। জীবনকে জানার আগে, তার সম্পৃক্ততায়, জগৎকে জানা জরুরি হয়ে ওঠে; কারণ, জীবন ছাড়া জগৎ সম্ভব কিন্তু জগৎ ছাড়া জীবন সম্ভবাতীত। জগতের এই লীলাখেলায় সৃষ্টিধর্মিতার সাথে-সাথেই আছে সৃষ্টিনাশিতার আশঙ্কা। জীবন ও জগৎ মূলত সৃষ্টিস্থিতিলয়ে আবদ্ধ। জগতের একটু ক্ষুদ্র অংশে আছে জীবন। জগৎ, মহাজগৎ, তারকারাশি, কনস্টেলেশন, গ্রহমণ্ডলী, স্টেলার অবজেক্ট, গ্যালাক্সি, আকাশগঙ্গা, সুরগঙ্গা, উদ্ভিদবিশ্ব, প্রাণিবিশ্ব, মানববিশ্ব—সবকিছুরই জন্য অপেক্ষা করছে মহাবিনাশ। জীবন, মহাজীবন, অস্তিত্ব, প্রজনন, বিস্তার, ধ্বংস, সুখ, দুঃখ, সৃষ্টিশীলতা—সবকিছুরই জন্য অপেক্ষা করছে মহাবিনাশ। জীবন ও জগৎ—উভয়েরই পরিণতি বিনাশে। কিন্তু বিনাশের আগ পর্যন্ত জীবনের মতোই মহাবিশ্বও প্রসারণশীল। প্রসারণ কি ধ্বংসের রূপক? আইনস্টাইন তাঁর যুগান্তকারী আপেক্ষিকতা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তত্ত্বে দেখান যে, এই মহাবিশ্ব প্রসারণশীল। তিনি কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট জুড়ে মহাবিশ্বকে স্থির করেন। রুশ পদার্থবিদ আলেকজান্দার ফ্রিডম্যান প্রথম তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করলেন যে মহাবিশ্ব প্রসারণশীল। তিনি আরও দেখালেন, মহাবিশ্ব সীমানাহীন এবং স্থানকালে সুনির্দিষ্ট। স্টিফেন হকিং মহাবিশ্ব সৃষ্টির ধারণাকে বাতিল করে দেন এবং দেখান, মহাবিশ্ব সৃষ্টিও হয়নি ধ্বংসও হয়নি, তা "উদ্ভূত" মাত্র। অতএব সৃষ্টিকর্তা কোথায়? সংক্ষেপে তিনি উত্তর দিলেন "ঈশ্বর নেই।"[২]

মহাবিশ্বের মতোই জীবনের শুরু সৃষ্টিতে, আর শেষ বিনাশে। জীবন মূলত বিনাশের পূর্বের এক অসাধারণ উদ্ভাসিত রূপ, যা মৃত্যুতে শেষমেশ বিলীন হয়। প্রাণের উদ্ভবই হয় বিনাশের ললাটরেখা নিয়ে। অন্যদিকে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, দূর থেকে দূরতর অবস্থায় চলে যাচ্ছে গ্যালাক্সিগুলো। স্থান-কালের এই এক গতিশীল অবস্থার ভেতর প্রাণের উদ্ভব। তবে জড়বিশ্ব থেকে প্রাণের উদ্ভবটি অনেককে আশ্চর্যান্বিত করে; আধুনিক মত অনুযায়ী অচেতন পদার্থ থেকে জীবনের উৎপত্তি স্বীকৃত, এবং প্রাণের উদ্ভবও স্বতঃস্ফূর্ত। একটি জড় মহাবিশ্ব আর তার অতি ক্ষুদ্র এলাকাতে কীভাবে প্রাণের বিকাশ ঘটাল এবং কীভাবে তা অবশেষে প্রাণবিশ্ব হয়ে উঠল, তা সত্যিই আশ্চর্যের। কেন প্রাণের সৃষ্টি হলো তা আরও আশ্চর্যের ও রহস্যের ব্যাপার। বস্তুর বা জড়ের নিয়ত বিন্যাস ও বিবর্তনের এক পর্যায়ে প্রাণের উদ্ভব এবং পরবর্তীকালে এর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার; এছাড়াও প্রাণের বিকাশে উত্তরোত্তর সক্রিয়তা ও অস্তিত্ব-স্বাতন্ত্র্য আরও বেশি আশ্চর্যের। কীভাবে প্রাণের উদ্ভব হলো, এই প্রশ্ন অপেক্ষা কেন হলো এটা আরও বেশি ভাবায় চিন্তাশীল মানুষকে। আর প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ততাও অনন্যসাধারণ ঘটনা। এই পৃথিবী, মহাবিশ্বের একটি ক্ষুদ্রতম এলাকা, প্রাণহীন অবস্থায় ছিল দীর্ঘকাল; কিন্তু ধীরে ধীরে তা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল প্রাণে—প্রাণীতে, উদ্ভিদে। জীবনের উৎপত্তি নিয়ে আছে বিভিন্ন ধারণা। অনেকে মনে করেন, স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াতেই প্রাণ দেখা দিয়েছে। তবে যেভাবেই ঘটুক না কেন, সৃষ্টির পর থেকেই পৃথিবী স্বতশ্চল ছিল প্রাণ সৃষ্টির ক্রিয়ায়। মোটামুটি যদি ধরা হয় যে, পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে চার-ছয় বিলিয়ন বছর আগে, তাহলে দেখা যায় প্রাণেরও উদ্ভব হয়েছে চার বিলিয়ন বছর আগে। অজৈব বস্তুসমূহ থেকে জৈবযৌগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া রহস্যময় হলেও বস্তুর মধ্যে প্রাণের বিকাশ অনিবার্য কি না সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

জীবনকে সংজ্ঞার্থ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, তবে তাকে অনুভব করা খুবই স্বতঃস্ফূর্ত এক উপলব্ধি। জীবনের সংজ্ঞার্থ অনুধাবন করতে গিয়ে ধন্দে পড়েছিলেন বিজ্ঞানী এলভিন শ্রোয়েডিঙ্গার। তিনি বলেছিলেন, জীবনের সংজ্ঞা দেওয়া আসলেই এক "সুস্পষ্ট অসমর্থতা"। অসাধারণ বলেছিলেন তিনি। তিনি বলতে চেয়েছেন, স্থান-কালের ভেতরে যে-সব ঘটনা ঘটছে জীবসত্তার মধ্যে, তাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আনা কি আদৌ সম্ভব, যদি তা হয় এক চলিষ্ণু প্রাণপ্রেতির ব্যাপার? সত্যিই তাই। কারণ এত বেশি তা বিস্তৃত এবং ব্যাপক যে, তার সংজ্ঞার্থ অন্বেষণ করা এক অর্থে পণ্ডশ্রম। প্রকৃতপক্ষে জীবন কী? মানুষ, প্রাণী, জীবজন্তু, বৃক্ষ, উদ্ভিদ—সবই আত্মপ্রকাশ করে আবার সুনির্দিষ্ট সময়ের পরিক্রমণে তা পৃথিবী থেকে অপসৃত হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্ষণজীবী পতঙ্গ বিকেলে জন্ম নেয়, সন্ধ্যায় সঙ্গম করে, রাতে ডিম পাড়ে, আর সূর্যোদয়ের আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই তার জীবন; ক্ষণস্থায়ী হলেও পূর্ণ। আবার কোনো কোনো প্রাণী পরিবর্তিত হতে হতে বেঁচে থাকে দীর্ঘকাল, এমনকি হাজার বছরের কাছাকাছিও। আবার অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতীপ রূপান্তর। যা-ই হোক না কেন, স্বাভাবিক জীবনের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় এক স্বতঃস্ফূর্ত ও সচেতন উপস্থিতির, তেমনি তার পাশাপাশি পৃথিবীতে অব্যক্ত জীবনেরও দেখা মেলে। দীর্ঘকাল এক অপেক্ষায় থাকে এ জীবন, সুপ্ত থাকে নিজের ভেতর, কখনও পূর্ণভাবে বিকশিত হয় না। অব্যক্ত জীবন বড়ো দুঃখজাগানিয়া;—যারা ব্যক্ত হতে পারত, যারা হতে পারত প্রাণবন্ত এবং উচ্ছ্বাসময়, তারা স্থবির ও অবিকশিত হয়ে আছে প্রকৃতির অমোঘ খেয়ালিপনায়। যারা হতে পারত সৃষ্টিশীল তারা অনেকটা অপসৃষ্টি হয়ে আছে। এ এক প্রাচীন বেদনা। কিন্তু অব্যক্তেরও সৌন্দর্য আছে, থাকতে পারে। অনেক কিছু অব্যক্ত বলেই হয়ে ওঠে সুন্দর, রহস্যময় বলেই শিল্পিত। জীবনের তাৎক্ষণিক ভঙ্গুরতা যেমন আছে, তেমনি দীর্ঘকালীন স্থিতিস্থাপকতাও আছে। জীবন বিবর্তনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং মূলত একটি থেকে অন্যটিতে আশ্লিষ্ট হয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন—"সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন।"[৩] তাই জীবন যে আসঙ্গলিপ্সু ও সমাশ্রিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। জীবন সৃষ্টিশীল, বহুপ্রজময় এবং ব্যাপক বিশাল। আর তা বলেই জীবনের সংজ্ঞার্থ দেওয়া এক অসমর্থতা।

প্রাণবৈচিত্র্য অনুধান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে জীবন ও মৃত্যু। বহু কবিতায় এ বিষয়ে তাঁর আবেগ এবং সংরাগ আমরা দেখতে পাই; কখনও এই আবেগ ক্ষণস্থায়ী, কখনও বা দীর্ঘস্থায়ী। এ সংক্রান্ত তাঁর অসংখ্য কবিতার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে মরণ (*ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*), প্রাণ (*কড়ি ও কোমল*), মৃত্যুর পরে (*চিত্রা*), প্রাণ (*নৈবেদ্য*), জন্ম (*নৈবেদ্য*), মৃত্যু (*নৈবেদ্য*), মরণমিলন (*উৎসর্গ*), জন্ম ও মরণ (*উৎসর্গ*) প্রভৃতি। *কড়ি ও কোমল* কাব্যের "প্রাণ" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত" আবার *নৈবেদ্যর* অন্তর্ভুক্ত "প্রাণ" কবিতায় বলছেন, "প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়।" অর্থাৎ প্রাণের প্রবহমানতা আর প্রমত্ততায় তিনি মুগ্ধ; হয়তো বের্গসনের গতিবাদ তাঁকেও আকৃষ্ট করেছিল। প্রাণপ্রেতি, প্রাণবৈচিত্র্য আর তার আসঙ্গবিভূতির মধ্যে তিনি দেখেছেন জন্মমৃত্যুর যৌথ অস্তিত্বকে, আর তাতে তিনি মুগ্ধ, আলোড়িত। তাই *নৈবেদ্যর* "প্রাণ" কবিতায় তিনি বলেছেন:

> বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু—সমুদ্র দোলায়
> দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
> করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
> অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।

এই "চিরতরঙ্গিত" "প্রাণতরঙ্গমালা"য় মুখরিত পৃথিবীকে রবীন্দ্রনাথ ভালোবেসে ছিলেন অন্তরঙ্গভাবে, তাই তিনি বলেছেন, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।"[৪] জীবনমৃত্যুর বৈপরীত্য নয়, বরং এই দুয়ের সম্পূরণকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন:

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয় জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে, পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাইবোনের মতো খেলা করে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গরঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে, আমাদের কোন ভয় থাকে না; কিন্তু বদ্ধ-মৃত্যু রুদ্ধ-ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। মৃত্যুর গতি সেখানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে একতালে নৃত্য করে, সেখানে মৃত্যুর জীবন আছে, সেখানে মৃত্যু ভয়ানক নহে।"[৫]

মৃত্যু কী? মৃত্যু হলো শারীরিকভাবে জীবনের সকল প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের অবলুপ্তি। মৃত্যু হলো জীবনের এক ওল্টানো নিবৃত্তি। মৃত্যু হলো চলমান দৃশ্যের অবসান। মৃত্যু হলো উদ্দীপনের সমাপ্তি। মৃত্যু ঘটে মূলত বিভিন্ন পর্যায়ে। শারীরিক (সোমাটিক) মৃত্যু হলো মোটের ওপর জীবগত মৃত্যু, অধুনা মস্তিষ্কের মৃত্যুকেও এক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। একসময় মৃত্যুকে বিবেচনা করা হতো মানব-শরীরের জৈবিক কার্যাবলির অপনোদনের দিক থেকে—নিশ্বাসক্রিয়া থেমে যাওয়া এবং রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাওয়া। কিন্তু এখন এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে, কারণ এখন কৃত্রিমভাবে এই দুই ক্রিয়াকে চালু রাখা সম্ভব। এখন মস্তিষ্কের মৃত্যুকেই, মস্তিষ্কক্রিয়ার অপরিবর্তনীয় স্থায়ী ক্ষতিকেই মৃত্যুর লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধেও অনেকে বলেছেন যে, মৃত্যু হলো সচেতনতার বা সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সক্ষমতার স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ ক্ষতি। অনেকে মানসিক কার্যসম্পাদন-ক্ষমতা হারায় কিন্তু তার মস্তিষ্কক্রিয়া কিছুটা হলেও বজায় থাকে। এই মতানুযায়ী, মৃত্যু হলো মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রের, বিশেষত, নিউকর্টেক্সের কর্মহীনতা। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আত্মা দেহকে ত্যাগ করে তখনই মৃত্যু হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। মৃত্যু নিয়ে সামাজিক ধারণাও এখন অগ্রসরমাণ। অনেকে ভাবেন, মৃত্যুর মান বা নীতিমালা কে নির্ধারণ করবে—চিকিৎসক, নীতিপ্রণেতা নাকি ব্যক্তি নিজে? মানুষ নিজের মৃত্যুর ক্ষেত্রে কি এই নীতি ঠিক করতে পারে? এক্ষেত্রে অনেকে মনে করেন, প্রত্যেকের নিজ মৃত্যুর অধিকার থাকা উচিত এবং তা হওয়া উচিত ব্যক্তির বেঁচে থাকাকালীন সম্পাদিত ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে। ব্যক্তির ইচ্ছাপত্রে স্পষ্ট থাকতে পারে তার মৃত্যুর উপায় বা ক্ষণ।

মৃত্যুবিশারদ বা থ্যানাটোলজিস্টরা[৬] কতকগুলো পর্যায়কে চিহ্নিত করেছেন যার ভেতর দিয়ে একজন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যেতে হয়, আর সেগুলো হলো প্রত্যাখ্যান ও বিচ্ছিন্নতা (না, আমি নেই, আমার কোনো অস্তিত্ব নেই); ক্ষোভ, রাগ, ঈর্ষা ক্ষুব্ধতা (কেন আমি আছি?); দর কষাকষি (যদি আমি ভালো হই, তাহলে কেন আমি বাঁচব না?); অবসাদ (বাঁচার কী উপযোগিতা?) ইত্যাদি। অনেকে মনে করেন, এই পর্যায়গুলো কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণীর ক্রমানুযায়ী ঘটে না, এগুলো অনুভূতি, আশা ও ভীতির সাথে অবিমিশ্র থাকতে পারে। আত্মার নিষ্ক্রমণকে মৃত্যু হিসেবে বিবেচনা করে ধার্মিকেরা। অন্যদিকে শারীরমৃত্যুর অগ্রবর্তী হিসেবে ঘটে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মৃত্যু: হৃদ্‌স্পন্দন বা শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে যাওয়া, চলচ্ছক্তিহীন হওয়া, মস্তিষ্কের ক্রিয়া থেমে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু শারীরমৃত্যুকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, শরীরের অঙ্গসমূহেরও স্থায়ী মৃত্যুর সময়সীমা রয়েছে: যেমন মস্তিষ্ক-কোষ শরীরের মৃত্যুর পর পাঁচ মিনিটের বেশি বাঁচতে পারে না; হৃৎপিণ্ডের কোষ পনেরো মিনিটের বেশি ও বৃক্ক-কোষ তিরিশ মিনিটের বেশি বাঁচতে পারে না। এজন্যই অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে মৃতের শরীর থেকে তা তাড়াতাড়ি সরিয়ে জীবিতের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়। শারীরমৃত্যুর পর মৃতদেহে কিছু পরিবর্তন আসে, যেমন আলগোর মর্টিস—মৃত্যুর পর শরীর শীতল হয়ে যাওয়া, রিগোর মর্টিস—মাংসপেশি শক্ত হয়ে যাওয়া (পাঁচ থেকে দশ ঘণ্টার মধ্যে শুরু হয়, তিন বা চারদিন পর শেষ হয়ে যায়), লিভোর মর্টিস—রক্ত জমাট ও ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া। অতএব দেখা যায়, মৃত্যু একসাথে একাধিক ও একাধিক সূত্রে এক। মৃত্যু মানে শরীরের মৃত্যু, শরীরের মৃত্যু মানেও আবার অঙ্গের মৃত্যু।

ক্রন্দসী কাব্যগ্রন্থের "সৃষ্টিরহস্য" কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, "হয়তো মানুষ মরে, কিন্তু তার বৃত্তি বেঁচে রয়"। মৃত্যুর পরও কর্মের অমরত্বের বিষয়টির ওপর ইঙ্গিত করেছেন কবি। কিন্তু মৃত্যু সমাপ্তি টানে জীবনের ওপর; অস্তিত্বকে অস্তিত্বহীন করে। ব্যক্তির ক্ষেত্রেই মৃত্যু সম্ভব: সমগ্রের ক্ষেত্রে মৃত্যু নেই। মৃত্যু জীবনের মতোই একক ও একাকিত্বময় অভিজ্ঞতা! একজনের মৃত্যু অন্যজনের জন্য সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় একজনের জন্ম অন্য কারও করার। মৃত্যুর মাধ্যমেই ব্যক্তি জগৎ থেকে চলে যায়। মৃত্যু তাই এক সম্ভাবনা। মানুষ মৃত্যুর কাছে নিক্ষিপ্ত, মানুষ এই সম্ভাবনাতে নিক্ষিপ্ত। মৃত্যু মানুষের অস্তিত্বের অনিবার্য সম্ভাবনা এবং তা শর্তহীন। মৃত্যু হলো জগতের কাছে এবং নিজের কাছে অস্তিত্বহীন হওয়া—সে ছিল এখন নেই, আমি ছিলাম আমি নেই, তারা ছিল তারা আর নেই। মৃত্যু সম্পর্কে বলা যায়, মানুষের জন্য এমন কিছু অপেক্ষমাণ যা এখনও হয়নি, অবশিষ্ট রয়েছে; অবশিষ্টটুকুর সমাপ্তিতে আর কিছু থাকে না। এটা এমন কিছু যা অন্য কারও ক্ষেত্রে হতে পারে না। মৃত্যু হলো মানুষের এমন একটা কিছু এখনও যা হয়নি। জন্মের পর থেকেই মানুষ মৃত্যু নিয়ে আছে, মানুষ মৃত্যু-অভিমুখী। মৃত্যু এক সম্ভাবনা কিন্তু মানুষ এই সম্ভাবনাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করে। প্রাত্যহিকতার আবর্তে সে ভুলে যায় যে মৃত্যু তার অন্তিম শর্তহীন সম্ভাবনা, যেহেতু তার সংঘটনের সময় অনিশ্চিত, আর এই অনিশ্চয়তার জন্যই মৃত্যুকে নিয়ে মানুষ উদাসীন থাকে। কিন্তু এই অনিশ্চিত-নিশ্চিতকে ভুলে মানুষ যথার্থ অস্তিত্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হাইডেগার তাই বলেন, মৃত্যু মানুষের এই অনিবার্য সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে। সম্ভাবনার হাত ধরেই মানুষ তার সত্তাকে বুঝতে পারে যে, মৃত্যুই তার অস্তিত্বলোপকারী। মৃত্যুর অনিশ্চয়তা মানুষকে উদ্বেগের মধ্যে ঠেলে দেয়। মৃত্যু হলো ব্যক্তির এক শর্তহীন সম্ভাবনা। এই সম্ভবনা হলো অন্তর্হিত হওয়ার সম্ভাবনা। মানুষ এই সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যায়, মৃত্যু মানুষের কাছে উদ্বেগ নিয়ে আবির্ভূত হয়। ব্যক্তি তার যূথবদ্ধ জীবন থেকে আলাদা হয়ে যায় মৃত্যুর দ্বারা; ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুই স্বাতন্ত্র্য, কারণ একজনের মৃত্যু অন্যজন বরণ করতে পারে না। হাইডেগার মৃত্যুকে বলেছেন সম্ভাবনা, তিনি বলেছেন মৃত্যুকে মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভুলে থাকতে চায়। কিন্তু মৃত্যু সম্ভাবনা হলেও, হাইডেগারের ভাষায়, তা এক বিকল্পহীন সম্ভাবনা, কারণ সম্ভাবনার একাধিক বিকল্প থাকে কিন্তু মৃত্যুর কোনো বিকল্প হয় না, তা অমোঘ ও অনিবার্য। অতএব বলা যায় মৃত্যু এক পরিণতি বা ঘটনা।

মৃত্যুকে নিয়ে সংশয়ে ভুগেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাকে অজ্ঞাত ভেবে চিন্তা করে ভয়ার্ত হয়ে উঠেছেন তিনি কখনও কখনও মৃত্যু অজ্ঞাত মোর/আজি তার তরে/ ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ওরে।[৭] কিন্তু পাশাপাশি অবশেষে সান্ত্বনা খুঁজেছেন, স্বস্তি পেতে চেয়েছেন তার নতুন ব্যাখ্যা খুঁজে; দিতে চেয়েছেন একে মাধুরী, দার্শনিকতায় প্রমিত করতে চেয়েছেন মৃত্যুকে:

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।[৮]

"এক শুভ দৃষ্টিপাতে" মৃত্যুর সাথে মিলনের কথা বলেছেন তিনি, যৌবনেও একবার বলেছিলেন, "ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে/বেঁধেছিস বাসা।" কিন্তু কখনও কখনও তিনি ভেবেছেন জীবনেরই কথা, মৃত্যু সেখানে স্রোতের শ্যাওলা মাত্র: "এ জগতের অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টিকিয়া থাকিতে পারে না।"[৯] আবার কখনও জীবন ও মৃত্যু—দুটিকেই অনিত্য ভেবেছেন: "পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। ... জীবন যেমন আসে জীবন তেমনি যায়। মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়।"[১০] রবীন্দ্রনাথ নিয়ম হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন মৃত্যুকে এবং এই বোধ জীবনের প্রথমেই তিনি পেয়েছিলেন। এ জন্যই ১৮৮৪ সালে, যখন তাঁর বয়স ২৩ বছর, প্রকাশিত কাব্য *ছবি ও গান*-এর "রাহুর প্রেম" কবিতায় তিনি এ বিষয়ে উপসংহার টানেন:

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে, আশার পিছনে ভয়—
ডাকিনীর মতো রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধ'রে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরাময়।

মৃত্যুর মাধুরীতে মুগ্ধ হতে চেয়েছেন সুধীন্দ্রনাথও, তিনি তাই বলেছেন, "মৃত্যুর মাধুরী কিন্তু বাকি আছে, এসো আজ তাতে/আমাদের অমরা সাজাই।"[১১] কিন্তু এই মুগ্ধতা কি সান্ত্বনাবশত? *ক্রন্দসী*র "প্রত্যাখ্যান" কবিতায় তিনি বলছেন, "চাহি না মৃত্যুরে আমি; স্বপ্নগর্ভ সেও নিদ্রাসম।" তিনি জানতেন, মৃত্যুর হাত থেকে কারও রক্ষা নেই: মিছে চাওয়া, "মিছে-এ-মিনতি/ তোমার সংহার হতে নেই, নেই কারও অব্যাহতি।"[১২] তাই গভীর দার্শনিকতায় তিনি বলেন শূন্যগর্ভ নিস্তারহীনতার কথা:

মৃত্যুর সৈকতে
মহত্ত্ব কল্পনামাত্র। বল্মীকের সামান্যময় স্তূপে
নির্লিপ্ত, নির্বাণ, শান্তি কেবলই স্বপন।[১৩]

মৃত্যুর অবগাহনে জীবনানন্দ উন্মথিত, ঘুমিয়ে যেতে চেয়েছেন তিনি মৃত্যুর মতো মন নিয়ে:

অধীর বাতাস লয়ে কাঁপুক না পৃথিবীর বন!—
মৃত্যুর মতন স্তব্ধ রক্ত থাক, ঘুমাক মৃত্যুর মতো মন।[১৪]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই মৃত্যুময়তার আচ্ছন্নতায় জীবনানন্দ ঘুম আর মৃত্যুর প্রগাঢ়তায় আবারও বলেন:

গভীর অন্ধকারে ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
হে হিম হাওয়া
আমাকে জাগাতে চাও কেন।
অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠব না আর;[১৫]

জীবনের আদি অবস্থায় প্রত্যাবর্তন, নির্জীব অবস্থায় প্রত্যাবর্তন, আর তা ঘটে মৃত্যুর মাধ্যমে। ঈশ্বরবিশ্বাসীদের কাছে মৃত্যু হলো জীবের ঈশ্বরে ও ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রত্যাবর্তন: মিলন ঘটে জীবাত্মা আর পরমাত্মার, সাক্ষাৎ ঘটে জীবের সাথে ঈশ্বরের। এই অর্থে মৃত্যু হলো "ক্রসিং দি বার"।[১৬] অতএব অমরত্বের এই জায়গা থেকে অন্যভাবে বলা যায়—জীবন হলো শক্তিপুঞ্জ; এর গতি আছে, মৃত্যুতে এই গতি লোপ পায় না, বরং রূপান্তর ঘটে, দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে পরিণত হয় মাত্র। পদার্থ যেমন শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে অবিনাশী হয়, জীবনও তদ্রূপ মৃত্যুর মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়। এও এক দর্শন যেখানে জীবনকে মনে করা হয় মৃত্যুর জন্য এক যাত্রা। মৃত্যু হলো রূপান্তর ব-ই অন্য কিছু নয়:

বুঝতে পারি, মৃত্যু বলে কিছু নেই, শুধু ম্যাজিক আছে,
রূপান্তর আছে—
উপযুক্ত পচনের পর, আমারও শরীর থেকে জন্ম নেবে
অসংখ্য কৃমি-কীট
কিলবিল করে তারা, আমারই চেতনা হয়ে, মাটির ভিতরে
ঢুকে যাবে পুনর্বার জনন ও জলের সন্ধানে।
কিংবা যে ছাই উড়বে, চিতার আগুন থেকে,
আমার শরীর পোড়া ছাই—
তাতেও মিশে থাকবে উদ্ভিদের জন্য সার, এবং তার প্রতিটি পাতায়
মানুষের শোকে-দুঃখে বাষ্পমোচনের জন্য মায়া-পরমাণু[১৭]

কিন্তু মানুষ কি মৃত্যুকে বরণ করতে চায়? ফ্রয়েড জীবন ও মৃত্যুর দ্বিপক্ষবাদিতার কথা বলেছেন, বলেছেন মৃত্যুইচ্ছার কথা। *অদিসি*র পঞ্চম অধ্যায়ে দেখি জলপরি ও দেবী কালিপসো গুহায় বসে সোনার চরকায় সুতো কাটতে কাটতে সুমধুর কণ্ঠে গান গাইছে। সে ভালোবাসে ইউলিসিস (ওদুসসেউস)-কে, রেখে দিতে চায় অমর করে তাকে। কিন্তু ইউলিসিস অমরত্বকে বাদ দিয়ে নিজ দেশে (ইথাকা) ফেরার সুযোগকে গ্রহণ করে। ইউলিসিস আসলে পরোক্ষে মরতেই চেয়েছেন, কারণ তিনি ফলপ্রত্যাশী ছিলেন। তার কাছে মৃত্যু এক পরিণতি, জীবনের মাধ্যমে যার শুরু হয়। অমরত্ব নয়, মৃত্যুই তার কাছে কাম্য।

মৃত্যুকেই মানুষ প্রকারান্তরে খোঁজে: "যেন কোনো ব্যথা [illegible] পৃথিবীতে—আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি?"[১৮] মানুষ মৃত্যুকে খোঁজে নানাভাবে: সংরাগে, কবিতায়, গল্পে, জীবনে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতায়। কারও কাছে মৃত্যু গন্তব্য, কারও কাছে তা অব্যাহতি। টমাস মানের নায়ক হান্স কাসটোর্প, এক উদ্ভিন্নমান যুবক, তিন সপ্তাহের জন্য, হামবুর্গ থেকে স্যুইটজারল্যান্ডের দাভোসের উদ্দেশে যাত্রা করে। অবস্থানের সময়-বিবেচনায় তার যাত্রা এক দীর্ঘ যাত্রা। সমভূমি থেকে উচ্চভূমিতে গমন তাকে বদলে ফেলে—সময়ের ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়: "স্থান, কালের মতোই, বিস্মরণের জন্ম দেয়।"[১৯] তিন সপ্তাহের অবস্থান পরিবর্তিত হয় সাত বছরে, কাসটোর্প বৌদ্ধিক ও ইন্দ্রিয়গতভাবে মৃত্যুতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যাওয়ার পর প্রথম রাতেই, বিছানায় শুয়ে সে ভাবে এই বিছানায়, গত পরশু, একজন মারা গেছে।"[২০] মৃত্যুচিন্তা তাকে অধিকার করে বসে, সে আরও ভাবে : "একদিক থেকে মৃত্যু এক পবিত্র, এক নিমগ্ন ও আধ্যাত্মিক অবস্থা, যা কিছু নিশ্চিত শোকসৌন্দর্যকে ধরে রাখে। অন্যদিকে তা এক ভিন্ন ব্যাপার। এটা যথাযথভাবে তার বিপরীত, এটা খুব শারীরিক, বস্তুগত, সম্ভবত তাকে বলা যায় না পবিত্র বা মগ্ন বা সুন্দর—এমনকি শোকময়ও নয়।"[২১] মৃত্যু-আচ্ছন্নতায় কাসটোর্প আক্রান্ত; প্রথম দিন বিছানায় শুয়ে নিজ বিছানাকে তার মনে হয়েছিল এক "নিয়মিত মৃত্যুবিছানা, এক সর্বজনীন মৃত্যুবিছানা।"[২২] আসলে জীবনও যেন এক মৃত্যুবিছানা। এবং একই সাথে জীবনের হেঁয়ালিতে পড়ে সে, জীবনের বিস্ময় নিয়ে ভাবতে থাকে: "জীবন কী? কেউ জানে না। সে নির্দ্বিধায় নিজ ব্যাপারে সচেতন, যেই মাত্র তা জীবন; কিন্তু সে জানে না সে কী।"[২৩] কিন্তু এটা তো ঠিক যে, জীবন মানেই জীবনান্তর। আর মৃত্যু শাস্তি নয়, নিয়ম যা স্থির-নির্দিষ্টভাবে আবর্তিত হয়, তাকে বলা যায় ধ্রুবপদ। আর যেভাবেই জীবনকে দেখা হোক না কেন, তার এক রূপক হলো ঝরে-পড়া—সময়ে, অসময়ে, কাল থেকে কালান্তরে। জীবনানন্দের ভাষায়:

যে-পাতা সবুজ ছিলো,—তবুও হলুদ হ'তে হয়,—
শীতের হাড়ের হাত আজো তারে যায় নাই ছুঁ'য়ে,—
যে-মুখ যুবার ছিলো,—তবু যার হ'য়ে যায় ক্ষয়,
হেমন্ত রাতের আগে ঝ'রে যায়,—প'ড়ে যায় নুয়ে ;—[২৪]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অস্তিত্ব ও নিরর্থকতা

অস্তিত্ব নির্যাসের পুরোগামী।

সোরেন কিয়ের্কেগার্দ

যদি এড়ানোর জন্য কেউ করে দুশ্চিন্তা তবে
প্রশ্ন: " এ জীবনে কী হবে?" একজন গাধার মতোই,
খায় সে স্বপ্নের গোলাপ; এরপর নিরর্থক মন,
মিথ্যায় পর্যবেসন ছাড়াই, নির্ভীকভাবে পছন্দ
করে কিয়ের্কেগার্দের উত্তর : "হতাশা"। প্রত্যয়িত
আত্মা, সবকিছুকেই বিবেচনা করে, সবকিছুরই
ব্যবস্থা করে।

আলব্যের কাম্যু

জীবন শব্দটি মানবিক, অস্তিত্ব শব্দটি জৈবিক। অথবা বলা যায়, অস্তিত্ব শব্দটি বড়ো বেশি দর্শনোদ্ভূত। অস্তিত্বের সংজ্ঞার্থের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে তার বিপরীতটির সংজ্ঞার্থকে অন্বেষণ করা, কারণ অস্তিত্বের পাশেই অনস্তিত্ব এক দৃশ্যমান রহস্য সৃষ্টি করে রেখেছে। বস্তুত অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব—এ দুটির একটির ব্যাখ্যা অন্যটির ব্যাখ্যাকে আহ্বান করে। অস্তিত্ব মূলত কী? অস্তিত্ব বা সত্তাকে এ সময়ে ব্যাখ্যা করতে গেলে তার মানবিক স্বরূপ উন্মোচন ছাড়া আর কী করার থাকে—কারণ প্রপঞ্চটি জৈবিক হলেও মানবোদ্ভূত। বের্গসন তাঁর *ক্রিয়েটিভ ইভলিউশন*-এর শুরুতেই "অস্তিত্ব" সম্পর্কে বলেছেন, "প্রথমেই আমি যা বুঝি তা হলো, আমি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় অগ্রসর হই। উষ্ণ বা শীতল, আনন্দিত বা দুঃখিত, ক্রিয়াশীল বা অক্রিয়, আমি আমার চারপাশের অবস্থাকে চেয়ে দেখি, অথবা বলা যায় আমি কিছু একটা চিন্তা করি। সংবেদন, অনুভূতি, ইচ্ছা, চিন্তন—এই হলো পরিবর্তনগুলো, যাতে আমার অস্তিত্ব বিভাজিত। অতঃপর আমি পরিবর্তিত হই বিরামহীনভাবে। কিন্তু এ-ই সর্বোপরি নয়। পরিবর্তন, আমরা প্রথমেই যা ভাবতে বসি না কেন, তা থেকে অধিক মৌলিক।"[১] বের্গসনের অস্তিত্বসংক্রান্ত ধারণার সাথে মিল আছে দেকার্তের বক্তব্যের: আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি।[২] কিন্তু বের্গসন সংবেদন, অনুভূতি, ইচ্ছা, চিন্তন ছাড়াও সামগ্রিকভাবে অস্তিত্বকে দেখতে চেয়েছেন পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে। অস্তিত্ব একটি বিবর্তিত ধারণা, একটি বিভাজিত সত্তার অবিভাজিত ঐক্যময় পরিবর্ধন। অস্তিত্ব একই সাথে পরিবর্তনগামী ও পরিবর্তিত এক রূপ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সত্তা কী? সত্তা হলো অস্তিত্বের অবস্থা বা বাস্তবতা। মানবের মাঝে এর অস্তিত্ব সচেতন উপস্থিতি হিসেবে। সত্তা বা অস্তিত্ব-সম্পর্কিত লেখা দেখতে পাওয়া যায় আদি ধর্ম ও দর্শনে এবং বর্তমান সময়ের অস্তিত্ববাদী দর্শন ও সাহিত্যে। রনে দেকার্ত, পুথাগোরাস, ইলিয়াটিক মতবাদ, সোফিস্ট মতবাদ, কান্ট, বাইবেল, মার্টিন হাইডেগার, জর্জ বার্কলি, প্লাতোন, দস্তইয়েফস্কি, কিয়ের্কেগার্দ, জ্যাঁ-পল সার্ত্র, আলব্যের কাম্যু, পারমেনাইদস, প্লাতিনাস, স্টোয়িক প্রমুখ লেখক-দার্শনিকদের এবং কতিপয় ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদে সত্তা ও অস্তিত্বের ব্যাখ্যার স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়। যদিও বর্তমান সময়ের আগে অস্তিত্ববিষয়ক ধারণা কোনো সুসংবদ্ধ দার্শনিক রূপ লাভ করেনি, তবু এ সংক্রান্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টিমণ্ডিত চিন্তন পরিলক্ষিত হয় প্রাচীন ও মধ্যযুগের কিছু চিন্তাবিদের চিন্তাধারায়। অন্যদিকে বাইবেল, উপনিষদ ও বৌদ্ধবাদী চিন্তায় মুহুর্মুহু সত্তার সংকট ও উত্তরণ-সংক্রান্ত উচ্চারণ পরিলক্ষিত হয়।

ইলিয়াটিক মতবাদের অন্যতম (অনেকের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ) গ্রিক-দার্শনিক পারমেনাইদস[৩] (জন্ম আনুমানিক খ্রি.পূ. ৫১৫)—যিনি ৬৫ বছর বয়সে অ্যাথেন্সে যান এবং সেখানে যুবক সোক্রাতেস তাঁর কথা শোনেন—লিখেছিলেন তাঁর দীর্ঘ উপদেশমূলক কবিতা *অন নেচার* যা একমাত্র রক্ষা-পাওয়া রচনা তাঁর, এবং যাতে তিনি তাঁর নিজস্ব দর্শন-ভাবনার প্রকাশ ঘটান। এতে তিনি পরম সত্তার (অ্যাবসলিউট বিইং) ধারণা বিধৃত করেছিলেন। তাঁর মতে বাস্তবতা, বিশুদ্ধ সত্য-সত্তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বরং যুক্তিতেই তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিশ্বাসই তাঁকে প্লাতোনের পূর্বসূরি করে। তাঁর তত্ত্ব মতে, অসত্তা থেকে সত্তার উদ্ভব ঘটে না, স্থানান্তরও ঘটে না। তাঁর এই ধারণারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর উত্তরসূরি এমপেদক্লেস ও দেমোক্রেতুসের মধ্যে—যারা বিশ্ব-সম্বন্ধে বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার সূত্রপাত ঘটান।

বৌদ্ধ-দর্শনে অস্তিত্বের ভিন্ন প্রবাহের কথা আছে। বৌদ্ধ-দর্শন মনে করে, জীবন দুঃখময়। মানবীয় অস্তিত্বের কার্যকারণ তাই দুঃখ থেকে নিজেকে উদ্ধারের এক অবিরাম প্রচেষ্টা। বৌদ্ধবাদের এই দুঃখবাদ তীব্রভাবে ধরা দেয় জার্মান-দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের দর্শনে। গ্রিক দার্শনিকগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার ও অপরিবর্তনীয় আকারের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। বৌদ্ধতত্ত্ব অনুযায়ী, সত্তার দশটি ভাগ রয়েছে এবং মানব-অস্তিত্ব এই দশা ধরে অগ্রবর্তিত হয়। এই দশটি দশা হলো: নরক, লোলুপতা, পশুপ্রকৃতি, ক্রোধ, প্রশান্তি, পরমানন্দ, জ্ঞান, আংশিক জ্ঞানালোক প্রাপ্তি, বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধত্ব। প্রথম চারটি দশা অস্তিত্বের অসুখী অবস্থাকে প্রকাশ করে। এভাবেই অস্তিত্ব দুঃখদশা ধরে নির্বাণের (বুদ্ধত্ব) দিকে চালিত হয়। প্রথম তিনটি দশা/অবস্থাকে বলা যেতে পারে পাপের পথ, এর সাথে চতুর্থ দশা (ক্রোধ) যুক্ত হয়ে চার পাপ হয় যা মানব অস্তিত্বের নানা দিককে প্রকাশ করে। সর্বশেষ বুদ্ধত্ব হলো চরম সুখকর অবস্থা যেখানে জীবনের মহান পরিসমাপ্তি ঘটে। এখানেই শরীরী ও বৌদ্ধিক অবস্থার সংযুক্তির মাধ্যমে মানবসত্তা পৌঁছে এক সত্তাহীনতায়, অস্তিত্ব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পৌঁছে এক অস্তিত্বহীনতায়। কিন্তু এর আগে অস্তিত্বের অংশ হিসেবে তাকে পার হতে হয় পূর্বের সবগুলো অবস্থা যা অস্তিত্বের বহুবিধ সম্পর্ককে উন্মোচিত করে। অস্তিত্বের দুঃখাবস্থাকে জীবন অস্বীকার করতে পারে না আর এজন্যই জীবন মূলত দুঃখময়। কিন্তু স্থায়ীভাবে এই দুঃখকে অতিক্রম বা জয় করার শিক্ষাই বৌদ্ধবাদ দেয় এবং তা সম্ভবও। ফলে বৌদ্ধবাদ দুঃখবাদী মতবাদ নয়। অস্তিত্বের একটি ব্যাপক স্বরূপ দুঃখাবস্থা হলেও তা দূরীকরণই বুদ্ধশিক্ষা, আর নির্বাণলাভই এর থেকে উদ্ধারের পথ।

কিন্তু কথা হচ্ছে, প্রথাগত প্রায় সব ধর্মই মানব-সম্পর্কিত পরমকারণবাদ বা টেলিয়োলজিক্যাল (teleological) ধারণায় বিশ্বাসী। টেলিয়োলজিক্যাল শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ ''টেলস'' (telos) থেকে যার অর্থ হলো ''সমাপ্তি''। অর্থাৎ পরমকারণবাদ হলো এমন ধারণা যা বলে যে সৃষ্টি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মানুষ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা সমাপ্তিকে সামনে রেখে জীবনযাপন করে। যেমন একটি ছুরির লক্ষ্য হলো কর্তন করা তেমনি মানুষেরও লক্ষ্য হলো বিধাতার আদেশ প্রতিপালন করা। আর যখন কোনোকিছুর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা গন্তব্য থাকে তখন তা সদর্থক ও দায়িত্বপরায়ণ। সুতরাং মানুষের জীবনের সুস্পষ্ট অর্থময়তা রয়েছে কারণ, তার রয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। কিন্তু জীবন-সম্পর্কিত এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন একদল দার্শনিক বা চিন্তক যাঁদের বলা হয় অস্তিত্ববাদী। তাঁরা মনে করেন যে, এ ধরনের বিশ্বাস মানবপ্রকৃতিকে বোঝার জন্য একটি ভুল ধারণা। তাঁরা বলেন, অস্তিবাদই হলো এক মানববাদ।

অস্তিত্ব-সম্পর্কিত বিবিধ ব্যাখ্যা ও সূত্রপাত সত্ত্বেও "অস্তিত্ববাদ" নামীয় দার্শনিক ও সাহিত্যিক ঊর্ধ্বাচারী এই বিষয়টির ঋজুরেখ উপস্থিতি ও সন্নিধি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয় ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে, যদিও অস্তিত্ববাদের প্রাথমিক উপাদান সোক্রাতেস, প্লাতোন, বাইবেল ও অন্যান্য আধুনিকপূর্ব লেখক-দার্শনিকদের লেখায় দেখা যায়। এই অস্তিত্ববাদ গুরুত্বারোপ করে ব্যক্তিক অস্তিত্ব, স্বাধীনতা, পছন্দ ইত্যাদি প্রপঞ্চের ওপর। কিন্তু নির্ধারিতভাবে এই শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে এর বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন, যদিও এর মধ্যে কিছু সাধারণ ধারণার মিল রয়েছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর অস্তিত্ববাদী লেখক-দার্শনিকেরা হলেন: দস্তইয়েফ্স্কি, কিয়ের্কেগার্দ, মার্টিন হাইডেগার, জ্যাঁ-পল সার্ত্র, আলব্যের কাম্যু, কাফকা, নিট্শে, কার্ল ইয়াসপাস, জ্যাঁ জেনে, গাব্রিয়েল মার্সেল প্রমুখ। কিন্তু এরও আগে সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক ব্লেজ পাসকাল আধুনিক অস্তিত্ববাদের বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক দার্শনিক রনে দেকার্তের কঠোর যুক্তিবাদের সমালোচনা করে একটি সুসংবদ্ধ দর্শনের কথা বলেন যা ঈশ্বর ও মানবতার বিষয়টিকে অহমের আঙ্গিকে প্রকাশ করতে পারে। তিনি হৃদয়ের যুক্তির ওপর গুরুত্ব দেন, যা বুদ্ধি ব্যতীত অসংখ্য বিষয় থেকে ধরা যায়। অস্তিত্ববাদী লেখকদের মতোই তিনি মানবজীবনকে দেখেন কূটাভাস হিসেবে, যেখানে মন ও শরীর-সহযোগে গঠিত মানবসত্তা নিজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক পরস্পরবিরোধিতা বা কূটাভাস।

কিন্তু তারপরও বলা উচিত, "অস্তিত্ববাদ" মূলত বিংশ শতাব্দীর দর্শন যা অস্তিত্বের উপলব্ধি, সম্ভাবনা ও সমস্যার ভেতর দিয়ে ব্যক্তির জীবনযাপনের দর্শনের প্রকাশ। অস্তিত্ববাদীদের মতে, ব্যক্তির অস্তিত্বের উপলব্ধিই তার সহজাত দর্শন। তারা ব্যক্তির জীবনবোধ ও কর্মের ওপর আস্থাশীল। বেঁচে থাকাই আসল কথা; প্রত্যেক জীবনই নিজ বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। তার কোনো পূর্বনির্দিষ্টতা নেই। ব্যক্তির নিজ উপলব্ধ জীবনই তার নিজ জীবন এবং প্রত্যেকেরই মুক্তিলাভের স্বাধীনতা আছে।

প্লাতোন এবং আরও অনেক দার্শনিক মনে করতেন, উচ্চতর নৈতিক ভালোত্ব সবার জন্যই এক। ঊনবিংশ শতাব্দীর ডেনমার্কীয় দার্শনিক কিয়েৰ্কেগার্দ—যিনি নিজেকে লেখক হিসেবে প্রথম অস্তিত্ববাদী হিসেবে ঘোষণা দেন—এই ধারণার বিরুদ্ধে মতামত দেন এবং বলেন, ব্যক্তির সর্বোচ্চ শুভত্ব তার অনুপম বৃত্তি বা আহ্বানের মধ্যেই নিহিত। তাঁর নিজ জার্নালে তিনি লেখেন, আমাকে অবশ্যই খুঁজতে হবে এমন সত্য যা আমার নিজের সত্য...সেই চিন্তা যার জন্য আমি বাঁচি বা মরি। অন্যান্য অস্তিত্ববাদীরা কিয়েৰ্কেগার্দের এই কথাটির প্রতিধ্বনি করে বলেন, একজন ব্যক্তি কোনোরকম সর্বজনীন ও সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়াই তার নিজের পথ নির্বাচন করবে। নৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য কোনো যৌক্তিক সম্ভাবনা বা উদ্দেশ্যই কার্যকর নয়। যে-কোনো অনুভূতিই ব্যক্তিনির্ভর। কিয়েৰ্কেগার্দ, যিনি ছিলেন খ্রিস্টীয় ধর্মে বিশ্বাসী, তিনিও ধর্মকে দেখেছেন ব্যক্তিক উপলব্ধির ফলাফল হিসেবে এবং বাতিল করেছেন প্রতিষ্ঠান ও পুরোহিত; ব্যক্তি ও ঈশ্বরের সম্পর্ককে সরাসরি হিসেবে ভেবেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান-দার্শনিক ফ্রিডরিখ নিট্‌শে বলেছেন, নৈতিক ভিত্তি কী হবে তা ব্যক্তি নিজেই ঠিক করবে। প্রথম প্রধান রচনা *আইদার/অর*-এ কিয়েৰ্কেগার্দ মানব-অস্তিত্বের দুটি পর্যায় বা স্তরের কথা বলেছেন যা একজন ব্যক্তি নিজের ক্ষেত্রে নির্বাচন করতে পারে, আর তা হলো: নান্দনিক বা নৈতিক। জীবনের নান্দনিক পথ হলো এক পরিশুদ্ধ আনন্দবাদ যা সুখভাবের চর্চা ও অনুসন্ধানের ধারণায় সমৃদ্ধ। নান্দনিক ব্যক্তি একাকিত্ব ও একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য অনবরত উদ্‌যোগ হিসেবে গ্রহণ করেন বহুমুখীনতা ও অভিনবত্বকে। কিন্তু পরিণামে মুখোমুখি হন হতাশা ও ক্লান্তির। জীবনের নৈতিক পথটি হলো তীব্রতা, সংরাগময় কর্তব্যনিষ্ঠা, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে শর্তহীন বাধ্যতা। *ফিয়ার অ্যান্ড ট্রেম্বলিং* গ্রন্থে কিয়েৰ্কেগার্দ আলোকপাত করেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আব্রাহামের নিজ পুত্র ইসহাককে উৎসর্গ করার ঘটনার ওপর, যা ওল্ড *টেস্টামেন্ট*-এর সৃষ্টিপুস্তকের ২২:১-১৯-এ বর্ণিত আছে, এবং যা তাঁর মতে, আব্রাহামের সাময়িকভাবে নৈতিকতা বর্জনের এক উদাহরণ। আব্রাহাম দৃঢ়সংকল্পচিত্তে তাঁর বিশ্বাসকে প্রমাণ করলেন ঈশ্বরের আদেশকে পালন করে, যদিও তিনি তা না বুঝেই করলেন। কিয়েৰ্কেগার্দের ভাষায়, এই "নৈতিক বর্জন"[৪] আব্রাহামকে দিয়েছে ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম এক দায়বদ্ধতা। চূড়ান্ত হতাশা থেকে

~ www.amarboi.com ~

মুক্তির জন্য ব্যক্তি তার ধর্মীয় জীবনের এক পর্যায়ে "বিশ্বাসের জন্য পদক্ষেপ" গ্রহণ করে, যা অন্তর্গতভাবে রহস্যময়, কূটাভাসময় এবং ঝুঁকিতে পূর্ণ। যে কেউ একে বলতে পারে ভয়ংকরের উপলব্ধি যা চূড়ান্ত অর্থে নিরর্থকতার ভয়। এভাবে কিয়ের্কেগার্দ মানব-অবস্থার দ্ব্যর্থকতা এবং নিরর্থকতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কিয়ের্কেগার্দ মনে করতেন, যৌক্তিক প্রতিপন্নতা সম্ভাব্য অবস্থায় কাম্য কিন্তু জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা যুক্তি বা বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। কিয়ের্কেগার্দের মধ্যে, পরবর্তী সময়ে, দার্শনিকেরা খুঁজে পান অস্তিত্ববাদী দর্শনের মৌলিক উপাদান আর এজন্যই তাঁকে বলা হয়ে থাকে আধুনিক অস্তিত্ববাদের জনক। নিট্‌শের মধ্যেও কিয়ের্কেগার্দের কথার প্রতিধ্বনি পরিলক্ষিত হয়, যদিও নিট্‌শে কিয়ের্কেগার্দের লেখার সাথে পরিচিত ছিলেন না। নিট্‌শে তাঁর প্রথাগত অধিবিদ্যা, নৈতিক অনুমতি এবং চিন্তামালার সমালোচনায় ট্র্যাজিক দুঃখবাদ ও ব্যক্তির জীবনসংরক্ষণ অভীপ্সার মাধ্যমে অধিকাংশের নৈতিক নিশ্চিতাবস্থার যে সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচারণ করেন, তার মধ্যে অস্তিত্ববাদের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। কিয়ের্কেগার্দ যেমন প্রথাগত ধর্মীয় নৈতিকতার সমালোচনার মাধ্যমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক খ্রিস্টীয় ধারণার সূত্রপাত ঘটান, নিট্‌শেও ঘোষণা করেন "ঈশ্বরের মৃত্যু" এবং সম্পূর্ণ ইহুদি-খ্রিস্টীয় মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করে পেগান বীরদের আদর্শকে সমর্থন করে বসেন। নিট্‌শে "মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন"[৫]-এর কথা বলেছেন, চিহ্নিত করেছেন নিজেকে তথাকথিত "অনৈতিকতাবাদী" হিসেবে। খ্রিস্টীয় নৈতিকতার মুখোশ-উন্মোচনকারী হিসেবে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, স্রষ্টা হবার আগে ধ্বংসকামী হতে হবে নিজেকে: "আর যে শুভত্বের ও অশুভত্বের স্রষ্টা হতে চায় তাকে হতে হবে প্রথমে ধ্বংসকামী ও মূল্যবোধ-ভঙ্গকারী।"[৬]

জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার বিংশ শতাব্দীর অস্তিত্ববাদী প্রপঞ্চবিদ্যার দার্শনিক মতবাদের অন্যতম স্থপতি। এই প্রপঞ্চবিদ্যা[৭] প্রপঞ্চ ও ব্যক্তিক চেতনার মধ্যকার সম্পর্ককে পরীক্ষা করে। তিনি "প্রকৃত" অথবা "অপ্রকৃত" অস্তিত্বের বিষয়ে অনুসন্ধান চালান। এ বিষয়টি ফরাসি-অস্তিত্ববাদী জ্যাঁ-পল সার্ত্রকে প্রভাবিত করেছিল। মানবসত্তা ও এর ধরনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত দার্শনিক হাইডেগার ব্যবহার করেন "Dasein" শব্দটি। এটা যে ক্রিয়া থেকে এসেছে তা হলো dasein যার অর্থ "অস্তিশীল" বা "এখানে, সেখানে"। দার্শনিক ইম্মানুয়েল কান্টও এই Dasein বিশেষ্যটি ব্যবহার করেছিলেন কোনো সত্তা বা বস্তুর অস্তিত্বকে বোঝাতে। কিন্তু হাইডেগার শুধু মানব-অস্তিত্বের ক্ষেত্রেই একে ব্যবহার করেছেন। তিনি এই শব্দটির মূল অর্থময়তার দিকেই নজর দিয়েছেন যা তাঁর বিবেচনায় বোঝায় "being (t) here"। হাইডেগারের মতে, মানবসত্তা অন্য সব সত্তা থেকে পৃথক। তাঁর ভাষায়, "Dasein in an entity for which, in its Being, that Being is an issue." এই Dasein-এর কোনো সুনির্দিষ্ট নির্যাস নেই এর সার বা নির্যাস তার অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে। এটা কোনো সুনির্দিষ্ট যথার্থ বস্তু নয়, বরং

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সত্তার বিভিন্নমুখী সম্ভাবনা।

কোনো কিছু ঘটানোর বিষয়ে একজন মানুষের কোনো অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা থাকে না। সে হয়তো মৃত্যুকে পছন্দ করতে পারে, কিন্তু সে জন্মকে নির্বাচন করতে পারে না, বা পারে না এক অবস্থা বাদ দিয়ে অন্য অবস্থার জন্ম দিতে। ফলে সে, হাইডেগারের ভাষায়, জগতে "নিক্ষেপিত"। কিন্তু একবার অস্তিত্ব নিক্ষেপিত হলে আত্মহত্যার পছন্দ অপেক্ষাও তার নিজ সত্তার ওপর অধিক নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি হয়। হাইডেগার যদিও আত্মহত্যার কথা বলেননি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *বিয়িং অ্যান্ড টাইম* (১৯২৭)-এ, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে তিনি আত্মহত্যাকে মৃত্যু-সম্ভাব্যতার প্রতি এক অযথার্থ সাড়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, জীবনের পূর্ণতা হলো মৃত্যু। মানুষের জীবনের সমাপ্তি হলো মৃত্যু, কিন্তু কখন আসবে মৃত্যু তা অনিশ্চিত, ফলে জন্ম হয় উদ্বেগের। অনিশ্চিত নিশ্চিততা থেকেই উদ্বেগের সৃষ্টি। মানুষ যথার্থ অস্তিত্ব উপলব্ধি করে তখনই যখন সে সম্ভাবনাকে সার্থক করতে উদ্‌যোগী হয়।

হাইডেগার নিজেকে অস্তিত্ববাদী হিসেবে বিবেচনা করতেন না। কিন্তু অস্তিত্ব তাঁর দর্শনকে অধিকার করে রয়েছে। তাঁর ওপর প্রভাব ছিল হুসার্ল, কান্ট, হেগেল, কিয়ের্কেগার্দ প্রমুখের। হাইডেগার মনে করতেন, মানব-অস্তিত্ব সত্তাকে প্রকাশ করার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠা পায়। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন "সত্তা"-র অর্থ কী, সত্তা কী? কীভাবে পদার্থের মধ্য দিয়ে সত্তাকে আবিষ্কার করা যায় সে-চিন্তা তিনি করেছেন। এই পদার্থ জগতে অবস্থিত মানুষ—যে অস্তিত্বশীল, যে নিজেই সত্তা। এই ব্যক্তিসত্তাই বিশ্লেষণের দাবি রাখে। জগতের অস্তিত্ব থেকে মানুষ বিভাজ্য নয়, অবিভাজ্য। কিয়ের্কেগার্দ যেমন অস্তিত্ব বিষয়ে মানুষের নৈতিক সমস্যার ওপর জোর দিয়েছেন, হাইডেগারও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *বিং অ্যান্ড টাইম*-এ অস্তিত্ববিষয়ক আলোচনায়, নৈতিক বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। মানুষের অস্তিত্বকে হাইডেগার বলেছেন "উদ্বিগ্ন-প্রযত্ন"[৮]—মানুষ বরাবরের মতো নিজের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকে, সে প্রশ্ন তোলে "আমি কে?" আর এই মীমাংসায় তিনটি বিষয়ে সে আলোকপাত করে: অস্তিত্বসূত্র,[৯] বাস্তবতা[১০] আর পতনশীলতা[১১]। এই অবয়বগুলো বস্তুজগতের বর্গের চেয়ে ভিন্ন। এগুলো ছাড়া আরও বিবেচ্য বিষয় হলো—জীবন, অবস্থিতি, মৃত্যু, স্বাধীনতা প্রভৃতি। অস্তিত্বের উদ্বিগ্ন-প্রযত্ন থেকে এগুলোর উৎপত্তি। অস্তিত্বলক্ষ্য অর্জিত হয় বুদ্ধি দিয়ে, বাস্তবতা বলতে বোঝায় বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্ক, আর পতন হলো অস্তিত্বের যথার্থতা বিষয়ে উদ্বেগহীনতা। এই তিনটি অবয়বের মাধ্যমেই অস্তিত্ব যথাযথভাবে অনুভূত হয়। সম্ভাবনার অস্তিত্বের কথা হাইডেগার বলেছেন। সত্তাকে মানুষ আয়ত্ত করতে চায়। বাস্তবতা হলো জগতে মানুষের অবস্থিতি। হাইডেগারের ভাষায়: অস্তিত্বময়তা সব সময় বাস্তবতা দ্বারা নির্ণীত হয়।[১২] মানুষের পতনশীলতা হলো জীবনের ক্লান্তি, নির্বেদ ও তার আশ্লিষ্টতা। এর থেকেই আসে অবসাদ, ক্লান্তি, আনন্দ, প্রেম ইত্যাদি। অস্তিত্বের তিনটি রূপ আছে: বাস্তবকে উপলব্ধি, সম্ভাবনার প্রতিষ্ঠা, ভাষার অগ্রবর্তিতা। অস্তিত্বের আরও দুটি রূপের কথা বলেছেন হাইডেগার যথার্থ (অথেনটিক) ও অযথার্থ (ইনঅথেনটিক)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Dasein কখনও যথার্থ কখনও বা তা না। যথার্থ-অস্তিত্ব অস্তিত্ব সম্ভাবনাকে অবহেলা বা বারিত করে। মৃত্যুর মাঝে জীবন নিক্ষিপ্ত, মৃত্যু মানুষের একক নিশ্চিত সম্ভাবনা এবং এই সম্ভাবনা বিরামহীন, যদিও মানুষ একে ভুলে যেতে থাকে। তবে মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা, এ এক অনিশ্চিত নিশ্চিততা। মৃত্যুকে ভুলে থাকা মানে সঠিক অস্তিত্ব থেকে দূরে সরে যাওয়া। মৃত্যু-তৃষ্ণা বা মৃত্যু-ভাবনা মানুষকে সচেতন করে ফলে সত্তা বা পূর্ণতা বিষয়ে সে যত্নবান হয়। আর শূন্যতার উদ্বেগ দ্বারাও মানুষ তাড়িত হয়, সে আলোড়িত হয়ে ওঠে। এই অভিজ্ঞতা প্রকারান্তরে "শূন্যতা"কে প্রকাশ করে। শূন্যতার অভিজ্ঞতা প্রকৃতপক্ষে নঞর্থকতার সামষ্টিক অভিজ্ঞতা। মৃত্যু-মন্থনতা বস্তুত আত্মোপলব্ধিরই ফল। হাইডেগার শূন্যতাকে এক ধরনের সত্তা বলতে চান। শূন্যতার প্রকাশ একটি মৌলিক প্রপঞ্চ যা সত্তা ও জগৎকে অভিঘাতময় করে। অস্তিত্ব ও শূন্যতা একাকার হয়ে থাকে এবং বাস্তব জগৎ দূরে নিক্ষেপিত হয়। ফলে জগৎ মানুষকে একা করে।

মৃত্যুর সম্ভাবনাকে হাইডেগার পরম ও একক সম্ভাবনা বলেছেন। এই সম্ভাবনা ভিন্ন। মানুষের ক্ষেত্রেই এই সম্ভাবনা বর্তমান। গোষ্ঠীগতভাবে এই সম্ভাবনা অর্জিত হয় না। মানুষই এই সম্ভাবনাকে বুঝতে পারে। মানুষ একা একা মৃত্যুকে বুঝে নেয়। এভাবেই সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। সঠিক ও যথার্থ অস্তিত্বের মধ্যে বাস্তব জগতের প্রতি এক ধরনের নিরাসক্ততা কাজ করে এবং এর হাত ধরেই মৃত্যুচেতনা আবির্ভূত হয়, আর মৃত্যু মানুষকে দেয় এক সমাহিত অবস্থা। হাইডেগার সত্তার সাথে মানুষের সংলাপের কথাও বলেছেন। নীরবতার মাঝ দিয়েই তা সম্ভব হয়ে ওঠে।

সার্ত্রকে বলা হয় আধুনিক অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রধান পুরুষ। তাঁর দর্শন নাস্তিক্য ও দুঃখবাদী। তাঁর মতে, মানুষ সবসময়ই এক যৌক্তিক ভিত্তি অন্বেষণ করে কিন্তু তা তারা পায় না। ফলে মানবজীবন হলো এক "অকার্যকর সংরাগ"। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত *সত্তা ও শূন্যতা* গ্রন্থে তিনি বলেন: সত্তা ও শূন্যতা স্ব-জন্য-সত্তা এবং স্ব-স্থিত-সত্তা। স্ব-স্থিত-সত্তা হলো জড় জগৎ যা তা-ই থাকে, অন্যদিকে স্ব-জন্য-সত্তা এমন কিছু যা তা থাকে না। চেতনা সব সময় কোনো বিষয়ের চেতনা, অন্য কোনো কিছুর দিকে তা ধাবমান, অথচ চেতনা তা নয়। তাই, চেতনা যা তা নয়, সেই দিকে গতিমান চেতনা একটি শূন্যতা।[১৩] সার্ত্র বলতে চেয়েছেন যে, মানুষ মূলত পৃথিবীতে একা, দায়িত্বের মধ্যে নিক্ষিপ্ত। মানব-অস্তিত্ব এক অনস্তিত্বের শূন্যতায় ঘেরা। কিন্তু এর সামূহিক উপলব্ধিই তার স্বাধীনতা। মানুষ মাত্রই মুক্তিলাভের স্বাধীনতা আছে।

সার্ত্র তাঁর দর্শনচিন্তাকে দার্ঢ্য করেছেন জার্মান-দার্শনিক এডমন্ড হুসার্ল, ফ্রিডরিখ হেগেল ও হাইডেগার-এর দর্শন-ভাবনা থেকে। *সত্তা ও শূন্যতা* গ্রন্থে তিনি বলেন, "কোনো বাস্তব অবস্থাই, তা যা-ই হোক না কেন (সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো, কিংবা মানসিক অবস্থা) কোনো কাজকে বাধ্য করতে পারে না।... বাস্তব অবস্থা চেতনার শূন্যতাকে উপলব্ধি করতে পারে না।"[১৪] তাঁর মতে,

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক হলো বিরোধময়। অস্তিত্বের অর্থই হচ্ছে সংগ্রাম। বিপদে-আপদে ঈশ্বরের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা আসে, কিন্তু তা হলো পরনির্ভরতা। কিন্তু একজন অস্তিত্ববাদী জীবনবোধ ও দায়িত্বে বিশ্বাসী। পৃথিবীতে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত—কোনো কিছুই অস্তিত্ব-অস্বীকৃত নয়। সার্ত্র আরও বলেছেন, ঈশ্বরহীন এই বিশ্বে মানুষ মূলত একক নিঃসঙ্গ, আর এই নিঃসঙ্গ মহাবিশ্ব শুধু নিরর্থকই নয়, চেতনাকে অধিকার করে রাখে এই উৎকণ্ঠা, হতাশা, উদ্বেগ। ফলে মানব-অস্তিত্ব মুখোমুখি হয় নিরর্থকতার, এই অনুভূতির ব্যাপ্তি ব্যক্তিকে ঘিরে রাখে। নিরর্থকতার দার্শনিক প্রেক্ষাপট হিসেবে অস্তিত্ববাদ এভাবেই আবির্ভূত হয়।

বস্তুত সুখ কী? জীবন কি সুখময় নাকি দুঃখময়? বিশ্বাসীদের কাছে সুখ পরকালে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি; দার্শনিকদের কাছে সুখ এক অসম্ভাব্য ধারণা; বুদ্ধিজীবীদের কাছে যুক্তি ও মানবিক গুণাবলির চর্চাই সুখ; উপযোগবাদীদের কাছে সুখ সর্বোচ্চ জনের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণ; ব্যক্তির কাছে সুখ হলো অস্তিত্বের একটি আনন্দময়, কল্যাণকর, তৃপ্তিময় এবং পরিপ্লুত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা।

মানুষ কি সুখী? কিয়ের্কেগার্দ তাঁর *আইদার/অর* গ্রন্থে বলেছেন: "জীবন আমার কাছে এক কটু পানীয়, যা আমাকে ফোঁটা-ফোঁটা করে গিলতে হয় গুনে-গুনে।"[১৫] জীবন বিস্বাদময়, তাকে খেতে হবে ধীরে ধীরে, একটানে তাকে গেলা যাবে না। বিস্বাদকে চেটেপুটে তার বিস্বাদের স্বাদ নিতে হবে। এটা হচ্ছে জীবনকে সহ্য করে যাওয়ার এক ধরনের দার্শনিক দাওয়াই। শোপেনহাওয়ার অভীপ্সার কথা বলেছেন তাঁর দর্শনে, বলেছেন, জীবনের জন্য যদিও এর প্রয়োজন তবু এর জন্যই অশান্তির শুরু। তাঁর ভাষায়: জীবন ভোগান্তিময়, জগতে আনন্দ অপেক্ষা বেদনা অসীমগুণ বেশি...। তিনি আরও বলেছেন, কষ্ট সকল জীবনের জন্যই অনস্বীকার্য এবং তা জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়ে যায়। কাম্যুর *ক্যালিগুলা* নাটকে দেখা যায়, ক্যালিগুলার বন্ধু হেলিকোন ক্যালিগুলার কাছে তার আবিষ্কৃত সত্যটা জানতে চাইলে উত্তরে ক্যালিগুলা বলে ওঠে, মানুষ মরে, আর তারা সুখী নয়।

অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিকদের বিভিন্ন লেখায় অস্তিত্বের নিরর্থকতা ও ভোগান্তির কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। জীবনের অর্থহীনতাকে বোঝাতে কিয়ের্কেগার্দ রূপকের আবরণে দিয়েছেন চমৎকার উদাহরণ: "কী অর্থহীন আর ফাঁকাই না জীবন—আমরা একজন মানুষকে কবর দিই, তার আগে কবর পর্যন্ত শবের সাথে অনুগামী হই, তাকে অতঃপর শায়িত করি, কোদাল দিয়ে তিনবার মাটি ঢেলে দিই, তারপর গাড়িতে চড়ে চলে আসি ঘরে। আর আমরা এই ভেবে খুশি হই যে দীর্ঘজীবন আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ।"[১৬] কিয়ের্কেগার্দ বোঝাতে চেয়েছেন—যা আমরা অন্যের ক্ষেত্রে হতে দেখি, তাকে আমরা নিজের ক্ষেত্রে বিবেচনা করি না

সার্ত্র তাঁর অস্তিবাদী দর্শনকে অভিহিত করেছেন নিরাশাময় হিসেবে, কারণ মানুষ কারও কাছ থেকে অবশেষে সাহায্য পায় না। এই মতবাদ তাই আশা-পরিপন্থি। তাঁর দর্শন নিরীশ্বরবাদী, আর তাঁর মতে মানুষ নিজের সুবিধার জন্য

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে। সার্ত্র বলেছেন, মানুষ তার অসীম দায়িত্বের মধ্যে পরিত্যক্ত, একা, সাহায্যহীন; মানব-অস্তিত্ব তাই এক শূন্যতা, এক চূড়ান্ত নৈরাশ্য। মানুষ অস্তিত্বশীল কিন্তু এর জন্য তার অস্তিত্বহীনতার বিরুদ্ধে তেমন কোনো অতিরিক্ত যুক্তি নেই। তাঁর প্রথম উপন্যাস *বিবমিষায়* জীবনের অর্থহীনতার দিকটি উন্মোচিত। উপন্যাসের নায়ক আঁতোয়ান রোঁকেতঁ একজন ফরাসি বুদ্ধিজীবী, জীবন সম্বন্ধে সে নির্মোহ। রোঁকেতঁ তিন বছর ধরে বাস করছে সমুদ্র-তীরবর্তী এক ছোটো শহরে, যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক নেতা মার্কি দ্য রোলেবোঁ বাস করতেন আর তাঁর জীবনী লেখার জন্যই নাস্তিক রোঁকেতঁ এখানে আসেন। কিন্তু তিনি হয়ে পড়েন অসুস্থ মানসিকতায় আচ্ছন্ন। সমস্ত জগৎ তাঁর কাছে অর্থহীন ঠেকে। তার মনে হয় তিনি যেন নিজ সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছেন। অস্তিত্বের অর্থহীনতা তাঁকে অসুস্থ করে তোলে। একটি গানের সুর তাকে প্রায়শই আবিষ্ট করে এবং অবশেষে তিনি ভাবেন, এই গানের সুরের মতো সুন্দর একটি উপন্যাস রচনা করবেন যা তাকে অস্তিত্বের অর্থহীনতা থেকে রক্ষা করবে। এই উপন্যাসে নায়কের জবানিতে সার্ত্র বলেছেন: "কোনো কিছু স্পষ্টভাবে স্থির না করেই আমি বুঝতে পারলাম, অস্তিত্বের চাবি খুঁজে পেয়েছি, আমার বমিভাবের চাবি, আমার জীবনের। আমি যে এসব পেরিয়ে ধরতে পারছিলাম, তা আমাকে এই মৌল অর্থহীনতায় ফিরিয়ে দিয়েছে।"[১৭] উপন্যাসে আরও বর্ণিত আছে:

> অর্থহীনতা: আর একটি শব্দ, শব্দের বিরুদ্ধে আমাকে লড়াই করতে হচ্ছে, ওই নিচে আমি বস্তুটাকে স্পর্শ করেছিলাম। কিন্তু আমি অর্থহীনতার সার্বিক রূপটা এখানে ধরতে চেয়েছিলাম। একটা গতি, মানুষের ছোট রঙিন জগতে আপেক্ষিকভাবে অর্থহীন সঙ্গের অবস্থাগুলোর সম্পর্কে।...অর্থহীন: পাথরগুলোর সম্পর্কে হলুদ তৃণগুচ্ছের সম্পর্কে শুকনো কাদা, গাছ, আকাশ, সবুজ বেঞ্চগুলোর সম্পর্কে। অর্থহীন, কোনো কিছুতে রূপান্তর করা যায় না, কোনো কিছু নেই, এমনকি কোন গভীর, গোপন প্রাকৃতিক আন্দোলনও তা ব্যাখ্যা করতে পারে না।"[১৮]

দস্তইয়েফস্কি সম্ভবত প্রথম প্রধান অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক। তাঁর *নোট্‌স ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড* (১৮৬৪)-এর বিচ্ছিন্ন বিবিক্ত প্রতিনায়ক বুদ্ধিবাদী মানবতাবাদের আশাবাদী অঙ্গীকারের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ প্রকাশ করছে। দস্তইয়েফস্কির এই "ভূতলবাসী" শুরুতেই বলেছে: "আমি এক অসুস্থ মানুষ... আমি একজন অসূয়াসম্পন্ন মানুষ, আমি একজন শ্রীহীন মানুষ। আমার মনে হয় যকৃৎ আমার নষ্ট হয়ে গেছে।" এই ভূতলবাসী লোক এক দ্বৈতসত্তার মানুষ। ভালোও নয় খারাপও নয়, ঠিক অর্ধাঅর্ধি। দোষ ও গুণ উভয়ের উপস্থিতি ও সংগ্রাম তার ভেতর: "আমি অনুভব করি, এই বিপরীতমুখী উপাদানগুলো আমার ভেতর সদর্থকভাবে সন্তরণ করছে।" এই উপন্যাসে দস্তইয়েফস্কি অস্তিত্বের বিযুক্তির বিষয়টি দেখেছেন, মানবের দুঃখের কথাটি বলেছেন। বলেছেন, মানুষ শুধু সুখের জন্যই বাঁচে না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুঃখের জন্যও বাঁচে। এই উপন্যাসে দস্তইয়েফ্স্কি উন্মোচন করেন অস্তিত্ববাদের এক মৌল ভাবনাকে এই বলে যে, মানুষ সবকিছুর চেয়ে বেশি করে মূল্য দেয় তার স্বাধীনতাকে। ভূতলবাসী মানব বলে, স্বাধীনতা মানুষের কাছে এতটাই মূল্যবান যে বৈজ্ঞানিক বিধিবিধান দ্বারা মানুষের ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হবে এই চিন্তাকে গ্রহণের চেয়ে পাগল হয়ে যাওয়াকেই সে বেশি পছন্দ করবে। *ব্রাদারস কারামাজোভ*-এর চরিত্র আলোয়শা বলে, জীবনকে ভালোবাসতে হবে বেশি করে, এমনকি তার অর্থময়তা থেকেও।

বিংশ শতাব্দীর মহান লেখক ফ্রানৎস কাফকার লেখায় বিচ্ছিন্ন মানুষের উদ্ভট মুখোমুখিতা দেখা যায় যা মূলত কিয়ের্কেগার্দ, দস্তইয়েফ্স্কি ও নিট্শের উত্তরভাষ্য। নিট্শের প্রভাব আরও দেখা যায় ফরাসি ঔপন্যাসিক আর্দ্রে মালরোর উপন্যাসে এবং সার্ত্রর নাটকে। জীবনের নিরর্থকতা ও অকার্যকারিতা অত্যন্ত কার্যকরভাবে দেখা যায় আলব্যের কাম্যুর লেখায়। অ্যাবসার্ড নাটকে, বিশেষত স্যামুয়েল বেকেট ও য়্যাজেন ইয়োনেস্কোর লেখায়ও অস্তিত্ববাদী ধারণার প্রকাশ দেখা যায়। আমেরিকান লেখকদের ওপর অস্তিত্ববাদের প্রভাব স্পষ্ট না হলেও ওয়াকার পার্সি ও জন আপডাইকের উপন্যাসে এবং নরমান মিলার, জন বার্থ ও আর্থার মিলারের লেখায় অস্তিত্ববাদী উপাদান পরিলক্ষিত হয়। ফরাসি লেখক জ্যাঁ জেনের লেখায়ও অ্যাবসার্ডিটির উপাদান দেখা যায়। তাঁর প্রথম নাটক *চাকরানি*তে তিনি অ্যাবসার্ড নাটকের সূচনা করেন, যেখানে দুই চাকরানি তাদের কর্ত্রীর ভূমিকা নেন এবং আত্মপরিচয়, বাস্তবতা ও মোহের টানাপড়েনে মেতে ওঠেন।

জীবন কি নিরর্থক? "তবে সব কিছুই নিরর্থক, জগৎ পরিপূর্ণ নিরর্থকতায়; রবীন্দ্রনাথও নিরর্থক, আইনস্টাইনও নিরর্থক, ওই গোলাপও নিরর্থক, ভোরের শিশিরও নিরর্থক, তরুণীর চুম্বনও নিরর্থক, দীর্ঘ সুখকর সঙ্গমও নিরর্থক, রাষ্ট্রপতিও নিরর্থক। কেননা সব কিছুরই পরিণতি বিনাশ।"—বলেছেন হুমায়ুন আজাদ।[১৯] আলব্যের কাম্যু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *দ্য মিথ অব সিসিফাস*-এ জীবনের এই নিরর্থকতার দিককে দার্শনিক অভিভাবে সঞ্জীবিত করেছেন। জীবনের একঘেয়ে, ক্লান্তিকর এবং অর্থহীন উৎসারের বর্ণনায় তিনি বলছেন "জাগরণ, গাড়িঘোড়া, অফিস বা ফ্যাক্টরিতে চার ঘণ্টার কাজ, খাবার, গাড়ি, চার ঘণ্টার কাজ, খাবার, ঘুম এবং সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার একই তালে চলে পুনরাবৃত্তি? এভাবেই সহজ আর স্বাভাবিকভাবে তাল ফেলা সারা বেলা। কিন্তু কোনো একদিন আবির্ভূত হয় এক 'কেন'। আর এভাবেই সবকিছু শুরু হয়ে যায় বিস্ময়ে এবং ক্লান্তিকর বিহ্বলতার ছায়ায়।"[২০] সার্ত্রও বলেছেন, ঈশ্বরহীন এই জগতে মানুষ সম্পূর্ণভাবে একক নিঃসঙ্গ। অতএব জীবন ও জগৎ হয়ে যায় একটি চেতনা যা শুধু অর্থহীনই নয় বরং হতাশা, অশান্তি, উদ্বেগ ও অস্বস্তিতে পূর্ণ; আর এই প্রতিবিশ্বই নিরর্থক বিশ্ব। এই জীবনকে, কাম্যু বলেছেন, সিসিফাসের জীবন, নিরর্থক জীবন। সিসিফাস করিন্থের রাজা, মৃত্যুর পর দেবতা হেদিস তাকে এক শাস্তি দেন: পাহাড়ের পাদদেশে পড়ে থাকা বিশাল পাথরখণ্ডকে পাহাড়ের চূড়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তুলে নিতে পারলে তার মুক্তি ঘটবে বলে হেদিস তাকে জানান। সিসিফাস যতবারই পাথরটিকে পাহাড়ের চূড়ার কাছে নিয়ে যান ততবারই পাথরটি গড়িয়ে আবার নীচে পড়ে যায়। সিসিফাস কখনোই পারেন না পাথরটিকে চূড়ায় নিয়ে যেতে। এক ক্লান্তিকর, একঘেয়েমি ও ফলাফলহীন পুনরাবৃত্তিতে আটকে থাকে সিসিফাসের জীবন। বিষয়টি প্রতীকী তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয় আধুনিক মানুষের জীবনে। এটাকে বলা হয় নিরর্থকতা যা ফলাফলহীন পুনরাবৃত্তির এক নিথর অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। মানুষ এর চক্রব্যূহতে আটকে পড়ে, আবার এই নিরর্থকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামও করে।

দ্য স্ট্রেঞ্জার (১৯৪২), *দ্য মিথ অব সিসিফাস* (১৯৪২), *ক্যালিগুলা* (১৯৪৪) ও *দ্য মিসআন্ডারস্টেন্ডিং* (১৯৫৮)-কে কাম্যু বলেছেন, "দ্য সাইকেল অব দ্যা অবসার্ড"। এই রচনাগুলোতে কাম্যু মানবঅস্তিত্বের নিরর্থকতার দিকটির উন্মোচন করেছেন। তাঁর মতে মানবজীবন নিরর্থক নয়, জগৎও নিরর্থক নয়, কিন্তু জগতে পতিত মানুষ নিরর্থক, তার সময় নিরর্থক। পৃথিবীতে মানুষ একা ও বিচ্ছিন্ন। *দি স্ট্রেঞ্জার*-এর নায়ক মারসোল এ পৃথিবীতে আগন্তুক, সিসিফাসও একাকী সঙ্গীহীন। এক অন্ধশক্তি চালাচ্ছে তাদের জীবন। জগতে তাদের অস্তিত্ব বেখাপ্পা-অসংগত-অযৌক্তিক। *দ্য মিথ অব সিসিফাস*-এ কাম্যু বলছেন:

> এমনকি খারাপ যুক্তিগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় যে জগৎকে, তাও এক পরিচিত জগৎ। কিন্তু, অন্যদিকে, হঠাৎ করেই জগতে আলো ও অধ্যাস হতে বঞ্চিত হয়েই মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও আগন্তুক হিসেবে অনুভব করে। যখন থেকে সে তার এক হারানো ঘরের স্মৃতি বা প্রতিশ্রুত দেশের আশা থেকে বঞ্চিত হয় তখন থেকেই তার নির্বাসনের কোনো প্রতিকার থাকে না। মানুষ ও তার জীবনের এই বিচ্ছেদ, অভিনেতা ও তার মঞ্চের এই বিচ্ছেদই হলো অ্যাবসার্ডিটির অনুভূতি। সকল স্বাস্থ্যবান মানুষের তাদের অনুভূত নিজ আত্মহত্যার চিন্তায়, অধিকন্তু কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই দেখা যায়, যে এই উপলব্ধি ও মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে।[২১]

নিরর্থকতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? আত্মহত্যা পারে নিরর্থকতা থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে। *দ্য মিথ অব সিসিফাস*-এ কাম্যু আত্মহত্যা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অ্যাবসার্ডের সাথে সংগ্রাম করে কোনো লাভ নেই, ফলে আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকতে পারে মানুষ। কিন্তু কাম্যু আত্মহত্যার ধারণাকে বাতিল করেছেন, কারণ, অ্যাবসার্ডের বিরুদ্ধে মানুষ যদি সংগ্রাম না করে আত্মহত্যা করে তবে অ্যাবসার্ড আরও জোর শক্তিতে আবির্ভূত হবে। সিসিফাসও মৃত্যুকে ঘৃণা করেন। অতএব আত্মহত্যা সমাধান নয়, বরং বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে অ্যাবসার্ডের বিরুদ্ধে। অতএব "অ্যাবসার্ড-চক্র" থেকে বের হওয়ার জন্য কাম্যু লেখেন "দ্রোহচক্র" যাতে আছে তাঁর উপন্যাস *দ্য প্লেগ* (১৯৪৮), দার্শনিক প্রবন্ধগ্রন্থ *দ্য রেবেল* (১৯৫১) ও নাটক *স্টেট অব সেজ* (১৯৫৮), *দি জাস্ট অ্যাসাসিন্স* (১৯৫০)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষ অ্যাবসার্ডমুক্ত অস্তিত্বজগৎ সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। *দ্য প্লেগ* উপন্যাসে দেখা যায়, আলজেরিয়ার বন্দর ওরাঁতে মহামারী আকারে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। প্লেগে অনেক মানুষ মারা যায় কিন্তু ডাক্তার বেরনার রিয়ো কোনো ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে নিরাসক্ত চিত্তে সংগ্রাম করছেন মহামারীর বিরুদ্ধে। তিনি এক অর্থে নিরর্থকতার বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করছেন।

কাম্যুর এই অ্যাবসার্ড-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি—যেখানে মানবতার উদ্দেশ্যহীন অবস্থান এবং অস্তিত্বের এক সংগতিহীন অসমঞ্জস অবস্থা বিধৃত—পরবর্তী সময়ে নাটকেও উদ্ভাসিত হয়েছে। মার্টিন এসলিন *দ্য থিয়েটার অব দি অ্যাবসার্ড* (১৯৬১) গ্রন্থে প্রথম অ্যাবসার্ড সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, নিরর্থকতা আদতে বোঝায় ''ঐকতান বহির্ভূত''। কাফকার ওপর লেখায় ইয়োনেস্কো নিরর্থকতার সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে বলেন, তা হলো, উদ্দেশ্যহীনতা...ধর্মীয়, আধিবিদ্যক এবং অতীন্দ্রিয় শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন, হারানো মানুষ; যার প্রতিটি ক্রিয়াই বোধবুদ্ধিহীন, নিরর্থক, ফালতু। তিনি এ বিষয়ে প্রধান যে নাট্যকারদের নাম নেন তাঁরা হলেন—স্যামুয়েল বেকেট, আর্থার আদামভ, য়্যাজেন ইয়োনেস্কো, জাঁ জেনে ও হ্যারোল্ড পিনটার। নৈরাশ্য ও শূন্যতাবোধ, ক্লান্তি ও নিরর্থকতা, দৈনন্দিনতার তুচ্ছতা ও পৌনঃপুনিকতাকে বিধৃত করতেই এই নাট্যকারেরা সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। কাম্যু যেমন তার "অ্যাবসার্ড-চক্র"-সংশ্লিষ্ট প্রধান রচনাগুলোতে মানুষের আমৃত্যু বন্দিদশার কথা বলেছেন। বলেছেন, অর্থহীনতা, সমাজের যুক্তিহীন অন্যায়, বিসংগতি এবং অসম্ভবতার আবর্তে আবদ্ধ মানবসত্তার কথা; এই পারিপার্শ্বিকতায় শৃঙ্খলিত মানুষের এই অ্যাবসার্ড অবস্থায় বেঁচে থাকাই একমাত্র অনুভূত সত্য। এরই প্রতিফলন দেখা যায় অ্যাবসার্ড নাটকে। বেকেটের *গোদোর প্রতীক্ষায়* নাটকে দেখা যায়, দুই ভবঘুরে অপেক্ষা করতে থাকে "গোদোর" জন্য, কিন্তু গোদো আসে না। এক শূন্যতাবোধ ও অর্থহীনতায় আক্রান্ত সমস্ত নাটকটি। ফলাফলহীন জীবনের ক্লান্তির কথা বলা হয়েছে নাটকটিতে। মানবজীবনের এক সর্বব্যাপ্ত অর্থহীনতার অরুন্তুদ রূপ উন্মোচিত এখানে। তাঁর *এন্ডগেম* নাটকেও এ-ই পরিদৃষ্ট হয়। এভাবেই বেকেট দেমোক্রেতুসের কথাতেই আবার বলে বসেন নিরর্থকতার চূড়ান্ত কথা: শূন্যতার চেয়ে অধিক বাস্তব আর কিছু নেই। আর্থার আদামভও *স্বীকারোক্তি* নামক পুস্তিকায় বলেন তাঁর আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটের কথা যা বস্তুত নিরর্থকতার স্বকীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে: "কে ওখানে? প্রথমত আমি জানি যে আমিই ওখানে। কিন্তু আমি কে? নিজের সম্পর্কে যা জানি তাতে বলা যায়, আমি এক যন্ত্রণাভোগী। আর যন্ত্রণাভোগ করি, কারণ আমার নিজের শিকড়ে রয়েছে বিকলাঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা। আমি বিচ্ছিন্ন। কী থেকে আমি বিচ্ছিন্ন—আমি জানি না তার নাম। কিন্তু আমি বিচ্ছিন্ন।" পাদটীকায় আদামভ যোগ করেন—আগে তাকে বলা হতো ঈশ্বর। আজকাল তার আর কোনো নাম নেই। ইয়োনেস্কো বলেন: মানবিক দুঃখকষ্টকে দূরীভূত করা কোনো সমাজের পক্ষেই সম্ভব নয়, কোনো রাজনৈতিক পদ্ধতিই বাঁচার কষ্ট থেকে, মৃত্যুভয় থেকে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরমের তৃষ্ণা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে না; এটাই সেই মানবিক অবস্থা যা সামাজিক অবস্থাকে নির্ধারণ করে, কিন্তু বিপরীতটি নয়। তাঁর *চেয়ার* নাটকেও আধিবিদ্যক শূন্যগর্ভতা, জগতের অবাস্তবতা, ঈশ্বরের অনুপস্থিতি এমনকি বস্তুর অনুপস্থিতিও সার হয়ে ওঠে যেখানে মানুষও নেই, সম্রাটও নেই। কাম্যুর *ক্যালিগুলা*তেও দেখা যায় নিরর্থকতার সার-উচ্চারণ, উত্তেজিত ক্যালিগুলা বলছে: আর জগতে যেখানে কোনো বিচারক নেই, সবাই দোষী, তাহলে কে তাকে অভিযুক্ত করবে! ক্যালিগুলার কাছে একমাত্র মৃতরাই বাস্তব।

কাফকা, দস্তইয়েফ্স্কির অন্যতম উত্তরসূরি, তাঁর লেখায়ও হাজির হয়েছে এক বিমূর্ত নিরর্থকতা। তাঁর *বিচার* উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায়, নায়ক জোসেফ কে. তার শোবার ঘরে "এক সুন্দর সকালে" আবিষ্কার করে যে পৃথিবীটা বদলে গেছে। "কেউ একজন নিশ্চয়ই জোসেফ কে. সম্পর্কে মিথ্যে বলেছে, কোনোরকম কারণ ছাড়াই এক সুন্দর সকালে সে গ্রেফতার হয়ে যায়।"—এই হলো *বিচার* উপন্যাসের ভয়ংকর সূচনা-পঙ্ক্তি। কাম্যুর মতোই কাফকাও নিরর্থকতা নিয়ে বলেন: "রোববার, ১৯ জুলাই, ঘুম, জাগরণ, ঘুম, জাগরণ, ভয়ংকর জীবন।" কাফকার জোসেফ কে. বা গ্রেগর জাম্‌জা উভয়েই নিরর্থক জীবনের দোলায় দোলায়িত। জোসেফ কে. দোষী সাব্যস্ত হয় কিন্তু সে জানে না কেন? ''মেটামরফসিস''-এ দেখা যায় এক উদ্ভট রূপান্তরিত জীবন, পিতা নিজে যেখানে তার কীটে পরিবর্তিত ছেলেকে আপেল ছুড়ে শেষ করে দিতে চায়: প্রথমে একটা আপেল, তারপরে একটি আপেল, গ্রেগর ভয়ে থেমে গেল, শুধু শুধু দৌড়ে কোনো লাভ নেই, কারণ তার বাবা তাকে বোমা-বিধ্বস্ত করতে চায়। " ...একটা আপেল খুব জোরে ছোড়া হয়নি। গ্রেগরের পিঠে লাগল এবং কোনো ক্ষতি না করে পড়ে গেল। ঠিক তার পরে সেটা এল, সেটা জোরে ছোড়া হয়েছে, সেটা তার পিঠে বসে গেল, গ্রেগর নিজেকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে চাইল, যেন এই চমকে দেওয়া অবিশ্বাস্য ব্যথা তার পেছনে থেকে যাবে।"[২২] ছোটোগল্প ''দ্য জাজমেন্ট''-এ পিতার কাছে দণ্ডিত, শাপগ্রস্ত হচ্ছেন ছেলে অকারণে: "অতএব জানো: আমি তোমাকে দণ্ড দিচ্ছি—জলে ডুবে তোমার মৃত্যু হোক![২৩] এভাবেই অস্তিত্ববিষয়ক উদ্ভটতাকে তুলে ধরেছেন কাফকা তাঁর সমস্ত লেখায়।

বিচার-এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতির শিকার জোসেফ কে.। বিচার চলছে তার, কোনো অন্যায় না করেই এক সকালে গ্রেফতার হয়ে যায় সে। জন্মের পর থেকেই যেন মানুষের বিচার চলছে, তার অপরাধ সম্বন্ধে সে জানতে পারে না কখনও। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এক অভিশপ্ত আবর্তে আবর্তিত হয় তার জীবন। গ্রেফতার দিয়ে শুরু এই উপন্যাস, দণ্ড দিয়ে সমাপ্ত হয়। কাফকা সমাপ্তি-অংশে বলেন: "ওখানে কে? বন্ধু? প্রিয়জন? কোনো সহানুভূতিশীল কেউ একজন? বা সাহায্যকারী কোনো জন যে সাহায্য করতে চায়? শুধু মানুষই একজন? অথবা ওখানে তারা সবাই? সাহায্য কি তাৎক্ষণিক পাওয়া যাবে? তার পক্ষে কি কিছু যুক্তি ছিল যেগুলোকে বিবেচনা করা হয়নি? নিশ্চয়ই সেরকম কিছু আছে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাফকা আরও বলেন, যুক্তি নিশ্চিতভাবেই অনড়, কিন্তু তা ব্যক্তিকে অনেক সময় নিরর্থক করে তোলে। যুক্তি এখানে কী? যুক্তি এখানে ক্ষমতা, ইতিহাস, আর অপরিহার্যতা। এখানে জোসেফ কে. রক্ষা পায় না, রক্ষা পায় যুক্তি। তার বিচার হয় অথচ বিচারককে সে কখনও দেখেনি, বিচারালয়েও সে কখনও প্রবেশ করেনি। বুকে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ছুরিটা বসে যায়; কে.-র চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। একজন তার গলা চেপে ধরেছিল, অন্যজন ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল। ...তবু সে দুজনকেই দেখতে পেল, মুখের সামনে একজনের গালের ওপর অন্যজনের গাল, ঝুঁকে শেষ দৃশ্যটা দেখছে। ঠিক যেন কুকুরের মতো! বলতে চাইল সে: তার মৃত্যুর পর তাদের বেঁচে থাকা কত লজ্জার।" একত্রিশতম জন্মদিন আসার আগের দিনই তার জীবন শেষ হয়ে গেল। কাম্যু একেই বলেছেন, মৃত্যুর পূর্বে দণ্ডিত মানুষটি শুধু বলে: কুকুরের মতো।[২৪] কাফকা বলেছেন এক যৌক্তিকতাহীন অনড় শক্তির কথা যা মানুষকে পিষে ফেলে; এই শক্তি একাধারে অন্ধ ও অন্তঃসারশূন্য। এই দণ্ডে মানুষ দণ্ডিত। ব্যক্তি এমন এক বিচারের মুখোমুখি হয় যখন সে বুঝতেই পারে না কেন তার এই দশা; সে সম্মুখীন হয় সেই অবস্থার, যখন কারণ-ফলাফলহীন এক কবন্ধ-অস্তিত্ব তাকে গ্রাস করে। মূলত এক অনস্তিত্বের ঘেরাটোপে, এক উদ্ভটতায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে জীবন।

দ্য মিথ অফ সিসিফাস-এর মুখ্য বিষয় সম্পর্কে, গ্রন্থের ভূমিকায়, কাম্যু বলেছেন: "এ বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হওয়া খুবই যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয় যে, জীবনের কোনো অর্থ আছে; অতএব আত্মহত্যা সমস্যার মুখোমুখিতাও যৌক্তিক।"[২৫] কাম্যু আত্মহত্যাকে বিবেচনা করেছেন সত্যিকার মারাত্মক দার্শনিক সমস্যা হিসেবে এবং বলেছেন, জীবন অর্থময় না নিরর্থক—এটা হলো মৌলিক দার্শনিক প্রশ্ন। কাম্যু বলেছেন, "দেখা যায় অনেকেই মরে কারণ তারা জীবনকে মূল্যবান হিসেবে বিবেচনা করে না। আবার আপাতবিরোধিতায় দেখা যায় অনেকে এমন ধারণা বা মায়ায় আত্মহত্যা করে যা তাদের বাঁচার যৌক্তিকতা দেয় (বাঁচার জন্য যা যুক্তি মরার জন্যও তা সুন্দর যুক্তি)। অতএব উপসংহার টানা যায় যে, জীবনের অর্থময়তার প্রশ্নই জরুরি প্রশ্ন।"[২৬] কাম্যু তাঁর এই লেখায় নিরর্থকতা ও তৎজাত আত্মহত্যার সম্পর্কের যথাযথ অবস্থা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, মানবিক প্রয়োজন এবং পৃথিবীর অযৌক্তিক নীরবতার মুখোমুখিতা থেকেই অ্যাবসার্ড-এর উৎপত্তি। কাম্যু বলেছেন, জীবন নিরর্থক হলে আত্মহত্যা যৌক্তিক কিন্তু নিরর্থকতা এতে বেড়ে যায়, স্থায়িত্ব পায়। শোপেনহাওয়ার দুঃখ-ভোগ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন যে এটা অনস্বীকার্য। ভোগান্তি ছাড়া জীবন অর্থহীন। তিনি বলেছেন, কাজ, কষ্ট, পরিশ্রম ও সমস্যা, বস্তুতপক্ষে সব মানুষই জীবনভর বহন করে বেড়ায়; যদি তাৎক্ষণিকভাবেই সব আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়ে যায়, তাহলে মানুষ কীভাবে জীবনধারণ করবে বা কীভাবেই বা সময় অতিক্রমণ করবে? তিনি বলেছেন, "এই অবস্থায়, একঘেয়েমি ক্লান্তিতে কেউ মারা যাবে, কেউ বা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবে, কেউ বা হানাহানিতে মেতে উঠে একে অপরকে মারবে এবং এভাবেই স্বাভাবিকভাবে আগত দুঃখকষ্টের চেয়েও তারা নিজেরাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজেদের জন্য অধিক ভোগান্তির জন্ম দেবে।"[২৭]

অতএব অ্যাবসার্ডিটির হাতে মানুষ বন্দি কিন্তু এর বিরুদ্ধে সংগ্রামই জীবন। জীবনবিদ্বেষী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমেই অ্যাবসার্ডকে জয় করা যায়। কাম্যু তাই আত্মহত্যা নয়, বিদ্রোহের মাধ্যমেই তাকে জয় করার কথা বলেছেন। *দ্য মিথ অব সিসিফাস*-পরবর্তী গ্রন্থ *দ্য রেবেল*-এ আত্মহত্যা-বহির্ভূত বেঁচে থাকার কথাই উচ্চারিত।

কাম্যু অ্যাবসার্ডকে ভেবেছেন অনিবার্য ও পরিত্রাণহীন। তাঁর কাছে ভাবনাই শুরু হয় ধ্বংস দিয়ে, আত্মহত্যার পোকাটি থাকে মানুষের অজানালোকে। অ্যাবসার্ড যে-কোনো সময়, যে-কোনো পথের ধারেই, যে-কোনো মানুষের মুখে আঘাত হানতে পারে। কাম্যু ভেবেছেন, মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতাই জানিয়ে দেয় যে এই পৃথিবী অ্যাবসার্ড। তাঁর কাছে "এই অ্যাবসার্ড" মানে হলো "তা অসম্ভব" এবং "পরস্পরবিরোধী"। এভাবেই কাম্যু ফলাফলে উপনীত হন, তাঁর ভাষায়: "এইভাবে আমি অ্যাবসার্ড থেকে তিনটি ফলাফল টানতে পারি, এগুলো হলো: আমার দ্রোহ, আমার স্বাধীনতা এবং আমার সংরাগ। কেবল সচেতনতার ক্রিয়া দিয়ে আমি জীবনের ভূমিকাকে রূপান্তরিত করি যা হলো এক মৃত্যুর আমন্ত্রণ এবং আমি অস্বীকার করি আত্মহত্যা।"[২৮] কাম্যু এভাবেই সিসিফাসের মধ্যে জীবনের মানে খুঁজে পান; সিসিফাসকে পর্বতের পাদদেশে ছেড়ে দেন, কারণ সিসিফাস শেখায় "উচ্চতর বিশ্বস্ততা, যা বাতিল করে দেবতাদের আর উত্তোলিত করে পাথরগুলো।" পৃথিবী, অতঃপর, প্রভুহীন হয়েও নয় বন্ধ্যা বা অকার্যকর। "উচ্চতার দিকে সংগ্রাম একজন মানুষের মন আপ্লুত করার জন্য যথেষ্ট। একজন নিশ্চিতভাবেই কল্পনা করবে সিসিফাসের সুখ।"[২৯]

নিরর্থকতার আক্রমণে কেউ কেউ উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। জীবনের চঞ্চলতা ও উদ্ভটতাকে প্রত্যক্ষ করে সে অস্থির হয়ে ওঠে। তলস্তোয় তাঁর *কনফেশনস*-এ জানিয়েছেন তাঁর জীবনের সে-সময়ের দোলায়মানতার কথা: সুন্দরী স্ত্রী, সন্তান, অর্থ, সুখ প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও এক চঞ্চলতা এক অভাববোধ তাঁকে তাড়িয়ে ফিরেছিল যা থেকে তিনি নিস্তার পাচ্ছিলেন না। জীবনের অর্থহীনতা, "কোনো এক বিপণ্ন বিস্ময়" হঠাৎ এসেই প্ররোচনা দেয় আত্মহত্যার; কেউ কেউ আত্মসমর্পণ করে মুহূর্তে জেগে-ওঠা অর্থহীনতার নিকট। কেউবা কাটিয়ে ওঠে, সিসিফাসের মতোই নিরর্থকতাকে নিয়ে, অন্তিম দণ্ডাজ্ঞা শিরোধার্য করে জীবনের অন্য এক মানে খোঁজে। সিসিফাসের মতোই নিরর্থকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ করতে চায় জীবনকে, এবং এই জীবনের অন্ধকার ও নৈরাশ্যকে উচ্চস্তরে উন্নীত করার চেষ্টায় ব্রতী থাকে। এভাবেই উল্‌ফ-মায়াকোভ্‌স্কি-সেলান-প্লাথ-সেক্সটন-বেরিম্যান-ট্রাকল প্রমুখের সমান্তরালে দেখি কিটস-শেলি-বোদল্যের-রিলকে-জীবনানন্দদের, যারা কিয়ের্কেগার্দ কথিত "নান্দনিক হতাশা" নিয়েই জীবনকে যাপন করতে চেয়েছেন।

দেখা-দেওয়া নিরর্থকতার ছায়ার দীর্ঘস্থায়ী উৎক্ষিপ্ততায় ব্যাপ্ত হতে দেখা যায় হ্যামলেটকে। পিতৃহত্যার কারণে হ্যামলেট উন্মথিত এবং উন্মাদ। জীবন ও জগৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তার কাছে অর্থহীন। সে ভাবে: এই স্থূল মাংসপিণ্ড গলে গলে/রূপ নিত তরল পদার্থ বিন্দু বিন্দু শিশিরের মতো/হে যদি চিরন্তন পাপবিদ্ধ না করতেন আত্মহত্যা। হে ঈশ্বর হে ঈশ্বর, জগতের সব কর্মকাণ্ড আমার কাছে/কী ক্লান্তিময়, বোধ করি পুরোনো, একঘেঁয়ে, নিরর্থক।[৩০] হ্যামলেট ঝেড়ে ফেলতে পারে না এই নিরর্থকতার কালচক্রকে, বরং তা দৃঢ় হয়, হ্যামলেট ভাবতে থাকে: মানুষকে দেখো, আশ্চর্য সৃষ্টি! বুদ্ধি, চিন্তায় দীপ্তিমান, ক্ষমতায় সীমাহীন। আচার-ব্যবহারে বিকশিত, মুগ্ধকর; দেবদূতের মতোই সৃষ্টিশীল,.. কিন্তু এ সত্ত্বেও আমার কাছে এ সবকিছু ধুলোর সার। শুধু ধুলো। কোনো পুরুষ দেখে আমি আনন্দবোধ করি না, নারী দেখেও নয়।[৩১] হ্যামলেটের জীবনে আবির্ভূত নিরর্থকতাকে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হতে দেখা যায়, ফলে লের্টাসের সাথে আত্মঘাতী অসিযুদ্ধে তার মৃত্যু হয়। এক অপরিত্রাণনীয় নিরর্থকতা আর অমোচনীয় উন্মত্ততায় সমাপ্ত হয় হ্যামলেটের জীবন। নিরর্থকতাবোধের আক্রান্ততা থেকেই ওফেলিয়ার প্রেমকে হ্যামলেট অস্বীকার করে, আর উন্মত্ততা থেকেই, ওফেলিয়ার মৃত্যুর পর, তার ভাই লের্টাসকে বলে তাকে ভালোবাসার পরিণামের কথা। হ্যামলেটের ক্ষেত্রে নিরর্থকতা নিঃশেষিত হয়নি, বরং সরলরেখার মতো অগ্রসরমান ছিল। এবং এই ক্রমবর্ধমান নিরর্থকতা রূপ নেয় মত্ততায়, প্রতিশোধে, যার আগুনে পরিণামে সমাপ্তি ঘটে সবকিছুর।

দ্য মিথ অব সিসিফাস-এ কাম্যু যে দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছেন, তারই প্রতিফলন দেখা যায় তার *আগন্তুক* উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক মারসোল এক অন্তঃসারশূন্য ও নিঃসঙ্গ চরিত্র, পৃথিবীতে নিজেকে যে "আগন্তুক" মনে করে। উপন্যাসের শুরুতেই নায়ক বলছে, "মা আজ মারা গেছে নাকি গতকাল, ঠিক জানি না।" এ এক চরম নিরাসক্ত সুর। এক আরবকে হত্যার অভিযোগে তার প্রাণদণ্ড হয় কিন্তু সে যাজককে জানায় যে তার কোনো অনুশোচনা নেই। যাজককে সে জানায় যে মৃত্যু হবে এটাই স্বাভাবিক। এভাবেই নায়ক নিজেকে এক অ্যাবসার্ড বৃত্তে আটকে রাখে, এক অর্থশূন্য দুর্বোধ্যতায় অবশেষে সে থেকে যায়। কোনো ক্রিয়াই তাকে তাড়িত করতে পারে না, এমনকি নিজ মৃত্যুদণ্ডও। সে নীতিহীন আবার নীতিহীন নয়; তার অন্তরের সম্পদ হলো নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব। সে তাই ভাবে: "আমি অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকিয়ে, যে রাত্রি তার সমস্ত সংকেত এবং নক্ষত্রখচিত এই প্রথম এবং সত্যিই প্রথম করা, যথার্থ ভ্রাতার মতো উপলব্ধি করা আমাকে এইটাই বোঝাল যে আমি সুখী ছিলাম এবং এখনও সুখী রয়েছি। সবকিছু সম্পন্ন করার জন্য, আমার নিজেকে কম নিঃসঙ্গ ভাবার জন্য যা বাকি থাকল, তা হলো এটা আশা করা যে আমার ফাঁসির দিনে যেন এক বিরাট দর্শক সমাগম হয় এবং আমাকে অভিসম্পাতের চিৎকার দিয়ে সম্বর্ধনা জানায়।"[৩২] অতএব অ্যাবসার্ড জগতের আঘাত থেকে মারসোল নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি, সে অপেক্ষা করতে থাকে কারাগারে তার ফলাফলের জন্য। সে আশা করতে থাকে অনেকে তার ফাঁসি দেখতে আসবে—তাকে অভিসম্পাত দিয়ে স্বাগত জানাবে; সে নিজেকে ভাবে সুখী হিসেবে। কীভাবে তাকে চিহ্নিত করা যায়? সে হত্যা করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একজনকে, তবু তাকে নীতিহীন অপরাধীরূপে ভাবতে পারা যায় না; আবার তাকে নিরপরাধী হিসেবেও ভাবা যায় না। তাকে আসলে প্রচলিত এইসব অভিধায় চিহ্নিত করা যায় না; তাকে বলা যায় অ্যাবসার্ড, আর এই অর্থহীনতা থেকেই সে মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা করে, অপেক্ষায় থাকে তার জন্য। পাদরি তাকে প্রায়শ্চিত্তের কথা বললে সে তাতে ক্লান্তিবোধ করে, তাকে (পাদরি) জানায় যে সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে মনে করে সকলেই একদিন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। বাস্তবের গোলকধাঁধা ও নিরেট দুর্বোধ্যতায় আক্রান্ত সে। প্রচলিত যুক্তির ঊর্ধ্বে সে, তবে তারও যুক্তি আছে আর তা হলো জীবনের যুক্তি, পাসকালের ভাষায়, অসংখ্য বিষয় থেকে যাকে বুঝে নিতে হয়। মারসোল শুধু অর্থহীন নয়, প্রকারান্তরে, এক অর্থহীনতার জলবায়ু সে সৃষ্টি করে। সে এক বিবিক্ত সত্তা, সে এক না-বলা মানুষ। সে যেন নীরব থাকতে চায় আর তা দিয়েই সে বিশিষ্ট হয়ে যেতে চায়, তার ভেতর কাজ করে এক নিরবচ্ছিন্ন সরলতা যা তাকে এই ক্রুর পৃথিবীতে একা করে দেয়, কারণ এই পৃথিবীতে সে প্রকৃতই এক "আগন্তুক"।

অ্যাবসার্ড নাট্যকার য়্যাজেন ইয়োনেস্কোর লেখায়ও আবির্ভূত হয় এই নিরর্থকতা, ইয়োনেস্কো উপলব্ধি করেন এই বিশ্বকে স্বপ্নের মতো, মনে করেন না পৃথিবীকে কঠিন। মনে হয় সবকিছুই স্বচ্ছ, মনে হয় নিজেকে মুক্ত। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে থাকেন বিপরীতটি এবং মনে হয় পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ক্ষণস্থায়ী:
জাগে বিপরীত অনুভূতি, আলোর তরলরূপ ভারী হয়ে আসে, স্বচ্ছতা ঘনত্ব পায়, পৃথিবী যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়। আমরা ও জগতের মাঝখানে, আবার সেই বাধার প্রাচীর, শূন্যতার 'না', জড়বস্তু আকীর্ণ পথ...এই নষ্ট স্বপ্নভার সব মুক্তিহরণ করে দেয়, দিগন্তরেখা আমায় ঘিরে ধরে, অস্তিত্বকে মনে হয় বদ্ধকারার অন্ধকার...।"[৩৩]
সুতরাং স্বপ্নমোহ ক্ষণস্থায়ী, অস্তিত্বের বন্দিদশাই স্থায়ী। অর্থহীনতা আর শূন্যতার গোলকধাঁধায় খেইহারা জীবন। মানুষ এভাবেই একক মানুষের নিঃসঙ্গ জগৎকে প্রত্যক্ষ করে।

কিন্তু জীবনের একান্ত-ভাবনা কি চূড়ান্তভাবেই নিরর্থকতামুখী? বেঁচে থাকার জন্য তা শুধু আমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হয়, কোনো সমাধান বা নিষ্পত্তি কি করে না! জীবনের অর্থ-অন্বেষণ বা অর্থহীনতার অন্বেষণের সাথেই আবির্ভূত হয় নিরর্থকতা বা অন্যকিছু। কিন্তু জীবনের জন্য তা কতটুকু মানানসই? বিজ্ঞানী আইস্টাইনের ভাষায়: "মানবজীবনের অর্থ কী বা অন্য প্রাণীর জীবনেরই বা কী অর্থ—এই প্রশ্নের কোনো উত্তর জানা মানে ধার্মিক হওয়ার মতো ব্যাপার। তুমি বলবে—এটা কি কোনো অর্থ বহন করে যে এর সমাধান খোঁজ করতে হবে? উত্তর হতে পারে, যে লোক তার নিজের জীবন ও তার স্বগোত্রীয় প্রাণীদের অস্তিত্বকে অর্থহীন হিসেবে বিবেচনা করে, সে কেবল অসুখী নয়, জীবনের জন্য অতি বেমানানও।"[৩৪]

সত্যিই তাই, স্বাভাবিক বিবেচনায় তারা অসুখী ও বেমানান, আর তাই তারা কেউ কেউ বা আক্রান্ত হন দীর্ঘমেয়াদি নিরর্থকতায়। কেউ কেউ এর স্থায়ী আবেশে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিভোর থাকেন সারাজীবন। কেউবা বিচলিত মুহূর্তে আত্মসমর্পণ করেন, বেছে নেন নিষ্ক্রমণের পথ। জীবনানন্দের ভাষায়, এসব মানুষেরা, "নিজের মুদ্রাদোষে", নিজেরা আলাদা হয়ে যায়, আলাদা হতে হতে জন্মপূর্ব অন্ধকারেই যেনবা ফিরে যেতে যায়। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও জ্যোৎস্নায় তারা দেখে ভূত, সবকিছু থাকার পরও তারা ক্লান্ত ক্লান্ত হয় :

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয় প্রেম-শিশু-গৃহ—নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপণ্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে,
আমাদের ক্লান্ত করে—
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;[৩৫]

তারা সরে যেতে থাকে, আর শূন্যতা পূর্ণ করতে থাকে আধারপাত্র। এই নিস্তারহীন অবস্থা ও অস্তিত্বের অপচিতিতে সে রেহাই খোঁজে, দড়ি হাতে চলে যায় আত্মহননে, কারণ, "এ-সব শূন্যতা ছাড়া কোনো দিকে আজ/কিছু নেই সময়ের তীরে।" এই অর্থহীনতার আবর্তে ব্যক্তি তখন বলে ওঠে তার অন্তিমকথা, রচনা করে তার আকরিক এপিটাফ:

সব কাজ তুচ্ছ হয়—পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়।[৩৬]

এভাবেই ব্যর্থ আর অর্থহীন জীবন, একসময় মনে হয়, "জগতের কোনও কাজে লাগেনি এ-অখ্যাত গতাসু।"[৩৭] সে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে আর "জলের মত ঘুরে ঘুরে" একা পথে লুপ্ত হয়ে যায়। এই নিঃসঙ্গতার ঈষৎকর অবস্থানে তার ভাবনা বিয়োগাত্মক ও অপচয়িত:

ক্ষতির সহিত ক্ষতি, অপচয়সনে অপচয়
যোগ দিতে দিতে মোর সুদীর্ঘ জীবন হবে ব্যয়
অখ্যাতির অবচ্ছায়ে।[৩৮]

প্রকৃতপক্ষে সে হয়ে ওঠে দূরত্বের মানুষ—জীবনে ও মৃত্যুতে

দূরতর সমুদ্র যে পেরিয়েছে, আমি তার মতো
এই সব গৃহস্থের সুস্থির সংসারে:
দিনগুলো নিজস্ব এবং পূর্ণ এদের ভাঁড়ারে
অথচ আমার মনে দূরত্বই সত্যে পরিণত।[৩৯]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু এক আত্মহত্যা!

> ...এই কথা আমরা যথাযথভাবে
> বলতে পারি যে, সব মৃত্যুই এক
> ছদ্মবেশী আত্মহত্যা।
>
> **জিগমুন্ড ফ্রয়েড**

> "আরম্ভ"—এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যান্ত্রিক
> জীবনের কর্মের শেষে ক্লান্তি আসে, কিন্তু
> একই সাথে তা সচেতনতার স্পন্দনকে
> খুলে দেয়। তা জাগিয়ে দেয় সচেতনতা
> আর যা অনুসরণ করবে তাকে প্রলুব্ধ করে।
> যা অনুসরণ করে তা হলো শৃঙ্খলে ধীর
> প্রত্যাগমন বা তা হলো সুনির্দিষ্ট জাগরণ।
> যথাসময়ে, জাগরণ শেষে আসে ফলাফল:
> আত্মহত্যা অথবা আরোগ্য।
>
> **আলব্যের কাম্যু**

আত্মহত্যার দার্শনিক ব্যাখ্যা কী? অথবা কী তার মনস্তাত্ত্বিক উপযোগিতা? আত্মহত্যা কি জীবনকে অস্বীকার নাকি মৃত্যুকে ভালোবাসা? অথবা মৃত্যু যখন অমোঘ এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখনই কি তার জানালা এক এক করে খুলে যায় যার দূর চারণভূমি ইশারায় ডেকে নিয়ে যায় তার গভীর অন্তঃপুরে? প্রকৃতই এ এক সমস্যা যে জীবন ও মৃত্যু যখন সমার্থক হয়ে যায় তখন অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে কীভাবে চিহ্নিত করা যায়! সোক্রাতেস বলেছেন জীবন ও মৃত্যুর সম-উপযোগিতা বিষয়ে। তিনি বলেছেন, মৃত্যু যে উত্তম কিছু হতে পারে, তা প্রত্যাশা করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুক্তিটি হলো, মরে যাওয়ার অর্থ হলো অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া, অসচেতন হয়ে যাওয়া, বা এ জগৎ থেকে অন্য এক জগতে আত্মার গমন, অতএব মৃত্যু যদি স্বপ্নহীন নিদ্রার মতো হয় অথবা যদি হয় অন্য জগতে গমন, তাহলে তা এক চমৎকার প্রাপ্তি। আলব্যের কাম্যু দিতে চেয়েছেন এর এক দার্শনিক উত্তর: মানুষ বাস করে নিরর্থকতায়; অর্থ ও উদ্দেশ্যহীন জীবন। তাঁর ভাষায়, জাগরণ, গাড়ি, চার ঘণ্টার কাজ, খাবার, ঘুম, আর সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার আর শনিবার একই পুনরাবৃত্তি—একই পথে চলা সব সময়। কিন্তু এক সময় দেখা দেয়—কেন।[১] এভাবেই এসে যায় নিরর্থকতা। এই হলো নিরর্থক সিসিফাসের নিয়তি যা তাকে বারে বারে একই চক্রে আবদ্ধ করে রাখে। সুতরাং এর থেকে উদ্ধারের

~ www.amarboi.com ~

পথ কী? এক হতে পারে তা মেনে নিয়ে চরকিতে আবর্তিত হওয়া। আর হতে পারে তা মেনে না-নিয়ে জীবনকে সমাপ্ত করা, আর তা সম্ভব শুধু আত্মহত্যার মাধ্যমে। মৃত্যুর অদৃষ্টবাদও মানুষকে প্রলুব্ধ করে জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করতে। *ইলিয়দ*-এ দেখা যায় অ্যাকিলিস যখন প্রিয়ামপুত্র লাইকাওনকে হত্যা করতে উদ্যোগী হয় তখন লাইকাওন তার কাছে প্রাণরক্ষার কাতর আবেদন জানায়। এতে অ্যাকিলিস আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, কেন সে মরতে এত কাতর হচ্ছে? অ্যাকিলিস তাকে আরও বলে, পাত্রোক্লাস তার থেকে বেশি যোগ্য ব্যক্তি ছিল কিন্তু সেও মরেছে, তার নিজের দিকে ইঙ্গিত করে অ্যাকিলিস বলে যে মৃত্যুর বিনাশী ছায়া তার ওপরও পড়েছে, এমন একদিন আসবে যখন শত্রুদের সাক্ষাতে তার জীবনদীপ নির্বাপিত হবে। দেখা যাচ্ছে, মৃত্যু অনিবার্য, জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে মৃত্যু, তাই অ্যাকিলিস অবশ্যম্ভাবী জেনে তুচ্ছজ্ঞান করছে মৃত্যুকে। যেহেতু মৃত্যু অনিবার্য, জীবন তাই তুচ্ছ, অথবা যদি পৃথিবীতে কেউ না মরত তবে মানুষ গোপনে গোপনে কামনা করত মৃত্যু, হয়তো তখন অমরত্ব থেকে বাঁচার পথ হতো আত্মহত্যা। যেহেতু মৃত্যুর সাথে মানুষের বাসনার সম্পর্ক রয়েছে, তাই তা হতে পারে এক অর্থে এক ধরনের অপ্রত্যক্ষ আত্মহত্যা। ফ্রয়েডের ধারণাও এরকমই ছিল। তিনি মনে করতেন, মানুষ মৃত্যুকামনা করে আর সেজন্যই সে মরে, অতএব সেই অর্থে সকল মৃত্যুই আসলে এক ধরনের আত্মহত্যা। ফ্রয়েড অবশ্য একে বলেছেন ছদ্মবেশী আত্মহত্যা। আত্মহত্যা হলো জীবনের এক দুঃসাহসিক কাজ যা একজন মানুষ একবারই করতে পারে; অথবা তা হলো এক যদৃচ্ছাক্রম: স্থানকালের ভেতর এক মাত্রামানুষের প্রবল অস্বীকার। আত্মহত্যা হলো নিজের দিকে নিজের ধাবিত করা মৃত্যু।

এ কথা বলা অমূলক নয় যে আত্মহত্যা প্রবলভাবে মুগ্ধ করেছে লেখকদের। পুরোনো সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আত্মহত্যা বিভিন্ন আঙ্গিকে, কখনও নিজ জীবনে, কখনও বা চরিত্র-চিত্রণে, লেখকদের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ উদ্দীপনা হিসেবে দেখা দিয়েছে। লেখকেরা একে দিতে চেয়েছেন এক শৈল্পিক ও পৌরাণিক মহত্ত্ব; যৎপরোনাস্তি একে সিক্ত করতে চেয়েছেন বিভাবমাধুর্যে। *ওল্ড টেস্টামেন্ট*-এ দেখা মেলে আত্মহত্যার: শৌল, অবিমেলক ও অহিথোফেলের আত্মহত্যা[২]। *নিউ টেস্টামেন্টে*ও দেখা যায় জুদাস জিশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রাপ্ত তিরিশ রৌপ্য মুদ্রা ছুড়ে ফেলে দেয় মন্দিরের মেঝেতে, তারপর সে জনান্তিকে গিয়ে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে।[৩]

হিব্রুশাস্ত্র ছাড়াও গ্রিক ও রোমান লেখকদের লেখায় পাওয়া যায় আত্মহত্যার মহিমান্বিত বিবরণ। গ্রিক পুরাণ ভরতি হয়ে আছে আত্মহত্যার কাহিনিতে। লিউকাকুস আপোলোর অসংগত লিপ্সার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য মৃত্যুবরণ করেন। ইয়োকাস্তাও আত্মহত্যা করেন যখন জানতে পারেন যে অয়দিপুস তার ছেলে। গ্রিক পুরাণ ও কিংবদন্তির বীর থিসিউসও সাইরসের এক নির্জন দ্বীপে, দেশবাসীর বিরূপতায়, আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করেন। গ্রিক রাজা ও আইনবেত্তাদের কাহিনিও লিপিবদ্ধ করেছেন গ্রিক ঐতিহাসিকেরা। তাঁরা লিখেছেন, অ্যাথেন্সের কোদরুস ও স্পার্টার লাইকারাগুসের আত্মহত্যার কথা। বিখ্যাত গ্রিক বাগ্মী দেমোসথেনেস[৪] বিরুদ্ধবাদীদের অবরোধ থেকে নিজেকে রক্ষার উপায় হিসেবে বিষপান করেন। সত্তর বছর বয়স্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সোক্রাতেসও নিজ দেশ অ্যাথেন্স থেকে নির্বাসনের পরিবর্তে হেমলক পান করে মৃত্যুবরণ করেন, যাকে বলা যেতে পারে এক প্রচ্ছন্ন আত্মহত্যা। স্টোয়িসিজমের জনক দার্শনিক জেনো[৫] ও তাঁর উত্তরসূরি ক্লেয়াস্থেসও[৬] আত্মহত্যা করেন।

রোমান দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মহত্যা হলো আদর্শ নির্গমনের এক উপায়। স্টোয়িক সেনেকা আত্মহত্যাকে বলেছেন, "মন্দের সমাপ্তি" যা একজনকে বিমুক্ত করে, স্বাধীন করে দেয়। তাঁর যুক্তি ছিল, মুক্তির উপায় প্রত্যেকের শরীরের শিরায় নিহিত, সবাই পালাতে চায় কিন্তু পারে না বলেই ঘৃণা ও অবহেলা নিয়ে বেঁচে থাকে। সেনেকাসহ অন্যান্য রোমান স্টোয়িকদের লেখা আত্মহত্যার প্রতি মধুর সমর্থনে পূর্ণ। ওই সময়ের বিখ্যাত সব লেখায় পাওয়া যায় আত্মহত্যার আবেগায়িত উৎসারণ ও যৌক্তিক ভিত্তি। *ইনিদ*[৭]-এ দেখা যায়, দিদো এক স্ব-আরোপিত আঘাতে মারা যান। সেই সময়ের তিন-বিখ্যাত লেখক—মহাকবি লুকান, বিদ্রূপাত্মক সাহিত্য-রচয়িতা পেত্রোনিয়ুস এবং নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক সেনেকা[৮] সম্রাট নিরোর আদেশে আত্মহত্যা করেছিলেন। লুকান একজন ইম্পেরিয়াল কোর্টের সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তা হয়েও নিরোর আদেশে তাঁর লেখা প্রকাশ থেকে বিরত থেকেছেন; স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিষয় ফাঁস হয়ে গেলে আত্মহত্যা অথবা দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হলে তিনি প্রথমটিকেই বেছে নেন। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে পেত্রোনিয়ুস নিজের জীবনের সমাপ্তি টানেন আর সেনেকাও প্রজাবিদ্রোহের অভিযোগে ৬৫ খ্রিস্টাব্দে অভিযুক্ত হন। তোসিতুস[৯] তাঁর বিখ্যাত *অ্যানালস্*-এ স্টোয়িকদের মৃত্যু-সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কমিক-নাট্যকার তেরেন্স (১৯৫-১৫৯ খ্রি.পূ.) ও দার্শনিক-কবি লুক্রেতিয়ুস[১০] (৯৪-৫৫ খ্রি.পূ.) সম্ভবত নিজেদের হত্যা করেছিলেন, যদিও এ বিষয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে। কোনো কোনো উৎস থেকে জানা যায়, তাঁরা আত্মহত্যা করেছেন আবার কেউ কেউ জানাচ্ছেন যে তাঁদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। যদিও তিনি আত্মহত্যা করেননি, তবু গীতি কবি কাতুল্লুস[১১] (৮৪-৫৪ খ্রি.পূ.) সব কবিদের কাছে এক প্রত্নপ্রতিমার মতো, যার জীবন প্রেম-প্রত্যাখ্যানে হয়েছিল বিনষ্ট। তিনি তাঁর কবিতায় বলেছেন, মৃত্যু সম্ভবত ক্লদিয়ার (প্রেমিকা) প্রত্যাখ্যান থেকে কষ্টকর নয়, বরং অধিক আনন্দের ও অগ্রাধিকারের। আত্মহত্যা করেছিলেন রোমান নারী কোলাতিনুস পত্নী লুক্রেতিয়া;[১২] আত্মহত্যা করেন কাসিয়ুস শত্রুদের হাতে ধরা না পড়ার জন্য।

আ. আলভারেজ তাঁর বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ *দ্য স্যাভেজ গড*-এ বলেছেন, আত্মহত্যা পশ্চিমা সংস্কৃতিতে পরিব্যাপ্ত এক ক্যানভাস বা পটভূমি। আলভারেজ দেখিয়েছেন, কীভাবে গত দুই সহস্রাব্দ ধরে ইতিহাস ও সাহিত্যে মানব-আচরণের এ দিকটি নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাঁর ব্যাপক অনুসন্ধান মধ্যযুগ থেকে রেনেসাঁ হয়ে যুক্তির যুগ এবং রোম্যান্টিক উন্মেষ হয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। বস্তুত উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর অনেক স্মরণীয় ও বরণীয় লেখকই ছিলেন হয় আত্মহত্যাস্পৃষ্ট অথবা হ্যামলেটের মতোই মৃত্যুতে আবিষ্ট,[১৩] যদিও তাঁরা সত্যিকার অর্থে নিজেদের হত্যা করেননি, বরং চূড়ান্ত এক পরিণতির দিকে তাঁরা নিজেদের ইচ্ছাকৃত এবং বেপরোয়াভাবে প্ররোচিত করেন। ফ্লবেরের *মাদাম বোভারির* নায়িকা ইমা বোভারি[১৪] বিষপান করে, আনা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কারেনিনা[১৫] ট্রেনের নীচে নিজেকে ছুড়ে দেয়, বৃদ্ধ কারামাজোভের[১৬] অবৈধ পুত্র স্মেরদিয়াকভ তার পিতাকে হত্যা করে নিজে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে, হেরমান হেসের অনেক নায়ক জলে ডুবে আত্মহত্যা করে, *ডেথ ইন ভেনিস*[১৭]-এর গুস্তাফ ফন আশেনবাখ ভেনিসে থেকে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে যদিও তার জানা ছিল যে প্লেগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে শহরে, হান্স কাসটোর্প[১৮] জাদুপাহাড় ছেড়ে যুদ্ধ করতে জার্মান বাহিনীতে যোগ দেয় যদিও সে জানে যে যুদ্ধে তাকে হতে হবে মৃত্যুর মুখোমুখি। গ্রেগর জাম্‌জা *মেটামরফসিস*-এ বিলুপ্ত হতে চায় কীটে,[১৯] পরিণত হয় মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষায়। তলস্তোয়ের *আনা কারেনিনার* চরিত্র ভ্রোনস্কি ও লেভিন এবং *যুদ্ধ ও শান্তির* পিয়ারে বেজুখোভ এবং *পুনরুত্থান*-এর কেতারিনা মাসলোভা নিজেদের জীবন ত্যাগ করতে চায়, আর্নেস্ট হেমিংওয়ের নায়কেরা মৃত্যুতে আক্রান্ত হয় আকছার। এ ধরনের অজস্র উদাহরণ থেকে ইঙ্গিত আসে যে, অনেক আধুনিক লেখকেরা ছিলেন মৃত্যুতে আক্রান্ত ও আচ্ছন্ন। আর আত্মহত্যায় তলস্তোয়ও হয়েছিলেন উদ্বেলিত; মনে করেছেন আত্মহত্যা প্রত্যেক মানুষের এক অপসারণ-অসাধ্য অধিকার। কবি জন ডানও আত্মহত্যাকে মনে করতেন নৈতিক ও সম্মানজনক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ কবি আঠারো বছর বয়সি টমাস চ্যাটারটন ১৭৭০ সালে আর্সেনিক খেয়ে আত্মহত্যা করেন। ১৮১১ সালে প্রুসিয়ান নাট্যকার ও নভেলা-লেখক হাইনরিশ ফন ক্লাইস্ট ওয়ানসির সমুদ্র-সৈকতে হেনরিয়েটা ফোগেলের সাথে এক আত্মহত্যার সন্ধিতে মিলিত হন এবং সর্বশেষ ঝুঁকিতে রাজনৈতিক কাগজ *ডি আবেন্ড ব্লেটার*-এর ব্যর্থতায় ক্লাইস্ট ফোগেলকে প্রথমে গুলি করেন, পরে নিজেকে গুলি করেন। ফরাসিতে *ফাউস্ট*-এর অনুবাদক ও কবি জেরার দ্য নেরভাল, ১৮৫৫ সালে, প্যারিসে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। নেরভাল সারাজীবন ধরেই ছিলেন মৃত্যুতাড়িত ও অধিকৃত, এবং আত্মহত্যায় সম্মোহিত। একদা দানিয়ুব নদীর পারে এক সন্ধ্যায় তিনি আহাজারি করেছেন এই বলে যে, এই নদী হতে পারে তাঁর সুন্দর কবর। শেষ জীবনে পাগলামো-বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ *অরেলিয়া* শেষ না করেই তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যান। ১৮৯৪ সালে আমেরিকান ঔপন্যাসিক কনস্টানস এফ উলসন ভেনিসে জানালা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। পরের বছরই কলম্বীয় কবি হোর্হে আসুনশিয়ন সিলভা আত্মহত্যা করেন; ৩১ বৎসর বয়সেই তিনি এই কাজ করেন।

বিংশ শতাব্দীতে অনেক লেখকই যাপন করেছেন বেপরোয়া জীবন, আত্মঘাতী সমৃদ্ধিতে ভরপুর ছিল তাঁদের জীবনধারা যা আসলে এক বিয়োগবিধুর অসম্পূর্ণতার অপর রূপ, এক সাংঘাতিক যাপন। এঁদের জীবন আসলে এক "মনস্তাত্ত্বিক আত্মহত্যা"।[২০] মনস্তাত্ত্বিক, কারণ তাঁরা আত্মহত্যাকে মনে মনে বরণ করে নিয়েছিলেন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে। আবার অন্যদিকে গ্যোয়েটে ও ফ্লবেরের মতো জীবনঘনিষ্ট লেখকও জীবনের কোনো কোনো ভীতিকাতর মুহূর্তে নিজেকে হত্যা করার জন্য প্ররোচনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।[২১] পরবর্তী সময়ে তাঁরা এই আত্মহত্যাস্পৃহাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রকারান্তরে একে সৃষ্টিশীলতায় পরিণত করেন অনবদ্যভাবে। অনেকে আবার আত্মহত্যা-সংঘটনে সচেষ্ট থেকেও অবশেষে পেরে ওঠেননি: গি দ্য মোপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩) উন্মাদনায় আক্রান্ত অবস্থায় ভীত এবং আতঙ্কিত হয়ে দুই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বার আত্মহত্যার চেষ্টা চালান; ইংরেজ কবি ফ্রান্সিস টমসন (১৯৫৯-১৯০৭) আফিম খেয়ে নেশা অবস্থায় ১৮৮৫ সালে লন্ডনের রাস্তায় শুয়েছিলেন যাতে গাড়ি এসে তাঁকে পিষ্ট করে দিয়ে যায়; পথচারী এক মহিলা এসে পরে তাঁকে উদ্ধার করেন সে-যাত্রায়। লেখক হওয়ার অনেক আগে, ১৮৭৮-এর মার্চ মাসে, জোসেফ কনরাড তাঁর জীবন শেষ করে দিতে উদ্যত হন। অর্থহীন অবস্থায় মার্সেইলিতে কাকাকে দ্বিতীয়বার ঋণের কথা বলতে ব্যর্থ হয়ে কনরাড তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে আটশ ফ্রাঙ্ক ধার নিয়ে নিচ ও মোনাকোর মধ্যবর্তী ভিলিফ্রাঙ্কির দিকে যান, সেখানে আমেরিকান নৌবাহিনীতে ভরতি হতে তিনি ব্যর্থ হন বিদেশি হওয়ার কারণে। এই সময়ে ভিলিফ্রাঙ্কি ত্যাগ করার পূর্বমুহূর্তে কনরাড এক ক্যাসিনোতে জুয়া খেলে ধার করা সব টাকা হেরে বসেন। কনরাড মার্সেইলিতে ফিরে এসে বুকে গুলি করে বসেন; গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সে যাত্রায় আহত অবস্থায় রক্ষা পান তিনি। টেলিগ্রাম পেয়ে তাঁর কাকা পোল্যান্ড থেকে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। পারিবারিক সুনাম রক্ষার জন্য তিনি এই বলে আত্মীয়-স্বজনকে জানান যে কনরাড ডুয়েল লড়তে গিয়ে আহত হন। *ইউটোপিয়ার* লেখক রাজনীতিক স্যার টমাস মোরও এক নৈতিক কারণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। কিছু উৎস থেকে মনে করা হয়, শেক্‌সপিয়রও আভোনে এক মদ্যপান উৎসবে ইচ্ছাকৃত অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে মারা যান। এলিজাবেথীয় নাট্যকার রবার্ট গ্রিন (১৫৫৮-১৫৯২) অতিরিক্ত মদ্যপানে মারা যান। ইংরেজি কবি টমাস স্যাডওয়েলও (১৬৪২-১৬৯২) মাত্রাতিরিক্ত আফিম সেবনে মারা যান; বাত রোগ থেকে অব্যাহতি বা প্রশান্তি লাভের জন্য তিনি আফিম খাওয়া শুরু করেছিলেন। মৃত্যুতাড়িত কবি-সামালোচক-গল্পলেখক এডগার অ্যালেন পো-ও আফিম সেবনে ধীরে ধীরে জীবনাবসানের দিকে ঢলে পড়েন। পো (১৮০৯-১৮৪৯) মাত্র ৪০ বছর বয়সে মারা যান; মারা যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে তিনি বাল্টিমোরের রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলেন। ফরাসি নাট্যকার ও গীতিকবি আলফ্রেদ দ্য মুস্যে (১৮১০-১৮৫৭) তাঁর জীবনের শেষ দশ বছর মদ্যপান ও লাম্পট্যে ডুবেছিলেন লেখিকা জর্জ স্যান্ডের প্রত্যাখ্যানকে ভুলে থাকার জন্য। অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণেই ৪৭ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। কবি দান্তে গাব্রিয়েল রোসেটি (১৮২৮-১৮৮২) অনবরত বেদনানাশক নেওয়ার ফলে মৃত্যুবরণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি প্রতীকবাদী কবি পল ভেরলেন (১৮৪৪–১৮৯৬) মদ্যপানের কারণে মারা যান। বিস্মৃত কবি আর্নেস্ট ডাওসন[২২] (১৮৬৭-১৯০০) এক হোটেলের মালিকের মেয়ে আদেলেদের প্রেমে পড়েন; প্রেমিকাকে পাননি, কিন্তু এই বিরহে তার বড়ো সঙ্গী হলো মদ। এক সময় নিজেকে আবিষ্কার করেন "মানব দাসত্ব" অবস্থায়, আর পতিত হন মৃত্যুমুখে। "সিনারা" কবিতায় তিনি তুলে ধরেন তাঁর মর্মবাণী:

কাল রাতে, গত রাতে হায়, তার ওষ্ঠ আর আমার
ওষ্ঠের মাঝামাঝিতে এখানে অবশেষে পড়ে তোমার ছায়া
সিনারা! সুরাপান আর চুম্বনের মধ্যবর্তী তোমার
নিশ্বাস আমার আত্মাকে স্পর্শ করে, সিক্ত করে,
আর আমি হয়ে পড়ি নিঃসঙ্গ ও দুর্বল কোনো এক
পুরোনো সংরাগে, আর নত হই অনুরাগে
এখনও বিশ্বস্ত আমি, সিনারা, আমারই ধরনে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বায়রনের স্বাস্থ্য ছিল খারাপ, তবু তিনি গ্রিক স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করে যুদ্ধে যোগদান করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। কবি ও নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লো (১৫৬৪-১৫৯৩) ছিলেন ঝগড়াটে ধরনের এবং তিনি পানশালায় এক সংঘর্ষে মারা যান। রুশ লেখক আলেকজান্দার পুশকিন বিয়ে করেছিলেন যাকে, সে ছিল, পুশকিনের ভাষায়, তাঁর ১১৩ নম্বর নারী। বিয়ের পর দুজনেই পরকীয়ায় মেতে ওঠেন। পুশকিন জানতেন যে তাঁর স্ত্রী তাঁর প্রতি ছিল অবিশ্বস্ত, তবু ঘটনা জানার পর তিনি হয়ে পড়েন বাতুলতাগ্রস্ত। ১৮৩৭ সালে আটতিরিশ বছর বয়সে, এসব মানসিক অশান্তির পরিণামে তিনি মারা যান। রুশ কবি ও ঔপন্যাসিক মিখাইল ইউরিভিচ্ লেয়ারমন্তফ[২৩] (১৮১৪-১৮৪১) এক তুচ্ছ অপরাধে প্রতিদ্বন্দ্বী সহকর্মী এক সৈনিকের সাথে দ্বৈরথে (ডুয়েল) মারা যান। এত সব উদাহরণ থেকে একটা বিষয়ে উপনীত হওয়া যায় যে এঁদের সবার মৃত্যুর পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও কাজ করেছিল নির্গমনের আত্মঅভীপ্সা যাকে বলা যায় নিষ্ক্রিয় আত্মলোপ।

ওই সময়ের মৃত্যুর আর এক কারণ হলো যৌনরোগ, প্রধানত, সিফিলিস। সে-সময়ে এই রোগের উৎপত্তি বা জীবাণু শনাক্ত করা যায়নি। নাট্যকার জর্জ পিল (১৫৫৬-১৫৯৬), চল্লিশ বছর বয়সে সিফিলিসে মারা যান। জন কিট্স যখন প্রথমবারের মতো স্কটিশ এক পতিতার সাথে মিলিত হন, তখনই এই রোগ তাঁকে ধরে। পরে তিনি আফিম ও আফিমের আরক খেয়ে এই রোগের চিকিৎসা চালান। এই দুজনই ছিলেন দুর্ভাগ্যের শিকার, কারণ অনেকেই সে-সময় পতিতার সংস্পর্শে যেত কিন্তু সবাই সংক্রমণগ্রস্ত হতো না; আর, এই দুজনই ছিলেন সুশিক্ষিত: পিল ক্রাইস্ট হাসপাতাল ও অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চে আর কিট্স চিকিৎসাবিদ্যায় লেখাপড়া করেন। উভয়েই হয়তো সংক্রমণের কথা জানতেন। পঁচিশ বছরে যক্ষ্মায় কিট্সের মৃত্যুকে প্রভাবিত করেছিল এই যৌনরোগ। কিট্স জানতেন যে তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শেষ চিঠিতে ফেনি ব্রাউনকে কিট্স লিখেছিলেন যে, সব সময় মনে হয় তাঁর আসল জীবনের মৃত্যু হয়েছে; এখন যেন মৃত্যু-পরবর্তী জীবন যাপন করছেন তিনি। মৃত্যুর আগ-মুহূর্তে, কিট্স যেন অপেক্ষায় ছিলেন মৃত্যুর জন্য; তাঁর শেষ উক্তি: "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এতদিনে মৃত্যু এল।"

চার্লস ল্যাম (১৭৭৫-১৮৩৪), কবি ও গদ্যকার, একদিন বেড়াতে গিয়ে পিচ্ছিল রাস্তায় পড়ে যান পা পিছলে, মুখে আঘাত পেলেন, যত্ন নিলেন না। দু দিন পরে মুখ ফুলে উঠল। তিনি মারা গেলেন। রুশ কথাশিল্পী ইভান তুর্গেনিয়েভ (১৮১৮-১৮৮৩) ক্যান্সার রোগে যন্ত্রণাভোগের একপর্যায়ে, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে, মোপাসাঁকে বলেছিলেন: "একটা রিভলভার দাও, যন্ত্রণা আর সইতে পারি না।" মনে হয় আত্মহত্যাই করতে চেয়েছিলেন তিনি।

বর্ণিত মৃত্যুগুলো আত্মহত্যা অথবা সম্ভবত আত্মহত্যাগামী, কারণ এখানে কাজ করেছে আত্মধ্বংসের মনস্তত্ত্ব। মৃত্যু এক আদি ও আসল অবস্থা, তাতে সবাইকে ফিরে যেতে হয়। বিংশ শতাব্দীতে এসে আত্মহত্যা এক ধ্রুপদি রূপ ধারণ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে তা যদি হয় হাতে গোনা, তাহলে বিংশ শতাব্দী হলো এক্ষেত্রে সংখ্যাবহুল। শুধু লেখক নয়, এই ক্ষেত্রে আছেন অভিনেতা, বিজ্ঞানী, ডাক্তার। এভাবেই এ সমস্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মহত্যা সংঘটিত হয় যার তাড়নাকে গ্যোয়েটের ভাষায় বলা যায়, "বল প্রায়ই করোটির কাছাকাছি যায়।"

বিংশ শতাব্দীতে অনেক লেখকই আত্মহত্যা করেননি সরাসরি, তবে তাঁরা ছিলেন ধীর আত্মবিনাশী। মন্থর আত্মবিনাশিতা কি এক ধরনের আত্মহত্যা? মৃত্যু যদি হয় এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল তাহলে সূক্ষ্ম আত্মবিনাশিতাও এক মন্থর আত্মহত্যা, এক ধীর পরিণাম। মদ্যপানের মাধ্যমে আত্মবিনাশী হয়েছেন অনেকে, এদের মধ্যে আছেন—এফ. স্কট ফিট্‌সজেরাল্ড, উইলিয়াম ফকনার, ডিলান টমাস, ট্রুম্যান ক্যাপোট। আবার এ শতাব্দীতে আরও আছেন অনেকে, যারা আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন: ডরোথি পার্কার, ইউজিন ও নিল, রেমন্ড চাণ্ডলার, জ্যাঁ জেনে, আ. আলভারেজ। ইউজিন ও'নিল আত্মহত্যা করতে গিয়ে তাঁর কলেজ রুমমেটের হস্তক্ষেপে বেঁচে যান। এছাড়াও বিংশ শতাব্দীর অনেক বিখ্যাত লেখক আত্মহত্যাকে চাক্ষুষ করেন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে : টমাস মানের দুই বোন, শ্যালিকা ও দুই ছেলে আত্মহত্যা করেন; হুগো ফন হফ্‌মানস্টাল, ইউজিন ও নিল, আর রবার্ট ফ্রস্টের ছেলে আত্মহত্যা করেন। গাব্রিয়েলা মিস্ত্রালও ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্টেফান ৎসভাইগ ও তাঁর স্ত্রীর আত্মহত্যাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

আত্মহত্যা একটি অন্তরিত বিষয়, এই অভিজ্ঞতা একক ও একাকিত্বময়। তবে নিশ্চয় এর পেছনে আছে মনোবিকলিত পরিপ্রেক্ষিত। হতাশা, ব্যর্থতা, বিষাদ, বিচ্ছিন্নতা, বিবিক্ততা, আত্মরতি ইত্যাদিকে এক্ষেত্রে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। নির্জ্ঞান জগতের এক নীরব খেলা এই আত্মহত্যা। বিংশ শতাব্দী অবচেতনের আবিষ্কারের কাল। এই শতাব্দীকে চিন্তা করা যায় না মার্কস, ডারউইন, আইনস্টাইন আর ফ্রয়েডকে ছাড়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ফ্রয়েডের তিন ছেলে সামরিক বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু ফ্রয়েড এই মানবীয় সমস্যা নিয়ে হয়ে ওঠেন বিবিধভাবে সন্দিহান ও সন্তাড়িত। যুদ্ধ তাঁর চিন্তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করল। তিনি ১৯১৪ সালে লেখেন আত্মরতির ওপর। তারপর তিনি লেখেন মৃত্যুপ্রবৃত্তি নিয়ে। তিনি বলেন, সব বস্তুই তার আদি অবস্থায় ফিরে যেতে চায়। একটি টেনে-ধরা রাবার সব সময়ই তার আদি নিশ্চল অবস্থায় যেমন ফিরে আসতে চায়, তেমনি মানুষও মরতে চায়, তার আদি নির্জীব অবস্থায় ফিরে যেতে চায়। মানুষ মরে কারণ সে মরতে চায়। অতএব এই অর্থে সব মৃত্যুই আত্মহত্যা। মানুষের ভেতর কাজ করে মৃত্যু-গূঢ়েষা, সেই জন্যই মানুষ প্রাণ দেয় নিশ্চিন্তে। ১৯৩৯ সালে, লন্ডনে, ফ্রয়েডের ক্যান্সার বেড়ে যায়। ফ্রয়েড তাঁর রোগী-দেখা বন্ধ করে দেন। জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড দখলের এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেন কর্তৃক জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর ফ্রয়েড তাঁর চিকিৎসককে বলেন তাঁকে প্রাণনাশক মরফিন দেওয়ার জন্য। ফ্রয়েড এভাবেই মরফিন গ্রহণ করে করে সে বছরের সেপ্টেম্বরে মারা যান। এক অর্থে তাঁর মৃত্যুও মনে হয় এক পরোক্ষ আত্মহত্যা। হয়তো জীবনের শেষ লগ্নে তিনি এক বিলম্বিত মন্থর আত্মহত্যাকে স্বাগত জানান, মরফিনের ধীর মাত্রার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করতে চাইলেন নিজ মৃত্যুকে।

স্কটিশ কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক জন ডেভিডসন যিনি ছিলেন আত্মহত্যাকারী, মনে করতেন, জীবন এক মহাজাগতিক মজা ছাড়া আর কিছু নয়। অস্তিত্ব দ্বন্দ্বাত্মক শরীর-আত্মা, স্ত্রী-পুরুষ, স্থান-কাল, রাত-দিন, আলো-অন্ধকারের মিথ্যা দ্বিত্বে পূর্ণ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুই পারে এর অবসান ঘটাতে। জগতের হেঁয়ালি বা ধাঁধার উত্তর নেবুলার হাইপোথিসিসের মধ্যেই খুঁজতে হবে। মহাজগৎ বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা। বস্তুগত সত্য তাই স্বীকারযোগ্য। সব কষ্টকর দ্বিত্বের উত্তর নিহিত আছে সৃষ্টির অসীম শক্তিমত্ততায়। মানুষের মধ্যে এক সুপ্ত ও গুপ্ত প্রাকৃতিক শক্তি কাজ করে যা বেঁচে থাকার স্পৃহাকে রহিত করে তাকে অনস্তিত্বে নিয়ে যেতে চায়।[২৪] মানুষ আকুলভাবে অদৃশ্য গগনবিস্তারী নিখিল শুদ্ধতায় প্রত্যাবর্তন করতে চায়। বিবর্তনের পর্যায়েই মানুষের ভেতরে চেতনা নিরঙ্কুশ হয়; মানুষের ভেতর চেতনা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে। এবং যাবতীয় মিথ্যা বিভাজন ও বিশিষ্টতা সত্ত্বেও এক সময় বিভ্রম আসে যে সে ঈশ্বর। এই মায়া থেকে একবার মুক্ত হতে পারলেই আত্মজ্ঞান অর্জিত হয়। এভাবেই মৃত্যু-আশ্লিষ্টতায় সে বোঝে তার স্বীয় প্রকৃতি, বিশ্বও বোঝে যে মানুষ নক্ষত্রের অংশবিশেষ, অবশিষ্ট সৃষ্টি থেকে অবিভাজ্য। এই প্রকাশসিদ্ধতাতেই মানুষ মৃত্যু ও অনস্তিত্বের শক্তিশালী মুগ্ধতাকে অভিজ্ঞতায় আনে।

পন্তিয়ুস পিলাত (প্রথম শতাব্দী) ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের রাজকীয় প্রদেশ জুদিয়ার সামরিক গভর্নর বা দেওয়ান: ২৬ থেকে ৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। ইহুদি ইতিহাসবিদ ফ্লাবিয়ুস জুসেফুস তাকে এক কঠিন প্রশাসক হিসেবে বর্ণনা করেন যিনি ইহুদিদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাতীয় গর্ব বিষয়ে ছিলেন অনুদার ও অবুঝ। পিলাতের নাম জড়িয়ে আছে জিশু খ্রিস্টের বিচার ও দণ্ডাদেশের সাথে। জুদিয়ার গভর্নরের ছিল রোমান নাগরিক ছাড়া অন্য সকল অধিবাসীর বিচারের ক্ষমতা। তবে সে সময়ে ধর্মীয় বিষয়ে দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের বিষয়টি ইহুদি সুপ্রিম কাউন্সিল ও ট্রাইব্যুনাল সানহিদ্রিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। সুসমাচার অনুযায়ী এই সানহিদ্রিনই জিশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে এবং মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাবসহ রোমান আদালতে জিশুকে পাঠায়। পিলাত তদন্ত ছাড়া মৃত্যুদণ্ড প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন করতে অস্বীকার করেন। ইহুদি-ধর্মযাজকেরা তখন জিশুর বিরুদ্ধে অন্য ধরনের অভিযোগ আনয়ন করে। তখন গভর্নর জিশুর এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেন এবং পিলাত জিশুর উত্তরে মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে রক্ষায় সচেষ্ট হন: "ইহা বলিয়া তিনি আবার বাহিরে যিহুদীদের কাছে গেলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, আমি ত ইহার কোনোই দোষ পাইতেছি না। কিন্তু তোমাদের এক রীতি আছে যে, আমি নিস্তার পর্বের সময়ে তোমাদের জন্য এক ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিই; ভালো, তোমরা কি ইচ্ছা করো যে, আমি তোমাদের জন্য যিহুদীদের রাজাকে ছাড়িয়া দিবো?[২৫] কিন্তু ইহুদিদের নিরন্তর চাপে এবং জেরুজালেমে গণঅভ্যুত্থানের শঙ্কায় পিলাত ইহুদিদের সন্তুষ্টির জন্য নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিশুর বিচার সমাপ্ত করেন। ৩৬ সালে পিলাতকে রোমে ফেরত নেওয়া হয়। ধর্মতাত্ত্বিক ও ক্যাসারিয়ার চার্চ ইতিহাসবিদ ইউসিবিয়ুসের মতে পিলাত পরবর্তীকালে আত্মহত্যা করেন। অন্যান্য উৎস হতে বলা হয়, পিলাত পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টান হন, পরিণামে রোমান সিনেট তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। এই জন্যই হয়তো কোপটিক চার্চ তাঁকে শহিদ হিসেবে মানে। পিলাত জিশুর কোনো দোষ দেখেননি; কিন্তু প্রদেশে যাতে বিদ্রোহ দেখা না দেয় সে জন্য জিশুর বিচার মেনে নেন। পুনঃপুন পিলাত বলেছিলেন জিশুর নির্দোষতার কথা "তখন পীলাত আবার বাহিরে গেলেন ও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লোকদিগকে কহিলেন, দেখো, আমি ইহাকে তোমাদের কাছে বাহিরে আনিলাম, যেন তোমরা জানিতে পারো যে, আমি ইহার কোনোই দোষ পাইতেছি না।"[২৬] "এই হেতু পীলাত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যিহুদীরা চেঁচাইয়া বলিল, আপনি যদি উহাকে ছাড়িয়া দেন, তবে আপনি কৈসরের মিত্র নহেন।"[২৭] পিলাত হয়তো এই আত্মকষ্টের কারণেই আত্মহত্যা করেছিলেন আর যদি খ্রিস্টান হয়ে শহিদ হন তবুও এটা এক ধরনের পরোক্ষ আত্মহত্যা; কারণ তিনি জানতেন, খ্রিস্টান হলে তাঁর ভাগ্যে আসবে নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড।[২৮]

বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর—যিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থপতি—রবার্ট ক্লাইভ আত্মহত্যা করেছিলেন। ইংল্যান্ডের মার্কেট ড্রেইটনের কাছে, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৭২৫ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৪৩ সালে, রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সর্বনিম্ন পর্যায়ের করণিক-পদ লেখকের বা মুন্সির চাকরি নেন এবং ১৭৪৪ সালে মাদ্রাজে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। একই বছরে ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলেও মাদ্রাজ ফ্রান্স কর্তৃক দখল হলে ক্লাইভ পালিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে, ১৭৪৭ সালে, সর্বনিম্নপদস্থ অফিসার হিসেবে কমিশন গ্রহণ করেন। সামরিক কর্মদক্ষতা ও সমর্থতার পরিচয় দিয়ে অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান স্থপতি হয়ে ওঠেন। সেখানে তিনি একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে ফরাসিদের কাছ থেকে, ১৭৫১ সালে, আরাকোট দখল করে নেন এবং ত্রিচিনোপোলির দখল ছেড়ে দিতে ফরাসিদের বাধ্য করেন। এভাবেই তিনি দক্ষিণ ভারতে ফরাসি শক্তি ও দখলকে খর্ব করেন এবং সেখানে ব্রিটিশ শক্তির সম্প্রসারণ ঘটান। ১৭৫৩ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে গেলে তিনি বীরের সম্মান পান। ১৭৫৬ সালে তিনি সেন্টডেভিড দুর্গের গভর্নর হিসেবে ভারতে আসেন। ১৭৫৭ সালে ২৩ জুন অল্প-সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ক্লাইভ, বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করে ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৬০ সালে ক্লাইভ ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে পার্লামেন্টে আসন নেন। ১৭৬৪ সালে নাইট উপাধি পান তিনি। পরের বছর তিনি আবার বাংলার গভর্নর হিসেবে আসেন। দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য ১৭৬৭ সালে তিনি আবার ইংল্যান্ডে ফিরে যান। কিন্তু ইংল্যান্ডে তাঁর শত্রুরা ব্যক্তিগত ধন-সম্পদের কারণ নিয়ে পার্লামেন্টে তাঁর অভিসংশন আনে। তিনি নিজেকে চমৎকারভাবে রক্ষা করেন; যদিও পার্লামেন্ট ১৭৭৩ সালে তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়, তবু তিনি এতে গ্লানিতে ভোগেন। এই গ্লানি, দীর্ঘতর ধারাবাহিক অসুস্থতা এবং আফিম-আসক্তির কারণে ১৭৭৪ সালে ২২ নভেম্বর তিনি আত্মহত্যা করেন।

ফ্রয়েড যখন বলেন যে মৃত্যু এক আত্মহত্যা অথবা ডেভিডসন যখন বলেন যে মানুষের মধ্যে এক সুপ্ত প্রাকৃতিক শক্তি কাজ করে যা বেঁচে থাকার স্পৃহাকে রহিত করে, তাকে অনস্তিত্বে নিয়ে যায়, তখন মৃত্যুর স্বাভাবিকতা নিয়ে প্রশ্ন আসে। মানুষের জীবনের মতোই তার মৃত্যুও এক দুর্ঘটনা, অতএব স্বাভাবিক মৃত্যু বলে কিছু নেই। এক মৃত্যুপ্রবৃত্তি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে অবিরত। সিমন দ্য বোভোয়ার তাঁর আত্মজৈবনিক লেখা *আ ভেরি ইজি ডেথ*[২৯]-এ এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন: "জন্মেছে বলেই মানুষ মরে না, বেঁচে থেকেছে বলেই মানুষ মৃত্যুবরণ করে না, বুড়ো হয়ে যাবার জন্য

~ www.amarboi.com ~

মানুষ মরে না। মানুষ মরে অন্য একটা কিছু থেকে।... স্বাভাবিক মৃত্যু বলে কোনো জিনিস নেই। যেহেতু একটা মানুষের উপস্থিতি পৃথিবীতে একটা জবাবদিহিতার সামনে দাঁড় করায়, সেহেতু তার জীবনে যা কিছু ঘটে তার কিছুই স্বাভাবিক নয়। সব মানুষকে মরতে হবে, কিন্তু প্রতিটি দুর্ঘটনা, সে যদি সে কথা জানেও, যদি তাকে সম্মতিও দেয়, তবুও তা একটা অন্যায্য লঙ্ঘন, অ্যান আনজস্টিফায়েবল ভায়োলেশন।"[৩০] বোভোয়ার এখানে চমৎকার বাগ্‌বিভূতি ও স্বতঃস্ফূর্ত দার্শনিকতায় মৃত্যুর অন্য এক অর্থ উন্মোচন করেছেন। মানুষের জীবনের মতোই মৃত্যুও অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। জীবন যখন অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় তখন মৃত্যুও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিক মৃত্যুও স্বাভাবিক জীবনের কাছে অগ্রহণযোগ্য, আবার অন্যভাবে জীবনের কাছে যে-কোনো মৃত্যুই গ্রহণযোগ্য।

আত্মার গভীর জগতের মহৎ অস্ট্রিয়ান অন্বেষক, অবচেতনের কলম্বাস, জিগমুন্ড ফ্রয়েড, অয়দিপুসের মতোই যিনি একে একে উত্তর দিয়েছেন মনোজগতের স্ফিংক্‌সের সকল ধাঁধার, সত্তরতম জন্মদিনে তাঁর ভক্তরা তাঁকে অবচেতনের আবিষ্কর্তা হিসেবে আখ্যায়িত করলে তিনি তাদের শুধরে দিয়ে বলেন, কবি ও দার্শনিকেরা অনেক আগেই অবচেতনকে আবিষ্কার করেছেন, তিনি শুধু অবচেতনকে অধ্যয়নের এক বৈজ্ঞানিক উপায় বাতলে দিয়েছেন মাত্র।

১৯৩০ সালে জর্জ সিলভেস্টার ভিয়েরেককে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে[৩১] তিনি বলেন, "মৃত্যু মূলত নিজে কোনো জীবগত প্রয়োজন নয়। সম্ভবত আমরা মরি কারণ আমরা মরতে চাই।" তিনি আরও বলেন, "যেমন একটি টেনে-ধরা রাবার বেল্ড তার আদি আকৃতিতে ফিরে যেতে চায়, তেমনি সকল জীবিত বস্তুই, সচেতন বা অবচেতনভাবে, আকুল থাকে পরিপূর্ণ ও পরমভাবে তার অজৈব অস্তিত্বের নিথরতায় ফিরে যেতে। বস্তুত মৃত্যু-ইচ্ছা ও জীবন-ইচ্ছা আমাদের ভেতর পাশাপাশি অবস্থান করে।" এই সাক্ষাৎকারে তিনি আরও জানান, মৃত্যু হলো প্রেমের বন্ধু, একত্রে তারা পৃথিবী শাসন করে। এই বার্তাই তিনি দিতে চেয়েছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *বিয়নড দ্য প্লেজার প্রিন্সিপল*-এ। মনোবিকলনচর্চার প্রথম দিকে মনে করা হতো যে, প্রেমই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এখন জানা যায় যে মৃত্যুও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলছেন, জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো বিলুপ্ত হওয়া।

আত্মহত্যা বিষয়ে বলতে গিয়ে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, মানুষ আত্মহত্যা পছন্দ করে না, কারণ নীতি সরাসরি লক্ষ্য ও পথকে পরিহার করে। জীবন অবশ্যই তার আস্তিত্বিক চক্রকে পরিক্রমণ করবে। প্রত্যেক স্বাভাবিক সত্তার ভেতরই জীবন-ইচ্ছা মৃত্যু-ইচ্ছাকে প্রতিসমতা দেয়, তা সত্ত্বেও অবশেষে মৃত্যু-ইচ্ছাই শক্তিমান হিসেবে দেখা দেয়। তিনি বলেন, "এই সুখদ উপলব্ধিতে আমরা আসি যে, আমাদের কামনাতেই মৃত্যু আসে। সম্ভবত মৃত্যুকে আমরা পরাভূত করতে পারি আমাদের হৃদয়ে তার বন্ধুতা ব্যতীত। এই অর্থে আমরা এই কথা যথাযথভাবে বলতে পারি যে, সব মৃত্যুই এক ছদ্মবেশী আত্মহত্যা।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মহত্যা: কৃষ্ণগহ্বর ও তার নিখিল উদ্ভাসন

কেউ কেউ হৃদয়ের প্রতিমাকে না-জেনে, অস্থির
দুর্ভাগা ভাস্কর যেন, চিহ্নিত শাপের অপমানে,
আপন ললাটে বক্ষে হাতুড়ির অত্যাচার হানে,

শার্ল বোদলেয়ার

আত্মহত্যা বাস্তবিকই এক মারাত্মক দার্শনিক সমস্যা।

আলব্যের কামু্য

আত্মহত্যা আর ইচ্ছামৃত্যু এক মৌলিক এবং
অপরিহার্য মানবাধিকার।

আর্নল্ড টয়েনবি

কিন্তু আত্মহত্যার আছে বিশেষ এক ভাষা
ছুতোরের মতোই তারা জানতে চায় কোন যন্ত্রপাতি,
কখনোই জিজ্ঞেস করে না কেন তা বানাবে?

অ্যান সেক্সটন

আত্মহত্যা আত্মহনন, আত্মনিধন, ইচ্ছামৃত্যু, স্বেচ্ছামৃত্যু, আত্মবিলোপ, আত্মবলি, আত্মহন্তা, আত্মহা। আত্মহত্যা: Suicide (ইংরেজি), Le suicide (ফরাসি), Selbstmord (জার্মান), Suicidio (ইতালীয়)—তা হলো, ইচ্ছাধীন আত্মহননকৃত মৃত্যু intentional, self-inflicted death, অর্থাৎ যে কাজ দ্বারা ব্যক্তি তার নিজের জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। এক্ষেত্রে আত্মহন্তারক নিজেই অপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্ত। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজের ওপর নিজেই আক্রমণ চালায়। প্রাচীন ভাষাগুলোতে আত্মহত্যা নামক কোনো শব্দই ছিল না। ইংরেজি সুইসাইড শব্দটি এসেছে লাতিন sui যার মানে একজন আর cidium মানে হত্যা। ভাষাতত্ত্বেও আত্মহত্যাকে মনে করা হতো হত্যা বা মৃত্যুবরণ করার এক ধরনের উপায়। আত্মহত্যাকারী সাধারণত মারাত্মক বেদনায় ও দুর্দশায় ভোগে এবং চূড়ান্তে উদ্ভূত সমস্যাবলির সমাধানে বলা যায় ব্যর্থ হয়। ফলে তা চালিত হয় নিজের দিকে, আর এজন্য আত্মহত্যাকে অনেকে বলে থাকেন বিপরীত হত্যা, অর্থাৎ স্বাভাবিক হত্যার বিপরীত তা, কারণ অন্যকে হত্যা না করে নিজেকে হত্যা করে ব্যক্তি। আত্মহত্যাকারী ভোগে নানা মানসিক অবসাদজনিত রোগে, বিশেষত, মানসিক বৈকল্যে, এবং জীবন সম্পর্কে এক বিপণ্ন আশাহীনতায়। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে নেই প্রতিপক্ষ? অর্থী ও প্রত্যর্থী এক্ষেত্রে একই ব্যক্তি। হন্তারক

~ www.amarboi.com ~

ও আক্রান্ত একই ব্যক্তি। আত্মহত্যার বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে হয়েছে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা, অনেকে একে দেখেছেন দার্শনিক সমস্যা হিসেবে। অনেকে দস্তইয়েফস্কির চরিত্রের মতোই মনে করেন যে, ঈশ্বর না থাকলে সবই অনুমোদিত। আর এ চেতনা থেকে আধুনিক সময়ে মৃত্যুর অন্যতম মুগ্ধকারী আঙ্গিক হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে আত্মহত্যা। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অভিনেতা-লেখক-দার্শনিক-শিল্পীদের মধ্যে আত্মহত্যা পরিদৃষ্ট হচ্ছে উল্লেখযোগ্যরূপে।

গবেষণায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর দশটি প্রধান কারণের মধ্যে আত্মহত্যা অন্যতম। আরও দেখা যাচ্ছে, সেখানে ১.৫% মৃত্যুই আত্মহত্যাজনিত, ১৯৮০ সালের শেষের দিক থেকে বার্ষিক আত্মহত্যার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০,০০০ যা প্রায় স্থির এবং যা বার্ষিক অপরাধজনিত হত্যার চেয়ে অধিক। আত্মহত্যা-হারও ১৯৫০-এর পর থেকে প্রায় একই রকম—প্রতি বছর ১ লক্ষে ১০ থেকে ১৩ জন। বিভিন্ন বয়সভিত্তিক অবস্থায় আত্মহত্যার প্রবণতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমেরিকায় সাধারণত ৭৫ বছর বয়সোর্ধ্ব শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে আত্মহত্যার হার অন্য বয়সিদের তুলনায় বেশি। এর কারণ হিসেবে দেখা গেছে, শারীরিক অসুস্থতা, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে অক্ষমতা এবং অচিকিৎস্য অবসাদই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দায়ী। ১৯৫০-১৯৯৩ সময়সীমায় দেখা যায়, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি মানুষের আত্মহত্যার হার তিনগুণ বেড়ে গেছে। এর কারণ স্পষ্ট নয়, তবে গবেষকেরা এর কারণ হিসেবে যুবক সম্প্রদায়ের ক্রমাগত মানসিক অবসাদ, মাদকাসক্তি এবং আগ্নেয়াস্ত্রের সহজলভ্যতাকে চিহ্নিত করেছেন। নারী-পুরুষ ও ভিন্ন নৃ সম্প্রদায়ের মধ্যেও আত্মহত্যা-হারের পার্থক্য দেখা যায়। ৮০% আত্মহত্যাই পুরুষের মধ্যে সংঘটিত হয় কিন্তু নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বা উদ্‌যোগ পুরুষদের অপেক্ষা তিনগুণ বেশি। তবে ৯০% আত্মহত্যাই সাদাদের মধ্যে সংঘটিত হয়। কানাডায় আত্মহত্যার হার যুক্তরাষ্ট্রের মতোই প্রায়। সেখানে প্রতি বছর ৩৮০০টি আত্মহত্যা রেকর্ড করা হয়। অন্যান্য দেশের মধ্যে, লাটভিয়ায় প্রতি এক-লক্ষে আত্মহত্যার সংখ্যা ৪২.৫, লিথুয়ানিয়ায় ৪২.১, এস্ট্রোনিয়ায় ৩৮.২, রাশিয়ায় ৩৭.৮ এবং হাঙ্গেরিতে ৩৫.৯। কম আত্মহত্যা দেখা যায় গোয়েতেমালা, ফিলিপাইনস, আলবেনিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, আর্মেনিয়ায়, যথাক্রমে .৫, .৫, ১.৪, ২.১, ২.৩। তবে এটা ঠিক, আত্মহত্যার প্রকৃত সংখ্যা ও তথ্য পাওয়া কঠিন, কারণ এক্ষেত্রে দাপ্তরিক পরিসংখ্যান অনেক ক্ষেত্রে এবং অনেক দেশেই অপ্রতুল।

আত্মহত্যার পদ্ধতি এক এক সংস্কৃতিতে এক এক রকম। তবে সারাবিশ্বেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যাই বেশি দৃষ্টিগোচর হতো একসময়। শরীরে গুলি করে আত্মহত্যা ঘটানোর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র আত্মহত্যার ৬০ ভাগই (শতকরা) গুলি করে আত্মহত্যা করা। এছাড়া বিষপান, অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ সেবনের মাধ্যমেও উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক আত্মহত্যা সংঘটিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এই হার ১৮%। আরও দেখা যায়, গাড়ি-দুর্ঘটনার মাধ্যমে আত্মহত্যা। কানাডাতে বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যার হার ৩০%। অনুন্নত দেশে ফাঁসি দিয়ে এবং বিষপান করে আত্মহত্যা বেশি পরিলক্ষিত হয়। অভিজাতদের মধ্যে গুলি করে আত্মহত্যা বেশি মাত্রায়

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংঘটিত হয়। আবার আত্মহত্যার ক্ষেত্রে পদ্ধতির প্রশ্নে পুরুষ ও নারীর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় গুলি করে আত্মহত্যার প্রবণতা, অন্যদিকে নারীর ক্ষেত্রে ড্রাগের অতিমাত্রায় সেবনজনিত আত্মহত্যা বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। আত্মহত্যার কারণগত জায়গা থেকেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়: নারীর ক্ষেত্রে যেখানে অন্তর্গত বিষয়গুলো ভূমিকা পালন করে, পুরুষের ক্ষেত্রে বাহ্যিক বিষয় আত্মহত্যার কারণ হয়ে দেখা দেয়। অনেকে আত্মহত্যালিপি (সুইসাইড নোট্‌স) রেখে যায়, বলে যেতে চায় আত্মহত্যার অন্তিম কারণ। মোট আত্মহত্যার ১৫-২৫%-এর ক্ষেত্রে আত্মহত্যালিপি পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান করা যায় আত্মহত্যাকারীর শেষ উপলব্ধি। জাপানিদের মধ্যে দেখা যায় এক বিশেষ ধরনের আত্মহত্যা, যাকে বলা হয় হারা-কিরি, যেখানে আত্মহত্যাকারী পেট চিরে নিজের নাড়িভুঁড়ি নিজেই টেনে বের করে ফেলে। সাধারণত সামুরাই যোদ্ধাদের মধ্যে এই রীতি বেশি দেখা যেত।

আত্মহত্যার আচরণগত বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং রহস্যময়। প্রশ্ন দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, কেন তবে কেউ কেউ আত্মহত্যা করে? অনেকে, বিশেষত গবেষকেরা মনে করেন, মস্তিষ্কের রহস্যময় ক্রিয়া, বংশগতি, মনস্তাত্ত্বিক প্রলক্ষণ এবং সামাজিক শক্তির বিশেষ প্রভাবের কারণেই আত্মহত্যা সংঘটিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, আত্মহত্যার পেছনে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কারণ বিদ্যমান: বাহ্যিক কারণের মধ্যে রয়েছে প্রেমে ব্যর্থতা, বিচ্ছেদ, বেকারত্ব অথবা অন্য যে-কোনো ধরনের ব্যর্থতা ইত্যাদি; আর অভ্যন্তরীণ কারণের মধ্যে আছে মনস্তত্ত্বগত এক গভীর রহস্যময় বিষয়, যার একটিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা যায় বিষাদবায়ু বা ডিপ্রেশন[১] যা অনেক সময়ই থাকে অনির্ণীত ও অচিকিৎস্য। ডিপ্রেশন এক মানসিক রোগ যা আত্মহত্যার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া আছে আরও অনেক মানসিক রোগ, যেমন বাইপোলার সমস্যা,[২] স্কিট্‌সোফ্রেনিয়া,[৩] উদ্বেগজনিত সমস্যা[৪]। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কারণগুলো অনেক সময় পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে, আবার একটি অন্যটির ওপর অধিকারও স্থাপন করে। তবে শুধু একটি কারণও এক্ষেত্রে একক ভূমিকা রাখতে পারে অনেক সময়।

গবেষণায় দেখা গেছে, আত্মহত্যাস্পৃহা অনেক সময় একটি নির্দিষ্ট গোত্রের যৌথ অবচেতনে রয়ে যায়। পারিবারিক বা বংশপরম্পরায়ও এ প্রবণতা ক্রিয়াশীল থাকে। মনে করা হয়, জীবগত কারণে কোনো কোনো পরিবারে ধারাবাহিক আত্মহত্যা সংঘটিত হয়। আমেরিকার পেনসিলভানিয়ার আমিস জনসাধারণের একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা গেছে, একশ বছর ধরে যে কতকগুলো আত্মহত্যা সংঘটিত হয়েছে তার তিন-চতুর্থাংশই হয়েছে বিশেষ চারটি পরিবারে। অনেক সময় কিছু মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রেই কিছু বংশগত বৈশিষ্ট্য পেয়ে যায়? যেমন মদাসক্ততা, স্কিট্‌সোফ্রেনিয়া? যা আত্মহত্যাক্রিয়াকে উৎসারিত করে। মস্তিষ্কের কিছু রাসায়নিক উপাদানও নেপথ্যে আত্মহত্যায় ভূমিকা রাখে।

আত্মহত্যার ওপর জিগমুন্ড ফ্রয়েড কিছু মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। তিনি আত্মবৈরিতার বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।[৫] আমেরিকান মনোচিকিৎসক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কার্ল মেনিংগার এ বিষয়ে পরবর্তীকালে ফ্রয়েডের ধারণাকে আরও প্রসারিত করেন। তাঁর মতে সব আত্মহত্যাই তিনটি পরস্পর-সম্পর্কিত অবচেতনিক মাত্রাকে উপস্থাপন করে প্রতিশোধ/ঘৃণা (জিঘাংসাবৃত্তি), অবসাদ/আশাহীনতা (মৃত্যুইচ্ছা) আর অপরাধ সংঘটন (হত্যা করার ইচ্ছা)।[৬] এই তিনটি প্রবৃত্তির যে-কোনো একটি তীব্রভাবে যখন আত্মমুখী হয় তখনই ঘটে আত্মহত্যা।

আমেরিকান এডউইন স্রেডম্যান? যাঁকে আত্মহত্যা-সম্পর্কিত গবেষণার একজন অগ্রদূত হিসেবে ধরা হয়? আত্মহত্যার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন যা হলো: অসহ্য মনস্তাত্ত্বিক ব্যথা-বেদনার সংবেদন, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নিরাশা এবং অসহায়তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মৃত্যুই একমাত্র সমাধানবিষয়ক আত্মোপলব্ধি। আবার অনেকে আত্মহত্যাকে ব্যাখ্যা করেছেন অনমনীয় চিন্তার দিক থেকে জীবন ভয়ংকর ও অবহনযোগ্য, মৃত্যুই একমাত্র বিকল্প। এই সুড়ঙ্গবীক্ষণও আত্মহত্যার অন্যতম ব্যাখ্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতা, আত্মস্থিতির অভাব এবং ক্রমাগত এক বিকলনকেও চিহ্নিত করা যায় এক্ষেত্রে। মনস্তত্ত্ববিদদের চোখে অনেক আত্মহত্যার উদ্‌যোগই আসলে এক অর্থে সাহায্য-প্রত্যাশার এক প্রতীকী কান্না, মনোযোগ নিবদ্ধ করার এক প্রচেষ্টা।

সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, সমাজকাঠামো এবং মূল্যবোধ আত্মহত্যা-হারকে প্রভাবিত করে। ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক এমিল দ্যুরকহাইম যুক্তি দেখান, আত্মহত্যার হার সামাজিক একীকরণের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ ব্যক্তির সমাজবদ্ধতার মাত্রার সাথে তা বাড়ে কমে। সামাজিক বন্ধন ও সম্পর্কগুলোর ভাঙন ধরলে আত্মহত্যা বেড়ে যেতে পারে। এটা ঘটে ব্যক্তির বহুমুখী অবস্থার অবনতির মাধ্যমে। দেখা গেছে, আত্মহত্যার প্রবণতা বয়স্ক ও বিবাহিত মানুষদের মধ্যে কম; বিধবা, বিচ্ছেদপ্রাপ্ত ও একক নিঃসঙ্গ মানুষের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি। অর্থাৎ সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনের ঘেরাটোপে যারা বসবাস করে তাদের মধ্যে আত্মহত্যার হার কম; অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন, বিবিক্ত ও একাকিত্বময় মানুষের মধ্যে আত্মহত্যা বেশি ঘটে। সামাজিক অবক্ষয়, ধর্মীয় বিশ্বাসহীনতা ও সর্বগ্রাসী নৈরাজ্যকেও আত্মহত্যার জন্য অনেকে চিহ্নিত করেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দোলাচল একে প্রভাবিত করে। দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আত্মহত্যার হার ছিল কম, কারণ তখন বেকারত্ব ছিল কম; আবার ১৯৩০-এর অর্থনৈতিক মহামন্দার সময় বেকারত্ব বেড়ে গেলে আত্মহত্যাও বেড়ে যায়। কখনও কখনও বিদ্রোহের উপায় হিসেবেও আত্মহত্যা সংঘটিত হয়, তবে একসাথে অনেক মানুষের আত্মহত্যা খুবই বিরল ঘটনা। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো, ৭৩ সালে মাসাদায়[৭] (বর্তমানে দক্ষিণ ইসরায়েলে অবস্থিত) প্রায় এক হাজার ইহুদি, রোমান অধিকার ও দাসত্বে থাকার প্রতিবাদে, একযোগে আত্মহত্যা করে। আবার ১৯৭৮ সালে গায়ানার জন্‌স্‌টাউনে ৯০০ জনেরও বেশি কাল্ট সদস্য তাদের গুরু জিম জোনস-এর নির্দেশে, আত্মহত্যা করে একযোগে। এখানে কাজ করেছিল অস্তিত্ব ও বিশুদ্ধতা রক্ষার এক বিপ্রতীপ তাড়না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানসিক অসুস্থতার পাশাপাশি শারীরিক অসুস্থতাও আত্মহত্যার অন্যতম কারণ। দুরারোগ্য ও দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভোগার কারণেও আত্মহত্যা সংঘটিত হতে পারে। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলে তার পরিণতিতে আত্মহত্যা সংঘটিত হতে পারে। আত্মহত্যার আগে অনেকে সতর্কতাও জ্ঞাপন করে যদিও তা প্রায়শই হয় রহস্যময় ও সাংকেতিক। জীবনের অর্থহীনতা, মৃত্যু-আচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তি সংকেত দিতে থাকে : কখনও ছবিতে, কবিতায়, কখনও বা ডায়েরিতে নোট লিখে ব্যক্তি এর প্রকাশ ঘটায়। অন্যান্য মারাত্মক সংকেত হলো, ব্যক্তির আচরণের হঠাৎ নাটকীয় ও অব্যাখ্যাত পরিবর্তন যাকে বলা হয় "অন্তিক আচরণ"[৮] যার মাধ্যমে অনুমান করা যায় তার আত্মহত্যাস্পৃহার তীব্রতাকে, এবং এই অবস্থায় ব্যক্তিকে ধরা গেলে আত্মহত্যা সংঘটনকে প্রতিহত করা যায়। কারণ আত্মহত্যাস্পৃষ্ট মানসিক অবস্থা সাধারণত ক্ষণস্থায়ী অবস্থা; মন এই আচ্ছন্নতাকে সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী করতে চায় না, তবে পরবর্তী সময়ে এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির মনে পুনর্জাগরিত হতে পারে। সহায়ক-আত্মহত্যার[৯] ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তি অন্যের সহায়তায় ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা করে বসে। সাধারণত তীব্র শারীরিক কষ্ট এবং দুরারোগ্য অসুস্থতার পরিপ্রেক্ষিতে একজন তার নিজ মৃত্যুর জন্য অন্যের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। চিকিৎসক যখন কোনো ব্যক্তিকে তার জীবনলীলা শেষ করার জন্য সুনির্দিষ্ট ওষুধ দেয় এবং ওই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রদত্ত ওষুধ গ্রহণ করে, তখন তাকে বলা হয় চিকিৎসক-সহায়ক আত্মহত্যা। সাধারণত এই ধরনের আত্মহত্যাই অধিক দৃষ্টিগোচর হয় এবং সহায়ক-আত্মহত্যার ক্ষেত্রে অন্য ধরনের অবস্থা খুবই বিরল। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যখন নিশ্চিত হন যে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা আর নেই, তখন ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার নির্ধারিত ওষুধ গ্রহণ থেকে বিরত থেকে নিদ্রার ওষুধ গ্রহণ করতে থাকে, যা একপর্যায়ে তার মৃত্যু ঘটায়। তবে এক্ষেত্রে কখনও কখনও ব্যক্তি/ রোগী না জেনে রোগমুক্তির জন্যই ওষুধ গ্রহণ করে যা তার মৃত্যুকে ডেকে আনে। সুতরাং এক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু-ইচ্ছার ব্যাপারটি শনাক্ত করা কঠিন।

ইউথানেজিয়া বা অনুগ্রহময় মৃত্যু থেকে সহায়ক-আত্মহত্যা আলাদা; ইউথানেজিয়ায় একজন ব্যক্তি (রোগী নয়) সম্ভাব্য ব্যথাহীন উপায়ে অনুকম্পা বা দয়ার বশবর্তী হয়ে রোগীর জীবনাবসান ঘটায়। ইউথানেজিয়া প্রত্যক্ষগোচর হয় যখন চিকিৎসক কোনো প্রাণনাশক বা মারাত্মক কোনো ওষুধ দেয়, এক্ষেত্রে রোগী নয় বরং অন্য কেউ তার মৃত্যুকে সংঘটিত করে। আর সহায়ক-আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই নিজের মৃত্যু ঘটায়। যেমন, চিকিৎসক হয়তো কোনো মারাত্মক প্রাণনাশক ওষুধ দিল, কিন্তু সহায়ক-আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই নিজের ওপর তা প্রয়োগ করে। ইউথানেজিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগকর্তা ভিন্ন।

প্রাচীনকাল থেকেই শান্তিময় ও গ্রহণীয় মৃত্যুর স্বপ্ন ও চিন্তা মানুষের মধ্যে কাজ করে আসছিল। বিভীষিকাহীন সহনীয় মৃত্যুর কামনায় উদ্বেল হয়েছিলেন দার্শনিকেরা, কিন্তু হাল সময়ের আগে এই চিন্তা কোনো সামাজিক সমস্যা ও বৈধ উদ্বেগ নিয়ে দেখা দেয়নি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে নতুন নতুন ওষুধের আবিষ্কার ও নতুন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসা-পদ্ধতির উদ্ভাবনের কারণে মানুষের আয়ু বেড়ে গেছে। সাথে সাথে দুরারোগ্য রোগের ক্ষেত্রে প্রশান্তিময় মৃত্যুর চিন্তাও গুরুত্ব পাচ্ছে। চিকিৎসাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বা পরিহারের বিষয়ে আইনানুগ অধিকারও এখন গুরুত্ব পাচ্ছে। মানসিকভাবে সুস্থ একজন মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার বিষয়টিও আইনানুগ ভিত্তি পাচ্ছে। যারা মনে করেন যে সহায়ক-আত্মহত্যা বৈধ করা উচিত, তাদের মতে নিজ মৃত্যুর সময় ও পদ্ধতির ওপরও ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত।[১০] অনেকে আবার এর বিরুদ্ধে মতামত দেন, তাদের মতে, সহায়ক-আত্মহত্যা বৈধতা পেলে সংশ্লিষ্ট ক্ষুব্ধ বা ভেদ্য ব্যক্তি আর্থিক চাপ অথবা পরিবারের বোঝা হওয়ার ভয়ে আত্মহত্যা করতে চাপ ভোগ করবে। ফলে তা আত্মহত্যা না হয়ে এক ধরনের বাধ্যত হত্যায় রূপ নিতে পারে। তাছাড়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে, মৃত্যু বিষয়ে মানুষের কোনো পছন্দ কাজ করার সুযোগ নেই, যেহেতু জন্মে তার হাত নেই।

হালে সহায়ক-আত্মহত্যার বৈধতা এক নতুন ধরনের বিতর্কের সূচনা করেছে। ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে মিশিগানের অবসরপ্রাপ্ত প্যাথোলজিস্ট জ্যাক কেভোরকিয়ান (Jack Kevorkian) এই বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেভোরকিয়ান ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের জীবনাবসানের সহযোগিতার লক্ষ্যে উদ্ভাবন করেন "সুইসাইড মেশিন"-এর। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে অজ্ঞান করে শিরাতে প্রাণনাশক পটাশিয়াম ক্লোরাইড ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয় যার ফলে ব্যক্তি/রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কেভোরকিয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে অপরাধ সংঘটনের; কিন্তু জুরিরা প্রতিবারেই কোনো ছুতোতে বিভিন্ন ব্যক্তির মৃত্যুতে সহায়তার অভিযোগে কেভোরকিয়ানকে শাস্তি দিতে অপারগতা দেখায়। কিন্তু ১৯৯৯ সালে একজন জুরি কেভোরকিয়ানকে দোষী সাব্যস্ত করে দ্বিতীয়-ডিগ্রি হত্যার অভিযোগে। এই মামলায় কেভোরকিয়ান দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে, মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রাণনাশক ওষুধ প্রয়োগ করেন। বিচারে কেভোরকিয়ানের দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড হয়ে যায়। কেভোরকিয়ানকে বলা হতো মি. ডেথ, এবং তিনি তার উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে আট বছরে প্রায় ১৭০ জনের মৃত্যু ঘটান। তাঁর মতে আত্মহত্যা হলো আত্মসঙ্কল্পের এক উদ্‌যাপন বা "a celebration of self determination।" সে-সময়ে কেভোরকিয়ানের কার্যকলাপ তুমুল বিতর্কের জন্ম দেয়। তার বিরুদ্ধবাদীরা তাকে চিকিৎসার মূলধারাচ্যুত নজিরবিহীন এক অপ্রচলিত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে। তাদের মতে, সহায়ক-আত্মহত্যার কোনো সাংবিধানিক যথার্থতা বা আইনানুগ বৈধতা নেই। অন্যদিকে কেভোরকিয়ানের সমর্থকেরা বলতে চাচ্ছেন যে, জীবন-রক্ষক উপাদানের সংযোগহীনতা ও মৃত্যুবরণ করার লক্ষ্যে উপাদানের সংযোগময়তার মধ্যে তেমন কোনো বৈধ-পার্থক্য নেই। তাদের মতে প্রত্যেক রোগীরই অধিকার আছে তার চিকিৎসাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের এবং অবশ্যই অধিকার আছে নিজ মৃত্যুর সময়কে নির্ধারণের, যদি সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও নৈতিক যথার্থতা থাকে। একজন মুমূর্ষুকে মৃত্যুবরণ করতে সহায়তা করাই বৈধ ও দায়িত্বপূর্ণ, যদি রোগী তা আন্তরিকভাবে কামনা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিষয়টি নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। আইনপ্রণেতা ও আইনব্যাখ্যাকারীরা একজন ব্যক্তিকে মৃত্যুবরণ করতে দেওয়া ও মৃত্যুবরণ করতে সাহায্য করার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। আইনের চোখে প্রথমটি বৈধ কিন্তু দ্বিতীয়টি অবৈধ। যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় সহায়ক-আত্মহত্যা বা আত্মহত্যায় সহায়তা করা অপরাধ এবং তা হত্যার অপরাধের পর্যায়ে পড়ে, কখনও বা একে ভিন্ন অপরাধ হিসেবেও ধরা হয়। কেভোরকিয়ানের ঘটনার পর দেখা গেছে, মিশিগান আইন পরিষদ ১৯৯৩ সালে, আত্মহত্যায় সহায়তাকে নিষিদ্ধ করে পৃথক আইন প্রণয়ন করে যাতে অপরাধের শাস্তি সর্বোচ্চ চার বছরের কারাদণ্ড। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে এই অপরাধকে নরহত্যা-সমতুল্য গুরু অপরাধ হিসেবে ধরা হয় যার শাস্তি সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড। অবশ্য কিছু কিছু রাজ্যে সাধারণ আইনের আওতায় এই অপরাধের বিচার হয়। কানাডীয় দণ্ডবিধিতেও আত্মহত্যায়-সহায়তা অপরাধ, যার শাস্তি সর্বোচ্চ চোদ্দো বছরের কারাদণ্ড। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সহায়ক আত্মহত্যার সমর্থকেরা এই আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট এই বলে ঘোষণা দেয় যে, সহায়তা-আত্মহত্যা নিষিদ্ধকরণ-সংক্রান্ত অঙ্গরাজ্যে প্রণীত আইন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে লঙ্ঘন করে না, বা তার পরিপন্থি নয়। আদালত স্টেট অব ওয়াশিংটন বনাম গ্লাকসবার্গ মামলার রায়ে বলেন যে, ফেডারেল সংবিধান কোনো ব্যক্তির জীবনাবসানের পছন্দকে নিশ্চিত করতে পারে না। সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীতে বলা হয়েছে, সরকার কোনো ব্যক্তিকে জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি থেকে, আইনের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যতীত, বঞ্চিত করতে পারবে না। এই মামলার রায়ে আদালত ব্যাখ্যা প্রদান করে যে ১৪তম সংশোধনীতে যে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে তা কোনো ব্যক্তির নিজের মৃত্যু, তার দিনক্ষণ ও পদ্ধতিকে বৈধতা দেয় না। কানাডার সুপ্রিম কোর্টও তাদের রায়ে বলে যে, সহায়ক-আত্মহত্যা নিষিদ্ধকরণ অসাংবিধানিক নয়। ১৯৯৩ সালে, স্যু রোডরিগিউজ নামীয় বেয়াল্লিশ বছর বয়স্ক এক নারীর দুরারোগ্য রোগ (রোগটির নাম Lou Gehrig's disease) ধরা পড়লে আদালতে সে চিকিৎসক-সহায়ক-আত্মহত্যার অনুমতির জন্য আবেদন জানালে আদালত তার আবেদন না-মঞ্জুর করে। রোডরিগিউজ-এর আবেদন ছিল যে সহায়ক-আত্মহত্যা নিষিদ্ধকরণ আইনটি কানাডিয়ান চার্টার অব রাইটস-এ প্রদত্ত ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের পরিপন্থি। আদালত তার রায়ে বলে যে, জীবনকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করার যে সামাজিক স্বার্থ, তা সহায়ক-আত্মহত্যা দ্বারা ক্ষুণ্ন হয়। অবশ্য অনেক বিচারকই পরামর্শ দেন যে রোডরিগিউজের মতো রোগীদের সহায়তা করার জন্য এই আইনের সংস্কার প্রয়োজন। পরে ১৯৯৪ সালের প্রথম দিকে রোডরিগিউজ অন্য-এক চিকিৎসকের সহায়তায় আত্মহত্যা করেন। ২০০১ সালে নেদারল্যান্ডস-এ সহায়ক-আত্মহত্যা ও সক্রিয় ইউথানেজিয়া বৈধতা পায়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে কিছু অবশ্য পালনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়। বলা হয়, রোগীকে স্ব-ইচ্ছায় তার নিজের মৃত্যু-বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত জানাতে হবে এবং নিজের অবস্থা সম্পর্কে তার পরিষ্কার জ্ঞান থাকতে হবে; রোগীকে অসহ্য কষ্টে থাকতে হবে এবং

~ www.amarboi.com ~

তার অবস্থার উন্নতি আর কখনও হবে না মর্মে নিশ্চিত হতে হবে; আর এক্ষেত্রে একজন দ্বিতীয় চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করবেন, রোগীকে মৃত্যুবরণ করার সহায়তায় তার মতামতের প্রয়োজন হবে। যুক্তরাষ্ট্রে একটিমাত্র অঙ্গরাজ্য, অরিগনে, চিকিৎসক-সহায়ক-আত্মহত্যাবিষয়ক আইন রয়েছে।

সারা বিশ্বেই সহায়ক-আত্মহত্যার (অন্যের সহায়তায় আত্মহত্যা করা) নৈতিক ও মানবিক দিক তুমুলভাবে আলোচিত হয়েছে। চিকিৎসকেরা যখন অন্যকে সহযোগিতা করেন আত্মহত্যায়, অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, অন্যকে মরতে দেন, তা কতটা নৈতিকভাবে যথার্থ এবং সমর্থনীয়—এ নিয়ে প্রচুর বাগ্‌বিতণ্ডা দেখা দিয়েছে। কারও কারও মতে, কোনো ব্যক্তির মৃত্যুপ্রক্রিয়ায় চিকিৎসক কর্তৃক সহায়তা প্রদান করা সম্পূর্ণ অননুমোদিত ও অবৈধ একটি ব্যাপার। চিকিৎসক কোনো অবস্থাতেই রোগীর মৃত্যু কামনা করতে পারেন না। তার কাজ হলো রোগীকে সারিয়ে তোলার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। অন্যদিকে সহায়ক-আত্মহত্যার সমর্থকেরা বলে থাকেন যে, একজনকে হত্যা করা আর একজনকে মৃত্যুবরণ করতে দেওয়া এক নয়। প্রথমটি অমানবিক, দ্বিতীয়টি ক্ষেত্রবিশেষে মানবিক। তারা আরও বলেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে, হত্যাও বৈধ। বিষয়টিকে সামান্যীকরণ না করে "হত্যা করা" আর "মরতে দেওয়া"-র মধ্যে যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে, তা বোধগম্য করা প্রয়োজন এবং এর ওপরই নির্ভর করে কোন কাজটি উচিত আর কোনটি অনুচিত। চিকিৎসা-নৈতিকতাবাদীরা বলেন, যখন কোনো রোগী বা রোগীর বৈধ প্রতিনিধি চিকিৎসা গ্রহণে অস্বীকার করে বসেন, তখন চিকিৎসকও চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করতে পারেন। সুতরাং এক্ষেত্রে বৈধ অস্বীকারের ফলে একজন রোগীকে মৃত্যুবরণ করতে দেওয়া যথার্থ। কারও কারও মতে, রোগী যখন জীবনদায়ী ওষুধ গ্রহণে অস্বীকার করে প্রাণনাশী ওষুধ গ্রহণে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন তখন দুটি ব্যাপারই একাকার হয়ে যায়। আমেরিকার মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ও কানাডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন মনে করে যে, ফিজিশিয়ান অ্যাসিসটেড সুইসাইড কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। আবার অনেকের মতে, আইন ও নৈতিকতা দ্বারা চিকিৎসকদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়, বিশেষত যদি এর দ্বারা রোগীর রোগের উপশম হয় এবং রোগী প্রশান্তি লাভ করে চিরতরে, বা ক্ষণকালের জন্য।

অবসাদ—"ডিপ্রেশন", এক মনোব্যাধি, যখন একজন ব্যক্তি অনুভব করে এক গভীর, অনড় বেদনা, আর হারিয়ে বসে জগৎ ও জীবন-সংক্রান্ত সমগ্র আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষা। এ হলো মনের একায়ন অবস্থা যখন ব্যক্তি দুঃখ ও বিষাদাচ্ছন্নতা দ্বারা মুহুর্মুহু আক্রান্ত হয়। সাময়িক দুঃখবোধ, আচ্ছন্নতা এবং একাকিত্বকে বোঝাতেও "ডিপ্রেশন" শব্দটি আকছার ব্যবহৃত হয়, তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে বা বিশেষ অর্থে মারাত্মক অবসাদ হলো মানসিক রোগ যখন কোনো ব্যক্তি কার্যতই অসমর্থ হয়ে পড়ে তার চারপাশের সাথে অভিযোজনে। ফলত এই ব্যর্থতা চিরস্থায়ী অবস্থায় পৌঁছে যায় কখনও কখনও—ব্যক্তি প্রকারান্তরে অর্থহীনতা, আশাহীনতা, বিচ্ছিন্নতা, আশ্রয়হীনতার গোলকধাঁধায় প্রবিষ্ট হয় এবং নিরূপিত আত্মহত্যা-

~ www.amarboi.com ~

চিন্তায় কম্পমান হয়ে ওঠে।

কিন্তু "ডিপ্রেশন"-এরও আছে বিভিন্ন ধরন; বাইপোলার ডিসঅর্ডার-এ (যাকে কখনও কখনও বলা হয় ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ অসুস্থতা) ব্যক্তির মানসিকতা বা অভীপ্সা ডিপ্রেশন ও ম্যানিয়ার দোলায় দোলায়িত হয়। অনেক ব্যক্তি আছেন যারা সময়ভিত্তিক এই সমস্যায় পতিত হন; তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শরৎ ও শীতকালে যখন দিনের আলো কয়েক ঘণ্টার বেশি থাকে না, তখনই তারা ডিপ্রেশনে ভোগেন। ডিসথিমিয়া বা মানসিক সন্তাপে ব্যক্তি বিষাদবায়ুতে আক্রান্ত হন, তার আত্মসম্ভ্রম কমে যায়। বিষাদ সাধারণত কম সময় ধরে স্থায়ী হয়, তবে মারাত্মক ডিপ্রেশন থেকে এর উপসর্গ সাধারণত কম হয়। আবার ডিসথিমিয়ায় আক্রান্ত অনেকে গভীর বিষাদবায়ুতেও পতিত হন মাঝে মাঝে। এই উভয় ধরনের ডিপ্রেশনকেই মানসিক রোগ বিশারদেরা ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। সাধারণভাবে অবসাদকে ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করলেও মনোচিকিৎসক এবং মনোবিশারদদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা একটি রোগ।

দীর্ঘমেয়াদি অবসাদগ্রস্ততা থেকে অবশেষে জন্ম নিতে পারে আত্মহত্যার প্রবণতা। দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে বয়স্কদের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা ৮ ভাগ জীবনের কোনো না কোনো সময়ে মারাত্মক ডিপ্রেশনে ভোগেন, এবং এই অঙ্ক কখনও কখনও ১৭% পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পুরুষ অপেক্ষা নারীদের মধ্যে এই হার ২-৩ গুণ বেশি দেখা যায়। অপেক্ষাকৃতভাবে বর্তমান সময়ের তরুণ-তরুণীর মধ্যে এই হার বেশি। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, পরিবার-কাঠামোর পরিবর্তন, নগরায়ন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভাবের হ্রাস এই ডিপ্রেশন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

সব বয়সেই ডিপ্রেশন দেখা দিতে পারে, তবে সাধারণত ২০-৩০ বছর বয়সের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা যায়। প্রথমত দেখা দেয়, তারপর মানসিক রোগ হিসেবে তা বিকাশলাভ করে, তারপর গভীরভাবে বিস্তার লাভ করে মাস থেকে বছর ধরে। আবার হঠাৎ করেও তা মারাত্মকভাবে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। এই পর্যায়ে ডিপ্রেশনে আক্রান্ত ব্যক্তি এমনই অসমঞ্জসশীল ও ভীতিকর অবস্থায় পৌঁছায় যে তার এই স্থিতিকে চিকিৎসকেরা "নার্ভাস ব্রেকডাউন" হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। এই পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থা এতটাই মারাত্মক হয় যে, ব্যক্তি প্রায়শই ক্রন্দনে আবর্তিত হয় এবং আনন্দকর কোনো ক্রিয়াই আর তার ভেতর কাজ করে না। বয়স-অনুযায়ী ডিপ্রেশনের ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়। অল্পবয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় শারীরিক অসুবিধা? যেমন মাথা ধরা, পেটব্যথা, সামাজিক প্রত্যাহরণ, খাদ্যাভাস পরিবর্তন, বিদ্যালয়-বিমুখতা, কর্মশিথিলতা ইত্যাদি। কিশোর-বয়সে দেখা যায় বিষাদগ্রস্ততা, ঘুমের ব্যাঘাত, শক্তি বা উচ্ছ্বাসহীনতা। আক্রান্ত বয়স্ক-ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা। এই অবস্থায় সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তনগুলোর মধ্যে অন্যতম খাদ্যাভ্যাস ও ঘুমের পরিবর্তন। ডিপ্রেশন অনেক সময় ক্ষুধামান্দ্য ও ক্ষুধাবৃদ্ধির কারণ ঘটায়, কারও ক্ষেত্রে ঘুমের হ্রাসবৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি, অনেক ক্ষেত্রে, মধ্যরাত্রিতে ঘুমোতে যায়, অস্থিরভাবে ঘুমায়, তারপর ক্লান্ত ও বিমর্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়ে খুব ভোরে উঠে পড়ে। অনেক বিষাদাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য ভোরই হলো সবচেয়ে খারাপ সময়। ডিপ্রেশনে আক্রান্ত ব্যক্তি অনেক সময় উত্তেজিত, চঞ্চল ও ব্যস্ততার ভানে থাকে, অনেক সময় থাকে নির্জীব ও শক্তিহীন। চিন্তাক্রিয়া, মনোসংযোগ ও স্মৃতিময়তায় থাকে তাদের তীব্র সমস্যা। অর্থহীনতা, অসহায়ত্ব, অপরাধবোধ ও আত্মঘৃণা তাদের সারাক্ষণ ঘিরে থাকে। এই জাতীয় মানসিক উপসর্গ ও আবেগি বেদনাবস্থা ব্যক্তিকে আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ করে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কমপক্ষে ১৫% অবশেষে আত্মহত্যা করে বসে; আর তার চেয়েও বেশিসংখ্যক ব্যক্তি উদ্‌যোগী হয় আত্মহত্যা সংঘটনে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে বিভ্রম[১১] (মিথ্যা বিশ্বাস) ও অমূলপ্রত্যক্ষণের (মিথ্যা ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি) লক্ষণাদি পরিলক্ষিত হয়। এই মানসিক বিকারাবস্থা মারাত্মক অসুস্থতার জন্ম দেয় এবং এই লক্ষণাদিতে আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতালে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা নিতে হয়, কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে আবার তাদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তারা আত্মহত্যা করে বসে। অনেক মনস্তত্ত্ববিদই মনে করেন, ব্যক্তির উদ্বেগময় জীবনঘটনা এবং তার জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক আক্রান্ততা থেকেই ডিপ্রেশনের জন্ম। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বিষাদের ক্ষেত্রে বংশগত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মানুষের জিন মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অবসাদ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটার মানুষের ভাবাবেগ ও মানসিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের রাসায়নিক পদার্থ ডোপামিন, নোরেপাইনেফ্রিন ও সেরোটোনিন বিষাদের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। মস্তিষ্কের এসব নিউরোট্রান্সমিটারের কম উপস্থিতির জন্য বিষাদের জন্ম হতে পারে। এজন্য বিষাদে আক্রান্তদের চিকিৎসায় প্রদত্ত এন্টিডিপ্রেসেন্ট ওষুধের কাজ হলো নিউরোট্রান্সমিটারের মাত্রাকে ঠিক করা। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় নিউরোট্রান্সমিটারের এই সরলীকৃত ব্যাখ্যাকে বাতিল করে নিউরোট্রান্সমিটার ও ডিপ্রেশনের মধ্যে এক জটিল সম্পর্ককে বোধগম্য করার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়া হরমোনের ভারসাম্যহীনতাকেও ডিপ্রেশন সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। দেখা গেছে, অবসাদগ্রস্ত মানুষের মধ্যে এডরিনাল গ্ল্যান্ডের নিঃসরিত হরমোন হাইড্রোকর্টিসন (কর্টিসল)-এর বেশি উপস্থিতি লক্ষণীয় যা উদ্বেগ বা মানসিক উত্তেজনার জন্য দায়ী। আবার পাশাপাশি, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অতি কার্যকারিতা এবং অল্প কার্যকারিতাও পরিণামে বিষাদের জন্ম দেয়। কিছু কিছু খাদ্য-উপাদানের, যেমন ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১২ ও ফলিক এসিড-এর অভাব বিষাদের জন্য দায়ী। এছাড়া স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধও বিষাদ বাড়িয়ে দেয়।

১৯১৭ সালে রচিত "মরনিং অ্যান্ড ম্যালানকোলিয়া" প্রবন্ধে জিগমুন্ড ফ্রয়েড প্রধানত বিষাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিষণ্নতা বিষয়ে আলোকপাত করেন। সেখানে তিনি উত্থাপন করেন বঞ্চনা বা বিচ্ছেদ বিষয়ে; যেমন প্রকৃত বিচ্ছেদ—যেমন স্বামী/স্ত্রীর মৃত্যু, অথবা প্রতীকী বঞ্চনা—গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা। ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তির বিচ্ছেদ বা বঞ্চিত হওয়ার ওপর অবচেতনের ক্ষোভ বা রাগ তার অহমকে দুর্বল করে দেয়, ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মঘৃণা ও আত্মধ্বংসী আচরণের জন্ম হয়।[১২] অবধারণবাদী বিষাদ-তত্ত্ব অনুযায়ী এক্ষেত্রে অযৌক্তিক চিন্তাপদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আমেরিকান মনোচিকিৎসক অ্যারোন বেক বলেন যে, অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রবণতা হলো নিজেকে, পরিবেশকে এবং নিজ ভবিষ্যৎকে ভ্রান্তিময় চিন্তার কারণে নঞর্থকভাবে দেখা। বেকের মতে, শিশুকাল থেকে এই আত্মপরাজয়ের এক বিশেষ দৃষ্টিভক্তি সে-সমস্ত মানুষের ভেতর কাজ করে, ফলে এই নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি অবসাদের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। মনোচিকিৎসক মার্টিন সেলিগম্যান বলেন, অবসাদের উৎপত্তি হলো এক ধরনের "শিক্ষিত অসহায়তা"[১৩] থেকে। এটা হলো এমন এক ধরনের অর্জিত বিশ্বাস যা এক অনিয়ন্ত্রিত ও পরিত্রাণহীন ঘটনার জন্ম নেয়। ফলে অনীহা, দুঃখবোধ ও উদ্বিগ্নাবস্থার সৃষ্টি হয়। আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ নিল আব্রামসন এই অসহায়তার সাথে যোগ করেন আশাহীনতা যার থেকে সৃষ্ট ব্যক্তির নঞর্থক চিন্তাকে অবসাদের জন্য দায়ী করা হয়। ব্যক্তি এই চিন্তাকে চিরন্তন হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। মনস্তত্ত্ববিদগণ অবসাদ ও দুঃখ—এই দুইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখিয়ে থাকেন; তাঁরা বলেন, দুঃখ হলো স্বাভাবিক শোকের অস্থায়ী মানসিক অবস্থা যা সময়ান্তরে দূরীভূত হয়, আর অবসাদ হলো এক মানসিক জটিল অবস্থা যা অনেক সময় চিরস্থায়ী রূপ লাভ করে এবং হয়ে দাঁড়ায় মানসিক রোগ।

স্থায়ী বা গভীর বিষাদ অবশেষে ব্যক্তিকে আত্মহত্যার পথে পরিচালিত করে, তবে ওষুধ-চিকিৎসা ও সাইকোথেরাপির দ্বারা অনেক সময় এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এন্টি-ডিপ্রেসেন্ট ওষুধ প্রয়োগে সাধারণত ৭০% ভাগ ডিপ্রেশন-আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে সদর্থক সাড়া মেলে; এসব ওষুধ মস্তিষ্কের সেরোটোনিন, নোরেপাইনেফ্রিন এবং অন্যান্য নিউরোট্রান্সমিটার কার্যকরভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করা হয় যাকে বলা হয় "ব্যক্তিত্ববর্ধক"[১৪] ওষুধ। এছাড়া, সাইকোথেরাপিতেও সুফল পাওয়া যায়। সাধারণত এক্ষেত্রে তিন ধরনের সাইকোথেরাপি দেওয়া হয়: কগনিটিভ-বিহেভিওরাল থেরাপি, ইন্টারপারসোনাল থেরাপি, সাইকোডাইনামিক থেরাপি।

ম্যানিয়া ও ডিপ্রেশনের দোলাচলে দোলায়িত ব্যক্তির সমস্যাকে বলা হয় দ্বিপ্রান্তীয় সমস্যা বা বাইপোলার ডিসঅর্ডার; আবার একে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ অসুস্থতাও[১৫] বলা হয়। ম্যানিয়া ও ডিপ্রেশন-আক্রান্ত ব্যক্তির মনের দুটি অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় : ম্যানিক অবস্থায় ব্যক্তি হয়ে ওঠে অতি সৃষ্টিশীল, শক্তিময়; আবার ডিপ্রেশ্ড অবস্থায় ব্যক্তি নঞর্থক ধারণায় হয়ে পড়ে ব্যর্থ ও বিষাদিত। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে ১% লোক বাইপোলার ডিসঅর্ডারে ভোগে। এই সংখ্যা সারাবিশ্বে প্রায় একইরূপ। তুলনায় ৮% লোক তাদের জীবনে মারাত্মক ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হয়। বাইপোলার ডিসঅর্ডার নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সমান হারে দেখা যায় আর উচ্চ আর্থ-সামাজিক শ্রেণির মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। দেখা গেছে, কমপক্ষে ১৫% মানুষ বাইপোলার ডিসঅর্ডারের ফলে আত্মহত্যা করে বসে থাকে। সাধারণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২০ বছর বয়সিদের মধ্যেই এই রোগ দেখা দেয় আর প্রথম পর্যায়ে পুরুষেরা ম্যানিয়ায় এবং নারীরা ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হয়। বাইপোলার ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তি চিকিৎসাহীন থাকলে সাধারণত চারটি ম্যানিয়া ও ডিপ্রেশন-দশার ভেতর দিয়ে যেতে হয় যা দশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বাইপোলার ডিসঅর্ডারে ডিপ্রেসিভ-দশায় ব্যক্তি ক্রমশ বিষাদাক্রান্ত হয়ে কাজ-কর্মে নিরাসক্ত হয়ে পড়ে, নিজেকে অসহায় ও মূল্যহীন ভাবতে থাকে। তাদের ঘুম ও খাদ্যগ্রহণ বেড়ে যায়, এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুঃখবাদী হয়ে অবশেষে তারা আত্মহত্যায় উদ্‌যোগী হয়ে পড়ে। কখনও কখনও ডিল্যুশন ও হেল্যুসিনেশনে আক্রান্ত হয় তারা। ম্যানিক-দশায় ব্যক্তি অকারণেই হয়ে ওঠে সুখী, আত্মগুরুত্বারোপিত এবং অস্বস্তিকর। প্রচণ্ড শক্তিময় ও উচ্চকিত চিন্তাশীলতা আর নিদ্রাহীন বাগ্‌চাতুর্যে তারা মশগুল হয়ে ওঠে। ভ্রমাত্মক মহনীয়তায় তারা তাড়িত হয়; প্রায়শই হয়ে ওঠে অযৌক্তিকভাবে চিন্তাশীল, অসামাজিক এবং চূড়ান্তে আত্মবিধ্বংসী। ফলে নানা অভ্যাস, অপরাধ ও অত্যাচারে কখনও বা তারা মেতে ওঠে। "দ্রুত আবর্তনী" বাইপোলার ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি বছরে চার বা ততোধিক ভাব-দশায় পতিত হয় এবং সে তখন আর কোনো স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারে না। আবার সাইক্লোথাইমিক[১৬] ডিসঅর্ডারে ব্যক্তি মৃদু ম্যানিয়া ও ডিপ্রেশনে দোলায়িত হয়। কখনও বা দেখা গেছে, এই আক্রান্ততা ঋতুনির্ভর হয়: শীতকালে ব্যক্তি ডিপ্রেশনে ভুগতে শুরু করে, আর বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে ভুগতে থাকে ম্যানিয়ায়।

বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, ম্যানিয়া অথবা ডিপ্রেশনের ওঠানামা বা দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণে আত্মহত্যার অভিঘাত সৃষ্টি হয় ব্যক্তির মনে। কখনও কখনও কোনো ঘটনায় দেখা দেয় এ জাতীয় স্পৃহা। স্কিট্‌সোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তরা অনেক সময় পৌঁছে যায় বাস্তববিবর্জিত মানসিক দশায়, ফলে অনেকে উদ্‌যোগী হয় আত্মহত্যায়; এর মধ্যে ১০% অবশেষে আত্মহত্যা করতে সক্ষম হয়। অনেক সময় হতাশা ও বিষাদবায়ু ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে আত্মহত্যায়। পল গগাঁ একবার আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা চালান; তার অল্প কয়েক দিন আগে তিনি আঁকেন তাঁর বিখ্যাত ছবি *কোথা থেকে এলাম? কে আমরা? কোথায় যাচ্ছি আমরা?*[১৭] (১৮৯৭)। মূলত গভীর হতাশাবোধে আক্রান্ত হন তিনি সে-সময়ে যা চিত্রকলাটির নামকরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌টকে তাঁর প্রথম স্বামী ক্যাপটেন গিলবার্ট ইমলে ছেড়ে দিলে গভীর হতাশায় তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা চালান। গি দ্য মোপাসাঁর ক্ষেত্রেও উন্মাদনাক্রান্ত এক হতাশা দৃষ্টিগোচর হয় এবং মোপাসাঁও আত্মহত্যার চেষ্টা চালান। আত্মহত্যায় তাড়িত হয়েছিলেন দার্শনিক হ্বিটগেন্সটাইনও। গভীর বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়ে তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অবশেষে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করেন এবং বলেন, "আত্মহত্যা বা কাউকে হত্যা করা সব সময়ই এক নোংরা কাজ।"[১৮] তীব্র ও অসহনীয় হতাশা এবং বিষাদে আক্রান্ত হয়েছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কি এবং তলস্তোয়ও। বিষাদে আক্রান্ত গোর্কি ফুসফুসে গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান, আর তলস্তোয় *আনা কারেনিনা* লেখার সময় তীব্র ও গভীর বিষাদে আক্রান্ত হন যা তাঁকে প্ররোচিত করেছিল আত্মহত্যা-ভাবনায়।

এমিল দ্যুরকহাইম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *সুইসাইড*-এ আত্মহত্যার নানাবিধ দিক,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশেষত সমাজতাত্ত্বিক দিকের ওপর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মানসিক অস্থির অবস্থার সাথে আত্মহত্যার সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনি অবতারণা করেছেন অনেকগুলো বিষয়ের। অনেকে বলে থাকেন, মানসিক বিচ্ছিন্নতা থেকেই আত্মহত্যা সংঘটিত হয় এবং আত্মহত্যা মূলত বিভ্রম ও মানসিক বিচ্ছিন্নতার ফল, অতএব ব্যক্তির ক্ষেত্রে আত্মহত্যার সংঘটন একটি অনৈচ্ছিক ব্যাপার, সুতরাং আইনানুযায়ী তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে না। দ্যুরকহাইম (১৮৫৮-১৯১৭) আত্মহত্যা প্রবণতার বিষয়টিকে একটি নির্দিষ্ট ধরনের উন্মাদনার দিক থেকে দেখতে চেয়েছেন যা মূলত একটি কার্যাকার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই ধরনের ভ্রমকে বলা হয় মনোম্যানিয়াক যা সাধারণত এক বিষয়কেন্দ্রিক উন্মাদনা। মনোম্যানিয়াক হলো এমন একজন অসুস্থ ব্যক্তি যার মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ সবদিক দিয়ে, কিন্তু তার মনস্তত্ত্বে রয়ে যায় এমন একটি মারাত্মক ভঙ্গুরতা বা ফাটল যা তাকে করে তোলে অস্বাভাবিক। সব কাজই তার সঠিক, সব চিন্তাই হয়তো দুর্দান্ত, শুধু কোনো একটি দিকে সে হয় তীব্রভাবে অযৌক্তিক এবং অ্যাবসার্ড। ফলে এই সুড়ঙ্গচিন্তায় যখন কোনোভাবে ঢুকে যায় আত্মহত্যা-উন্মাদনা, তখন তার কারণ হয় একমাত্র মনোম্যানিয়া। সুস্থ ও মনোম্যানিয়াক ব্যক্তির মানসিক জীবন মোটামুটি একই রকম কিন্তু এ দুয়ের একটি অতি-বিশেষিত পার্থক্য রয়েছে।

দ্যুরকহাইম চার ধরনের আত্মহত্যার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন[১৯]: ম্যানিয়াকাল বা উন্মাদনাজনিত আত্মহত্যা, বিষাদজনিত আত্মহত্যা, আচ্ছন্নতাজনিত আত্মহত্যা, প্রেরণাদায়ক বা স্বয়ংক্রিয় আত্মহত্যা। ম্যানিয়াকাল বা ভাবোন্মাদনাজনিত আত্মহত্যার সূত্রপাত হয় অমূল-প্রত্যক্ষণ বা বিভ্রমজনিত ধারণা থেকে। ব্যক্তি কোনো কাল্পনিক বিপদ বা গ্লানি থেকে রক্ষার জন্য বা কোনো রহস্যময় অপার্থিব আদেশ বা অনুজ্ঞা পালনের জন্য আত্মহত্যা করে বসে। তবে এই মানসিক অবস্থার সাথে ম্যানিয়া-সংক্রান্ত লক্ষণের মিল ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে মনের অবস্থার পরিবর্তন দ্রুত হয় এবং এক অবস্থা দ্বারা অপরটি প্রতিস্থাপিত হয়। যে অমূলপ্রত্যক্ষণ বা বিভ্রমের ফলে আত্মহত্যার উদ্যোগ হয়, ব্যর্থ হলে তার আর পুনরাগমন ঘটে না, অন্তত সেই সময়ে। পরে যদি তা ফিরেও আসে তবু সেই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হয় ভিন্ন।

বিষাদজনিত আত্মহত্যা ঘটে সাধারণত চরম হতাশা ও বর্ধিত বিষণ্নতা বা দুঃখের অবস্থা থেকে, যখন ব্যক্তি তার সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষ ও বস্তু থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে। আনন্দ তাকে টানে না, সে সবকিছুকেই দেখে অন্ধকার মেঘের ওপার থেকে। জীবন তার কাছে একঘেয়ে ও কষ্টকর। এই অনুভূতিগুলো যত দীর্ঘমেয়াদি হয় ততই আত্মহত্যাস্পৃহা বাড়তে থাকে। অমূলপ্রত্যক্ষণ ও বিভ্রমাত্মক চিন্তা প্রায়শই সাধারণ হতাশার দিকে ব্যক্তিকে চালিত করে এবং সরাসরি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটায়। কিন্তু খেদোন্মাদনার মতো এই ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভেতর উত্থান-পতন বা গতিশীলতা কম দৃষ্টিগোচর হয়। ব্যক্তি এক্ষেত্রে থাকে স্থির-স্বভাবের। উদাহরণস্বরূপ, এক অল্প বয়সি বালিকা, ধনীর দুলালি, গ্রামে তার শৈশব কাটিয়ে চোদ্দো বছর বয়সে শিক্ষা সমাপ্তির জন্য বাইরে যায় গ্রাম ছেড়ে। সে-সময় থেকেই সে এক চূড়ান্ত বিরক্তি, নির্জনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্য একমুখীন এক ইচ্ছার সংস্পর্শে আসে এবং অবশেষে মৃত্যু তার জন্য অমোঘ হয়ে ওঠে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে নির্বাক ও জড়ভাবে বসে থাকে, তার বুক এক ভয়ানক দুর্ঘটনার ভীতিতে কাঁপতে থাকে, চোখ ভূমিতে হয়ে থাকে নিবদ্ধ। নিজেকে রক্ষা করতে সে ভুলে যায়। একসময় বুঝতে পারে যে, সে যা ভাবছে তা এক অপরাধ এবং অবশেষে সে আত্মহত্যার ভাবনা পরিত্যাগ করে, কিন্তু এক বছর পর আত্মহত্যাস্পৃহা আবারও সজোরে তার ভেতর আবির্ভূত হয় এবং তা সার্থক হয়। এই হলো আত্মহত্যার নমুনা, যাকে বলা যায় বিষাদজনিত আত্মহত্যা।

আচ্ছন্নমূলক আত্মহত্যায় দেখা যায়, কোনো বাস্তব বা কাল্পনিক উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ছাড়াই, কোনো পরিষ্কার কারণ ছাড়াই, মৃত্যুর অনড় চিন্তায় আত্মহত্যাচিন্তা ব্যক্তির সমস্ত মন অধিকার করে বসে। ব্যক্তি জানে যে, কোনো সুনির্দিষ্ট যৌক্তিক কারণ ছাড়াই সে মৃত্যু-আচ্ছন্নতায় অধিকৃত এবং সে ইচ্ছামৃত্যুগামী। চুরি বা হত্যা করার মতোই, কোনো যুক্তি বা চিন্তন ছাড়াই, এক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। এটাও এক মনোম্যানিয়ার ধরন। ব্যক্তি জানে যে তার অভীপ্সার ধরন নিরর্থক বা উদ্ভট। সে তাকে প্রতিহত করতেও সচেষ্ট হয় প্রথমে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় সে নিমিষেই হয়ে পড়ে বিমর্ষ, বিষাদগ্রস্ত, এবং ক্রমাগত উদ্বেগকাতর; এর ফলে ব্যক্তির সংঘটিত আত্মহত্যাকে এ ক্ষেত্রে বলা হয় "উদ্বেগজনিত আত্মহত্যা"। উদ্ভূত উদ্বেগ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ব্যক্তি এক্ষেত্রে আত্মহত্যা করে।

প্রেরণাগত বা স্বয়ংক্রিয় আত্মহত্যাও উদ্দেশ্যহীন, ব্যক্তির কল্পনা বা বাস্তবতায় এর কোনো ভিত্তি নেই। এক অমোঘ ও অদম্য প্রেরণাই এর কারণ। ব্যক্তির বিকারগ্রস্ত ধারণার সাথেই এর সম্পর্ক। স্বয়ংক্রিয় ও স্বাচ্ছন্দ্য ঢঙে এই আত্মহত্যা ঘটে। উল্লিখিত বহিঃসামাজিক কারণগুলো ছাড়াও, দ্যুরকহাইম, আত্মহত্যার বহিঃসামাজিক উপাদান হিসেবে দেখেছেন গোত্র, বংশগতি। এবং কিছু নিখিল (সৌর) উপাদানকেও তিনি আত্মহত্যা-সংশ্লিষ্ট কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। গোত্র বলতে তিনি ইউরোপের ৪টি নৃতাত্ত্বিক বা গোষ্ঠী-ধরনকে বুঝিয়েছেন: জার্মানিক টাইপ (জার্মান, স্ক্যান্ডিন্যাভীয়, অ্যাংলো-স্যাক্সন, ফ্লেমিশ), কেলটো-রোমান টাইপ (বেলজীয়, ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনিশ), স্লাভ টাইপ, উড়াল-আলটাইক টাইপ। এদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতার ক্রমহ্রাসমান বর্গে অবস্থা নিম্নরূপ জার্মানীয় মানুষ প্রথমে, তারপর কেল্টো-রোমানস, তারপর স্লাভস, সর্বনিম্নে উড়াল-আলটাইক। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দ্বারা দ্যুরকহাইম দেখিয়েছেন, আত্মহত্যার বিবেচনায় গোত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর সাথে বংশগত-সঞ্চারণের বিষয়টিও জড়িত। আত্মহত্যাকারীর সন্তানও কি আত্মহত্যাকারী হয়? অনেক সময় দেখা যায়, একটি পরিবারে আত্মহত্যা ভয়ংকরভাবেই পুনরাবির্ভূত হয়। গলের উদাহরণ দিয়ে দ্যুরকহাইম দেখান, এক জমিদার তার সাত সন্তান ও দুই মিলিয়ন অর্জিত অর্থ উত্তরাধিকার রেখে মারা যান; ছয় সন্তানই প্যারিস বা তার উপকণ্ঠে বাস করত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পিতার সম্পত্তি ভোগ করত, কেউ কেউ প্রাপ্ত সম্পত্তির পসারও ঘটায়। সবাই ছিল সৌভাগ্যবান ও স্বাস্থ্যবান, কিন্তু দেখা গেল চল্লিশ বছরের মধ্যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাত জনই আত্মহত্যা করল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতামহ, পিতা, সন্তান—সবাই আত্মহত্যা করে বসে আছে। তবে শারীরতত্ত্ববিশারদগণ এর থেকে বংশগত পরম্পরার ধ্রুব সত্যে উপনীত হওয়ায় বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। অনেক সময় দেখা যায়, প্রজন্মের অনেকেই যক্ষ্মারোগ আক্রান্ত হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে যক্ষ্মা বংশানুক্রমিক।

কিছু মহাবৈশ্বিক কারণ বা উপাদানকে আত্মহত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেখিয়েছেন দ্যুরকহাইম। তিনি তাঁর *সুইসাইড* গ্রন্থে ইউরোপীয় মানচিত্রে অক্ষাংশের ডিগ্রি বা কোণগত পার্থক্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন এক চমৎকার চিত্র:[২০]

৩৬ – ৪৩ ডিগ্রি অক্ষাংশে	প্রতি ১০ লক্ষ অধিবাসীতে ২১.১ আত্মহত্যা
৪৩ – ৫০ ডিগ্রি অক্ষাংশে	প্রতি ১০ লক্ষ অধিবাসীতে ৯৩.৩ আত্মহত্যা
৫০ – ৫৫ ডিগ্রি অক্ষাংশে	প্রতি ১০ লক্ষ অধিবাসীতে ১৭২.৫ আত্মহত্যা
৫৫ ডিগ্রির বেশি অক্ষাংশে	প্রতি ১০ লক্ষ অধিবাসীতে ৪৪.১ আত্মহত্যা

এর থেকে পরিলক্ষিত হয়, দক্ষিণ ও উত্তর ইউরোপে আত্মহত্যা কম, আর মধ্য ইউরোপে বেশি। ঋতুভিত্তিক অবস্থানের কারণেও আত্মহত্যার হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়। দেখা যায়, যখন আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, তাপমাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে,—সে সময়েই মানুষ বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে পড়ে। এজন্য অনেকে মনে করেন, অধিক শীতপ্রধান দেশগুলোতে আত্মহত্যা বেশি। আবার কেউ কেউ মনে করেন, শরৎকালেই আত্মহত্যা বেশি সংঘটিত হয়। তবে এ ব্যাপারে দ্বিমত আছে। অনেকে আবার মনে করেন শীত বা শরৎকালে নয় বরং যখন প্রকৃতি সুন্দর ঝলমলে হয়ে ওঠে এবং তাপমাত্রা থাকে কাম্য পর্যায়ে, তখনই বরং আত্মজীবননাশের ঘটনা বেশি ঘটতে দেখা যায়। বছরকে যদি দু-ভাগে ভাগ করা হয়, যার মার্চ থেকে আগস্ট ছয় মাস উষ্ণকাল, আর অপর ছয় মাস শীতকাল—তাহলে উষ্ণকালেই আত্মহত্যা বেশি সংঘটিত হয়। দেখা গেছে, বার্ষিক ১০০০ আত্মহত্যার মধ্যে ৫৯০ থেকে ৬০০টিই ঘটে উষ্ণকালে আর ৪০০টি অবশিষ্ট শীতকালে। যদি এভাবে ভাগ করা হয়: ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি শীতকাল, মার্চ থেকে মে বসন্তকাল, জুন থেকে আগস্ট গ্রীষ্মকাল আর অবশিষ্ট তিন মাস শরৎকাল, তাহলে গ্রীষ্মকালেই সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা সংঘটিত হতে দেখা যায়।

আত্মহত্যার সামজিক কারণগুলোকে বিবেচনা করতে গিয়ে দ্যুরকহাইম বিভিন্ন ধরনের উপাদানের উল্লেখ করছেন। "ইগোইস্টিক সুইসাইড" সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, ধর্মীয় বিশ্বাসের অবস্থানগত দিক থেকে আত্মহত্যার উপাত্তকে। দেখা গেছে, ইউরোপের ক্যাথোলিক দেশগুলোতে (স্পেন, পর্তুগাল ইত্যাদি) আত্মহত্যার প্রবণতা কম, বরং প্রোটেস্ট্যান্ট দেশগুলোতে এই হার তুলনামূলক বেশি। আবার ইহুদিদের মধ্যে প্রোটেস্ট্যান্টদের অপেক্ষা আত্মহত্যার হার কম। অবিবাহিত অপেক্ষা বিবাহিত পুরুষদের মধ্যে অধিক আত্মহত্যা দেখা গেছে। ফ্রান্সে, ১৮৭৩-৭৮ সময়ে, বিবাহিতদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ১৬,২৬৪টি আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবিবাহিতদের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ১১,৭০৯।[২১] আবার দেখা যায় বিবাহিত-সন্তানহীনদের মধ্যেও আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। বিবিধ শক্তি নিয়ন্ত্রণকারী সমাজে আত্মহত্যা কম পরিদৃষ্ট হয়। ব্যক্তির একাকিত্ব ও উন্মুল অবস্থার সাথে আত্মহত্যার রয়েছে ধনাত্মক সম্পর্ক। দ্যুরকহাইম আর এক ধরনের আত্মহত্যার কথা বলেছেন তাঁর গ্রন্থে (*সুইসাইড*), তা হলো পরার্থবাদী আত্মহত্যা।[২২] এই ধরনের আত্মহত্যা দেখা যায় সমাজের বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে, যারা অধীনতা বা পরাজয়কে সহ্য করতে না পেরে প্রকারান্তরে আত্মহত্যা করে। দ্যুরকহাইম বার্থোলিন[২৩]-এর বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ডেনিশ যোদ্ধারা বৃদ্ধ বয়সে বা অসুস্থতায় বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করাকে গ্লানিকর মনে করতেন এবং এই কলঙ্ক থেকে রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করে থাকতেন। গোথেরা বিশ্বাস করত যে, যারা প্রাকৃতিকভাবে মৃত্যুবরণ করে তারা চিরকাল বিষাদময় এক অবস্থায় বিষাক্ত প্রাণীদের সাথে এক গুহায় অবস্থান করে। অন্য একটি গোত্রের মধ্যে দেখা গেছে, উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে বৃদ্ধ লোকেরা পড়ে আত্মাহুতি দেয়। রাজস্থানে দেখা গেছে, পরাজিত হয়ে শত্রুর হাতে ধরা পড়ার ভয়ে রাজমহিষীরা আগুনে আত্মাহুতি দিত। কখনও কখনও গোত্র বা সম্প্রদায়-প্রধানের মৃত্যুতে তার অনুসারী ও চাকর-বাকরেরা তারই সাথে সহগমনের উদ্দেশ্যে একসাথে আত্মহত্যা করত। স্বামীর মৃত্যুতে চিতায় স্ত্রীর আত্মাহুতির ঘটনা প্রচলিত ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে। ১৮১৭ সালে বাংলা প্রদেশেই ৭০৬ জন বিধবা স্বামীর চিতায় আরোহণ করে আত্মাহুতি দেয়। ১৮২১ সালে সমগ্র ভারতে ২.৩৬৬টি এরূপ ঘটনা ঘটে।[২৪] এ জাতীয় আত্মহত্যায় পরার্থপরতা নিহিত, অন্যের প্রয়োজনে বা ধর্মীয় ও সামাজিক প্রয়োজনে ব্যক্তি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে থাকে। সতীদাহের মতো ঘটনাকে বলা যেতে পারে বাধ্যতামূলক পরার্থবাদী আত্মহত্যা, কারণ এখানে ব্যক্তি সমাজের চাপে বাধ্য হয় আত্মহত্যায়। কখনও কখনও অনেক তুচ্ছ অভিযোগের কারণেও ব্যক্তি আত্মহত্যা করে থাকে। জাপানে সামান্য কারণে আত্মহত্যার এক বিভাবময় আঙ্গিক প্রকাশিত হয় যাকে বলা হয় হারা-কিরি। ইউরোপে সৈনিকদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেসামরিক লোকদের আত্মহত্যার হার অপেক্ষা বেশি। জাতি, সম্প্রদায় বা সামাজিক কারণে যে আত্মহত্যা, তাতে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেকাংশেই মূল্যহীন থাকে, ফলে সুনির্দিষ্টভাবেও এই আত্মহনন অমানবিক ও মৌলিক মর্যাদার পরিপন্থি। এখানে পরোক্ষভাবে কাজ করে প্রাণ নেওয়ার মতো একটি বিষয় যা অন্যায় ও মানবাধিকার-বিরোধী।

আত্মহত্যা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনোভাবটি কেমন? অনেক মানুষই এ বিষয়ে কথা বলতে বিব্রতবোধ করেন, কারণ এতৎসংক্রান্ত সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি ঋণাত্মক। অনেকে মনে করেন, আত্মহত্যাবোধে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা না করাই উচিত, কারণ এতে এই চেতনা সক্রিয়ভাবে অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। অবশ্য চিকিৎসা-বিশারদেরা বলে থাকেন, আত্মহত্যা-চিন্তায় আক্রান্ত ব্যক্তি অন্যের সাথে ভাববিনিময় করে এ জাতীয় চিন্তা থেকে নিজেকে বিমুক্ত রাখতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসে এমনটাও পরিলক্ষিত হয়, প্রাচীনকালে আত্মহত্যাকে গৌরবজনক হিসেবে দেখা হতো অনেক দেশে। প্রাচীন মিশরে মনে করা হতো, আত্মহত্যার মাধ্যমে একজন মানুষ নিদারুণ অসহ্য অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। জাপানে ব্যর্থতা বা কর্তব্যচ্যুতাবস্থায় লজ্জা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সংঘটিত আত্মহত্যা হারা-কিরিকে[২৫] মর্যাদাকর হিসেবে বিবেচনা করা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি কামিকাজে পাইলটরা[২৬] শত্রুর লক্ষ্যস্থলে যে আত্মঘাতী আঘাত হানত, তাকে তারা সম্মানজনক হিসেবে বিবেচনা করত। ভারতে প্রচলিত সতীদাহে যাওয়াকে অনেকে গৌরবজনক ও ধর্মীয় সার্থকতার উপায় হিসেবে দেখত। রোমানরা মনে করত, আত্মহত্যা এক নির্গমনের উপায়। আত্মহত্যা-বিষয়ে গ্রিক মনোভাবও ছিল ভালোমন্দে মেশানো।

ইহুদিদের মধ্যে আত্মহত্যাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে; শুধু শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় তার অনুমতি রয়েছে মাত্র। *যাত্রাপুস্তক*-এর দশ আজ্ঞায় নিষেধ করা হয়েছে নরহত্যা।[২৭] খ্রিস্টানদের নিকট আত্মহত্যা পাপ ও নিন্দনীয়। চতুর্থ শতাব্দীতে সন্ত অগাস্তিন আত্মহত্যাকে পাপ বলে ঘোষণা করেন। মধ্যযুগে রোমান ক্যাথোলিক চার্চ আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহ গির্জা-সংলগ্ন পবিত্র ভূমিতে কবর-দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইংল্যান্ডের আইনেও আত্মহত্যা দণ্ডনীয়, যদি না তা হয় উন্মত্ততা বা অসুস্থতার কারণে সংঘটিত। এই আইনেরই প্রতিফলন দেখা যায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোতে।

খ্রিস্টানেরা আত্মহত্যাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের কৃত পাপ হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ মানুষের জীবন ও মৃত্যু সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন; সুতরাং এর অন্যথা ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘনের নামান্তর। মানুষ তার নিজ মৃত্যুর পরোয়ানা নিজে জারি করতে পারে না। গ্রিক ও রোমানদের নিকট মর্যাদা-রক্ষার পরিস্থিতি বিবেচনায় আত্মহত্যা সম্মানজনক। জাপানের সামুরাই যোদ্ধাদের মধ্যে আত্মহত্যা ছিল উন্নত নৈতিকতার দৃষ্টান্ত। গ্রিক দার্শনিক দেমোক্রেতুস তাঁর সৃষ্টিশীলতা নিঃশেষিত হওয়ার কারণে উপবাসের মাধ্যমে আত্মহত্যা করেন। জুলিয়াস সিজারের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কাতো সিজারের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আত্মহত্যা করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন গ্রিক বা রোমান সাম্রাজ্যে আত্মহত্যার এক ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুমোদন ছিল। জাপান এবং চিনেও প্রাচীনকালে তথাকথিত আত্মহত্যাসংক্রান্ত ধারণার বিপরীতে অন্য চিন্তার একটি ভিন্ন মাত্রা ছিল।

হিন্দু ধর্মে মনে করা হয়, এ জীবন পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল, অতএব জন্মের যাবতীয় প্রাপ্যতাই নিয়তি-নির্দিষ্ট। সুতরাং জীবনে আত্মহত্যার সুযোগ নেই, কারণ তা নিয়তিবিরুদ্ধ কাজ। তবে হিন্দু ধর্ম অতি বিধান-নির্ভর ধর্ম নয়, সুনির্দিষ্টভাবে বলা নেই ব্যক্তির এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে; কিন্তু হিন্দু পুরাণে বিশেষত *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এ ইচ্ছামৃত্যু চোখে পড়ে; তাতে মনে হয় প্রাচীন ভারতে এর অনুমোদন ছিল। মৃত্যু প্রচ্ছন্নভাবে কারও জন্য অপেক্ষায় রয়েছে, তাকে দেখা হতো অসম্মানজনক হিসেবে। এমিল দ্যুরখাইম তাঁর বিখ্যাত *সুইসাইড* গ্রন্থে এ বিষয়ে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলোকপাত করেছেন এবং ব্রাহ্মণ কালানুজ-এর আত্মহত্যার বিষয়টির অবতারণা করেছেন।[২৮]

সন্ত অগাস্তিনের ঘোষণার পর মধ্যযুগ পর্যন্ত খ্রিস্টানেরা আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় কবরস্থ করত না। এর প্রমাণ মেলে শেক্সপিয়রের *হ্যামলেট* নাটকে। সেখানে নায়িকা ওফেলিয়া হ্যামলেটের প্রত্যাখ্যানে উন্মাদিনী হয়ে যায় এবং এক-পর্যায়ে জলে ডুবে মারা যায়। তার মৃত্যু স্বাভাবিক নাকি আত্মহত্যা এ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে পুরোহিতরা খণ্ডিত ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে ওফেলিয়াকে সমাধিস্থ করে। মৃতের আত্মার শান্তির জন্য রেকুইয়াম ম্যাস বা প্রার্থনা-সংগীত ওফেলিয়ার জন্য করা হয়নি, কেননা তার মৃত্যু ছিল সন্দেহজনক। নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে দেখা যায় প্রথম ভাঁড় বলছে: "শোনো! মেয়েটি নিজেই নিজের মৃত্যুকে স্বাগত করেছে, তার কি খ্রিস্টান ধর্মমতে কবর হবে?" যাজকদের মধ্যেও দেখা যায় এই নিয়ে সন্দেহ।

ইসলামে আত্মহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও পাপের কাজ। বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর বেঁচে গেলে সে এবং উক্ত কর্মে তাকে সহায়তাকারী উভয়ে তাযীবের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে।[২৯] ইসলামি আইনে আত্মহত্যা "হারাম" কাজ। পবিত্র *আল কোরান*-এ বলা হয়েছে: "আল্লাহ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাহাকে হত্যা করিও না।"[৩০] "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"[৩১] এ ছাড়াও পবিত্র *হাদিস*-এ বলা আছে, যে ব্যক্তি যে উপায় অবলম্বন করে আত্মহত্যা করে, নরকে ঠিক সে-উপায়ে পুনঃপুন সে শাস্তি পেতে থাকবে; অর্থাৎ কেউ বিষপানে আত্মহত্যা করলে নরকে সে অনবরত বিষ খেয়ে কষ্ট পেতে থাকবে; যে ধারালো অস্ত্র শরীরে বিদ্ধ করে আত্মহত্যা করে সে অনবরত তা করতে থাকবে; যে পাহাড়ের ওপর থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে সে চিরকাল নরকে তা-ই করতে থাকবে।[৩২] ইসলামে নিজেকে কষ্ট দেওয়া বা আহত করাও শাস্তিযোগ্য: "কোনো ব্যক্তি নিজ সত্তাকে কোনো প্রকারে শাস্তি দিলে, আহত করিলে অথবা দেহের কোনো অঙ্গ কর্তন বা বিনষ্ট করিলে সে তাযীবের আওতায় শাস্তিযোগ্য হইবে।"[৩৩] এই প্রসঙ্গে বলা আছে একটি ঘটনা: একদিন মহানবি এক ব্যক্তিকে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন; সে-ব্যক্তি উত্তর দিল যে সে প্রতিজ্ঞা করেছে রোদে দাঁড়াবার এবং কারও সাথে কথা না বলার। মহানবি তখন বলেন: "আল্লাহ তাহার কষ্টের মুখাপেক্ষী নহেন। তোমরা তাহাকে ছায়া গ্রহণ করিতে ও কথা বলিতে নির্দেশ দাও।"[৩৪] বলা বাহুল্য, যাকে বলা যায় সহায়ক আত্মহত্যা অর্থাৎ আত্মহত্যার জন্য অন্যের সহায়তা চাওয়া বা অন্যকে নির্দেশ প্রদান করা, তা-ও ইসলামে নিষেধ। বলা হয়েছে যে, "কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে নিজের জীবন সংহারের সম্মতি বা নির্দেশ প্রদান করিলে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি তদনুযায়ী প্রথমোক্ত ব্যক্তির জীবন সংহার করিলে হত্যাকারীর উপর দিয়াত্ প্রদানে বাধ্য করা হইবে।"[৩৫] এক্ষেত্রে আঘাতে যদি নির্দেশপ্রদানকারীর মৃত্যু না হয় তাহলে আদালত ইচ্ছা করলে নির্দেশদানকারী ও কার্যসম্পাদনকারী, উভয়ের বিচার করতে পারে।

যদিও *মনুসংহিতা* হিন্দুদের অন্যতম বিধানগ্রন্থ বা কোড তবু *মহাভারত*-এ পাওয়া

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

যায় কাহিনিসূত্রে বর্ণিত অনেক নীতিকথা। *মহাভারত*-এ মানুষ দুঃখ-দুর্দশার ফলে আত্মহত্যা করে বলে উল্লেখ আছে "দেহধারী জীব বিপরীত বুদ্ধির বশে অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়; সে অতিভোজন করে বা অনাহারে থাকে, পরস্পরবিরোধী বস্তু ভোজন ও পান করে, ভুক্ত খাদ্য জীর্ণ না হতেই আবার খায়, দিবসে নিদ্রা যায়, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা স্ত্রী সংসর্গের ফলে দুর্বল হয়। এই রূপে সে বায়ুপিত্তাদির প্রকোপিত করে এবং পরিশেষে প্রাণান্তকর রোগের কবলে পড়ে। কেউ কেউ উদ্‌বন্ধনাদির দ্বারা আত্মহত্যা করে।"[৩৬] সাধারণভাবে হিন্দুরা মনে করে থাকে—আত্মহত্যা মহাপাপ, নরকে গমন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে আত্মহত্যা বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই তবে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি আত্মহত্যার পক্ষে মতামত দেয় না। বৌদ্ধরা মনে করে, মৃত্যুর দ্বারা জীবন-যন্ত্রণার উপশম হয় না, বরং কর্মের দ্বারা তা বহমান থাকে। তারা আরও মনে করে, সাধনার জন্য প্রয়োজন শরীর, শরীর হলো মাধ্যম। বুদ্ধও তাঁর সাধনা শুরুর এক পর্যায়ে কঠোর শরীরপাতন থেকে সরে আসেন। এতে তাঁর পাঁচ শিষ্য তাঁকে সন্দেহ করলে তিনি তাঁদের বলেন, শরীর ভিন্ন সাধনা সম্ভব নয় বিধায় শরীরকে রক্ষা করতে হবে। তবে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় অনেক বৌদ্ধ (হীনযানী) আগুনে পুড়ে আত্মাহুতি দেয় প্রতিবাদস্বরূপ। হীনযানী বৌদ্ধরা মানবদেহকে অশুদ্ধ ভাবে, হয়তো এই বোধ থেকেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। অন্যদিকে মহাযানীরা মনে করে, জীবন হলো বুদ্ধপ্রকৃতি আর বুদ্ধজগৎ—এই দুইয়ের আধার। যেহেতু বৌদ্ধরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী, তাই আত্মহত্যার দ্বারা জীবনের অবসানে কোনো ফল আসে না বলেই তারা মনে করে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের প্রচলিত দণ্ডবিধিতে আত্মহত্যার উদ্‌যোগ গ্রহণকে দণ্ডার্হ হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে, তবে অধুনা এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে ইউরোপ ও আমেরিকায়। আমেরিকার অনেক অঙ্গরাজ্যে আত্মহত্যা অনুমোদিত হয়ে আইনি মর্যাদা পেয়েছে। আত্মহত্যা-সংক্রান্ত দণ্ডবিধির ধারাটি একটি সুন্দর ধাঁধা: এমন কার্য যা করতে উদ্‌যোগী হওয়া অপরাধ কিন্তু সম্পাদন করলে আর অপরাধ নয়, তা হলো আত্মহত্যা: কারণ আত্মহত্যা করে ফেললে ব্যক্তি চলে যায়, মুক্ত হয়ে যায় জীবন হতে, তখন আর বিচার সম্ভব নয়, কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হলে উদ্‌যোগী ব্যক্তি আইনের আওতায় এসে যায়। বাংলাদেশে প্রচলিত *দণ্ডবিধির* আওতায় আত্মহত্যায় উদ্‌যোগী হওয়া বা আত্মহত্যার সহযোগিতা করা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। এ বিষয়ে *দণ্ডবিধির* ৩০৯, ৩০৬, ৩০৫ ধারা প্রণিধানযোগ্য। ৩০৯ ধারায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করার উদ্‌যোগ গ্রহণ করে ও অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, সেই ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে৷ ৩০৬ ধারায় বলা আছে, কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে যদি তাকে কেউ এই কাজে সহায়তা করে থাকে, তা হলে সহায়তাকারী ব্যক্তি সর্বোচ্চ দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। ৩০৫ ধারায় বলা আছে, আঠারো বছরের কম বয়স্ক কোনো

~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তি, কোনো উন্মাদ ব্যক্তি, কোনো জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা কোনো প্রমত্ত ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে, অনুরূপ আত্মহত্যা সংঘটনে সহায়তাকারী ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে, কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ বছর মেয়াদি কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।[৩৭] এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, আত্মহত্যা-উদ্‌যোগী ব্যক্তি অপেক্ষা আত্মহত্যায় সহায়তাকারীর শাস্তির পরিমাণ বেশি।

আত্মহত্যার নৈতিক ও জৈবিক বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। কারও কারও মতে, অস্তিত্বের অনিঃশেষ প্রবাহকে জোর করে বাধাগ্রস্ত করা অনৈতিক, কারণ তা জীবগত প্রাকৃতিক পরিণতির পরিপন্থি। হুমায়ুন আজাদ মনে করেন, আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়, এর দ্বারা জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করা যায় না। তাঁর ভাষায়, "আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়, এটা একটি আস্তিত্বিক পাপ। মানুষ তার নিজের ইচ্ছায় মরবে না, বেছে নেবে না স্বেচ্ছামৃত্যু: মানুষকে মরতে হবে মিটমাট না ক'রে।"[৩৮] মিটমাট না করা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষ মৃত্যুবরণ করবে না। মৃত্যু হবে মৃত্যুর মতো উদ্ভটভাবে বা অনিশ্চিতভাবে। কিন্তু আর্নল্ড টয়েনবি মনে করেন যে, অন্য লোকের প্রাণ নেওয়াটা বড়ো অন্যায়, আত্মহত্যার বিষয়টি ব্যক্তির সুবিবেচনাপ্রসূত বিচারের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।[৩৯] তাঁর মতে ব্যক্তির বেঁচে থাকার আশা আর নেই, কিন্তু প্রাণ আছে, এক্ষেত্রে ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য থাকলে তার মৃত্যুর সুচিন্তিত ইচ্ছাকে বাধা দেওয়া ঠিক নয়: "এই পরিস্থিতিতে কোনো লোক যদি ইচ্ছামৃত্যু বা যন্ত্রণাবিহীন মৃত্যু চায়, আমি মনে করি, তার সেই অনুরোধ মেনে নেওয়া উচিত। সে যদি আত্মহত্যা করতে চায়, আমি নিশ্চিতভাবেই মনে করি, তাতে বাধা দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করা উচিত নয়।"[৪০]

ব্যক্তির যদি সমাজে নিজেকে যুক্ত করার অধিকার সহজাত হয় তাহলে নিজ জীবন থেকে প্রত্যাহারের অধিকারও সহজাত হওয়া উচিত। আত্মহত্যাকে বিবেচনা করা যেতে পারে একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে, যার দ্বারা ব্যক্তি তার আত্মবিলোপের অধিকারকে প্রতিপাদন করে, ব্যক্তি অতিক্রম করে যেতে চায় সামাজিক অনুশাসন। মানুষকে আস্তিত্বিক চক্র পূর্ণ করতে হবে—এ জাতীয় ধারণা নিশ্চিত এক বিশ্বাসগত ধারণা, এটা মানুষের বিবেচনা-প্রসূত সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। আস্তিত্বিক চক্র পূর্ণ করার বিষয়টি একটি ভ্রান্তিজনক ও ধর্মীয় ধারণা। যে যতদিন বাঁচে ততদিনই তার জীবন, তার আস্তিত্বিক চক্র। এর কোনো পুনর্নির্ধারিত পরিধি থাকার বিবেচনা সঠিক নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস ও পটভূমি

সর্বত্রই এমন মানুষজন আছে যারা তাদেরই
বিরুদ্ধে আত্মহত্যার দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার
করে বেঁচে থাকে। ...আত্মহত্যা, সংক্ষেপে, বেঁচে থাকার
এক ধারাবাহিক, প্রাত্যহিক, চির-বর্তমান সমস্যা।
এটা একটি মাত্রার প্রশ্ন। আমি
তাদের দেখেছি সকল উন্নয়ন ও হতাশার ভিন্ন
ভিন্ন পর্যায়ে। ব্যর্থ আইনজীবী, উন্নাসিক ডাক্তার,
বিষাদগ্রস্ত এয়োস্ত্রী, রাগি, অল্প-বয়েসি...
সব ধরনের মানুষই তাদের নিজ জীবনের বিরুদ্ধে
এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত যা তাদের প্রতিদিনকার
কার্যকলাপ। আত্মহত্যার অর্থ, সত্যিকার
সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করতে হবে,
উপযুক্ত ব্যাপক মাত্রায় তার অর্থময়তাকে সৃজন করতে হবে
যা সে দাবি করে।

ড্যানিয়েল স্টার্ন

আত্মহত্যা নয় অপরিহার্যভাবে পাপ।

জন ডান

মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি এঁকেছিলেন ছবিটি, সম্ভবত এটিই ছিল তাঁর শেষ ছবি: *গমখেতের ওপর উড়ন্ত কাক*। মাথার ওপর ইতস্তত উড়ে যাওয়া কাক আর মধ্যভূমিতে গমখেত। তার কয়েকদিন পর তিনি গুলি করে বসেন নিজেকে, নিজের অন্তরকে। গুলিটি সরাসরি গিয়ে ঢুকেছে হৃৎপিণ্ডে, অথবা বসে আছে তাঁর ঠিক হৃদয়ের কাছে। চিলেকোঠায়, তাঁর নিজ ঘরে, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন তিনি গুলিকে আত্মার ভেতর নিয়ে। শেষবারের মতো ধূমপান করলেন। ঘটনার দুই দিন পর, ১৮৯০ সালের ২৯ জুলাই ভোরে তিনি চলে গেলেন। তিনি কে? তিনি ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ: ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনশিল্পী ও মৃত্যুশিল্পী, যিনি বলেছিলেন, "অনেক সময় ভাবি দিনের তুলনায় রাত্রি অনেক বেশি প্রাণবন্ত আর অনেক বেশি বর্ণময়,"[১] যিনি বলেছিলেন, "কোনো একটা অনন্ত গভীর সত্য ছাড়া জীবন আমার কাছে অর্থহীন।"[২] ভ্যান গঘের মৃত্যু আত্মহত্যার রংকে উজ্জ্বল করেছিল, আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল শিল্পীজীবনের মুহুর্মুহু ভঙ্গুরতাকে। আত্মহত্যার রং কী? আত্মহত্যার রং কালো নয়, লাল নয়, তার রং অর্থই

~ www.amarboi.com ~

নীল, তা নিঃসীম নীলিমাক্রান্ত ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে,—জগৎ পেরোনো উল্লম্বরেখায়। মৃত্যুর রং কালো, জীবনের রং লাল, আত্মহত্যর রং নীল—প্রগাঢ় নীল; আর তাই মৃত্যুর স্থান মাটি হলে আত্মহত্যার স্থান নীলিমায়। আত্মহত্যা দূর নীলিমাকেই স্বাগত জানায় এবং আত্মহতরা অবশেষে নীলিমাতেই লীন হয়। তাদের প্রকৃত সমাধি রচিত হয় দূর দিগন্তেই।

ভ্যান গঘের আত্মহত্যা যেভাবে উদ্বেলিত করেছিল বিংশ শতাব্দীকে তার কোনো তুলনা নেই, এমনকি এখনও এর অভিঘাত ব্যাপক। এর আগেও আত্মহত্যা সংঘটিত হয়েছে লেখক-শিল্পীদের মধ্যে কিন্তু তা ছিল অব্যাপ্ত ও অব্যবস্থিত। লেখক ছাড়া শিল্পীদের মধ্যেও প্রতিভাত হয়েছে আত্মহত্যা, যেমন—১৯০৬ সালে প্যারিসে এসে বেহিসাবি জীবন-যাপনে মত্ত হওয়া ইতালীয় চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর আমাদেয়ো মোদিল্লেয়ানি (১৮৮৪-১৯২০), আমেরিকান চিত্রশিল্পী আর্শাইল গোর্কি (১৯০৪-১৯৪৮), আমেরিকান বিমূর্ত-শিল্পী জ্যাকসন পোলোক (১৯১২-১৯৫৬), রুশ বংশোদ্ভূত আমেরিকান শিল্পী মার্ক রোথকো (১৯০৩-১৯৭০), আমেরিকান আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ আলফ্রেড হেনরি মওরার (১৮৬৮-১৯৩২), লুডভিগ কির্শনার,[৩] ফাঁসোয়া লা মোয়েঁ[৪], নিকোলাস দ্য স্তেইল, মধ্যযুগের ইতালীয় ভাস্কর ফ্রান্সেসকো বোরোমির্নি প্রমুখ আত্মহত্যা করেছিলেন। কিন্তু ভ্যান গঘের আত্মহত্যা যেন জীবন ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা রক্তস্তম্ভ, তা নিজেই যেন রচনা করেছে এক নিজস্ব শৈলীর। আত্মহত্যা প্রতিভাত হতো সাধারণের মধ্যে এবং লেখক, দার্শনিক ও চিত্রশিল্পীর মধ্যে, তবে এর পাশাপাশি প্রাচীনকালে ও আধুনিক সময়ে বীর ও রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যেও আত্মহত্যা সংঘটিত হতে দেখা যায়। এমনকি আধুনিক সময়ে ধার্মিকদের মধ্যেও আত্মহত্যার ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়: ১৯৬৩ সালের মে মাসে রাষ্ট্রপতি দায়েম[৫]-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ৭ জন বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

পৃথিবীর আদি রচনাগুলোতে কোনো না কোনোভাবে রয়েছে আত্মহত্যা বা তার আশ্রয়ী বিষয়ের দ্বিরালাপ। ধর্মগ্রন্থ, দর্শন, বিধি, আত্মজৈবনিক লেখা—সবকিছুতেই এর ছায়া খুঁজে পাওয়া যাবে। মিশরের প্যাপিরাস বা ভারতবর্ষের ভূজ্যপত্র বা চিনের কাগজ, সবকিছুতেই বিবরণ মিলবে আত্মহত্যার। খ্রিস্টপূর্ব ১৯৩৭-১৭৫৯-এ রচিত মিশরীয় উপদেশাত্মক গল্প *নিজ আত্মার সাথে মানুষটির সংলাপ*-সংক্রান্ত রচনায় দেখা যায় আত্মলোপের বিষয়। এই রচনাটি—*জীবনক্লান্ত একজন মানুষ ও তার আত্মার বিতর্ক* বা *আত্মহত্যা-বিষয়ক বিতর্ক* নামেও পরিচিত—মধ্য রাজত্বের সময়ের (খ্রিস্টপূর্ব ২০৪০-১৭৫৯) শেষদিকে রচিত বলে মনে করা হয়। প্যাপিরাসের যে একমাত্র অনুলিপিটি পাওয়া গেছে তা-ও অসম্পূর্ণ: রচনার শুরুটা পাওয়া যায়নি আর অনেক লাকুনা বা খামতি রচনাটিকে করে তুলেছে অনুবাদ-অসাধ্য, কৃত অনুবাদ হয়ে পড়েছে বহুঅর্থময়। পণ্ডিতেরাও তাই এর অর্থ বিষয়ে এক হতে পারেননি। যা-ই হোক, অধিকাংশই একমত হয়েছেন যে, রচনাটিতে এমন একজন মানুষের কথা বলা হয়েছে যে জীবনে ক্লান্ত হয়ে পশ্চিমে, অর্থাৎ পরলোকে চলে যেতে চাইছে কিন্তু তার ''বা'', যাকে অনুবাদ করা হয়েছে ''আত্মা'' হিসেবে, তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে চাইছে না। খুব দুর্বোধ্য ভাষায় রচিত

~ www.amarboi.com ~

এ সংলাপে দেখা যায় একজন মানুষ ও তার ''বা''-এর যুক্তিতর্ক। পাণ্ডুলিপির শুরুটার হদিশ মেলেনি, রক্ষা পাওয়া পাণ্ডুলিপিতে তাই দেখা যায় মানুষটি তার আত্মাকে জবাব দিচ্ছে। নিজ দুর্ভাগ্যের দুঃখ-দুর্দশায় তাড়িত হয়ে মানুষটি আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চিন্তা করছে। আগুনে পুড়ে মারা যাওয়ার অর্থ তার কোনো মমি হবে না, হবে না কোনো সমাধিসৌধ। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে একজনের যথাযথ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হলেই সে পরলোকে, মৃতদের ভূমিতে, বেঁচে থাকে এবং প্রত্যেক রাতে তার আত্মা সেই ঘরে ফিরে আসে। মানুষটির কাছ থেকে যথাযথ অন্ত্যেষ্টির প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মানুষটির আত্মা তাকে আত্মহত্যা না করে লাগামছাড়া আনন্দ করার জন্য বলে। লোকটি তখন তার আত্মাকে বলে—১. সে যদি তার কথামতো আনন্দে নিজেকে নিমজ্জিত করে তবে তার নাম নেকনজরে পড়বে, ২. তার সময়ের লোকজন খারাপ, কোথাও শুভত্ব বলতে কিছু নেই, আর তার কোনো সত্যিকারের বন্ধুও নেই, ৩. মৃত্যুই বরণীয় এবং ৪. মৃতরা দেবতাদের মধ্যে থাকে। মানুষটির যুক্তি শুনে তার আত্মা সন্তুষ্ট হয় এবং বলে যে বাঁচা বা আত্মহত্যা যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন এটা তার সাথেই থাকবে, আর তারা একসাথে একটি বাড়ি বানাবে। মানুষটি বলে: ''আমার আত্মা আমাকে বলেঃ ভ্রাতঃ, তুমি আমার সবচেয়ে আপন, শোক পাশে রাখো। (যদিও) জ্বলন্ত কাঠকয়লার ধাতুপাত্রে নিজেকে আত্মাহুতি দেবে, (এখনও) আটকে আছ তুমি জীবনে, যা তুমি বলেছ। আমার এখানে থাকা ঠিক কি না জানি না কারণ তুমি পরলোককে প্রত্যাখ্যান করেছ নাকি পরলোকে যাওয়া ঠিক তোমার, আর তোমার শরীর পৃথিবীতে থাকবে। তুমি মরে শান্তি পেলে আমি বিশ্রাম নেব। তখন আমরা একত্রে একটি ঘর বানাব।''

প্রাচীন রোমান সম্রাট, রাজনীতিবিদ ও সেনাপতিদের মধ্যে আত্মহত্যা সংঘটনের হার অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হতো। জার্মানিতে রোমান গভর্নর পাবলিয়ুস কুইনতিলিয়ুস ভারুস চেরুসি উপজাতিদের সাথে যুদ্ধে পরাজয়ের পর আত্মহত্যা করেছিলেন ৯ খ্রিস্টাব্দে। রোমের ৫ম এবং জুলিয়ো ক্লদিয়ান ধারার শেষতম সম্রাট নিরো (নিরো ক্লদিয়ুস সিজার দ্রেনসুস জার্মানিকুস: ৩৭–৬৮খ্রিস্টাব্দ) আত্মহত্যা করেছিলেন। ৬৪ সালের জুলাই মাসে রোমের দুই তৃতীয়াংশ যখন পুড়ে যায় তখন নিরো ছিলেন আন্তিয়ামে, ৬৮ সালে গল ও স্পেনীয় সেনাবাহিনী এবং প্রিতোরিয়ান গার্ড তার বিরুদ্ধে গেলে তিনি পালিয়ে যান। সিনেট কর্তৃক গনশত্রু ঘোষিত হওয়ার পর ৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন তিনি রোমের সন্নিকটে আত্মহত্যা করেন। কাতো দ্য ইয়ঙ্গার বা মার্কুস পোরেসিয়ুস কাতো ছিলেন রোমান রাজনীতির এক স্বনামধন্য ব্যক্তি, খ্রি.পূ. ৬৫-এ তিনি আর্থিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর সততা ও মিতব্যয়িতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু সিজারের রাজনীতির বিরুদ্ধাচারণ করার কারণে সিজারের সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের শর্ত না মেনে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর সততা ও সুনাম পরবর্তীকালে রোমান সাহিত্যের গর্ব হয়ে উঠেছিল। রোমান রাজনীতিবিদ, জুলিয়ুস সিজারের অন্যতম হত্যাকারী, পাবলিয়ুস সারভিলিয়ুস কাসকা খ্রি.পূ. ৪২-এ, সম্ভবত, ফিলিপ্পির যুদ্ধের সময় আত্মহত্যা করেছিলেন। মার্কুস জুনিয়ুস ব্রুতাসও আত্মহত্যা করেছিলেন। রোমান রাজনীতিবিদ কুইনতুস লুতালিয়ুস কাতুলুস (১৫০?-৮৭ খ্রি.পূ.) সম্ভবত আত্মহত্যা করেন। লুসিয়ুস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেপতিমিয়ুস সেভারাজ-এর স্ত্রী জুলিয়া দুমনা ২১৭ সালে আত্মহত্যা করেন; ক্ষমতাহীন হওয়ার কারণেই তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। তিনি ছিলেন মার্কুস অরেলিয়ুস আন্তোনিয়ুসের মাতা। রোমান ছাড়াও পারস্যের রাজা ২য় কামবাইসেস (রাজত্ব ৫৩০-৫২২ খ্রি.পূ.) যিনি ছিলেন মহান সাইরাসের পুত্র, সম্ভবত আত্মহত্যা করেছিলেন। এছাড়া প্রাচীন ভারতের মগধ রাজ্যের মৌর্য্য শাসনের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য (শাসনকাল খ্রি.পূ. ৩২১?-খ্রি.পূ.২৯৮?) শেষ জীবনে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে উপবাসের মাধ্যমে জীবননাশের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

প্রাচীনকাল ছাড়াও, আধুনিক সময়ে, রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে আত্মহত্যা সংঘটিত হতে দেখা যায়। ব্রাজিলের একনায়ক রাষ্ট্রপতি, যার নেতৃত্বে ব্রাজিল লাতিন আমেরিকার অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দেশে পরিণত হয়, গেতুলিও ভরনেলেস ভার্গুস ১৯৫৪ সালের ২৪ জুন আত্মহত্যা করেন।

প্রাচীনকালের আত্মহত্যা আর বর্তমানকালের আত্মহত্যার সামাজিক দিক অনেকটাই পরিবর্তিত। প্রাচীনকালে আত্মহত্যাকে দেখা হতো না কোনো বিধিবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে। মূলত প্রাচীনকালে একে অনেক সময়ই বিবেচনা করা হতো মহার্ঘ আত্মাহুতি হিসেবে। চতুর্থ শতাব্দীর আগে এই দৃষ্টিভঙ্গির তেমন পরিবর্তনও হয়নি। প্রাচীন সমাজ ও আদিম পেগান ধর্মে আত্মহত্যার মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করাকে মহৎ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তবে এটাও বলা উচিত, সমাজে কিছুমাত্রায় অন্ধ ধারণাও ছিল আত্মহত্যা সম্বন্ধে। অনেক সমাজে মনে করা হতো আত্মহতের ভূত এসে পার্থিব জীবনের তার অত্যাচারীকে ধ্বংস করবে। অনেকে আবার মনে করত আত্মহত্যার মাধ্যমে ব্যক্তি আসলে মরে না বরং এক জাদুকার্য সম্পাদন করে যা এক জটিল জাদুআচারের মাধ্যমে ব্যক্তির শত্রুদের মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু যোদ্ধা সমাজে, দেবতারা যেখানে ছিল আক্রমণাত্মক ও সাহসী, সেখানে আত্মহত্যাকে বিবেচনা করা হতো ভালো কাজ হিসেবে। যেমন ভাইকিংদের স্বর্গ হলো ভালহাল্লা, যা এমন এক স্থান যেখানে হিংস্রতার মাধ্যমে যারা মারা যেত তারা অবস্থান করত বলে মনে করা হতো, এবং সেখানে বীরদের সম্মানে প্রদত্ত ভোজসভায় দেবতা ওডিন প্রধান হিসেবে উপস্থিত থাকত। যারা হিংস্রতা বা অন্যের আঘাতে মারা যেত শুধু তারাই ওই ভোজসভায় অংশ নিতে পারত। সবচেয়ে বেশি সম্মাননীয় ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল যুদ্ধে মারা যাওয়া ব্যক্তিরা; তারপরই ছিল আত্মহত্যাকারীদের স্থান। যাদের বৃদ্ধ-বয়সে, রোগে ভোগে শান্তিময় ও স্বাভাবিক মৃত্যু হতো, তাদের ভালহাল্লায় স্থান হতো না। ওডিন নিজেই যুদ্ধের সর্বোচ্চ দেবতা, কিন্তু ফ্রেজারের মতে, তাকে ফাঁসির দেবতাও বলা হতো।[৭] মানুষ ও প্রাণীরা উপশালার কুঞ্জবনের পবিত্র গাছে ফাঁসি দিত তার সম্মানে। এটাও দেখা যায়, দেবতা নিজেও নিজের উদ্দেশে আত্মাহুতি দিত। অন্য এক উৎস থেকে জানা যায়, দেবতা ওডিন নিজের তরবারিতে নিজেকেই আহত করেছিল আনুষ্ঠানিক দাহের আগে।[৮] সে নিজেই আত্মহত্যা করেছিল এবং তার অনুসারী ও পূজারীরা তার মহান পথ অনুসরণ করে আত্মাহুতি দিত। ড্রুইড পুরোহিতদের মধ্যে এমন এক ধর্মীয় নীতি ছিল যা অন্যদেরকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করত। এর উদ্দেশ্য ছিল এমন এক অন্য জগতের আহ্বান সৃষ্টি করা যাতে মৃত বন্ধুদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য ব্যক্তি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজেদের হত্যা করে, কারণ তা হলেই তারা তাদের সাথে সুখে সেখানে বসবাস করতে পারবে। এর সাথে মিল আছে আফ্রিকান উপজাতিদের সাধারণ এবং হিন্দুদের প্রাচীন সতিদাহ প্রথার। আফ্রিকান প্রথা অনুযায়ী রাজা মারা গেলে তার যোদ্ধা ও দাস সবাই একযোগে আত্মহত্যা করত যাতে রাজার সাথে তারা স্বর্গে বাস করতে পারে। সতীদাহের অন্তর্গত উদ্দেশ্যও ছিল এরকম। ইগলুলিক এস্কিমো এবং মারকুইসাস দীপপুঞ্জের অধিবাসীরা বিশ্বাস করত যে হিংস্র মৃত্যু হলো স্বর্গে যাওয়ার পাসপোর্ট। এর বিপরীতে যাদের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ মৃত্যু হতো তারা অতঃপর আতঙ্কজনক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সংকীর্ণ ভূমিতে স্থান পেত। মারকুইসাস-এর ক্ষেত্রে তারা যেত হাওয়াইকির নিম্নস্তরে। প্রাচীন সিথিয়ার লোকেরা তাদের স্বাভাবিক যাযাবর জীবনের পরিক্রমায় অতি বৃদ্ধ হয়ে গেলে নিজেদের জীবন শেষ করাকে সম্মানজনক হিসেবে বিবেচনা করত; এই ধারায় তারা তাদের যুবকদেরকে বৃদ্ধদের বহন করার দায় থেকে এবং তাদের হত্যা করার মতো অপরাধ করা থেকে রক্ষা করত। এই আত্মহত্যার উদ্দেশ্যটি মোটেই ধর্মীয় ছিল না বরং তা ছিল সামাজিক ভাবনায় তাড়িত, আত্মহতরা আসলে পরবর্তী প্রজন্মকে দায় থেকে মুক্ত করতে চাইত। এই সমস্ত আত্মহত্যাকে দ্যুরকহাইম বলেছেন "পরার্থবাদী" আত্মহত্যা; এ ধরনের আরেক উদাহরণ হলো ক্যানটেন ওয়াটস-এর মৃত্যু, যিনি আন্টার্টিকার বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে স্কট ও তার সঙ্গীদের সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন কোনো সম্প্রদায়ের সমগ্র নৈতিকতা ও পুরাণচেতনা আত্মহত্যাকে উৎকৃষ্ট জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করে তখন তার উদ্দেশ্য থাকে না বিশুদ্ধ আত্মসমর্পণ; বরং তা হয় অনেকটা আত্মরতিমূলক: "ওডিনের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। আমার প্রতি আমার উপসর্গ।" মাইয়া (মায়া) সভ্যতায়ও দেখা যায়, সেখানে রয়েছে আত্মহত্যার দেবী ইক্সটাব এবং লোকেরা বিশ্বাস করত যে আত্মহত্যাকারী এক বিশেষ স্বর্গে অবস্থান করবে। সুতরাং মনে করা যথার্থ যে আদিম সমাজে এক কাল্পনিক অমরত্ব দ্বারা মানুষ তাড়িত হতো। যেহেতু মৃত্যু ছিল অপরিহার্য ও অনেকাংশেই নিয়তিনির্দিষ্ট আর এ কারণে তা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণও, অতএব আত্মহত্যা ছিল নীতি অপেক্ষা নিছক আনন্দের ও অভিযানের ব্যাপার। এটা অনেকটা এ রকম: একজন কিছুদিন পৃথিবীতে সময় ব্যয় করে আসলে পরকালে দেবতার সাথে ভোজে বসার সুযোগ পাওয়ার জন্য। এটি প্রকৃত অর্থেই এক অসার কাজ। তবে আদিম গোষ্ঠীরা একে উপভোগ করত।

কিন্তু "খ্রিস্টান ইউরোপে আত্মহত্যার ইতিহাস হলো সরকারি নীতিবিরুদ্ধ কাজের ইতিহাস, আর এর বাইরে এক হতাশার ইতিহাস", বলেছেন আল আলভারেজ।[৯] ১৬০১ সালে, এলিজাবেথীয় আইনজীবী ফুলবেকের লেখা থেকে জানা যায়, আত্মহত্যাকারীকে তার ঝুলে থাকা ফাঁসির অবস্থা থেকে ঘোড়ায় টেনে নামানো হতো এবং ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া কেউ তার দেহ স্থানান্তর করতে পারত না। অন্য কথায় আত্মহত্যাকে বিবেচনা করা হতো অতীব ঘৃণ্য কাজ হিসেবে, সর্বনিকৃষ্টতম অপরাধ হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হতো। পরবর্তীকালে ব্ল্যাকস্টোন লিখেছেন, আত্মহত্যাকারীকে কবর দেওয়া হতো মহাসড়কের ধারে শরীরের সাথে একটি খুঁটি গেঁথে, এটাই বোঝাতে যে আত্মহত্যাকারী আর ভ্যাম্পায়ারের মধ্যে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পার্থক্য নেই। কবরের জন্য নির্ধারিত জায়গাটি সাধারণত নির্বাচন করা হতো কোনো চৌরাস্তার মোড়ে যা সাধারণত হতো মানুষকে দণ্ড দেওয়ার জায়গা, আর আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহের মুখের ওপর একটি পাথর চাপা দিয়ে দেওয়া হতো যেন ভূত হয়ে সে উঠে এসে জীবিতদের তাড়া করতে না পারে। বাস্তবিক অর্থে ভ্যাম্পায়ার বা ডাইনির ভয় থেকেও আত্মহত্যার ভীতি দীর্ঘস্থায়ী হতো কারণ যে-কোনো আত্মহত্যা দীর্ঘসময় ধরে মানসিকভাবে বিবশ করে রাখত জনমানুষের মনকে। এ জাতীয় অসম্মানজনক ঘটনা সর্বশেষ ইংল্যান্ডে ঘটে ১৮২৩ সালে যখন গ্রিফিথ নামক একজনকে গ্রোসভেনর প্লেজ ও চেলসিয়ার কিংস রোডের চৌমাথায় কবর দেওয়া হয়। কিন্তু এতকিছুর পরও আত্মহত্যাকারীরা রেহাই পেত না: বছরের পর বছর যাবৎ এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত আত্মহত্যার দাবিহীন মৃতদেহ চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অঙ্গব্যবচ্ছেদ-বিদ্যার কাজে ব্যবহৃত হতো। সামান্য হেরফের সত্ত্বেও এই একই রকম হানিকর অবস্থা কম-বেশি বিরাজমান ছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশে। ফ্রান্সে, স্থানীয় নিয়মের এদিক-ওদিক সত্ত্বেও, আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহ পা থেকে ওপরে ঝুলিয়ে রাখা হতো; তারপর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে দাহ করে শরীরের অংশ বর্জ্য হিসেবে স্তূপে ফেলে রাখা হতো। কোথাও কোথাও মৃতদেহ দরজা দিয়ে না বের করে জানালা দিয়ে বের করা হতো এবং জানালার শিকগুলোও পরে পুড়িয়ে দেওয়া হতো। কোথাও মৃতদেহ কোনো পিপায় ভরে ভাসিয়ে দেওয়া হতো জলে। সুসভ্য অ্যাথেন্সেও মৃতদেহ শহরের বাইরে, নির্ধারিত কবরখানা থেকে দূরে, অখ্যাত স্থানে কবর দেওয়া হতো। তার আগে দুই হাত কেটে, কাটাহাত অন্যত্র মাটি চাপা দেওয়া হতো। এই নিয়ম কম-বেশি প্রচলিত ছিল থিবিস ও সাইপ্রাসে। স্পার্তাতে তা ছিল এমনই মারাত্মক যে প্লাতাইয়ের[১০] যুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যুকামনা করার অপরাধে আরিস্তোদেমুসকে মৃত্যুর পরও এর জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। দেখা যায়, গ্রেকোলাতিন নগরগুলোতে আইনপ্রণেতারা বা আইনপরিষদ উদ্বিগ্ন থাকত আত্মহত্যা-বিষয়ে, কোনো সুষম নৈতিক ভিত্তি এক্ষেত্রে বিরাজিত ছিল না। আত্মহত্যা করতে চাইলে আগাম অনুমতি নেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল, আত্মহত্যা একমাত্র তখনই অপরাধ হতো যখন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তা সংঘটিত হতো। অ্যাথেন্সে আত্মহত্যাকারীকে রাষ্ট্র বা নগরের বিরুদ্ধে অন্যায়সুলভ কাজ করার জন্য অতঃপর দায়ী করা হতো এবং আত্মহত্যাকারীকে এ কাজের জন্য অ্যাটিমিয়া (সম্মানচ্যুতি) সহযোগে শাস্তি দেওয়া হতো, অর্থাৎ মৃত্যুর পর নানাভাবে তাকে সম্মানচ্যুত করা হতো। স্বাভাবিক ও শোভন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করা হতো আত্মহত্যাকারীকে। এথেন্সে যখন কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করার সংকল্প বিষয়ে উপযুক্ত কারণ আর কেন জীবন অসহনীয়—এ বিষয়ে যুক্তিসহ সিনেটকে অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন করত এবং সিনেট অতঃপর তার আবেদন মঞ্জুর করত, কেবল তখনই আত্মহত্যাকে বৈধ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। লাইবেনিয়ুস[১১] এ জাতীয় এবং এ বিষয়ে কিছু নীতিবাক্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও তিনি তার সময় উল্লেখ করেননি, কিন্তু এগুলো অ্যাথেন্সে বলবৎ ছিল এবং তিনি নিজেও এর প্রশংসা করেছেন। এই নীতিকথা এরূপ:

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> যে-ই আর বাঁচতে চাইবে না, সে-ই তার কারণ বর্ণনা করে সিনেটকে জানাবে, আর সিনেটের অনুমোদন পাওয়ার পরই জীবনের অবসান ঘটাতে পারবে সে। যদি তোমার নিজ অস্তিত্ব ঘৃণার্হ হয়, তাহলে মরো; যদি তুমি নিয়তি দ্বারা হও আবিষ্ট ও আচ্ছন্ন, তবে পান করো হেমলক। যদি হও দুঃখ দ্বারা অবনত, তবে জীবনদীপ নির্বাপিত করো। অসুখী লোককে তার দুর্ভাগ্য পুনর্গণনার সুযোগ দাও, তাকে পরিত্রাণের উপায় বাতলানোর সুযোগ দাও ম্যাজিস্ট্রেটকে, আর তখনই শুধু তার চরম দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটবে।[১২]

একই নিয়ম পাওয়া গিয়েছিল কিয়োস-এ। মার্সেই-এও তা চালু হয় গ্রিক উপনিবেশবাদীদের দ্বারা। আত্মহত্যাকারীর অনুমোদন পাওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট তাদেরকে নির্ধারিত বিষ সরবরাহ করত, যা খেয়ে তারা আত্মহত্যা করত। আদি রোমান আইনে আত্মহত্যার বিষয়টি নেই, কিন্তু যেহেতু তা গ্রিক আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তাই পরবর্তীকালে একই পদ্ধতি অনুপ্রবেশ করেছিল তাতে। *ইনিদ*-এর ব্যাখ্যাকার সারভিয়ুস[১৩]-এর কথা থেকে অন্ততপক্ষে জানা যায় যে, রোমান পুরোহিতদের সৃষ্ট নিয়মানুযায়ী আত্মহত্যাকারীকে সমাধিস্থ করা হতো না। আরও উল্লেখ পাওয়া যায়, আত্মহত্যাকারীদের মৃতদেহ ক্রুশবিদ্ধ করে পাখি ও হিংস্র প্রাণী দিয়ে খাওয়ানো হতো। কিন্তু এই নিয়মের পরিবর্তন হয় এবং গ্রিসের মতো অনুমতি পাওয়া সাপেক্ষে আত্মহত্যা বৈধ করা হয়। সিনেট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই-বাচাই করে আত্মহত্যার অনুমতি প্রদান করত এবং এর পদ্ধতিও ঠিক করে দিত। তবে সৈনিকদের চাকরি বা যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং তার শাস্তি হতো মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু যদি কোনো সৈনিক আত্মহত্যার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যথার্থ কারণ দেখাতে পারত তবে তাকে শুধু চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতো। কিন্তু চূড়ান্তভাবে তার কাজ যদি মনে হতো কোনো সামরিক ক্রটিজনিত অনুশোচনা থেকে উদ্ভূত, তবে তার ইচ্ছাকে বাতিল করা হতো এবং তার সমুদয় সম্পত্তি সরকারি কোষাগারে জমা করা হতো। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আত্মহত্যা সংঘটনের ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্যেকে রোমে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা হতো, উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর না হলে প্রচলিত আইনে আত্মহত্যাকে শিথিল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হতো।

এইসব প্রাচীন নিয়মগুলোকে ইউরোপে যথাযথভাবে মর্যাদাপূর্ণ এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার অনুকূলে শক্তিশালী করা হয়। ১৬৭০ সালের শেষের দিকে ফ্রান্সে আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহকে মর্যাদাচ্যুত, কুলচ্যুত করে নীচুশ্রেণির কাতারে ঘোষণা প্রদানের আইন করা হয়। তাদের বাড়ির গাছপালা কেটে ফেলা হতো এবং প্রাসাদও ভেঙে দেওয়া হতো। ইংল্যান্ডে আত্মহত্যাকারী হত্যাপরাধী বলে গণ্য হতো। দুই দেশেই আত্মহতের সমুদয় সম্পত্তি রাজকোষাগারে জমা করা হতো। ভলত্যের এক প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, আত্মহতের সহায়সম্পত্তি রাজাকে প্রদান করা হতো, রাজা প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পত্তির অর্ধেক অপেরা দলের প্রধান মহিলাকে দান করতেন, অবশিষ্ট অর্ধেক আইনানুযায়ী অভ্যন্তরীণ রাজস্ব হিসেবে কোষাগারে জমা হতো।[১৪]

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রান্সে ভলত্যের ও মঁতেসকিওর উপহাস সত্ত্বেও এই সমস্ত পুরোনো আইন-কানুন ১৭৭০ সাল পর্যন্ত রয়ে যায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুইবার তা আবার পুনঃকার্যকর করা হয়। তবে আত্মহত্যাকারীর সম্পদ আটক এবং খ্যাতির অপনোদন করা ফরাসি বিপ্লবের সাথে সাথে চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত হয়। ১৭৯১ সালের নতুন প্রবর্তিত দণ্ডবিধিতে আত্মহত্যা অনুল্লিখিত রয়ে যায়। কিন্তু ইংল্যান্ডে আত্মহত্যাকারীর সম্পত্তি ক্রোক করার নিয়ম ১৮৭০ সাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়ে যায় এবং ব্যর্থ আত্মহত্যাকারীকে কারাগারে পাঠানোর নিয়ম ১৯৬১ সাল পর্যন্ত বলবৎ থেকে যায়। মানসিক ভারসাম্যহীনতার ও তার গণ্ডগোলের জন্যই আত্মহত্যা সংঘটিত হয়—এই প্রতীতি আইনজীবীদের মধ্যে দৃঢ় হয়; কারণ, এই বিবেচনা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, আত্মহত্যা মৃত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে ধর্মীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে এবং উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করে তার সম্পদপ্রাপ্তি থেকে।

কিন্তু আত্মহত্যা-সম্পর্কিত সামাজিক নিয়মকানুনের উৎসারণ শুরু হয় অনেক আগেই। খ্রিস্টীয় সমাজ গঠনের পরপরই আত্মহত্যাকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস এই কথা বলে যে জীবনের অবমাননা করা অনুচিত কারণ তা ঈশ্বরের দান। ফলে আত্মহত্যা শয়তানের কর্ম হিসেবে চিহ্নিত হয়। ৪৫২ খ্রিস্টাব্দে আরলেস কাউন্সিল আত্মহত্যাকে অপরাধ হিসেবে এবং শয়তানের রোষ থেকে এর জন্ম বলে ঘোষণা করে।[১৫] কিন্তু এই ঘোষণা আইন হিসেবে এবং দণ্ডবিধিতে অন্তর্ভুক্ত হতে লেগে যায় পরবর্তী শতাব্দী; ৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল অব প্রাগ দণ্ড হিসেবে তা মঞ্জুর করে। সিদ্ধান্ত হয় যে, আত্মহত্যাকারীকে জীবনের পবিত্র উৎসর্গকারী হিসেবে সম্মানিত করা এবং তাকে স্মৃতিচিহ্নিত করা হবে না, আর পরমগীত গেয়ে মৃতদেহকে কবরস্থও করা হবে না।[১৬] বেসামরিক জনআইন, প্রথা ও ধর্মীয় অনুশাসনকে মেনে ধর্মীয় শাস্তির পাশাপাশি আর্থিক শাস্তিও আরোপ করা হয়। এসবেরই অনুবৃত্তিক্রমে দেখা যায়, ১৭৪৯ সালের ৩১ জানুয়ারি পার্লামেন্ট অব প্যারিস এগুলোর অনুমোদনের জন্য এক ডিক্রি জারি করে।[১৭] ইংল্যান্ডে দেখা যায়, দশম শতাব্দীতে রাজা এডওয়ার্ড-এর এক আইনে আত্মহত্যাকারীকে দস্যু, গুপ্তঘাতক ও সকল ধরনের অপরাধীর সমতুল্য হিসেবে গন্য করা হয়। ১৮৩২ সাল পর্যন্ত আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহে একটি লাঠি গুঁজে টেনেহিঁচড়ে চৌমাথার উঁচু স্থানে অনানুষ্ঠানিকভাবে কবর দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।[১৮] দেখা যায়, ১৮৮৯ সালে ১০৬টি বৈধ বিচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল এই অপরাধে যার মধ্যে ৮৪টির শাস্তি হয়ে ছিল শুধু ইংল্যান্ডে।[১৯] আরও দেখা যায়, জুরিখে এক অত্যাশ্চর্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হতো: কেউ ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করলে ছুরির বাটটি মৃতদেহের মাথার কাছাকাছি জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া হতো; যদি কেউ জলে ডুবে আত্মহত্যা করত তাহলে পাঁচ ফুট জলের নীচে মাটিতে তাকে কবর দেওয়া হতো।[২০] প্রুসিয়াতে ১৮৭১ সালের দণ্ডবিধির আগ পর্যন্ত আত্মহত্যাকারীর দেহ ধর্মীয় প্রথা ও আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই কবর দেওয়া হতো।[২১] নতুন জার্মান দণ্ডবিধিতে আত্মহত্যায় সহযোগিতার শাস্তি ছিল তিন বছরের কারাদণ্ড।[২২] অস্ট্রিয়াতেও পুরোনো প্রথার নিয়মকানুন অনেক দিন মানা হতো। ১৮৮১ সালের নিউ ইয়র্ক রাজ্যের দণ্ডবিধিতে আত্মহত্যাকে অপরাধ বলে ধরা হয়েছিল কিন্তু ব্যবহারিক কারণে শাস্তি অনেক সময় অনারোপিত হতো। উদ্‌যোগ গ্রহণের শাস্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিল ২ বছর কারাদণ্ড বা ২০০ ডলার জরিমানা বা উভয় দণ্ড।[২৩]

অনেকে বলে থাকেন? আদিম সমাজ ও গোষ্ঠীর আত্মহত্যাসংক্রান্ত নিষেধ ও ধারণাগুলো খ্রিস্টান সমাজেও কিছু পরিবর্তিত হয়ে রয়ে গিয়েছিল। যেমন রাস্তার চৌমাথায় আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহ কবর দেওয়ার রীতির সাথে মিল আছে বাগান্দার ডাইনি চিকিৎসকদের রীতির। আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহের ওপর পাথর ও খুঁটি পুঁতে রাখার রীতি হয়তো এজন্য এসেছে যে চৌমাথায় তা করা হলে সার্বক্ষণিক জনসমাগমের জন্য কবরের অস্থির আত্মা উঠে আসতে পারবে না, অন্যথায় দুষ্ট আত্মা ঘরে ফিরে আসবে। খ্রিস্টান মতে চৌরাস্তা একধরনের প্রতীক—হয়তো বা ক্রস প্রতীক যা মন্দ আত্মাকে মৃতদেহের মধ্যে আবির্ভূত হতে বারিত করবে। ফ্রয়েড প্রথম দিকে তাঁর তত্ত্বে বলেছিলেন, আত্মহত্যা প্রকৃতপক্ষে হলো এক পক্ষান্তরিত হত্যা, এক বিরুদ্ধতা, যা অন্য বস্তু বা ব্যক্তি থেকে পরিবর্তিত হয়ে আত্মপক্ষে প্রযুক্ত হয়।[২৪] যে-কোনো কারণে মানুষের আক্রমণ অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে না যেতে পারলে তা নিজের দিকে আসে। এই মতও খ্রিস্টীয় কুসংস্কার ও বিধি থেকে জাত। আদিম সমাজে এইসব ধারণা বা রীতির কারণ ছিল, তারা মনে করত, আত্মহত্যাকারীর ভূত তার অত্যাচারীদের ধ্বংস করবে, বা গোষ্ঠীর কঠোর রীতি আত্মহত্যাকারীর শত্রুদের বাধ্য করবে তার মতোই নিজেকে হত্যা করতে। এগুলো সংঘটিত হয় এ জাতীয় ধারণা হতে যে আত্মহত্যা প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নয়। আসলে আত্মহত এক জাদুকার্যে রত হয় যা এক জটিল জাদু-আচারের মাধ্যমে শত্রুদের মৃত্যুতে শেষ হয়। আত্মহত্যার আদিম ভীতিগুলো দীর্ঘদিন ইউরোপে প্রচলিত ছিল; এর সাথে হত্যাপরাধকে মিলিয়ে দেখা হতো। আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহকে যে শাস্তি দেওয়া হতো তা যেন একটি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির শাস্তির মতো যার শাস্তি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো। অর্থাৎ মৃতদেহেরও যেন ফাঁসি হতো। আল আলভারেজ বলেছেন, ইংরেজি সুইসাইড শব্দটি লাতিন-উদ্ভূত এক আধা-বিমূর্ত শব্দ যা ইংরেজিতে পরবর্তীকালে ঢুকেছে। এর প্রথম ব্যবহার হয় ১৬৫১ সালে। কিন্তু আলভারেজ বলেছেন, তিনি তারও আগে স্যার টমাস ব্রাউনের ১৬৩৫ সালে লেখা গ্রন্থ *রিলিজিও মেডিসি*[২৫]-তে এই শব্দটির দেখা পান। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৬৪২ সালে। কিন্তু ১৭৫৫ সালে ডা. জনসন[২৬]-এর অভিধানের আগে এই শব্দটি খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল। এই শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত হতো "আত্ম-হত্যা", "আত্ম-ধ্বংস", "আত্ম-খুন" "আত্ম-বধ", "আত্ম-নরহত্যা" ইত্যাদি অর্থে।[২৭]

চার্চ কর্তৃক আত্মহত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণার বিষয়টিও কিছুটা গোলমেলে ব্যাপার বলে মনে করা হয়, কারণ, *বাইবেল* (ওল্ড বা নিউ)-এর কোথাও এ ব্যাপারে সরাসরি কিছু বলা নেই। *ওল্ড টেস্টামেন্ট*-এ চার ব্যক্তির আত্মহত্যা বর্ণিত আছে: স্যামসন, শৌল, অবিমেলক ও অহিথোফেল আর এই চারজনের কারও আত্মহত্যার ক্ষেত্রেই কোনো বিরূপ কিছু বলা নেই। *নিউ টেস্টামেন্ট*-এ জুদাসের আত্মহত্যার কথা বলা আছে। বলা আছে যে, তার আত্মহত্যা তার কৃতকর্মসংক্রান্ত অনুতাপেরই ফল। চার্চের প্রথম শতকে আত্মহত্যা এমন এক নিরপেক্ষ বিষয় ছিল যে, জিশু খ্রিস্টের মৃত্যুকেও, আদিযাজকদের মধ্যে অন্যতম কঠোর যাজক তারতুলিয়ান[২৮] বলেছেন এক ধরনের আত্মহত্যা।[২৯] জন ডানও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর আত্মহত্যার সপক্ষে লেখা *বিয়াথানাটস* গ্রন্থে বলেছেন: "আমাদের পবিত্র পরিত্রাণকর্তা...আমাদের পরিত্রাণ ও উদ্ধারের জন্য জীবনোৎসর্গের এই পথ পছন্দ করেছেন, আর অঝোর রক্ত ঝরিয়েছেন।"[৩০] এক্ষেত্রে তাঁরা হয়তো মাথায় রেখেছেন *নতুন নিয়ম বাইবেল*-এর জন ১০:১৮-এর এই উক্তিটিকে: No one takes it(my life) from me, but I lay down of my own accord.

প্রতীত হয় যে, আত্মহত্যাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনার বিষয়টি খ্রিস্টীয় অনুশাসনে পরে যুক্ত হয় যখন চার্চ তার সামাজিক নিয়মকানুনগুলোকে চালু করছিল। *বাইবেল*-এ বর্ণিত আত্মহত্যার ঘটনাগুলো স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক এবং যথোপযুক্ত বলেই প্রতিভাত হয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চার্চ আত্মহত্যার বিরুদ্ধে আইন করা শুরু করে আর তখন এর বৈধতার বাইবেলীয় উৎস ছিল *যাত্রাপুস্তক*-এ বর্ণিত দশ আজ্ঞার ষষ্ঠ আজ্ঞাটি: "তোমরা নরহত্যা কোরো না।" তখন সেন্ট অগাস্তিনের নির্দেশে বিশপেরা এই আদেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায়। কিন্তু রুসো বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে *বাইবেল* থেকে নয়, অগাস্তিন এই যুক্তি গ্রহণ করেন প্লাতোনের *ফায়েদ্রুস*[৩১] থেকে। মানুষের জীবন দেবতাদের নিয়মে নিগড়িত—এই পুথাগোরীয় নীতিবোধের কথা বলেছেন সোক্রাতেস হেমলক পানের আগে, ফলে আত্মহত্যাকে কখনোই গ্রহণ করা যায় না কারণ তা হবে দেবতাদের প্রতি অশ্রদ্ধার কাজ। পুথাগোরাস এজন্যই ফাঁসের মাধ্যমে আত্মহত্যাকে প্রত্যাখ্যান করেন।[৩২] সোক্রাতেসও এই ভাবধারায় প্রাণিত ছিলেন; তিনি মনে করতেন মানুষের জীবন দেবতাদের সম্পত্তি।[৩৩] অগাস্তিনের যুক্তিগুলো ছিল নিখুঁত ও কার্যকরভাবে একই রকম, কারণ খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তিই হলো এই যে, মানবশরীর অমর আত্মার যান, যার মূল্যায়ন হবে পরজগতে। যেহেতু আত্মা অমর তাই প্রত্যেক জীবনই সমানভাবে মূল্যবান। আর যেহেতু জীবন হলো ঈশ্বরের দান, তাই তাকে প্রত্যাখ্যান করা মানে ঈশ্বরকে ও তাঁর ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করা; তাঁর আত্মার রূপকে হত্যা করা মানে তাঁকে হত্যা করা। খ্রিস্টীয় ভাবনায় আত্মহত্যা নিষিদ্ধকরণ জীবনের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ থেকে উৎসারিত এবং তা রোমকদের নিত্যনৈমিত্তিক হত্যাস্পৃহা থেকে ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। কিন্তু এই কূটাভাস বা পরস্পর বিরোধিতার বিষয় নিয়ে ডেভিড হিউম বলেছেন ভিন্ন কথা; তাঁর মতে একেশ্বরবাদী ধর্মই হলো এমন এক ধর্ম যা বিশ্বকে একক, সুসংবদ্ধ ও বৌদ্ধিক সমগ্রতা হিসেবে বিবেচনা করে যদিও তার ফলাফল হিসেবে দেখা যায় গোঁড়ামি, মৌলবাদিতা ও অত্যাচার; অন্যদিকে বহুঈশ্বরবাদী ধর্মগুলো বৌদ্ধিকভাবে নিরর্থক ও বৈজ্ঞানিক বোধগম্যতার পরিপন্থি বলে আপাত প্রতিভাত হয়, কিন্তু তবুও তা দিয়েছে সহনশীলতা, ব্যক্তিক স্বাধীনতা, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধাবোধ, এবং এক মুক্ত পরিবেশ। সুতরাং যখন আত্মহত্যাকে বিশপেরা অপরাধ হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন তাদের ভেতর পেগান রোমে এ সংক্রান্ত প্রচলিত উদারতা ও কমনীয়তার বিরুদ্ধ-মনোভাব কাজ করেছিল এবং তারা এর থেকে নৈতিক দূরত্ব রক্ষায় ছিল তৎপর। অর্থাৎ তারা চেয়েছিল যে-কোনোভাবেই তাদের নিয়ম রোমান নিয়ম থেকে হবে ভিন্ন, তবেই তা হবে স্বতন্ত্র। অনেকটা বিরোধী অবস্থানের মানসিকতায় তারা আত্মহত্যাকে অনৈতিক ও বেআইনি মর্মে ঘোষণা করে বসে। অতএব দেখা যায়, আত্মহত্যাকে পাপ বা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপরাধ হিসেবে বিবেচনার বিষয়টি খ্রিস্টান ধর্মে অপেক্ষাকৃত পরে এসেছে এবং তা বাহ্যত এক ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ব্যাপার যা জুদীয়-হেলেনিক ঐতিহ্য থেকে একেবারে নতুন একটি বিষয় এবং তা পরবর্তীকালে পরিব্যাপ্ত হয়েছে ইউরোপ জুড়ে কুয়াশার মতো। আর এর ব্যাপ্তির সাথে জড়িত রয়েছে মৃত সম্বন্ধে আদিম-ভীতি, কুসংস্কার। খ্রিস্টান, ইহুদি ও হেলিনীয় ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও যা টিকে ছিল মানুষ ও সমাজের মনে। খ্রিস্টীয় ভাবধারা এক্ষেত্রে সাঙ্গীকরণ করেছিল অনেক পেগান কুসংস্কারকে। এক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্ম ক্রয় করেছে পেগান কুসংস্কারকে। মৃতদের-সম্পর্কিত আদিম ভয় ও ভীতি মানুষের মনে অনেক সময় অতিশক্তিমান হয়ে ওঠে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বললে, অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক মৃত্যু এই ভয়কে আরও চাগিয়ে দেয়। মৃত্যুর পর মৃতরা পৃথিবীতে উঠে আসে—মধ্যযুগে ইউরোপে প্রচলিত এ ধরনের কুসংস্কারের অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায় "মরণের নৃত্য" প্রতীকে। কুসংস্কার ছিল যে, মৃতরা অনেকসময় কবর থেকে উঠে যূথবদ্ধভাবে নৃত্য করে বেড়ায়। এই নৃত্যরত কঙ্কালরূপী মৃত্যু এসে জীবিতদের টেনে নিয়ে তাদের হাত ধরে নাচতে থাকে এবং সমবেত নৃত্যের মাধ্যমে এক সময় মৃত্যুলোকে নিয়ে যায়। এছাড়াও প্রতিহিংসাপরায়ণ মৃত্যু প্রাচীনকালে অনুষ্ঠিত হতো প্রচুর যার থেকে মৃত্যুর ভীতিকর রূপ সমাজে গভীর ছাপ রাখত। ফলে এইসব অস্বাভাবিক মৃত্যু-সম্পর্কে গড়ে ওঠে নানা বিভীষিকাময় কাহিনি। রোমক সাম্রাজ্যে গ্লাদিয়েতরদের প্রদর্শনীগুলোতে এ জাতীয় ভয়ংকর মৃত্যু অনুষ্ঠিত হতো। স্পার্তাকাসের[৩৪] উত্থান ও দ্রোহ দমনের পর ছয় হাজার দাসের লাশ রোম থেকে কাপুয়া পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে রাস্তায় শায়িত ছিল। খ্রিস্টীয় জগতে রোমক এ সব অনুষ্ঠান বন্ধ হয় কিন্তু শুরু হয় অন্য ধরনের প্রকাশ্য হত্যালীলা। অপরাধীদের প্রকাশ্যস্থানে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বা গিলোতিনে শিরশ্ছেদ করে বা জীবিতাবস্থায় পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে জনসম্মুখে মৃত্যু ঘটানোর নিয়ম সে-সময়েও প্রচলিত হয়। দীর্ঘ সময় ধরে এদের মৃতদেহ প্রকাশ্যস্থানে পড়ে থাকত। জনসাধারণ এই সমস্ত মৃত্যু দেখে আনন্দ উপভোগ করত। প্রকাশ্যযুদ্ধে তরবারি দিয়ে, ছুরি দিয়ে, পৈশাচিক উপায়ে হত্যা সংঘটিত হতো যা অবলোকন করত সাধারণ জনসাধারণ। প্যারিসে পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান ছিল মর্গ, যেখানে প্রদর্শনীর জন্য মৃতদেহগুলোকে সুসজ্জিতভাবে সাজিয়ে রাখা হতো। মৃত্যুর এই বিভীষিকা হতো প্রদর্শিত যা দেখা যেত প্রাচীন অনেক জাতির মধ্যেও। ফ্রেজার তাঁর *দ্য গোল্ডেন বাও* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে অবতারণা করেছেন এ সংক্রান্ত বিষয়; হাবামাল-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন যে সেখানে দেবতা নিজে বলছেন:

> জানি ঝড়ো গাছে ঝুলে আছি আমি
> পুরো নয় রাত ধরে
> বল্লমে আহত করে শরীর, ওডিনকে উৎসর্গ করে,
> নিজেকে উৎসর্গ করে, নিজেকে।[৩৫]

অতএব হত্যা বা আত্মহত্যার বিভীষিকা শতাব্দী থেকে শতাব্দী জুড়ে জনমনে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং এর আতঙ্কে ভঙ্গুর ও ব্যাধিগ্রস্ত ছিল জনমানুষের মন ও মানসিকতা। মৃত্যু নয় বরং মৃত হয়ে ওঠে এই বিভীষিকার নায়ক।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মহত্যা মূলত একটি আত্মচেতনাগত অবস্থা। একজন মানুষ আত্মহত্যা করে মূলত এই চেতনায় তাড়িত হয়ে যে জগতে বেঁচে থাকা তার জন্য অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়, এবং এই চেতনায় মৃত্যুই কখনও কখনও প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিতে পারে। আর সমস্ত অসুখ ও দুর্দশার সমাপ্তি হিসেবে মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানো এবং তাতে আশ্রয় নেওয়া কোনোভাবেই অর্থহীন হতে পারে না। মঁতেন তাই বলতে পেরেছেন যে আমাদের মৃত্যু নির্ভর করে আমাদেরই ওপর।

কতিপয় ক্ষেত্রে অনেকের নিকট আত্মহত্যা "উন্নত সভ্যতার সূচক"[৩৬] হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কারণ তা সাধারণত বহমান আটপৌরে প্রবৃত্তি ও আত্মসংরক্ষণের বিরুদ্ধে যায়। সম্ভবত এই ধারণার জন্ম হয়েছে গ্রিক সভ্যতা থেকে যেখানে ধ্রুপদি ব্যক্তিবর্গদের মধ্যে আত্মহত্যার রীতি ছিল উচ্চমাত্রায়। শুধু তা-ই নয় এর সাথে যুক্ত হয়েছিল উচ্চ দার্শনিকতা ও গভীর জীবনবোধ। ব্যাপারটি অনেকটা এ রকম, যেহেতু প্রাচীন গ্রিস সভ্যতার পীঠস্থান এবং সেখানে উচ্চ স্তরে আত্মহত্যা পরিদৃষ্ট, অতএব এ দুটি, অর্থাৎ আত্মহত্যা ও সভ্যতা, ধনাত্মকভাবে সহ-সম্পর্কিত। কেউ একজন যদি বলে যে, তুমি তোমার সমাজের আত্মহত্যা-হার আমাকে বলো, আমি তোমাকে তোমার সাংস্কৃতিক বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে বলে দেব, তাহলে তা হয়তো একটি চমকিত বিষয় বলে মনে হবে কিন্তু কখনও কখনও তা সভ্যতার সূচক হিসেবে আকর্ষণীয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু গোষ্ঠীগত আত্মহত্যা প্রবণতার ক্ষেত্রে তা সম্ভবত সঠিক নয়। কারণ গোষ্ঠীগত আত্মহত্যা সংঘটিত হয় গোষ্ঠীর প্রবৃত্তি থেকে যার সাথে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মিশে থাকে গোষ্ঠীয় সংরক্ষণবাদ। অর্থাৎ এটা গোষ্ঠীর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এক প্রতিবাদ।

কিন্তু পরার্থবাদী বা আত্মসংরক্ষণ পরিপন্থি আত্মহত্যা ছাড়াও দেখা যায় অন্য ধরনের আত্মহত্যা যা মূলত ঘটে প্রযোজ্যমান প্রতিবেশের প্রতিক্রিয়া থেকে, যা প্রকারান্তরে গোষ্ঠী-পরিপন্থি চেতনায় বা সামগ্রিক অবলুপ্তির চেতনায় সংক্রামিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তাসমানীয় আদিবাসীরা মৃত্যুবরণ করেছিল শুধু এইজন্য নয় যে কোনো এক অপরাহ্ন ক্রীড়ায় কাঙারুদের মতোই তাদের শিকার হতে হচ্ছে, বরং অনেকটা এই কারণেও যে প্রতিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা অসহ্যকর হয়ে উঠেছিল তাদের কাছে, আর এজন্য তারা আত্মহত্যা করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে জাতি বা গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের বংশবৃদ্ধিকে অস্বীকার করার এক সুপ্ত অভিলাষে। পরিহাস এই যে, এই যাত্রার সর্বশেষ রক্ষা-পাওয়া এক বৃদ্ধাকে মমি করে রেখেছে অস্ট্রেলীয় সরকার যা জাদুঘরের দর্শনার্থীর কৌতূহলকে এখন নিবৃত্ত করছে মাত্র। এই গোষ্ঠীগত অবলুপ্তির অন্য এক চেতনা প্রতিফলিত হয় মাসাদায়, যেখানে রোমকদের আগ্রাসন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে গিয়ে অবশেষে দুর্গে আটকে-পড়া প্রায় এক হাজার ইহুদি একযোগে আত্মহত্যা করে। স্পেনিয়াডরা যখন নতুন পৃথিবী (লাতিন আমেরিকা) আবিষ্কার করে, তখন আদিবাসীদের ওপর তাদের অত্যাচার এত ক্রুর ছিল যে রেডইন্ডিয়ানরা তা সহ্য করতে না পেরে নিজেরাই নিজেদের হত্যা করতে থাকে। সম্রাট ৫ম চার্লসের কয়লাখনিতে কাজ করার জন্য ম্যাক্সিকো উপসাগরীয় এলাকা থেকে যে চল্লিশ জন স্থানীয় বাসিন্দাকে আনা হয়েছিল, তাদের মধ্যে উনচল্লিশজনই উপোস করে ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যুবরণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওয়েস্ট ইন্ডিজে, স্পেনীয় ইতিহাসবিদ গিরোলামো বেনজোনির তথ্যানুযায়ী, চার সহস্র পুরুষ ও অসংখ্য নারী পর্বতের দুরুহ পার্শ্ব থেকে লাফ দিয়ে বা একে অন্যকে আঘাত করে আত্মহত্যা করে। তিনি আরও জানান, হাইতিতে লক্ষ লক্ষ আদিবাসী অধিবাসীর মধ্যে, হত্যা ও আত্মহত্যার পর কম জনই বেঁচেছিল। এর ফলে শেষের দিকে স্পেনীয়রা শ্রমিক-স্বল্পতার মুখোমুখি হয় এবং তারা এই বলে রেড ইন্ডিয়ানদের এই মহামারী আত্মহত্যাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে যে, যদি তারা আবার আত্মহত্যা করে তবে তারাও (স্পেনীয়রা) আত্মহত্যা করে পরজগতে গিয়ে তাদের এর চেয়েও বেশি অত্যাচার করবে।[৩৭]

উল্লিখিত গোষ্ঠী-আত্মহত্যাগুলোকে মনে হবে আত্মহত্যার বিপরীত কাজ বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মরক্ষার মনস্তত্ত্বেরই এক ভিন্ন রূপ এক্ষেত্রে দেখা যায় এবং গোষ্ঠী অবলুপ্তির এই প্রচেষ্টা গোষ্ঠীর বিশুদ্ধতা রক্ষারই এক ভিন্ন ক্রিয়া। এক প্রতিরোধস্পৃহার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াই এই গোষ্ঠী বা দলবদ্ধ আত্মহত্যা। এর সাথে মিলে যায় ফ্রয়েড-কথিত নিজের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার তত্ত্বটি। নিজের প্রতি আক্রমণাত্মক হওয়ার রয়েছে দুটি দিক: একটি হলো ব্যষ্টিক ও অন্যটি সামষ্টিক দিক থেকে সংঘটিত।

রোমক সাম্রাজ্যে আত্মহত্যার এক অভিনব শৈলী এবং সংস্থান দৃষ্টিগোচর হতো। এর কারণ হিসেবে বিবেচনায় আনা যায় রোমক সাম্রাজ্যের জটিল সাংস্কৃতিক স্তরকে, যেখানে মৃত্যুকে মাঝেমধ্যেই খুব স্বাভাবিকভাবে আসতে দেখা যায়, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাস চালিত করত না দর্শনকে, যেখানে জাতীয় আইন এই বোধকে বিবেচনায় আনত এবং যেখানে সর্বজনীন সহনশীলতা এক মহত্তম উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল। রোমক সাম্রাজ্যে আত্মহত্যা পরিপন্থি আইনগুলো বারিত করেনি আত্মহত্যা সংঘটনকে; বরং সেখানে সংঘটিত হয়েছে মহত্তম ও গরিমাময় আত্মহত্যাগুলো—বাদ যায়নি সম্রাট, সেনাপতি, দার্শনিক, কবি, এমনকি সৈনিকেরাও। গ্রিকদের মধ্যেও আত্মহত্যার বিষয়ে সহনশীলতা দেখা দিয়েছিল। আত্মহত্যার বিরুদ্ধে যে-ট্যাবুগুলো ছিল তারও যোগসূত্র ছিল জাতিহত্যার সাথে। সাহিত্যে ও দর্শনে আত্মহত্যা দেখা দেয় কোনোরকম বিরূপ মন্তব্য বা দোষারোপ ছাড়া। প্রথম সাহিত্যিক আত্মহত্যা, অয়দিপুসের মা ইয়োকাস্তার আত্মহত্যা মর্যাদাকর হিসেবে বিবেচিত হয়, যা ছিল এক অসহনীয় অবস্থা থেকে সম্মানজনক নিষ্ক্রমণের পথ। হোমারও নিরাসক্তভাবে, কিছুটা স্বাভাবিক ও বীরত্বপূর্ণ মনোভাবে বলেছেন আত্মবধের কথা। ইজিউস তার পুত্র থিসিউসের ভ্রমের জন্য সাগরে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেন, যার ফলে তার নামানুসারে সাগরের নাম রাখা হয় ইজিয়ান সাগর। এরিগোনে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেন পিতার মৃতদেহ দেখে। দেলফির দৈববাণীতে যখন ঘোষিত হয় যে অ্যাথেন্সবাসী তাদের রাজাকে হত্যা না করলে লাসিদেমোনিয়ানরা[৩৮] অ্যাথেন্স দখল করে নেবে, তখন, রাজা কোদরুস ছদ্মবেশে শত্রুদের শিবিরে গিয়ে এক সৈনিকের সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে পরে তাঁকে হত্যা করার জন্য সৈনিককে প্ররোচিত করেন।[৩৯] সিসিলিতে গ্রিক উপনিবেশ কাতানার[৪০] বিধানকর্তা চারোনদাস নিজের সৃষ্ট বিধির একটি নিজে ভঙ্গ করার অনুশোচনায় আত্মহত্যা করেন।[৪১] স্পার্তার আরেক বিধানকর্তা লাইকুরগুস তাঁর জনগণকে একবার শপথ পড়ান যে দেলফি থেকে ফিরে না-আসা পর্যন্ত তারা তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলবে। তারপর তিনি দেলফিতে গিয়ে তাঁর নতুন প্রণীত আইন নিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলোচনা করেন এবং আইনগুলো ঠিক আছে মর্মে দৈববাণী লাভ করেন। কিন্তু তিনি তখন উপোসের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করতে লাগলেন এই কারণে যে, তিনি ফিরে না গেলে স্পার্তার জনগণ তাদের শপথ থেকে বিচ্যুত হবে না এবং আইনগুলো মেনে চলতে থাকবে শেষাবধি। এই ধারণায় চালিত হয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।[৪২] তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ;—নিজের রাজ্যকে আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বা জনগণ যেন আইন চিরতরে মেনে চলে তার জন্য তাঁরা আত্মত্যাগ করেন, মৃত্যুকে বরণ করেন। গ্রিকরা কেবল তিন কারণেই আত্মহত্যা করত—অসম্মান থেকে নিজেকে রক্ষা করা, দুঃখ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এবং মহৎ দেশপ্রেমের তাগিদ ও প্ররোচনায়।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আত্মহত্যা ছিল সহনীয় এবং অনেক সময় প্রশংসিত ব্যাপার। কোনো স্থির বা অনড় দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করত না আত্মহত্যার বিষয়ে; আদর্শ, অনুপ্রেরণা ও নৈতিক ভিত্তির দিক থেকে এর বৈধতাকে গভীরভাবে বিবেচনা করা হতো। মোট কথা, আত্মহত্যার বিষয়টিকে একটি ভারসাম্যময় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এ বিষয়ে সোক্রাতেস, প্লাতোন এবং পুথাগোরাসের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখেছি। আরিস্তোতল আত্মহত্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে যা বলেছেন তা-ও একই রকম, বিরুদ্ধ হলেও ভারসাম্যময়। তাঁর মতে, আত্মহত্যা একটি রাষ্ট্রবিরুদ্ধ কাজ, কারণ ধর্মীয় দিক থেকে এটা নগরকে দূষিত করে, আর অর্থনৈতিক দিক থেকে এটা রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় নাগরিকদের হারানোর মাধ্যমে রাষ্ট্রকেই দুর্বল করে; এটা মূলত সামাজিক দায়িত্বহীনতার কাজ। আরিস্তোতলের আত্মহত্যা-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা প্রয়োজনভিত্তিক। বিপরীতে, প্লাতোনের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও কম সরল। সোক্রাতেসের নরম যুক্তি আত্মহত্যাকে মূলত অস্বীকারই করে, একই সাথে তিনি মৃত্যুকে অসীমভাবে কাঙ্ক্ষিত বলেও মনে করেছিলেন। সোক্রাতেস আনন্দচিত্তে হেমলক পান করেছিলেন এবং অপূর্ব বাগ্মিতায় ও যুক্তিতে মৃত্যুর উপযোগিতা বিষয়ে এমন বক্তব্য প্রদান করেন যে, তা এক উদাহরণ হয়ে অন্যদেরও আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল পরবর্তী সময়ে: গ্রিক দার্শনিক ক্লিওমব্রোতুস *ফায়েদ্রুস* দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন, আর কাতো এই বই প্রতি রাতে দু-বার পড়ে একদা নিজের তরবারির ওপর আছড়ে পড়েন। প্লাতোন আত্মহত্যার এই ধারণাকে পরিশোধন করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, যদি জীবন ও তার বাহ্যিক পরিস্থিতি হয় অপরিশোধিত ও অসহনীয়, তাহলে আত্মহত্যা যৌক্তিক ও যথার্থ কাজ। কষ্টকর রোগ ও অসহ্য অবস্থা এ জগৎ থেকে মুক্তি নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণগুলো অনুদার হলেও দার্শনিক ব্যাখ্যা যথার্থ হিসেবে বেশি দৃষ্টিগোচর হয়।

সোক্রাতেসের মৃত্যুর একশ বছরের মধ্যে স্টোয়িকেরা আত্মহত্যাকে এক যৌক্তিক ও কাম্য বিষয়ে পরিণত করতে শুরু করেন। স্টোয়িক ও এপিকুরীয়—উভয়ের কাছেই জীবন এবং মৃত্যু ছিল এক নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষ ব্যাপার। এপিকুরীয়দের নীতি ছিল ভোগ ও আনন্দ। যা কিছুতে উন্নতিবর্ধন হয় তা-ই শুভ আর যা থেকে দুঃখের জন্ম হয় তা-ই খারাপ। স্টোয়িকেরা প্রকৃতির সাথে সাযুজ্যময় জীবনকে মূল্যবান হিসেবে বিবেচনা করতেন; কিন্তু যখন তা আর থাকে না মৃত্যু তখন এক যৌক্তিক পছন্দ হিসেবেই আবির্ভূত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হতে পারে। স্টোয়িকবাদের স্থপতি দার্শনিক জেনো ৯৮ বছর বয়সে পড়ে গিয়ে আঙুল ভেঙে ফেলার পর যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেন, আর তাঁর উত্তরসূরি ক্লেয়ান্থেস মাড়িতে ফোঁড়া উঠলে তার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপবাস করতে শুরু করেন; দুই দিনের মধ্যে মাড়ির অবস্থা অনেকটা ভালো হয়ে গেলে তাঁর চিকিৎসক তাঁকে সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন, কিন্তু ক্লেয়ান্থেস খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, যেহেতু মৃত্যু অভিমুখে তিনি তাঁর অভিযাত্রা শুরু করেছেন, তাই এখন আর পশ্চাদপসরণ করবেন না; এবং এভাবেই উপবাসের মাধ্যমে অবশেষে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৪৩]

"ধ্রুপদি গ্রিক আত্মহত্যা, অতঃপর যদিও কিছুটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে, তবু তা ছিল এক সৌম্য শান্ত যুক্তিবোধে প্রাণিত"—বলেছেন আল আলভারেজ।[৪৪] অ্যাথেন্স এবং গ্রিক উপনিবেশ মার্সেইলি ও কিউসে সরকারিভাবে আত্মহত্যার পূর্বানুমোদনের নিয়ম ছিল বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, যেখানে আত্মহত্যার আবেদন সিনেট মঞ্জুর করলে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেমলক সরবরাহ করা হতো। যখন বাহ্যিক পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে আত্মহত্যাকে সঠিক মর্মে বলেছেন প্লাতোন। আদি গ্রিক স্টোয়িকেরা এই ভাবধারাকে উন্নত ও সংহত করেছিলেন এবং একে দাঁড় করিয়েছেন যথার্থ দার্শনিক ভিত্তির ওপর। রোমক সাম্রাজ্যের শেষের দিকে যে উত্তর-স্টোয়িকবাদ বা তৃতীয় পর্যায়ের স্টোয়িসিজম পরিদৃষ্ট হয়, তাতে প্লাতোনেরই চিন্তাধারার আরও উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয়। এক্ষেত্রে যুক্তি অনিবার্যতই একই রকম কিন্তু প্লাতোনের বাহ্যিক পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় এসে যায়। যখন অন্তর্গত বাধ্যবাধকতা অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তখন আত্মহত্যার বিষয় নিয়ে আর দ্বন্দ্ব থাকে না; তখন কত মহার্ঘ উপায়ে, সাহসিকতায় ও শৈলীতে তা করা যায় তা-ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রোমকদের চোখে আত্মহত্যা আর অনৈতিক বা অসততা বলে মনে হয় না, বরং এ একজনের জন্য এক মহৎ গুণপনার কাজ মর্মে বিবেচিত হয়। রোমক স্টোয়িকদের লেখায়ও আত্মহত্যার আর্তি চোখে পড়ে, যেমন সেনেকার বিখ্যাত উক্তি :

> বোকা মানব, কেনইবা তুমি শোক করো, আর কেনই বা তুমি পাও ভয়? যেদিকেই তুমি তাকাবে সেখানেই দেখবে মন্দের সমাপ্তি। তুমি কি দেখো না এই প্রসারিত গিরিচূড়া? এটাও মুক্তির দিকে ধাবিত। তুমি দেখো না এই বন্যা, এই নদী, এই কূপ? মুক্তি এদের সাথে একঘরে থাকে। তুমি কি দেখো এই অবর্ধিত, রৌদ্রদগ্ধ আর দুঃখভারাক্রান্ত বৃক্ষটিকে? তার প্রতিটি শাখা-প্রশাখাতেই মুক্তি ঝুলে আছে। তোমার গ্রীবা, গলা এবং তোমার হৃৎপিণ্ড —সবকিছুই দাসত্ব থেকে মুক্তির অনেক উপায়...তুমি কি স্বাধীনতার, মুক্তির পথের অনুসন্ধান করো? তোমার শরীরের প্রতিটি শিরায় শিরায় তুমি তা খুঁজে পাবে।[৪৫]

অতিশয়োক্তি নয়, নয় কোনো উচ্চকিত বাক্যালংকার; সেনেকা তাঁর এই নীতিবাক্যকে নিজের জীবনে প্রতিপন্ন করেছিলেন: লাতিন সাহিত্যের রৌপ্যযুগের অন্যতম এই প্রধান লেখক সম্রাট নিরোর প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছুরিকাঘাতের মাধ্যমে আত্মহত্যা করেন। উল্লেখ্য যে, নিরো ছিল তাঁর ছাত্র। তাঁর স্ত্রী পাউলিনাও, যিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিলেন না স্টোয়িক, তাঁর স্বামীর সাথে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান, কিন্তু তিনি রক্ষা পেয়ে যান সে যাত্রায়।[৪৬]

সেনেকার বিখ্যাত উক্তির মতোই আরেকটি বয়ান পাওয়া যায় সেনেকারই যোগ্য-বন্ধু আত্তালুসের কাছ থেকে, যা তিনি তাঁর একজন বন্ধু মার্সেল্লেনুসকে বলেছিলেন, যখন মার্সেল্লেনুস এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন এবং এর থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে আত্মহত্যার কথা ভাবছিলেন :

> পীড়িত হোয়ো না, আমার প্রিয় মার্সেল্লেনুস, মনে করো তুমি কোনো মহৎ বিষয়ের জন্ম দিচ্ছ। জীবন কোনো মর্যাদাময় বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তোমার দাস, তোমার পোষ্যপ্রাণী তোমারই মতো একে ধারণ করে আছে: কিন্তু সম্মানজনকভাবে, বিচক্ষণতার সাথে, সাহসের সাথে মৃত্যুবরণ করা এক মহৎ ব্যাপার। চিন্তা করো, কত দীর্ঘকাল ধরে তুমি একই ধরনের বাজে-মন্থর-নিষ্প্রভ কাজের সাথে যুক্ত হয়ে আছ খাওয়া, ঘুমানো আর উদরপূর্তি। এই হলো একই বৃত্ত ধরে একঘেয়ে অনুবর্তন। একজন বিচক্ষণ, সাহসী বা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষই কেবল মরতে চায় না, একজন রুচিবাগীশ মানুষও মরতে চায়।[৪৭]

মার্সেল্লেনুস তাঁর বন্ধুর উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন এবং উপবাসের মাধ্যমে অতঃপর আত্মহত্যা করেছিলেন। আত্মহত্যা করে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন প্রাচীনকালের বরেণ্যদের সাথে, যারা হলেন: নেমোস্থেনেস, ইসোক্রাতেস, কোদরুস, চারোনদাস, লাইকুরগুস, হেগেসিয়ুস, ক্লিওমব্রোতুস, ক্রাসুস, মারিয়ুস, আন্তোনিয়ুস, কাতো,[৪৮] জেনো, ক্লেয়াস্থেস, সেনেকা, পাউলিনা, আরিস্তোদেমুস, দিয়োজেনুস, সিলেনুস প্রমুখ। এই তালিকায় আরও আছেন গ্রিক বাগ্মী আইসোক্রাতেস ও দেমোসথেনেস; রোমান কবি লুক্রেতিয়ুস, লুকান ও লাবিয়েনুস; নাট্যকার তেরেন্স; সমালোচক আরিস্তরচাজ, আর পেত্রোনিয়ুস আরবিতের; হান্নিবাল,[৪৯] বোয়াদিসিয়া, ব্রুতাস, কাসিয়ুস, মার্ক আন্তনি ও ক্লেওপাত্রা, কোসিইয়ুস নেরভা,[৫০] স্তাতিয়ুস,[৫১] নিরো, ওতো, সাইপ্রাসের রাজা তলেমি এবং পারস্যের রাজা সারদানাপালাস।[৫২] মিথরিদাতেস শত্রুদের হাতে থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য বছরের পর বছর ধরে সামান্য মাত্রার বিষ খেয়ে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতায়নের চেষ্টা করেন, ফলে, যখন চূড়ান্তভাবে জীবন সমাপ্ত করতে চাইলেন বিষ খেয়ে, তখন তিনি ব্যর্থ হলেন। জন ডান তাঁর আত্মহত্যার ওপর লিখিত বইয়ে ক্লাসিক্যাল সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিদের আত্মহত্যার তালিকা দিয়েছেন কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী যেখানে সংযুক্ত হয়েছে তাঁর রসাত্মক টীকাটিপ্পনী। ডান তাঁর বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে ক্লাসিক্যাল সময়ের বাইশ জন আত্মহতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এছাড়া ইচ্ছাকৃত শহিদ হওয়া, ঐচ্ছিক মৃত্যুবরণ করা মানুষদের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি মাসাদায় ইহুদিদের আত্মহত্যা, ভারতের সহমরণ প্রথা, প্রভুর প্রতি আনুগত্যস্বরূপ গলের মানুষদের আত্মহত্যা ও রোমক গ্লাদিয়েতরদের মৃত্যুবরণ করার কথাও তিনি বলেছেন। মঁতেনও লিখেছেন অনেকের নাম। তাঁর আত্মহত্যাবিষয়ক প্রবন্ধে তিনি যোগ করেন অনেক অংশ। দুজনেই আত্মহত্যাকারীর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাম উল্লেখ করেছেন কম-বেশি একশর মতো।

একটি বিষয় পরিষ্কার যে, রোমক দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মহত্যা কোনো ভয় বা আকস্মিক পরিবর্তনযোগ্য বিষয় নয়, বরং এক প্রযত্নায়িত বিবেচনা; কীভাবে ও কোন পথে এবং কোন নীতির ওপর ভিত্তি করে মানুষ জীবন যাপন করবে তার এক পছন্দের বৈধতা। আবার বলা যায়, এই নৈতিক ভিত্তি ও পছন্দ শুধু পরিকল্পিত আত্মহত্যাকে ত্বরান্বিতই করেনি, বরং তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বারিতও করেছিল। যেমন কোরেলিয়ুস রুফুস-এর উদাহরণ দেওয়া যায়, যিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত লোক এবং যিনি দমিতিয়ানের রাজত্বে পরিকল্পিত আত্মহত্যাকে স্থগিত রাখেন এই বলে যে, একজন অত্যাচারীর অধীনে মৃত্যুবরণ করার তাঁর ইচ্ছে নেই। এই শক্তিশালী সম্রাটের মৃত্যু হলে কোরেলিয়ুস রুফুস স্বাভাবিক চিত্তে মুক্ত মানব হিসেবে অতঃপর আত্মহত্যা করেন।[৫৩] তাঁর এই কৃতকর্ম মনে করিয়ে দেয় যে, মহৎভাবে বাঁচার অর্থ সঠিক সময়ে মহৎভাবে মৃত্যুবরণ করা। সবকিছুই নির্ভর করে যৌক্তিক পছন্দ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির ওপর।

রোমক আইনেও এই স্পৃহাকে পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। প্রতিশোধ, হীনম্মন্যতা, ভয় বা ভীতি নয়, আইন প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দাঁড়ায়। জাস্টিনিয়ানের *ডাইজেস্ট* থেকে জানা যায়, একজন ব্যক্তিগত নাগরিকের আত্মহত্যা শাস্তিযোগ্য ছিল না, যদি তা দুঃখ ও রোগগত অধৈর্যের ফল হিসেবে ঘটত এবং অন্য কোনো যৌক্তিক কারণ-উদ্ভূত হতো: অথবা তা যদি ঘটত কোনো জীবনবিতৃষ্ণা, পাগলামো বা অসম্মানের ভয় থেকে। সুতরাং এ সমস্ত যৌক্তিক আত্মহত্যাকে আইন অনুমতি দিত, কিন্তু যদি তা না হতো যৌক্তিক আত্মহত্যা তাহলে তা ছিল দোষের এই বিবেচনায় যে, যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, সে অন্যকিছুকেও ভালোভাবে রক্ষা করতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, এই আত্মহত্যা অযৌক্তিক বলেই তা অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হতো। রোমক সাম্রাজ্যে দাসদের আত্মহত্যা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতো, কারণ দাসটি তার প্রভুর আর্থিক বিনিয়োগের অংশ ছিল; দাসের আত্মহত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হতো মালিকের স্বার্থ। এক্ষেত্রে কোনো দাস আত্মহত্যা বা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলে, তাকে ক্রয় করার ছয় মাসের মধ্যে, জীবিত বা মৃত যা-ই হোক না কেন, দাসটিকে তার পুরোনো মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ করার নিয়ম ছিল এবং এক্ষেত্রে পূর্বের সম্পাদিত আদান-প্রদান চুক্তি অবৈধ বলে গণ্য হতো।

সৈনিকের ক্ষেত্রেও এ জাতীয় নিয়মনীতি ছিল। একজন লোক রাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলে তাকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এক্ষেত্রে তার আত্মহত্যাকে বিবেচনা করা হতো পলাতক হওয়ার মতো অপরাধ হিসেবে। আলভারেজ বলেছেন, "রোমক আইন যে-দুটি উপমাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছে তা হলো—সৈনিক আর অস্থাবর সম্পত্তি, যা সোক্রাতেস অসাধারণ বাগ্মিতায় ব্যবহার করেছেন।"[৫৪] এর অর্থ হলো, সৈন্যকে বিবেচনা করা হতো অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে যা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া অপরাধীর ক্ষেত্রে আত্মহত্যা আর একটি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতো, কারণ সে তাকে প্রদত্ত দণ্ড বা শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার লক্ষ্যে আত্মহত্যা করেছে বা আত্মহত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছে। আত্মহত্যাকারী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সৈনিকের শাস্তি ছিল তার সমুদয় সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকরণ। এখানে আত্মহত্যাকারীকে বৈধ উত্তরাধিকারীবিহীন হিসেবে ঘোষণা করা হতো। আত্মহত্যায় উদ্‌যোগ গ্রহণকারী জীবিত থাকলে তার আত্মীয়স্বজন তার পক্ষ সমর্থন করতে পারত এবং এক্ষেত্রে যদি দোষী অবশেষে নির্দোষ হিসেবে বিবেচিত হতো তাহলে তার উত্তরাধিকার বহাল থাকত; অন্যথায় সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে চলে যেত। অন্যভাবে দেখলে প্রতীতি হবে যে আত্মহত্যা-সংক্রান্ত রোমক দণ্ডবিধি ছিল পুরোপুরিই অর্থনীতিনির্ভর; সৈনিকের বা দাসের আত্মহত্যার সাথে যুক্ত থাকত আর্থিক ক্ষতি। আত্মহত্যা ধর্ম বা নৈতিকতার দিক থেকে হয়তো দোষের ছিল না, বরং দাসভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় মূলধন বিনিয়োগ বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ক্ষতির বিবেচনায় তা ছিল দোষের।

কিন্তু মৃত্যুবিষয়ক এই নিরপেক্ষ চিন্তা বা উদারতা রোমক জীবনের সর্বত্র ছিল না; ব্যক্তিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে তা প্রতিভাত হলেও গণমৃত্যুগুলো ছিল ভয়ংকর ও হিংস্রতায় পূর্ণ। রোমে রাজকীয় গণমৃত্যু উপভোগ্য ছিল মানুষের কাছে। জন ডান তাঁর বইয়ে অন্যের থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, গ্লাদিয়েতর-প্রদর্শনীগুলোতে প্রতি মাসে অনেক মানুষ মারা যেত। ফ্রেজার বলেছেন, একটি সময়ে আনন্দ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মৃতের উত্তরাধিকারীদের পাঁচ মিনা পর্যন্ত (প্রায় ১২০ পাউন্ড) ক্ষতিপূরণ দেওয়া হতো। বাজার এতই প্রতিযোগিতামূলক ছিল যে, প্রার্থীরা আঘাতের মাধ্যমেই মৃত্যুবরণ করতে চাইত যেন তার উত্তরাধিকারীরা বেশি অর্থ পায়।

কিন্তু রোমের এই হত্যাজঘন্যতা ও মৃত্যুদীর্ণতার মধ্যে মৃত্যুসম্বন্ধে স্টোয়িক আত্মসম্মানবোধই ছিল সর্বশেষ রক্ষাপ্রাচীর। যখন ওইসব প্রশান্ত স্টোয়িক বীরেরা তাদের দিকে তাকাত, তারা দেখত এক অকথ্য, নিষ্ঠুর, কাণ্ডজ্ঞানহীন, নষ্ট এবং স্পষ্টত মূল্যহীন জীবন, যা তারা যুক্তির আদর্শ দিয়ে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকত যেমনটা গোবেচারা খ্রিস্টানেরা স্বর্গ ও ঈশ্বরের শুভত্ব বিষয়ে, পৃথিবীতে তাদের জীবনের কষ্টের কারণে, তাদের বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকতে ছিল অভ্যস্ত। স্টোয়িকবাদ হতাশাবাদী দর্শন, এই দর্শনের অনুসারীরা অর্জন করত এক নির্বিকারত্ব যা ছিল সর্বাবস্থায় স্থিতপ্রাজ্ঞ থাকার শক্তি। আলভারেজ বলেছেন, "বিনা অর্থে নয় যে সেনেকা—যিনি ছিলেন এর সবচেয়ে শক্তিমান ও প্রভাবশালী মুখপাত্র—রোমক সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর সম্রাট নিরোর শিক্ষক ছিলেন।"[৫৫] এই কথায় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন সেই নির্বিকারত্বকে যা সেনেকাকে নিরোর মতো কুখ্যাতের শিক্ষক থাকাকে যৌক্তিক করেছিল। এ সমস্ত কারণেই, সম্ভবত, স্টোয়িকদের প্রশান্ত রূপ আদিখ্রিস্টানদের ধর্মীয় আক্ষেপে সাঙ্গীকৃত হয়েছিল। "বৌদ্ধিক আত্মহত্যা ছিল স্থূল রক্তলোলুপতার এক ধরনের অভিজাত স্বাভাবিক পরিণাম"—বলেছেন আলভারেজ।[৫৬] তিনি আরও বলেছেন, খ্রিস্টত্ব, যা প্রথমে ছড়ায় দরিদ্র ও বঞ্চিতদের মধ্যে, এই রক্তলোলুপতাকে গ্রহণ করল, আত্মহত্যার অভ্যাসের সাথে তাকে মিলিয়ে নিল, এবং তাদের মধ্যে শহিদ-হওয়ার অভীপ্সা সঞ্চারিত করল। রোমকেরা হয়তো খ্রিস্টানদের সিংহের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করল কিন্তু যখন তারা দেখল যে খ্রিস্টানেরা এই মৃত্যুকে গৌরব ও পরিত্রাণ হিসেবে গ্রহণ করছে, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গেল। রোমক সাম্রাজ্যে আদিখ্রিস্টানেরা ছিল অতি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, অনেকে তাদের ইহুদিদের একটি শাখা হিসেবে দেখত। আদিখ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণ অপেক্ষা তাদের নিজস্ব আচরণের কারণে হতো বেশি, কারণ আদিখ্রিস্টানেরা রোমকদের পেগানাচারকে ব্যঙ্গ করত হরহামেশাই। রোমের বিদগ্ধ ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে খ্রিস্টানদের একগুঁয়েমি আচরণ হতবুদ্ধিকর বলে মনে হতো; যখন খ্রিস্টানেরা প্রতিষ্ঠিত পেগান ধর্মের প্রতি সামান্যতম সৌজন্যও প্রকাশ করত না, তখন পেগানদের তা বিহ্বল করত এবং এই বিহ্বলতা অবশেষে ক্রোধে পরিণত হতো। ফলে খ্রিস্টানদের ওপর ঘটত পেগানদের অত্যাচার, আর একে অজুহাত করে হাজার হাজার খ্রিস্টান আত্মপ্ররোচিত হয়ে শহিদ হতে চাইত। আলভারেজ বলেছেন, শহিদ হওয়া যতটা না ছিল খ্রিস্টীয় সৃষ্টি তার চেয়ে বেশি ছিল রোমক অত্যাচারের ফল।[৫৭]

আদিখ্রিস্টানেরা কোনো কোনো রোমক ধর্মীয় উৎসবকে যেমন নিজেদের করে নিয়েছিল, তেমনি মৃত্যু ও আত্মহত্যা-সম্পর্কিত রোমক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিকেও গ্রহণ করেছিল কিছুমাত্রায়। এবং গ্রহণ করতে গিয়ে তারা এদের পরিবর্তিত করেছিল, বিকৃত করেছিল এবং চূড়ান্তভাবে পাল্টেও ফেলেছিল। সব শ্রেণির রোমকদের কাছেই মৃত্যু ছিল অগুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মৃত্যুবরণ করার ধরনটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্যুতে তাদের আপত্তি ছিল না কিন্তু তা যেন হয় সুন্দর, যৌক্তিক ও গৌরবময় মৃত্যু, তার প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা ও আকুলতা ছিল। ফলে তারা নিজ মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করতে চাইত যাতে তা তাদের জীবনের চূড়ান্ত মূল্য হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, মৃত্যুতে তারা আকৃষ্টও ছিল। সাধারণভাবে মৃত্যু ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার এবং অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপারও; তবে তাকে হতে হতো গরিমাময়। খ্রিস্টানদের (আদি) কাছেও তখন মৃত্যু ছিল অত্যন্ত নিরাসক্ত একটি ব্যাপার, তবে তার পরিপ্রেক্ষিত ছিল পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিত। খ্রিস্টীয় অমরত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ছিল অগুরুত্বপূর্ণ, এবং এক অর্থে মন্দ ও পাপময়: জীবন যতই দীর্ঘ ও পূর্ণ হয়, পাপের প্রলুব্ধতা ও বোঝা ততই বাড়ে। মৃত্যু, অতঃপর, হতে পারে এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আর তা যদি হয় ধর্মীয় কারণে তাহলে তো কথাই নেই। অতএব খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মনে যতই এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, এই পৃথিবী পাপ-প্রলোভনে পূর্ণ এক অশ্রু-উপত্যকা যেখানে তারা অস্তিত্ব নিয়ে বস্তুত অপেক্ষমাণ যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের পরমার্থিক গৌরবে ভাস্বর করে, ততই আদিখ্রিস্টানদের মধ্যে অমোঘভাবে সংঘটিত হতে থাকে আত্মহত্যা। স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা কঠিন ও সময়ক্ষেপণ বলে মনে করে আদিখ্রিস্টানেরা তাড়াতাড়ি আত্মহত্যার দ্বারা অমরলোকে পৌঁছে যেতে তৎপর হয়ে পড়ল। ফলে দেখা গেল, স্টোয়িকেরা যেখানে জীবন অসহ্য হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তাকে ধারণ করত এবং অবশ্যম্ভাবী ও শেষ উপায় হিসেবেই শুধু আত্মহত্যাকে বেছে নিত, সেখানে আদিখ্রিস্টানেরা সর্বতোভাবেই জীবনকে অসহ্য ও অবহনীয় মনে করে বিনা কারণেই তার থেকে মুক্তির উপায় খুঁজত। আলভারেজ প্রশ্ন তুলেছেন, "কেন, তারপর, জীবন পরিত্রাণহীন, যখন ছুরির আঘাতে পৃথিবী ছেড়ে যাওয়াই একমাত্র স্বর্গসুখ?"[৫৮] তিনি আরও বলেছেন যে, "খ্রিস্টীয় শিক্ষাই ছিল প্রথমত আত্মহত্যার জন্য এক শক্তিশালী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উদ্দীপ্ততা।"[৫৯] চার্চই প্ররোচিত করত ধর্মের স্বার্থে ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে শহিদ হওয়ার জন্য, ব্যক্তি প্ররোচিত হতো জীবনোৎসর্গে, যা ছিল মূলত এক ধর্মীয় অভিলষিত মৃত্যু।

আদিযাজকেরা, খ্রিস্টানত্বের জন্য আত্মহত্যাকে অনুমোদন করতেন মহার্ঘভাবে। আত্মহত্যাকারীকে শহিদ হিসেবে ভূষিত করে নানাভাবে তাকে গৌরবান্বিত করতেন যার মধ্যে ছিল চার্চ-ক্যালেন্ডারে এ জাতীয় শহিদদের নাম অন্তর্ভুক্তি ও বার্ষিকী উদ্‌যাপন, তাদের মৃত্যুবরণের তারিখ দাপ্তরিকভাবে রেকর্ডকরণ, এবং তাদের স্মৃতিচিহ্নের তর্পণ। আদি যাজকদের মধ্যে সবচেয়ে রক্তপিপাসু হিসেবে বিবেচিত তেরতুলিয়ান ঘোষণা দেন যে, যে নগরে খ্রিস্টীয় রক্ত ঝরেছে, তা কখনোই শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। আলভারেজ বলেছেন, শহিদেরা স্বর্গ থেকে অর্ধ-নিমীলিত চোখে তাকাবেন আর দেখে সুখবোধ করবেন যে তাদের শত্রুরা নরকে অনন্তকালের জন্য কষ্ট ভোগ করছে।[৬০] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শহিদ হওয়া ছিল আদিখ্রিস্টানদের কাছে স্বর্গে যাওয়ার গ্যারান্টি যেমন ভাইকিংস ও ইগলুলিক এস্কিমোদের কাছে হিংস্রভাবে মৃত্যুবরণ করা ছিল ভালহাল্লায় প্রবেশের পূর্বশর্ত। পার্থক্য শুধু শহিদেরা যোদ্ধা হিসেবে নয়, ভুক্তভোগী হিসেবে মৃত্যুবরণ করত। কারণ যার জন্য তারা যুদ্ধ করত তা এ জগতের জন্য নয়; এই জয় ছিল চড়ামূল্যের। এ সময়, আদিখ্রিস্টানদের মধ্যে শহিদ হওয়ার এক ধর্মান্ধতা জেগে উঠেছিল যা প্রায় পাগলামোর পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এই পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে ডান বলেছেন, "ওই সময়ে এই ধরনের মৃত্যুবরণ করার এক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা রোগের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল...সেই যুগের শহিদ হওয়ার বাসনার বাস্তবায়নের জন্য অনেকে মুখিয়ে থাকত এমনভাবে যে তারা খিস্টান হতো কেবল এজন্যই যে তাদের পুড়িয়ে মারা হবে এবং শিশুরাও জল্লাদদের এমনভাবে বিরক্তি উৎপাদন করত যেন তাদেরও আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।"[৬১] এই মত্ততা ডোনাটিস্টদের[৬২] মধ্যে এমন উত্তুঙ্গ পর্যায়ে উঠেছিল এবং তাদের শহিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এমনই অনিবারণীয় ও চরম হয়ে উঠেছিল যে, একসময় চার্চ তা দমনের উদ্দেশ্যে তাদের ধর্ম-অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। এডওয়ার্ড গিবন-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *দা হিস্ট্রি অব দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান আম্পায়ার*-এ এর এক অদ্ভুত এবং রোমহর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়। গিবন ডোনাটিস্টদের এই আত্মত্যাগকে বলেছেন, "ধর্মীয় আত্মহত্যা"। কারণ তারা মরছে খ্রিস্টীয়বাদের উন্মাদনার কারণে।[৬৩] তিনি তাদের এই আত্মহত্যাকে সমস্ত দেশ ও কালের বিবেচনায় অতুলনীয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং আরও বলেছেন যে, এ সমস্ত খ্রিস্টীয়-অনুরাগী গোঁড়ারা জীবনকে ভাবত ভয়ংকর আর শহিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করত মৌলিকভাবে, বা এর দ্বারা তারা ছিল আচ্ছন্ন ও গর্বিত এবং এতেই পারলৌকিক সুখ নিহিত আছে বলে বিশ্বাস করত। কখনও কখনও তারা কদর্য ও অশোভনীয়ভাবে পেগান ধর্মীয় উৎসব ও মন্দিরগুলোকে অবমাননা করত এবং দেবতাদের অপমান করার কারণে প্রতিশোধ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে পেগানদের উত্তেজিত করত। তারা অনেক সময় বিচারালয়েও হানা দিত এবং আতঙ্কিত বিচারকগণকে তাদের ওপর শাস্তি আরোপের জন্য বাধ্য করত। তারা পথচারীদেরও আহ্বান করত তাদের আঘাত করার জন্য যাতে তারা শহিদ হতে পারে এবং এজন্য তাদের পুরস্কার দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিত। অন্য কোনো পথ না

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থাকলে তারা তাদের বন্ধু ও ধর্মভ্রাতাদের সামনে ঘোষিত দিনক্ষণে উঁচু পাথর থেকে পড়ে আত্মহত্যা করত। এবং এ ধরনের অনেক উঁচু পাথরের চূড়া দেখা গেছে যা এই ধর্মীয় আত্মহত্যার চিহ্ন হিসেবে গৌরবান্বিত হয়ে আছে—বলেছেন গিবন।[৬৪]

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত ডোনাটিস্টদের উত্থান ও আত্মবিসর্জনের দৃষ্টান্ত সমসাময়িকদের প্রভাবিত করেছিল। সন্ত অগাস্তিন এ সম্পর্কে বলেছেন, শহিদ হওয়ার তাড়নায় ভক্তিসহকারে নিজেদের হত্যা করা ছিল তাদের দৈনন্দিন-ক্রীড়া।"[৬৫] কিন্তু তিনি খ্রিস্টীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত আত্মত্যাগের যৌক্তিকতা নিয়ে উভয় সংকটে পড়েছিলেন, চিন্তা করেছিলেন তার সমাধান করার। ফলে পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আত্মহত্যার বৈধতাকে তিনি চ্যালেঞ্জ জানান এবং এই আত্মহত্যা প্রবণতার কারণেই সাধারণভাবে আত্মহত্যাকে তিনি "এক ঘৃণ্য ও জঘন্য শয়তানি" কর্ম বলে ঘোষণা দেন। খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নেওয়া থেকে ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত মৃত্যু আসার মধ্যবর্তী যে-কোনো পাপ থেকেও আত্মঘাতী পাপ অনেক মারাত্মক বলে তিনি ঘোষণা দেন। তিনি এক্ষেত্রে *ওল্ড টেস্টামেন্ট*-এর দশ আজ্ঞার ষষ্ঠ আজ্ঞা "তোমরা হত্যা করো না" থেকে তাঁর প্রথম যুক্তির অবতারণা করেন এবং বলেন যে, নিজেকে হত্যা করা মানে এই আদেশকে অমান্য করা এবং এক্ষেত্রে সে হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত। অধিকন্তু, কেউ যদি তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্মহত্যা করে, তাহলে, সে রাষ্ট্র ও চার্চের কাজে অনধিকার চর্চা করেছে বলে বিবেচিত হবে। কেউ যদি পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরলমনে আত্মহত্যা করে, তাহলে সে তার নির্দোষ রক্তকে নিজের হাতে নেয় যা তার জীবনের সমস্ত পাপের চেয়েও মন্দ, কারণ তখন সে আর তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করার সুযোগ পায় না। যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে অগাস্তিন সবশেষে, প্লাতোন ও পুথাগোরাসের যুক্তিকে গ্রহণ করে বলেন যে, জীবন হলো ঈশ্বরের উপহার এবং জীবনের কষ্টভোগ যেহেতু ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত, তাই, আমরা নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা একে কমাতে পারি না, বরং ধৈর্য সহকারে বহন করার মধ্যেই এক্ষেত্রে আত্মার মহত্ত্ব নিহিত থাকে। সুতরাং কেউ আত্মহত্যা করার অর্থ হলো, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা। আত্মহত্যার বিরুদ্ধে অগাস্তিন এতদূর গিয়েছিলেন যে, এমনকি ধর্ষণ এড়ানোর জন্য আত্মহত্যা করাকেও তিনি অন্যায় বলেছেন। ধর্ষণকে এড়ানোর জন্য আত্মহত লুক্রেতিয়া সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেও তিনি লুক্রেতিয়ার আত্মহত্যাকেও অনুমোদন করেননি।

এভাবে, অগাস্তিনের কর্তৃত্বময় ঘোষণা এবং আদিখ্রিস্টান ও ডোনাটিস্টদের বাড়াবাড়ি-রকমের শহিদ হওয়ার ফলে চূড়ান্তভাবে আত্মহত্যার বিরুদ্ধে সামাজিক ও ধর্মীয় মতামত প্রতিষ্ঠিত হয়। দেখা যায়, ৫৩৩ সালে কাউন্সিল অব ওরলিন্স কোনো দোষী ব্যক্তি আত্মহত্যা করে বসলে তার যথাযথ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অধিকারকে রহিত করার আদেশ দেয়, এক্ষেত্রে তারা সম্পত্তির উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত রোমক আইনকেও ঠিক অনুসরণ করেনি। রোমক আইনে এইরূপ আত্মহত্যাকারীর সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে মর্মে বলা ছিল। কখনও কখনও কোনো কোনো স্থানে আত্মহত্যাকে হত্যাপরাধ থেকেও নিকৃষ্ট মর্মে বিবেচনা করা হতো। ফলে মৃত্যুর পর সাধারণ অপরাধীদের যেখানে যথাযথভাবে খ্রিস্টীয় প্রথামতে সমাধিস্থ করা হতো সেখানে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মহত্যাকারীদের তা থেকে বঞ্চিত করা ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। ৫৬২ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল অব ব্রাগা[৬৬] মৃতের সামাজিক মর্যাদা যা-ই হোক না কেন, সব ধরনের আত্মহত্যারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল অব তোলেদো[৬৭] আত্মহত্যায় উদ্‌যোগীর ক্ষেত্রেও এই বিধি জারি করে।

এভাবেই এক কঠোর নিষেধাজ্ঞার দেয়াল দাঁড়িয়ে যায়। আত্মহত্যা ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে পরিণত হয় সর্বোচ্চ ঘৃণ্য কাজ হিসেবে। রোমকদের বিকল্প সুন্দর নির্গমনের পথ, আদিখ্রিস্টানদের স্বর্গে প্রবেশের চাবি অবশেষে পরিণত হয় সবচেয়ে মারাত্মক প্রাণঘাতী পাপ হিসেবে। সন্ত মথি যেখানে জুদাস ইস্কারিয়োতের আত্মহত্যাকে কোনোরকম মন্তব্য ছাড়া শুধু বর্ণনা করেন এবং তাঁর এই মন্তব্যহীনতার দ্বারা হয়তো তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এটা হয়তো ছিল জুদাসের অন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সেখানে পরবর্তী ধর্মতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, জুদাস জিশু খ্রিস্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যে অপরাধ বা পাপ করেছে তার চেয়েও ঘৃণার কাজ করেছে আত্মহত্যা করে। সেন্ট ব্রুনো একাদশ শতাব্দীতে আত্মহত্যাকারীকে ঘোষণা করেন, "শয়তানের জন্য শহিদ" বলে, আর এর দুই শতাব্দী পর সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *সুম্মা কন্ট্রা জেন্টাইলস*[৬৮]-এ সমস্ত ব্যাপারটির ইতি টানেন এই বলে যে, আত্মহত্যা, ঈশ্বর যিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে কৃতকর্মজনিত এক প্রাণঘাতী পাপ। তিনি আরও বলেন, এটা ন্যায়বিচার ও বদান্যতার বিরুদ্ধে সংঘটিত পাপ। দেখা যায়, অ্যাকুইনাসও তাঁর যুক্তি ধার করেছেন অখ্রিস্টীয় উৎস থেকে:—প্লাতোনের যুক্তি থেকে অগাস্তিন তাঁর এই যুক্তিটি হাওলাত করেছেন। ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে পাপ, যার দ্বারা তিনি সম্প্রদায়ের প্রতি তার দায়িত্বকে বুঝিয়েছেন, তা-ও আরিস্তোতলকে মনে করিয়ে দেয়, কারণ তিনি বলেছিলেন যে আত্মহত্যা নগরকে দূষিত করে। বদান্যতার বিরুদ্ধে পাপ দ্বারা অ্যাকুইনাস বুঝিয়েছেন প্রবৃত্তগত বদান্যতা, যা প্রতিটি মানুষ তার নিজের ভেতর বহন করে, যার অর্থ হলো আত্ম-সংরক্ষণের প্রবৃত্তি, যা অন্য নীচ প্রাণীদের মতোই মানুষের মধ্যেও সহজাত; এর বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ হলো প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া যা এক আত্মঘাতী পাপ। এই যুক্তি প্রথম ব্যবহৃত হয় হিব্রু জেনারেল জোসেফুস-এর কথায় যা তিনি রোমকদের কাছে পরাজিত তাঁর সৈন্যদের আত্মহত্যা থেকে বিরত করার উদ্দেশে বলেছিলেন। তিনিও এগুলো নিয়েছিলেন প্লাতোনের যুক্তি থেকে।

এভাবেই অখ্রিস্টীয় ভাবধারা ও উৎস থেকে আহৃত যুক্তির প্রাবল্যে অগাস্তিন থেকে অ্যাকুইনাস পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘকাল ধরে আত্মহত্যা বাস করেছে কুসংস্কারের ভেতর, যেখানে তাকে বলা হয়েছে সবচেয়ে মারাত্মক প্রাণঘাতী পাপ। অগাস্তিন তাঁর প্রতিরোধমূলক যুক্তির অবতারণা করে বলেছেন, শহিদ হওয়াকে ভক্তি করার সময় অতিবাহিত, এবং তা চতুর্থ শতাব্দীর চার্চের অবস্থা ও গৌরবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক নয়। অধিকন্তু এটা আত্মার ধারক হিসেবে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাসংক্রান্ত খ্রিস্টীয় শিক্ষার পরিপন্থি, সুতরাং তা নিশ্চিতভাবেই অপরাধ। কেউ যদি নিজেকেই হত্যা করে তবে প্রতিবেশীকে ভালোবাসার খ্রিস্টীয় অনুশাসনের কোনো মূল্যই আর থাকে না।

এভাবেই শহিদ হওয়ার ছদ্মবেশে যা ছিল আদিখ্রিস্টানদের এক বিশুদ্ধ অভিগমন, যার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওপর ধীরে ধীরে উঠেছে খ্রিস্টানতন্ত্রের বিশাল সৌধ, তা-ই নিকৃষ্ট পাপ হিসেবে বিবেচিত হয় সহস্র-বছর ব্যাপী। অগাস্তিনের শিক্ষা ও খ্রিস্টীয় "ক্যানন ল"[৬৯] একই সাথে আত্মহত্যা ও তদোদ্ভূত আদি আতঙ্ককে চাগিয়ে তুলেছিল এবং এর অপসৃতির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল রেনেসাঁর সেই ক্ষণ পর্যন্ত, যখন নিজ জীবন সমাপ্ত করার নৈতিক অধিকার-সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাগুলো আত্মপ্রকাশ করতে থাকে এবং একই সাথে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও নৈতিকতাগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকে মারাত্মকভাবে। ফলে এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিরাজিত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আপত্তি বা বক্তব্য উচ্চারিত হয় প্রথমবারের মতো—আত্মহত্যা অপরিহার্যভাবে নয় পাপ। বলেছিলেন একজন কবি, বিখ্যাত "আধিবিদ্যক কবি" জন ডান (১৫৭২-১৬৩১), যিনি ছিলেন একজন যাজকও। রচনা করেন আত্মহত্যাবিষয়ক অন্যতম আদিগ্রন্থ *বিয়াথানাটস*, যা ১৬৪৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। কিন্তু তারপরও চরম কথাটির জন্য অপেক্ষা করতে হয় আরও অনেক দীর্ঘ সময়। ইত্যবসরে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হতে থাকে। ব্যক্তি থেকে সমাজ, নৈতিকতা থেকে সমস্যা এবং অঘটন থেকে বিষয়মুখী দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হতে থাকে। হেনরি মরসেল্লি, একজন ইতালীয় সাইকোলজিক্যাল মেডিসিন-এর অধ্যাপক এবং দ্যুরকহাইমের বিখ্যাত পূর্বসূরি, যিনি আত্মহত্যা-সমস্যার প্রথম পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ উপস্থাপনে অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব, ১৮৭৯ সালে লেখেন: "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাচীন দর্শন আত্মহত্যাকে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র দিয়েছিল, কিন্তু এখন এর চর্চার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ব্যক্তিত্ববাদ ও স্বাধীন চিন্তার প্রকল্প হিসেবে নয়, বরং জাতিগত শক্তিসমূহের সাথে-সম্পর্কিত সামাজিক প্রপঞ্চ হিসেবে।"[৭০]

ফলে আত্মহত্যা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত দর্শন এবং ব্যক্তির ওপর আরোপিত দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হতে থাকে। ব্যক্তির বা পরিবারের ওপর যে শাস্তি আরোপ করা হতো, তারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে পরিবারের বিড়ম্বনারও অবসান হয়। আত্মহত্যার উদ্‌যোগ গ্রহণকারীও এখন আর শাস্তি পান না, এখন অনেক দেশেই তা কাগজেকলমে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। আত্মহত্যা এখন সামাজিক ও নৈতিক অবস্থান থেকে বিজ্ঞানের যুক্তিশীলতা এবং ব্যাখ্যা-বিবেচনার যৌক্তিক ভিত্তির ওপর নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করতে পেরেছে। পাশ্চাত্যে স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকারে গড়ে উঠেছে নানা সংগঠন। প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে নিজ মৃত্যুর অধিকার। দীর্ঘ ইতিহাস ও পটভূমি থেকে আত্মহত্যা ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে, আত্মপ্রকাশ করেছে বহমান অভিভাব থেকে ভিন্ন বিভাবে—এই সময়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভ্রান্তি, বিবেচনা ও যুক্তিসূত্র

আত্মহত্যা তাই বিবেচিত হতে পারে পরীক্ষানিরীক্ষা
হিসেবে—এক প্রশ্ন যা
একজন প্রকৃতির কাছে রাখে, প্রকৃতিকে বাধ্য
করার চেষ্টা করে উত্তর দিতে। প্রশ্নটি
হলো: মৃত্যু একজন মানুষের অস্তিত্ব
ও তার বস্তু-প্রকৃতির
গভীরে কী পরিবর্তন সৃষ্টি করে? এটা
এক জবরজঙ্গ পরীক্ষানিরীক্ষা, যেহেতু
তা চেতনতার ধ্বংসের সাথে বিজড়িত,
যা প্রশ্ন উত্থাপিত করে আর উত্তরের অপেক্ষায় থাকে।

আর্টুর শোপেনহাওয়ার

যে বোঝাকে সব সময় মাটিতে ফেলে
দিতে ইচ্ছা করে তাকে ক্রমাগত
বয়ে নিয়ে যেতে চাওয়া—এর চেয়ে
মূর্খতা আর কী হতে পারে?

ভল্তেয়ার

আদিযুগ, মধ্যযুগ, আধুনিকযুগ: সামাজিক, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক—এই ধারাবাহিকতায় আত্মহত্যার রূপ ও বিবেচনা এখন অনেক স্থিত ও সংহত। আদিকালে আত্মহত্যাকে সামাজিক বিবেচনায় বিচার করা হতো এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিও সেক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ভূমিকাশীল থাকত। মধ্যযুগে ধর্মীয় বিবেচনা ও অনুশাসন দ্বারা বিষয়টি পুরোপুরিভাবে দেখা হতো এবং তার মাধ্যমেই একে বাতিল করা হতো, আর আধুনিককালে এসব কিছুর ওপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করতে লাগল এবং তা বিবেচিত হতে শুরু করল চিকিৎসাবিজ্ঞানের জায়গা থেকে। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও অন্বেষণে আত্মহত্যাকে বিচারবিশ্লেষণ ও অবলোকনের কাজ শুরু হলো। যদিও এখনও আত্মহত্যা হতে পারেনি সম্পূর্ণভাবে কুসংস্কার ও সন্দেহমুক্ত, তবু একদা যা ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক অপরাধ এবং প্রাণঘাতী পাপ, এক্ষণে তা ব্যক্তিগত কর্ম বা নিদেনপক্ষে পারিবারিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হতে লাগল। এর কারণ হয়তো এই যে, নৈতিক অর্থে দণ্ড ধারণার শিথিলতা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবমোচন

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মহত্যার বিষয়টিকে স্বাভাবিক সমাজেও সহনশীল করতে শুরু করল, যার ফলে আত্মহত্যা শুধু পাপ বা ঘৃণ্য—এই বোধের অবসান কিছুটা হলেও কার্যকর হতে লাগল। কিন্তু আত্মহত্যা কি শ্রদ্ধাশীল হয়েছে? প্রাচীন গ্রিক ও রোমক সভ্যতায় আত্মহত্যাকে মহৎ ও কার্যকর বিবেচনায় উত্তীর্ণ করেছিল মূলত দার্শনিক-সাহিত্যিক-রাষ্ট্রনীতিকেরা, এবং কখনও কখনও সম্রাটেরা তাঁদের জীবনদৃষ্টি ও দর্শনের দ্বারা। কিন্তু স্বাভাবিক সমাজজীবনে একটি ভীতিকর ও অভিঘাতমূলক বিষয় হিসেবে তখনও তা সর্বৈব কার্যকর ছিল, যেমন এখনও অনেকটা আছে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাথে, এ বিষয়ে যে-জিনিসটি আধুনিককালের পার্থক্য রচনা করেছে তা হলো, আধুনিককালে বিষয়টির সাথে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞান: নিদানিক ও মনস্তাত্ত্বিক—উভয় অর্থে। আর এ কারণেই, একই সাথে ভীতিকর ও ট্র্যাজিক হওয়া সত্ত্বেও, আত্মহত্যার বিষয়টিকে শ্রদ্ধার সাথে দেখা হচ্ছে এবং আত্মহত্যাকারীকে দেখা হচ্ছে ট্র্যাজেডির নায়ক হিসেবে। আল আলভারেজ বলেছেন, "যদিও তা মানবীয় অভিঘাতময় এখনও, তবু একই সাথে তা শ্রদ্ধার বিষয়ও হয়ে যাচ্ছে: অর্থাৎ, একটা নিবিড় বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় হয়ে গেছে তা, আর বিজ্ঞান যে-কোনো কিছুকেই শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।"[১]

এই পরিবর্তন সামাজিক শিথিলতা ও মানসিক চেতনার পরিবর্তন, যা মূলত ঘটতে থাকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের দিকে। এর আগে যদি আমরা যাই, তাহলে রেনেসাঁ বা যুক্তিবাদের যুগ বা রোম্যান্টিক যুগমুহূর্তে মৃত্যুসংক্রান্ত অবরুদ্ধ চিন্তার ক্ষয় শুরু হলেও তা যেহেতু বিবেচনা করা হতো সাহিত্যিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, তাই সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিকে প্রতিপন্ন করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, যতদিন না আলো ফেলে দেখা হলো ব্যাপারটিকে বিজ্ঞানের সার্চ লাইট দিয়ে। যে-কোনো বদ্ধমূল ধারণা বা সংস্কার বা ধর্মীয় গোঁড়ামিকে সামগ্রিকভাবে দর্শন ও সাহিত্য দিয়ে মোকাবিলা করা যায় না। দর্শন বা সাহিত্য হয়তো গ্রহণযোগ্যতার একটি অস্পষ্ট বাতাবরণ তৈরি করতে পারে মাত্র। কিন্তু যখনই এ সমস্ত অপ্রতর্ক্য বিষয়গুলোকে যাচাই করা হয় বিজ্ঞান দিয়ে, তখনই এই কুসংস্কারগুলোর দ্রুত অপসারণ শুরু হয়। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যখন বিশ্লেষণী ভূমিকায় আবির্ভূত হয় তখন তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে ইতিহাস ও দর্শন। মূলত এ সংক্রান্ত পরিবর্তনটি দেখা দেয় ১৮৯৭ সালে, বিখ্যাত ধ্রুপদি ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ *আত্মহত্যা: সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা* প্রকাশের মাধ্যমে। গ্রন্থের উপশিরোনামটিই (আ স্টাডি ইন সোসিওলজি) ছিল মূর্তিভাঙা ও অভিনব, কারণ তা বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সাঙ্গীকৃত করেছিল। বইটিতে ছিল না কোনো ধর্মীয়-নৈতিকতার বিবেচনার বিষয়, বরং সামাজিক শর্তগুলো আলোচনায় উঠে এসেছিল যা আত্মহত্যার মতো নিষিদ্ধ, হতাশ ও দুর্বোধ্য বিষয়টিকে একটি সামাজিক যৌক্তিক কাঠামোর ওপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করল। এক্ষেত্রে তুলনা করা যায় আত্মহত্যার ওপর লিখিত প্রথম ইংরেজি স্মরণীয় গ্রন্থ *বিয়াথানাটস*কে, যা প্রকাশিত হয়েছিল দ্যুরকহাইমের বইটির প্রকাশের অনেক আগে—১৬৪৭ সালে; বইটির লেখক জন ডান নিজেও চাননি বইটি প্রকাশিত হোক, কারণ, তিনি চাননি চার্চ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ও সমাজকে মোকাবিলা করতে; ফলে বইটি তাঁর মৃত্যুর ষোলো বছর পর তাঁর পুত্র কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৭০০ সালে বইটি আবার ছাপা হয়। বইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা ছিল একজন বিখ্যাত কবি ও যাজক কর্তৃক অনালোচিত বিষয় নিয়ে রচিত মৌলিক গ্রন্থ যা আত্মহত্যা-সম্পর্কিত প্রথাগত খ্রিস্টীয় ধারণার বিপরীতে লেখা প্রথম ইংরেজি পুস্তক। বইটির ভিত্তি ছিল ইতিহাস ও ধর্ম। যদি বিজ্ঞান ও সমাজনিরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে বইটি লেখা হতো তাহলে হয়তো তা প্রস্তুত থাকত মোকাবিলার। ডান ধর্মকেই ভিত্তি করেছিলেন আত্মহত্যার সপক্ষে যুক্তি প্রয়োগের জন্য। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, বাইবেলে আত্মহত্যাকে খারাপ বলা হয়নি। গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য এটাই দস্তুর ছিল। দ্যুরকহাইমের কাজটি আত্মহত্যাসংক্রান্ত অমনস্কতা-অনিশ্চয়তা-দ্ব্যর্থকতা থেকে যথাযথ কারণ ও ফলাফল নির্ণয়ে প্রথমবারের মতো সার্থক হয়। দ্যুরকহাইম ভাবালুতা ও দোলাচলতা থেকে মুক্ত হয়ে এর কারণ নির্ণয়ে ব্রতী হন; ব্যবহার করেন ইতিহাস, উপাত্ত, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং অর্গলমুক্ত করেন এই ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ গবেষণাকে। তারপর আর সংকোচ নেই, নেই দ্বিধা বা অনড়তা। শুরু হয় বহুবিধ গবেষণা, ১৯২০-এর পর একাধিক্রমে এক্ষেত্রে দৃষ্ট চিকিৎসাগত পরীক্ষানিরীক্ষা, পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ, মনোচিকিৎসাগত ও মনোবৈজ্ঞানিক প্রামাণিকতা, সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মীদের গবেষণা, এমনকি বিমা কোম্পানিরও সক্রিয় দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ভালোভাবে। ফলে রচিত হতে থাকে প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র, গ্রন্থ, এমনকি কবিতাও। আবির্ভূত হয় নতুন ক্ষেত্র বা বিভাগ যার নাম "সুইসাইডোলজি" বা আত্মহত্যাবিদ্যা। বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালে স্থাপিত হয় সুইসাইডোলজিক্যাল ইউনিট। বাল্টিমোরের জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত মেডিক্যাল স্কুলে খোলা হয় এ সংক্রান্ত ইউনিট; যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কল্যাণ বিভাগ প্রকাশ করতে থাকে একটি ম্যাগাজিন যার নাম *বুলেটিন অব সুইসাইডোলজি*। শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে তুলে ধরা নয়, আত্মহত্যাকে নিবারণ ও প্রতিরোধের জন্য আমেরিকায় ও ইউরোপে গড়ে ওঠে বিভিন্ন প্রতিরোধ সংস্থা, প্রণয়ন করা হয় বিভিন্ন কর্মসূচি। ১৯৫৩ সালে লন্ডনে স্থাপিত হয় এ সংক্রান্ত প্রথম জরুরি কেন্দ্র। আমেরিকায় লজ এনজেলেস-ভিত্তিক অনেক আত্মহত্যা-প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। প্রতি বছর সেখানে আত্মহত্যাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যাতে আলোচিত হয় আত্মহত্যার বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব অবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯৫০-এর দিকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদগণ কর্তৃক প্রথম আত্মহত্যা প্রতিরোধ-সংক্রান্ত টেলিফোন হটলাইন স্থাপিত হয়। পরামর্শক ও প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকেরা সাধারণত এই হটলাইনগুলো সার্বক্ষণিক তদারকি ও পরিচালনা করে এবং এ ধরনের কোনো আবেদন বা ডাক পেলে পেশাগত সহায়তা প্রদানের জন্য ফোনকারীকে বলে। যদিও হটলাইন পরিষেবা খুবই কার্যকর মর্মে প্রতিভাত হয়েছে, তবু তা একান্তভাবেই প্রযোজ্য হয় যারা ফোন করে সাহায্য চায় তাদের ক্ষেত্রে। দেখা গেছে, পুরুষ অপেক্ষা নারীরা বেশি ফোন করে থাকে, যারা সাধারণত আত্মহত্যার অধিক ঝুঁকিতে থাকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অধিক-সংখ্যক স্কুল-কলেজেও আত্মহত্যা প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, যার আওতায় ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা প্রদান করা হয় যাতে করে আত্মহত্যা-ঝুঁকিতে থাকা ছাত্রদের চিহ্নিত ও সতর্ক করতে সক্ষম হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এসব কিছু সম্ভাব্য আত্মহত্যাকে কতটুকু বারিত করতে পারে তা স্পষ্ট নয়।

আত্মহত্যা অনেক সময় অতি আত্মচেতনার ওপরও নির্ভর করে। এক্ষেত্রে আত্মঘাতীর মানসলোক সম্পর্কে জানা যদিও অসম্ভব, তবু আত্মহত্যার উদ্দেশ্যকে, অনেক-সময়ই, আলাদা করা যায় না আত্মঘাতীর মনের অবস্থা থেকে। অনেক ভ্রান্ত ধারণাই আত্মহত্যার বিষয়ে প্রচলিত যদিও ইত্যবসরে এদের অনেকগুলোর অবসান হয়ে গেছে। ধারণা করা হয় যে, ভাবগত সূত্রে আত্মহত্যার বিষয়টি প্রেমের সাথে জড়িত। অনেকে আত্মপ্রেমের সাথে একে মিলিয়ে চিন্তা করেছেন। তবে এক্ষেত্রে প্রধান অনুসিদ্ধান্তটি হলো, তরুণ বয়সের ভালোবাসার সাথে আত্মহত্যা অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত। এই প্রতিকল্পের আদর্শ হলো রোমিও ও জুলিয়েট, এবং তাদের আদর্শ ও আবেগময় প্রেম যার পরিণতি ছিল মৃত্যু এবং আত্মহত্যার মাধ্যমেই তাদের মৃত্যু হয়েছিল। পরিসংখ্যান ও গবেষণায় দেখা গেছে, রোমিও-জুলিয়েটের আত্মঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা কিং লিয়ারের এরূপ সম্ভাবনা থেকে অনেক কম ছিল। রোমিও জুলিয়েটের প্রেম অল্প বয়সের আবেগের ফসল; আত্মহত্যার জন্য যে কারণকে দেখানো হয়েছে তা-ও অগভীর ও রোম্যান্টিক গোছের। আত্মঘাতী হওয়ার পেছনে কাজ করেনি কোনো মৃত্যু-আচ্ছন্নতা, তা যেন এক হঠাৎ ভাবাবেগের ফল। এ জাতীয় অল্পবয়সি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে বাধার পরিণতি হয় শুধু আত্মহত্যার হুমকি বা সাময়িক উদ্‌যোগ গ্রহণ; তা হয়ে পড়ে না চরমভাবে আত্মঘাতী। সাধারণত তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আসে আত্মহত্যাস্পৃহা, তা হয় না চরম সিদ্ধান্তের ফল। ফলে তা প্রায়শই ব্যর্থ হয় এবং এই স্পৃহাও স্থায়ী হয় না। কিন্তু রোমিও ও জুলিয়েটের ক্ষেত্রে তা সার্থক হয়। অন্যদিকে, কিং লিয়ারের স্বাভাবিক মৃত্যু হয় কিন্তু তাঁর আত্মহত্যার উদ্‌যোগ সার্থক হয়নি, যদিও আত্মহত্যার জন্য তাঁর অবস্থা ছিল অধিক অনুকূল। সুতরাং মনে করা যায়, যুবকেরা বেশি আত্মহত্যা উদ্‌যোগী, অন্যদিকে সফলতায় বয়স্করাই সার্থক। সাধারণত বয়স্কদের ক্ষেত্রে এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে ৫৫-৬৫ বছর বয়সের মধ্যে আর যুবকদের মধ্যে উদ্‌যোগের সর্বোচ্চ হার দেখা যায় ২৫-৪৪ বছর বয়সের মধ্যে। বয়স্করাই অধিক সার্থক আত্মহত্যায়, কারণ তারা অধিক জ্ঞানী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারঙ্গম আর যুবকেরা হঠাৎ আবেগের বশে আত্মহত্যার হুমকি বেশি দিয়ে থাকে, বলেছেন আলভারেজ।[২] কিন্তু তিনি অন্য আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের কথা বলেছেন। তিনি অধ্যাপক আরউইন স্টেনগেলের কথা ধরে বলেছেন যে, আত্মহত্যার উদ্‌যোগের ক্ষেত্রে থাকে সাহায্যের ক্রন্দন, ফলে যুবকেরা, নিজ আত্মধ্বংসের ক্ষেত্রেও থেকে যায় আশাবাদী। যদিও বয়স্কদের তুলনায় তারা বেশি ভেদ্য থাকে তবু তারা বিশ্বাস করে, যে-কোনো কিছু বা কেউ অবশেষে আবির্ভূত হবে উদ্ধারে। প্লট হিসেবে *রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট* একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনভিপ্রেত কমেডি, যেমনটি *দ্য উইনটারস টেল* অনভিপ্রেত ও পুনরুদ্ধারিত ট্র্যাজেডি। লিয়ারের মতো একজন বন্ধুহীন বা পরিবারহীন বা কর্মহীন এবং সম্ভবত দুরারোগ্য রোগে ভোগা বৃদ্ধ রোমিও ও জুলিয়েটের মতো তীব্র আবেগ এবং মোহ থেকে মুক্ত। সুতরাং, প্রকৃত ভ্রান্তি হলো, বলেছেন আলভারেজ, বৃদ্ধ বয়সের অবিচলিত ভাব, বিজ্ঞান যা স্বাভাবিকভাবে অনুমোদন করে না।[৩]

অন্য একটি জনপ্রিয় ভুল ধারণাকেও রোমিও ও জুলিয়েট মূর্ত করে, তা হলো আত্মঘাতী মহৎ সংরাগ। প্রেমের জন্য যারা মারা যায় তারা সাধারণত ভ্রান্তি আর দুর্ভাগ্যের শিকার হয়। রোমিও ও জুলিয়েট আত্মহত্যা করে একে অপরের অনুপস্থিতিকে সহ্য করতে না পেরে; জুলিয়েট রোমিওর সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা থেকে আত্মহত্যা করে। কারণ মরলেই তার সাথে মিলন সম্ভব। তাদের সমস্যা তাদের যত না নিজের, তার চেয়ে বেশি অন্যের সমস্যা, এক সরল আবেগায়িত সমস্যা।

আর একটি জনপ্রিয় ভ্রান্তি হলো, আত্মহত্যা খারাপ আবহাওয়ায় বেশি সংঘটিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা একটি ফরাসি উপন্যাস শুরু হয় এভাবে: "নভেম্বরের বিষণ্ন মাসে, যখন ইংল্যান্ডের মানুষেরা তাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ও জলে ডুবিয়ে...।[৪] বিস্তৃত উদ্ধৃতিতে না গিয়েও অনুমান করা যায়, এখানে কাজ করেছে এই ধারণা যে, আত্মহত্যা অনেকটা শীতকালের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রচলিত কুসংস্কার-ভীতি এই যে, আত্মহত্যা এক অন্ধকারময় কাজ এবং শীতকালে আবহাওয়ার আত্মা আকাশে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হলো, বিষণ্ন নভেম্বর মাসে আত্মহত্যা-হার সারা বছরের তুলনায় কম থাকে।

অনেকে মনে করেন, আত্মহত্যার অনুবর্তনের রূপটি এরকম: শরতে এই হার কমতে শুরু করে, মধ্য-শীতে সর্বনিম্ন হারে যায়, তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। গ্রীষ্মের শুরুতে, মে ও জুন মাসে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে, জুলাইতে আবার একটু কমে যায়।[৫] কিন্তু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আরউইন স্টেনগেল এ ধরনের তথ্যে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। বরং তিনি তাঁর *সুইসাইড অ্যান্ড অ্যাটেম্‌টেড সুইসাইড* গ্রন্থে এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে যে, ছন্দোময় জীবগত পরিবর্তনগুলো প্রাণীদের জীবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, যদিও তা মানুষের মধ্যে একটু কমই পরিলক্ষিত।[৬] আলভারেজ এ সম্পর্কে বলেছেন ভিন্ন কথা:

> আমার কাছে বরং বিপরীতটাই বেশি সত্য বলে মনে হয়েছে: একজনের জীবন শেষ-করার তাড়না বসন্তকালেই বৃদ্ধি পায় এজন্য নয় যে কোনো রহস্যময় জৈবিক পরিবর্তন আসে বরং এজন্য যে এগুলো তখন অনুপস্থিত থাকে। আত্মঘাতী বিষণ্নতার ব্যাপারটা জলবায়ু, শৈত্য, জমাট অনড়াবস্থার সাথে বিজড়িত। প্রকৃতি মনোরম ও নরম হয়ে উঠলে ব্যক্তির মনের গভীর ও অভ্যন্তরীণ শৈত্য দেখা দিতে পারে এবং বহির্জগতের সাথে অন্তর্জগতের ব্যবধান বেড়ে যেতে পারে, যা প্রকারান্তরে... অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে। ফলে আত্মহত্যা এক অস্বাভাবিক অবস্থার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে।[৭]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মহত্যাকে জাতিক প্রবণতার বিষয় হিসেবে দেখাও জনপ্রিয় ভ্রান্তি। কোনো জাতির মধ্যে এই কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিসংখ্যান-উপাত্ত দ্বারা সমর্থনীয় কি না তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। জাপানে প্রতি বছর ঘটে প্রায় ৩৫ হাজার আত্মহত্যা যা একটি স্থিতিশীল উপাত্ত। আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ও চিকিৎসাগত উদ্‌যোগগুলোতেও এর হেরফের হয়নি। ফলে মনে করা স্বাভাবিক যে আত্মহত্যাপ্রবণতা জাপানিদের যৌথ অবচেতনের একটি বিশেষ দিক যদিও আত্মহত্যাবিজ্ঞান এই অনুমিতিকে স্বীকার করে না। দুশ বছর আগে আত্মহত্যাকে "ইংরেজ অসুস্থতা" হিসেবে গণ্য করা হতো ইউরোপে। মনে করা হতো যে ইংরেজরা আত্মহত্যাপ্রবণ জাতি। ফরাসি ভাষায় "সুইসাইড" শব্দটি ঢুকেছে ইংরেজি শব্দ থেকে। ফরাসিরা ইংরেজদের আত্মহত্যাপ্রবণ জাতি হিসেবে বিবেচনা করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর এক ফরাসি প্রাবন্ধিক ইংরেজদের সম্বন্ধে লিখেছেন এই কথা। বিখ্যাত মঁতেসকিও তাঁর *দ্য স্পিরিট অব দি ল-স*-এ লিখেছেন:

> "আমরা দেখি না যে রোমানেরা বিনা কারণে নিজেদের হত্যা করেছে; কিন্তু ইংরেজরা প্রায়শই কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই নিজেদের ধ্বংস করে বসে: তারা সুখের চরমাবস্থায় প্রায়শই নিজেদের ধ্বংস করে। রোমানদের এই কার্যের কারণ হলো এ ব্যাপারে তাদের শিক্ষার প্রভাব: এটা তাদের নীতি ও প্রথার সাথে যুক্ত ছিল; ইংরেজদের মধ্যে এর কারণ হলো তাদের বদমেজাজের প্রতিক্রিয়া।"[৮]

জাতিগত প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে আত্মহত্যাকে বিবেচনা করা এক হাস্যকর ব্যাপার কিন্তু এগুলো ভিন্নভাবে প্রত্যয়ী-ভ্রান্তির সৃষ্টি করে, জনমানসের অব্যাখ্যাত জায়গায় তা স্থান করে নেয়। ফরাসিদের চোখে যেমন ইংরেজ, তেমনি আমেরিকানদের চোখে সুইডিশেরা। সুইডেনে বর্তমান আত্মহত্যা-হার ১৯১০ সালের হারের প্রায় একই রকম, যখন এ সংক্রান্ত সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলো প্রবর্তিতই হয়নি। ইংরেজদের মতোই সুইডিশেরাও এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক কুসংস্কারে আক্রান্ত। তাদের আবহাওয়ার রহস্যময়তার মতোই তাদের চিন্তা করা হয় বিষণ্ন, অনমনীয় ও অননুমেয় রূপে। একই আবহাওয়াগ্রস্ত নরওয়েজীয়দের মধ্যে এই হার কম। মধ্য ইউরোপের হাঙ্গেরি এক্ষেত্রে প্রথম; অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ। কিন্তু পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে প্রতিভাত করে না। স্টেনগেল বলেছেন, "এটা স্পষ্ট যে অতি শিল্প-সমৃদ্ধ উন্নত দেশগুলোতে তুলনামূলকভাবে উচ্চ-আত্মহত্যা-হারের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।"[৯] অতএব এসব আলোচনা থেকে বলা যায়, দাপ্তরিক পরিসংখ্যান প্রকৃত অবস্থার একটি ক্ষুদ্র অংশকে তুলে ধরতে পারে বড়োজোর, সামগ্রিক ও বাস্তব চিত্রকে কখনোই আলোকিত করতে পারে না। এক্ষেত্রে চিহ্নিতকরণের সমস্যাও একটি বিরাট সমস্যা: একজন গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারা গেল, একজন অতিরিক্ত মদ্যপানে মারা গেল, একজন বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে মারা গেল—কিন্তু প্রশ্ন হলো, এগুলোকে আত্মহত্যা থেকে বাদ দিয়ে দেখা অনেক সময় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, আবার এগুলো যে প্রকৃতই আত্মহত্যা তাতেও নিশ্চিত হওয়া দুঃসাধ্য। ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মহত্যার প্রকৃতি ও ঘটনা থেকে যায় রহস্যময়।

আত্মহত্যা-সংক্রান্ত জনপ্রিয় ধারণা ও বিশ্বাসগুলোও একাধারে হাস্যকর। ১৯৪০ সালে একজন ভিক্টোরীয় চিকিৎসক আত্মহত্যায় উদ্যত এক রোগী সম্পর্কে লেখেন:

> অনেক প্রতিকার প্রদানের পরও যখন কোনো উপকার হলো না, তখন প্রত্যহ সকালে ঠান্ডা জলে স্নান করার জন্য রোগীকে পরামর্শ দেওয়া হলো। দশ দিন পর দেখা গেল, আত্মঘাতের ইচ্ছা একেবারেই অন্তর্হিত হলো এবং তা আর কখনোই দেখা দিল না। সময়মতো প্রদত্ত বিশোধন আত্ম-ধ্বংসের ইচ্ছাকে দূর করে দিল।[১০]

প্রচলিত এই ধারণাগুলো মিথ্যা, আত্মঘাতী মানসিকতা এভাবে দূরীভূত হয় তার কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই। চিকিৎসা বা এ জাতীয় ব্যবস্থাপনা আত্মহত্যার সুপ্ত বা কার্যকরী ইচ্ছাকে প্রশমিত করলেও তা ফিরে আসতে পারে। দ্যুরকহাইম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে দেখিয়েছেন, এই স্পৃহা সাময়িক অবদমিত হলেও পুনরায় আবির্ভূত হতে পারে।[১১] স্টেনগেল অনুমান করেন যে, শতকরা ৭৫ ভাগ সার্থক আত্মহত্যা বা সম্ভাব্য আত্মহত্যার ক্ষেত্রেই ব্যক্তি অভিপ্রায় সম্পর্কে আগে থেকেই পরিষ্কার সতর্কতা জানিয়ে রাখে এবং এই সতর্কতা উপেক্ষিত হলেই চূড়ান্ত ঘটনাটি ঘটে।[১২] উপেক্ষা ও তীব্র হতাশার চরম পর্যায়ে ব্যক্তি তার কঠোর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।
প্রচলিত ভ্রান্তি ও কুসংস্কারগুলোর অবসানের মাধ্যমে আত্মহত্যা পেয়ে যায় গবেষণা ও মনোবিশ্লেষণিক ভিত্তিভূমি। আত্মহত্যা বিষয়ে অনেক হেত্বাভাস বা ভ্রান্ত ধারণা বেশ আকর্ষণীয় বিষয়, যদিও এগুলো তথ্য, উপাত্ত, পর্যবেক্ষণে ভুল হিসেবে বিবেচিত। তা একটি উচ্চাবচ বিষয়ও, কারণ জনরটনা ও জনবিশ্বাস অনেক সময় একে একটি প্রতীতিতে পরিণত করে যা এক বদ্ধ কুসংস্কারের রূপ নিতে পারে। তবে এর সাথে জড়িত আছে এক ভাবালুতা, যাকে বলাও যায় এক রোমান্টিক কল্পনা।

বর্ণিত ভ্রান্তধারণার অন্ধ্রেরন্ধ্রে রয়েছে মানুষের বদ্ধ বিশ্বাস ও সংস্কার, তবে সবচেয়ে আধুনিক ও গুরুত্বপূর্ণ হেত্বাভাস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এই ধারণাটি যে, সভ্যতার উত্তরোত্তর বিকাশের সাথে সাথে আত্মহত্যার হারও বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সভ্যতা ও আত্মহত্যার মধ্যে উচ্চমাত্রার ধনাত্মক সহ-সংস্রব রয়েছে। মোটা দাগে বললে বলতে হয়, বর্তমান সভ্যতায় বেশি আত্মহত্যা সংঘটিত হচ্ছে। বিষয় বা অনুসিদ্ধান্তটিকে মারাত্মকভাবে মোকাবিলা করেন জিলবোর্গ। গ্রেগরি জিলবোর্গ বলেন, আত্মহত্যা সত্যিকারঅর্থে "মানব জাতির মতোই প্রাচীন, এটা সম্ভবত নরহত্যার মতোই পুরোনো আর প্রায় স্বাভাবিক মৃত্যুর মতোই শাশ্বত। গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মান যত নীচু তত গভীরভাবেই তার তাড়না দেখা দেয়।... আজকের মানুষ আত্মহত্যার বিষয়ে যতটা ভাবিত, তার পূর্বপুরুষদের সাথে তুলনায় বস্তুত তা কম, কেননা পূর্বপুরুষেরা আত্মহত্যাগত আদর্শ, পুরাণবোধ, এবং এর এক অনতিক্রমণীয় কৌশলকে ভালোভাবেই অনুধারণ করত।"[১৩] জিলবোর্গ বলেছেন, "সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে আত্মহত্যার হার বৃদ্ধির ধারণাটি একটি ভ্রান্ত ধারণা, হয়তো কোনো অজানা পদ্ধতিতে সভ্যতা আত্মহত্যা-প্রবণতাকে আমাদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সঞ্চারিত করে।" স্টাইনমেট্জ-এর উক্তিও জিলবোর্গের ধারণাকে শক্তিশালী করে। আদিম মানুষের ওপর পরিচালিত গবেষণায় স্টাইনমেট্জ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, "সংগৃহীত উপাত্ত থেকে সম্ভাব্য প্রতীয়মান হয় যে সভ্য মানুষ অপেক্ষা আদিম মানুষের মধ্যে আত্মহত্যা-প্রবণতা অধিকতর পরিলক্ষিত।"[১৪] তবে এসবই ধ্রুব সত্য নয়, কারণ আত্মহত্যার পরিসংখ্যান সর্বত সঠিক হয় না। জিলবোর্গ বলেছেন, আত্মহত্যা পরিসংখ্যানগত মূল্যায়নের বিষয় হতে পারে না, যেহেতু অনেক আত্মহত্যাই থেকে যায় অতথ্যভুক্ত। সুতরাং পরিসংখ্যান বা ডেমোগ্রাফিতে নয়, আত্মহত্যার ইতিহাস লুকিয়ে থাকে সংস্কৃতি, দর্শন, পুরাণ ও জন-ইতিহাসের গোপন অলিখিত দস্তাবেজে।

ভ্রান্ত ধারণাগুলোর অবমোচন ঘটতে থাকে। আত্মহত্যাকে ঘিরে যে নৈতিক ঘৃণার বাতাবরণ বিরাজমান ছিল, এমিল দ্যুরকহাইম তা দূরীকরণে প্রবল ভূমিকা রাখলেন। সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে অকথনীয় আত্মহত্যার বৈজ্ঞানিক শ্রেণীকরণে তিনি ব্রতী হলেন, এবং দেখালেন যে, আত্মহত্যা তিন ধরনের, এবং প্রত্যেক আত্মহত্যাই যে-কোনো একটিতে পড়ে। এই তিন প্রকার শ্রেণিবিন্যাস হলো: ইগোইস্টিক, অলট্র্যোইস্টিক ও অ্যানোমিক এবং এর যে-কোনোটিই সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিস্ব ও সামাজিক অবস্থার উপজাত। ইগোইস্টিক বা অহংবাদী আত্মহত্যা তখনই ঘটে যখন ব্যক্তি আত্মশ্লাঘাজনিত এককাবস্থায় সমাজের সাথে সঠিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে না, সে তার নিজ স্থির অবস্থায় পতিত থাকে। ব্যক্তি এক্ষেত্রে বহিরস্থিত। এর সাথে জড়িত আছে একান্নবর্তী পরিবার-সংগঠনের ভাঙন এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের অপনোদন। সাধারণত দেখা গেছে, একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যরা যৌথ অবস্থানের নৈকট্যের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তায় কম আক্রান্ত হয়, ফলে আত্ম-ধ্বংসী তাড়নাবোধও কম হয়। কিন্তু বিশ্লিষ্ট ও অণু-পারিবারে ব্যক্তির অবস্থা থাকে অনেকটা উন্মুল। মানসিক অসংগতি ও বিচ্ছিন্নতা, পিতা-মাতার বিচ্ছেদ ইত্যাদি উপাদানগুলো একাকিত্বের ভারে ব্যক্তির আত্মঘাতী তাড়নাকে চাগিয়ে দেয়। নগর জীবনের বিচ্ছিন্নতা আর আধুনিক ব্যক্তিক বিষাদ এক্ষেত্রে মারাত্মক মাত্রায় ভূমিকাশীল থাকে, ফলে ঘটে অহংবাদী বা অস্মিতাময় আত্মহত্যা।[১৫] অন্যদিকে, অলট্র্যোইস্টিক সুইসাইড বা পরার্থবাদী আত্মহত্যা অহংবাদী আত্মহত্যার ঠিক বিপরীত। এক্ষেত্রে ব্যক্তি আত্ম বা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার বশে আত্মহত্যা করে না, বরং সমাজ বা গোষ্ঠীর মাঝে নিজের শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত রেখে গোষ্ঠীর লক্ষ্য বা অস্তিত্বকে রক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেয়। প্রাচীন সমাজে এর নজির আকছার পরিলক্ষিত হতো। সমাজ বা দেশ বা অন্যের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করা এই শ্রেণিতে পড়ে। ব্যক্তি এখানে গোষ্ঠীমুখী এবং গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য উৎসর্গপ্রাণ। আলব্যের কাম্যু তাঁর বিখ্যাত *দ্য মিথ অব সিসিফাস*-এর শুরুতে, "অ্যাবসার্ড ও আত্মহত্যা" আলোচনায় বন্ধনী-বাক্যে যা বলেছেন তা এই পরার্থবাদী আত্মহত্যার দর্শনকে অন্য অর্থে প্রতিফলিত করে: "বেঁচে থাকার জন্য যাকে যুক্তি বলা হয় তা মৃত্যুবরণ করার জন্যও এক চমৎকার যুক্তি।"[১৬] অহংবাদী বা পরার্থবাদী—এই উভয়

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধরনের আত্মহত্যার ক্ষেত্রেই সমাজ এক বিবেচিত উপাদান, ব্যক্তির শিকড় সমাজে কতটা প্রোথিত, তার মাত্রার ওপরই এই দুয়ের সারাৎসার নিহিত। একটি সমাজ-বিচ্ছিন্ন, অন্যটি সমাজ-নির্ভর। সমাজনির্ভরতা যত কমে আসে ততই সমাজবিচ্ছিন্নতার মাত্রা বাড়তে থাকে; অতএব তারা বিপরীতভাবে সম্পর্কিত।

অ্যানোমিক[১৭] বা অন্বয়বাদী আত্মহত্যার ক্ষেত্রেও সমাজ-সম্পৃক্ততা রয়েছে, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানে হঠাৎ ও অসংগত পরিবর্তন হয় যার ফলে সে উদ্ভূত নতুন অবস্থার সাথে খাপ খেতে ব্যর্থ হয়। হঠাৎ বিশাল প্রাপ্তি বা চ্যুতি, ব্যাপক ও মারাত্মক লাভ-লোকসান, পারিবারিক বিচ্ছেদ বা হঠাৎ কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ব্যক্তিকে এক নতুন অচেনা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করতে পারে, যার ফলে সে তার পুরোনো অভ্যাস বা পুরোনো প্রয়োজনগুলো নিয়ে আর সন্তুষ্ট না-ও হতে পারে। হঠাৎ করেই এই নতুন সমাজে সে নিজেকে নিক্ষেপিত ভাবতে পারে এবং ভেবে বসতে পারে যে তার এতদিনকার জগৎ ও জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। ফলে নতুন জগতে চূড়ান্ত অভিযোজনে ব্যর্থ হয়ে সে আত্মবিলোপে উদ্‌যোগী হয়ে বসে। এই ভারসাম্যহীনতার ব্যাপারটি বোঝাতে দ্যুরকহাইম বলেছেন:

> কোনো জীবিত সত্তাই সুখী হয় না বা অস্তিত্বশীল থাকে না যদি তার প্রয়োজন আর জোগানের মধ্যে পরিপূর্ণ অনুপাত বজায় না থাকে। অন্য কথায়, যদি তার প্রাপ্যতার থেকে প্রয়োজন বেশি হয় বা অন্য ধরনের কিছু যদি হয়, তাহলে উপাদানগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হতে থাকবে এবং এর ফলাফল হবে বেদনাময়।[১৮]

দ্যুরকহাইম আরও বলেছেন, প্রাণিকুলে, স্বয়ংক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই ভারসাম্য বজায় থাকে। কারণ, মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীরা সম্পূর্ণভাবে বস্তুগত অবস্থাতেই নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না, মানুষের প্রায় সব প্রয়োজনই একই মাত্রায় তার দেহের বা বস্তুগত ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল নয়।[১৯] মানুষ একই সাথে মূর্ত ও অমূর্ত চিন্তায় মশগুল হয়ে উঠতে পারে, যার ফলাফল অনেক সময় বেদনাময় হিসেবে দেখা দেয়। এজন্যই আত্মহত্যা শুধু মানুষই করতে পারে, প্রাণীদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

দ্যুরকহাইম, অতঃপর, অ্যানোমিকে[২০] আধুনিক সমাজের আত্মহত্যার অন্যতম নিয়মিত ও সুনির্দিষ্ট কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[২১] সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, আত্মহত্যার শ্রেণিবিভাজনগুলো নির্ভর করে ব্যক্তি কতটুকু সমাজের সাথে সম্পৃক্ত তাতে নয়, বরং সমাজ কতটুকু তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার ওপর। জীবনে অস্তিত্বের আর কোনো ভিত্তি না থাকার আত্মকেন্দ্রিক ফল হলো অহংবাদী আত্মহত্যা, আর পরার্থবাদী আত্মহত্যার কারণ হলো মানুষের অস্তিত্বের অনন্যসাধারণ ভূমিকা ও করণীয় বিষয়ে অতিমানবধারণা। অ্যানোমিক বা অন্বয়বাদী আত্মহত্যায় উল্লিখিত অস্তিত্ব উঠে আসে মানবীয় কার্যকলাপের অভাব-সংক্রান্ত অবস্থা থেকে, যার পরিণামে আসে ভোগান্তি। দ্যুরকহাইম বলেছেন, অন্বয়বাদী আত্মহত্যা আর অহংবাদী আত্মহত্যার মধ্যে "জ্ঞাতি-বন্ধন" রয়েছে। তাঁর ভাষায়- "ব্যক্তির মধ্যে সমাজের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপ্রচুর উপস্থিতি থেকেই দুটি উৎসারিত হয়। কিন্তু এই অনুপস্থিতির এলাকা দুই ক্ষেত্রে এক নয়। অহংবাদী আত্মহত্যায় প্রকৃতপক্ষে সমন্বিত ক্রিয়াকলাপে অদক্ষতা বা অক্ষমতা থাকে, ফলে পরবর্তী সংগতির ক্ষেত্রে বঞ্চনা দেখা দেয়। অ্যানোমিক আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তির মৌল সংরাগের ওপর সমাজের প্রভাবের ঘাটতি থাকে। তবে এরূপ সম্পর্ক সত্ত্বেও দুটিই স্বাধীন।"[২২] দ্যুরকহাইম বলেছেন, একজন অহংবাদী না হয়েও অন্বয়বাদী অবস্থায় থাকতে পারে আবার বিপরীতটাও হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, "এই দুই প্রকারের আত্মহত্যা একই সামাজিক পরিবেশ থেকে তাদের শক্তি সঞ্চয় করে না; একটির প্রধান ক্ষেত্র হলো বুদ্ধিবাদী বৃত্তিতে—চিন্তার জগতে, অন্যটি শিল্প বা বাণিজ্যিক জগতে।"[২৩] দ্যুরকহাইম এই বিষয়কে আরও বিস্তারিত করেছেন তাঁর গ্রন্থে, তিনি আর্থিক বিষয় বহির্ভূত অ্যানোমিকেও আত্মহত্যার জন্য দায়ী করেছেন। এককথায়, এই তিন ধরনের আত্মহত্যার আন্তঃসম্পর্কে এদের মধ্যে স্বাভাবিক মিল পরিদৃষ্ট হলেও মৌলিক চারিত্র্য ভিন্ন। বলা যায় অহংবাদী আত্মহত্যার উদাহরণ যদি হয় *ক্যাচ ২২*[২৪] তাহলে পরার্থবাদী আত্মহত্যার উদাহরণ হবে কামিকাজে পাইলট। আর সাহিত্যে অ্যানোমিক অবস্থায় শিকার হিসেবে আমরা বলতে পারি কাফকার *মেটামরফসিস*-এর নায়ককে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিচ্ছিল আত্মহত্যা-সংক্রান্ত প্রচলিত ঘোরকে। দ্যুরকহাইমের যুগান্তকারী গ্রন্থটির প্রভাব এক্ষেত্রে ছিল অভাবিত। আলভারেজ বলেছেন, "দ্যুরকহাইমের সেরা কর্মটির বিশাল প্রভাব ছিল এই বিষয়ে জোর দেওয়া যে, আত্মহত্যা কোনো ক্ষমাহীন বা ক্ষমার অসাধ্য নৈতিক অপরাধ নয়, বরং এক সামাজিক বাস্তবতা, যেমন বাস্তবতা হলো জন্মহার বা উৎপাদনহার; আত্মহত্যার পেছনে রয়েছে সামাজিক কারণ যা আইনের বিষয় এবং যৌক্তিক আলোচনা ও বিশ্লেষণকে উপলব্ধি করতে সক্ষম। নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা এক সামাজিক রোগ, যেমনটা বেকারত্ব, যা সামাজিক ব্যবস্থাদির দ্বারা দূর করা সম্ভব।"[২৫] এভাবে, দ্যুরকহাইম, ফ্রয়েডেরও আগে প্রথম আত্মহত্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অগ্রগামী হন। তারপর অনেকেই একে মনঃসমীক্ষণের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে থাকেন। আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক ডি. ডগলাস তাঁর *দ্য সোশাল মিনিংস অব সুইসাইড*-এ বলেছেন, আত্মঘাতী ক্ষণটি বা অবস্থাটি বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো একটা কিছু ভুল থেকে যায় ব্যক্তির মধ্যে যার ফলে সে উদ্‌যোগী হয় এবং এই ব্যক্তিগত কারণ আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময় মনে হতে পারে হাস্যকর। এর অর্থ, কোনো মানুষই আত্মঘাতী হয় না যদি না তার জীবনে থাকে কোনো সমস্যা বা গণ্ডগোল। সমাজতাত্ত্বিকেরা এই ভুলকে সমাজের ভুল হিসেবে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হন এবং তারা এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে চান এভাবে যে, উচ্চ আত্মহত্যা-হারের অন্যতম কারণ হলো অত্যধিক সামাজিক চাপ ও অস্বস্তি। এক্ষেত্রে সমাজ-প্রকৃতি বিষয়ে তারা মনোযোগী হয়ে ওঠেন এবং মনে করেন যে সামাজিক কৌশল, সামাজিক বিবেক, সামাজিক বিবেচনা, আলোকদীপ্ত সামাজিক সেবার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উন্নত দেশসমূহে, যেখানে এসব বিষয়ের উন্নত অবস্থা বিরাজমান, সেখানেও এ জাতীয় আত্মহত্যা-হারের হেরফের হতে দেখা যায় না কেন। কারণ বহুবিধ, তাই এর উত্তরও হবে যৌগিক ও জটিল। সমাজ-প্রকৃতি ধনাত্মকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু মানব-প্রকৃতির বিবেচনায় এই পরিবর্তন ধনাত্মক না হয়ে হতে পারে ঋণাত্মক। অধ্যাপক স্টেনগেল এ বিষয়ে করেছেন শিকড়সন্ধানী উক্তি: "বিবর্তনের কোনো এক পর্যায়ে মানুষ আবিষ্কার করে বসে যে, সে কেবল প্রাণী বা সহকর্মী মানুষকেই হত্যা করতে পারে না, বরং নিজেকেও হত্যা করতে পারে। মনে করা যেতে পারে যে জীবন কখনোই তার কাছে একরকম থাকে না।"[২৬] এর থেকে কি কোনো তত্ত্ব দাঁড়িয়ে যায় যে, আত্মহত্যা এক মানবীয় বৈশিষ্ট্য যা উন্নত সমাজও মুছে ফেলতে পারে না? কথাটির সারবত্তা আছে। মানুষ অন্যকে হত্যা না করে নিজেকে হত্যা করার মানসিকতাও অর্জন করতে পারে, এবং এটা হাবেলের ক্ষেত্রেও দেখা দিতে পারত। আর তা ঘটলে মানুষের ইতিহাসের প্রথম ভ্রাতৃহত্যা না হয়ে হতো প্রথম আত্মহত্যা। পিটার সেনসবারি তাঁর বিখ্যাত *সুইসাইড ইন লন্ডন* (১৯৫৫) গবেষণায় দেখান যে, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা স্থানিক দারিদ্র্য থেকেও আত্মধ্বংসের জন্য এক অধিক শক্তিশালী উদ্দীপক হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। তিনি দেখান, পূর্ব লন্ডনে বাস করা বঞ্চিত কিন্তু কর্মজীবী শ্রেণির মধ্যে আত্মহত্যার হার সচ্ছল ব্লুমসবেরি এলাকার চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবেই কম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—বিচ্ছিন্নতাবোধ, একাকিত্ব প্রভৃতি দূরীকরণের দ্বারা সামাজিক হয়ে ওঠার মাধ্যমে আত্মহত্যাকে অংশত রোধ করতে পারি আমরা, কিন্তু আত্মহত্যা কোনো না কোনোভাবে সমাজ-মনস্তত্ত্বে মৃদুভাবে হলেও ধ্বনিত হতে থাকে। আলভারেজ এ প্রসঙ্গে বলেছেন আর এক দ্যোতনাময় কথা: "এটাও সত্য যে আত্মহত্যা নিজেই তার সমাজ সৃষ্টি করে।"[২৭] এখানে আমরা আবার সে কথাতেই আসতে পারি যে, আত্মহত্যা একটি চরম রহস্যময় বিষয়, আত্মহত ছাড়া এর প্রকৃত কারণ জানা এক অর্থে কঠিন।

"হতাশা সংক্ষেপে খোঁজে তার নিজ পরিবেশ, যেমন জল নামার জন্য খোঁজে সমতল।"—বলেছেন আল আলভারেজ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *দ্য স্যাভেজ গড*-এ।[২৮] তিনি আরও বলেছেন, "আত্মহত্যাকে ঘিরে সমাজবিদ্যার তত্ত্বসমূহের সবগুলোরই কিছু-না-কিছু সত্যতা রয়েছে, যদিও কয়েকটি অন্যগুলোর চেয়ে অধিকতর সত্য, আবার অধিকাংশই পরস্পরবিরোধী, কিছু এগুলো আংশিক এবং প্যাঁচানো। তারা অবিরত একটা নেতিবাচকতা ও আশাহীনতায় ফিরে আসে যা সামাজিক চাপগুলোকে উপরিতলে আনতে পারে কিন্তু এই আশাহীনতা ও নেতিবাচকতাগুলো ওই সামাজিক চাপগুলোর আগেও অস্তিত্বশীল ছিল, আর সম্ভবত ওগুলো এমনকি দূরীভূত করার পরও থেকে যেতে পারে।"[২৯] আলভারেজ এক্ষেত্রে ভিয়েনার মনোরোগ চিকিৎসক মার্গারিট ফন অ্যানডিকস-এর ব্যবহৃত অসুখের ইতিহাসগুলোর উদাহরণ দিয়েছেন। মার্গারিট ফন অ্যানডিকস বিশ্বাস করতেন যে, আত্মহত্যার অবস্থাগুলো মানবীয় আচরণকে পর্যবেক্ষণের জন্য চরম পরীক্ষামূলক অবস্থা, যেমন তাপমাত্রা ও চাপমাত্রার চরমাবস্থা, যার অধীনে নিরীক্ষাধর্মী পদার্থবিদ প্রকৃতিকে পরীক্ষা করেন। মার্গারিট ভিয়েনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকগুলো পরিদর্শন করেন, ব্যর্থ আত্মহত্যাকারীদের কথাবার্তা শোনেন এবং এসব আত্মহত্যার উদ্‌যোগ গ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার নেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, কী কারণ একজন ব্যক্তিকে আত্মহত্যায় তাড়িত ও বাধ্য করে, এ বিষয়ে যুক্তি জীবনের বোধগম্যতার ওপর আলো ফেলবে। কিন্তু দেখা গেল আত্মহত্যায় ব্যর্থ ব্যক্তিরা তাদের চেষ্টা সফল না হওয়ার পর প্রায়শই অস্পষ্ট ও দ্বিধাগ্রস্ত বক্তব্য দিয়ে থাকে। অতএব বলা যায়, মার্গারিটের পদ্ধতিতে দুটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়: বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে গিয়ে দোটানায় পড়ে এবং অবশেষে শুধু ক্ষমা চায়। তারা আবার হতাশা এবং লজ্জাকে যৌক্তিকভাবে ঢাকতে চায়। অন্যটি হলো, আলফ্রেড অ্যাডলারের মতবাদের ওপর মার্গারিটের চরম আনুগত্য। অ্যাডলার আদি ভিয়েনা মনঃসমীক্ষক দলের অন্যতম, যিনি ফ্রয়েড কর্তৃক দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এই প্রস্তাব রাখার জন্য যে, আত্মহত্যায় প্রাথমিক মানবীয় ঝাঁপ দেওয়ার প্রপঞ্চটি সামাজিক আগ্রাসন অপেক্ষা বেশি আদিম নয়। তিনি এই বলে উপসংহার টানলেন যে, জীবনের অর্থময়তা এবং আত্মহত্যার যৌক্তিকতা সবকিছুই সামাজিক সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে আলোচিত। তিনি একটি উপসিদ্ধান্ত দিলেন যে, "লাঞ্ছিত আত্মসম্ভ্রম" আত্মহত্যার অন্যতম প্রধান কারণ যা বোঝায়, অন্যের চোখ দিয়েই আমরা আমাদের মূল্যকে পরিমাপ করি, অন্যের কাছে যে-কারণে আমরা মর্যাদাবান তা-ই আমাদের মূল্য; আমাদের বাস্তব ও ব্যক্তিগত অর্জনের মানেই হলো অন্যের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠা, আর তা না হলেই লাঞ্ছিত হয় আত্মসম্ভ্রম।

সুতরাং কারণ ও উদ্দেশ্য নির্ণয় অনেকাংশেই দীর্ঘসূত্রিতায় পড়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোলকধাঁধায় পথ হারায়। সামাজিক তত্ত্বগুলো, যতই আকর্ষণীয় মনে হোক না কেন, তা জন্ম দেয় দুর্দশার। এক পরম আন্তরশূন্যতার জন্ম হয় যাকে সর্বোচ্চ সামাজিক কৌশল ও সেবা দিয়েও দূর করা যায় না। আলব্যের কাম্যু বলেছেন এক্ষেত্রে আরও যথাযথ কথা:

> সামাজিক প্রপঞ্চ ছাড়া আত্মহত্যা কখনোই অনুসরিত হয় না। এর বিপরীতে ব্যক্তিক ভাবনা ও আত্মহত্যার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে, আমরা প্রাথমিকভাবে অবগত। কাজের মতোই হৃদয়ের নীরবতায় তা প্রস্তুত হয়, যেন এক মহৎ শিল্পকর্ম। মানুষটি নিজে থাকে এ বিষয়ে অজ্ঞ। এক সন্ধ্যায় সে ট্রিগারে চাপ দেয়, অথবা দিয়ে বসে ঝাঁপ। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং ম্যানেজার আত্মহত্যা করে; আমাকে বলা হয়েছিল যে পাঁচ বছর আগে সে তার কন্যাকে হারায়, এবং এরপর থেকেই আজ অব্দি সে ব্যাপকভাবে বদলে ফেলেছে নিজেকে, আর এই অভিজ্ঞতা তাকে "গোপনে ধ্বংস" করেছে। এর অধিক যথার্থ কথা অকল্পনীয়। চিন্তার আরম্ভটাই হলো ধ্বংসে আরম্ভ। এ ধরনের শুরুর সাথে সমাজের সম্পর্ক খুবই কম। পোকাটি রয়েছে মানুষের হৃদয়ে।[৩০]

কাম্যু গুরুত্ব দিয়েছেন হৃদয়ের যুক্তির ওপর, সামাজিক কারণকে তিনি কিছুটা বাতিল করে দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে, কম ভাবনার বা প্রতিফলনের ভেতর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিয়েই তা ঘটে, চিন্তা কম সময়ের তবু তা ঘটে। কাম্যু আরও বলেছেন, কোথা থেকে সংকট দেখা দেয় তা অজানাই থাকে। মূলত এটা অজানা এবং অদৃশ্যে জন্ম নেওয়া পোকা যা কুটকুট করে কেটে দেয় বাঁচার অদ্ভুত স্নায়ুমণ্ডলিকে।

কাম্যু, আত্মহত্যার কারণ হিসেবে, প্রতিপন্ন করতে চাইছেন নিরর্থকতাকে। বলা প্রাসঙ্গিক যে, আত্মহত্যার ক্ষেত্রে বাহ্যিক দুর্দশার ভূমিকা অত্যন্ত কম। দেখা গেছে, প্রাচুর্যময় শিল্পোন্নত দেশে স্বল্পোন্নত দেশ অপেক্ষা আত্মহত্যার হার অনেক বেশি, এবং গরিব অপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্যময় চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এই হার বেশি। যদিও মনে করা হয়, বঞ্চনা আত্মহত্যার জন্য এক উদ্দীপক হিসেবে দেখা দেয়, তবে এর ব্যতিক্রমও চোখে পড়ে। দেখা গেছে নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আত্মহত্যার হার ছিল লক্ষণীয়ভাবে কম। এর কারণ হয়তো এই ছিল যে, দুর্দশা একটি পর্যায় পর্যন্ত বাঁচার শক্তিকে তীব্র করে। এই বিষয়ে একজন মনোরোগ চিকিৎসক জানান, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে অনেক উন্মাদ ও মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ছিল যারা সেখানে বরং ভালো ছিল। বলা হয় যে উৎকণ্ঠায় ভোগা রোগী, ভয়ংকরতার প্রকৃত কারণে, উদ্বেগকে বিশ্লিষ্ট করতে পারে। এক্ষেত্রে বাস্তব-উৎকণ্ঠা মানসিক-উৎকণ্ঠার স্থান নিয়ে নেয়। অবসাদগ্রস্ত রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, চারপাশের ভীতিকর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মানসিক রোগ চাপা পড়ে যায়। যেমন জৈবিক অসুস্থতা দেখা দিলে মানসিক অবসাদগ্রস্ততার মাঝে-মধ্যে উন্নতি হয়। মনোচিকিৎসক তাঁর বর্ণনায় বলেন, ভয়ংকর অবস্থায় থাকা ৩০০০ ব্যক্তির মধ্যে মাত্র চার জনের আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়, যার মধ্যে তিনজনকেই রক্ষা করা সম্ভব হয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওই মনোরোগ চিকিৎসক বলেন, এই ঘটনাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে এই জাতীয় চরম দুর্দশাময় অবস্থায় যদি কেউ আর বাঁচতে না চায় তবে আত্মহননের জন্য কোনো সক্রিয় পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন নেই; একটাই কাজ একজন করতে পারে, বাঁচার জন্য চেষ্টার নিবৃত্তি ঘটানো। সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া মানে খাদ্যের সংস্থান যা একজনকে কর্মক্ষম ও জীবিত রাখবে, কিন্তু একজন তা পরিত্যাগ করার অর্থ মৃত্যুকে আহ্বান করা। এর থেকে অন্য একটা জিনিস বেরিয়ে আসে আর তা হলো, আত্মহত্যার পেছনে এক মানসিক নীরব প্রস্তুতি কাজ করে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বাহ্যিক সংগ্রামের কারণে ব্যক্তির মানসিক জীবন হয়তো সক্রিয় ছিল না, আর মানসিক তাড়না ছাড়া আত্মহত্যা সংঘটিত হয় না। এছাড়া আত্মহত্যার ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায় এক উদ্দেশ্যহীন বিচ্যুতি যা জীবনের বাহ্যিক সুখের সময়েই সংঘটিত হয়। মঁতেসকিও একেই বলেছেন, "সর্বত নির্ণয়-অসাধ্য...সুখের সর্বোচ্চ বিকাশের মুহূর্তে," আর কারণকে যদি চিহ্নিতও করা হয় তাহলে দেখা যাবে তা অতি তুচ্ছ ও অগ্রাহ্যকর। কবি চিজারে পাভেজে, ইতালির ঔপন্যাসিক, তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার মধ্যগগনে থাকা অবস্থায় আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে যা বলা হয় তা অত্যন্ত তুচ্ছ: এক সামান্য আমেরিকান অভিনেত্রীর সাথে তাঁর অসুখী প্রেম, যে অভিনেত্রীকে তিনি খুব কমই জনতেন। পাভেজের আত্মহত্যার পর সেই অভিনেত্রী বলেছিলেন, "আমি জানতাম না

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে তিনি এত বিখ্যাত ছিলেন।" সামান্য ও তুচ্ছ ঘটনায় আত্মহত্যা সংঘটনকে আলভারেজ বলেছেন, "তারা অনেকটা মৃদু সীমান্ত সংঘর্ষের মতো যার থেকে জন্ম নেয় বড়ো যুদ্ধ।"[৩১] তিনি আরও বলেছেন, "প্রকৃত প্রেরণা, যা একজনকে বাধ্য করে নিজ জীবন নিতে, থাকে অন্যত্র; তারা বহাল থাকে অন্তর্গত জগতে, সুদূরস্থিত, পরস্পরবিরোধী, গোলকধাঁধাময়, এবং অধিকাংশত দৃশ্যের বাইরে।"[৩২] সিলভিয়া প্লাথও তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে থাকা অবস্থায় আত্মহত্যা করেছিলেন। এরকম আছেন আরও অনেকে—হেমিংওয়ে, মায়াকোভ্স্কি, বেরিম্যান প্রমুখ।

আত্মহত্যার মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। সমীক্ষকেরা এ ব্যাপারে এতই বাক্-সংযমী যে, তাদের একজন প্রশ্ন তোলেন: "গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমস্যা এই রকম: আত্মহত্যা-সংশ্লিষ্ট ট্যাবুগুলো কি এতই ব্যাপক ও গভীর যে এমনকি মনঃসমীক্ষকেরাও তাদের উপাত্ত, বিষয় ও এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে চায় না?"[৩৩] এর একটি কারণ স্পষ্ট: রোগী যে অবশেষে আত্মহত্যায় সফল হয় তা চিকিৎসকের জন্য এক দ্ব্যর্থহীন ব্যর্থতা, যেহেতু চিকিৎসার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো জীবনকে বাঁচার উপযোগী করা। এখানে আরও একটি সাধারণ বাস্তব সমস্যা থাকে, সমীক্ষকেরা শুধু আত্মঘাতী ভীতি-প্রদর্শন ও উদ্যোগের বিষয়েই বিজড়িত থাকেন, প্রকৃতপক্ষে সার্থক আত্মহত্যা তার বিশ্লেষণের বাইরে থাকে। ফলে আত্মহত্যা বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সূত্রগুলো নিয়ে সমীক্ষকেরা কাজ করেন যা শুধু তাদের চিকিৎসাগত উপাদানই সরবরাহ করে। এভাবেই মনঃসমীক্ষাগত চিন্তাভাবনাগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আত্মহত্যা বিষয়ে আদি চিন্তক ও সমীক্ষক হিসেবে মৌলিকভাবে উঠে আসে ফ্রয়েডের নাম।

১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে, ভিয়েনার মনঃসমীক্ষণ সমাজ আত্মহত্যাবিষয়ক এক সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। সে-সময় ফ্রয়েডের দুই প্রধান শিষ্য স্টেকেল ও আলফ্রেড অ্যাডলার সিম্পোজিয়ামের সব তত্ত্বগত গবেষণা ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্পাদন করলেন। অবশ্য এর কিছুকাল পরেই অ্যাডলার ফ্রয়েডের সাথে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর ভিন্নমত তুলে ধরেন, যাকে বলা হলো "ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞান"। মূলত অ্যাডলার ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্বকে না মেনে মানসিক নিয়তিবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। এই দুজনই, স্টেকেল ও অ্যাডলার, তাঁদের নিজ নিজ পূর্বধারণা ও অনুমান থেকে আত্মহত্যার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। অ্যাডলার নতুন তত্ত্বে হীনম্মন্যতার অনুভূতি, প্রতিশোধ ও সমাজ-বিরুদ্ধ আগ্রাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অ্যাডলার মনে করতেন, ব্যক্তিসত্তার প্রধান সৃষ্টিভাণ্ডার হলো এই হীনম্মন্যতাবোধ এবং দৈহিক হীনম্মন্যতা থেকে মানসিক হীনম্মন্যতার উদ্ভব ঘটে। একে অতিক্রম করার জন্য ব্যক্তি অনেক ক্ষতিপূরণমূলক কৌশলের দ্বারস্থ হন এবং বাহ্যিক ভাবের আশ্রয় নেন। যদি সেখানেও বাধা-ব্যর্থতা আসে তবে ব্যক্তি আত্মসমালোচনা করে এবং নিজেকে হীন মনে করতে থাকে। আত্মসমালোচনা এবং অন্যের ধারণা তখন হীনম্মন্যতাগ্রস্ত ব্যক্তির মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। স্টেকেল বিষয়টিকে সম্পর্কিত করেন হস্তমৈথুন ও তার অপরাধবোধের সাথে। এখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত নীতির অবতারণা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেন, যার ওপর পরবর্তীকালে অনেক তত্ত্ব দাঁড়ায়: "যে অন্যকে হত্যা করতে কখনোই চায় না বা অন্তত অন্যের মৃত্যু কামনা করে না, সে নিজেকেও হত্যা করতে পারে না।"[৩৪] এ সমস্ত উপস্থাপনই সামাজিক নিয়তিবাদ বিষয়ে এক ব্যাপক পরিবর্তনের সূচক বহন করে যার সূত্রপাত করেছিলেন দ্যুরকহাইম তেরো বছর আগে (১৮৯৭) প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের মাধ্যমে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাহীন এ সমস্ত ব্যাখ্যাকে ফ্রয়েড গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তিনি আলোচনায় শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে অনেকটা নীরবই থেকে যান। অবশেষে তিনি বলেন, "শোক ও বিষণ্ণতা"র জটিল পদ্ধতিকে বুঝতে না পারলে আত্মহত্যার বিষয়টিকে বোঝা যাবে না।

ফ্রয়েড আত্মহত্যা বিষয়ে যা বলেছিলেন তার চেয়ে বেশি তিনি জানতেন, বলেছেন ডা. লিটম্যান, কিন্তু তাঁর সমস্যা ছিল তাত্ত্বিক: কীভাবে আত্মধ্বংসের সাথে সুখনীতির সমন্বয় করা যায়। যদি মৌল প্রবৃত্তি-তাড়না হয় লিবিডো এবং আত্মসংরক্ষণ, সেক্ষেত্রে আত্মহত্যা অবোধগম্য এবং অস্বাভাবিক। ১৯১০ সালে অনুষ্ঠিত আত্মহত্যাবিষয়ক সিম্পোজিয়ামের পাঁচ বছর পর তিনি লেখেন তাঁর রচনা "মরনিং অ্যান্ড ম্যালানকলিয়া" যা ১৯১৭ সাল পর্যন্ত অপ্রকাশিত থেকে যায়। সেখানে তিনি বলেন:

> অহমের আত্মপ্রেম খুবই ব্যাপক, যাকে আমরা এমন আদিম অবস্থা হিসেবে স্বীকার করে নিই যার থেকে প্রবৃত্তিগত জীবন অগ্রসর হয়, আর আত্মরতির লিবিডো এতই বিস্তারিত যে তাকে আমরা ভয়ে পরিণত হতে দেখি জীবনের জন্য যা এক ভীতিস্বরূপ, আমরা ধারণা করতে পারি না কীভাবে এই অহম্ তার নিজ ধ্বংসযজ্ঞে সম্মতি দেয়। আমরা এও ভালোভাবে জানি, এটা সত্য যে, কোনো নিউরোটিক ধারণাই আত্মহত্যা চিন্তা করে না যতক্ষণ না সে অন্যকে হত্যার তাড়না বা ইচ্ছাশক্তিকে নিজের দিকে প্রত্যার্পিত করে, কিন্তু আমরা কখনোই এর ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হই না যে কী শক্তির খেলায় এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথ খোঁজে। বিষাদের বিশ্লেষণ এমন দেখায় যে অহম্ নিজেকে হত্যা করতে পারে কেবল যদি বস্তুকেন্দ্রিক ক্যাথেক্সিস ফিরে এসে অবলম্বিত হয়, এটা বস্তু হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করে যদি তা সক্ষম হয় নিজের বিরুদ্ধে বৈরিতাকে সঞ্চারিত করে প্রত্যক্ষভাবে যা বস্তুর সাথে সম্পর্কিত এবং যা বাহ্যিক জগতে অহমের আদি প্রতিক্রিয়াকে উপস্থাপন করে। প্রেম ও আত্মহত্যা—এই দুই বিপরীতধর্মী তীব্রতায় অহম্ পুরোপুরিভাবে বস্তু দ্বারা বিমোহিত হয়, একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে।[৩৫]

উদ্ধৃতিটিতে ফ্রয়েডের আত্মহত্যা-সংক্রান্ত ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেখানে ধরা পড়েছে যে, আত্মহত্যা হলো এক স্থানচ্যুত বৈরিতা। কিন্তু এই উদ্ধৃতিবন্ধে প্রথম বারের মতো ফ্রয়েড অন্তর্গত জগতের জটিল ছবি আঁকতে চাইলেন ধীরে ধীরে, যা পরবর্তী সময়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। "মরনিং অ্যান্ড ম্যালানকলিয়া" রচনায় ফ্রয়েড মনোজগতের গঠন এবং ধর্ষকাম ও মর্ষকামবিষয়ক সমস্যার ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলোকপাত করেন পরবর্তীকালে যা তাঁর বিখ্যাত মৃত্যুপ্রবৃত্তি ধারণায় পরিণত হয়, গ্রিক দেবতার নামানুসারে যাকে বলা হয় থ্যানাটোস। তিনি দেখলেন মানুষ কেবল সৃষ্টিই করে না, ধ্বংসও করে। মানুষ কেবল অন্যকেই ধ্বংস করতে চায় না, নিজেও ধ্বংস হতে চায়।

ফ্রয়েড বলেছেন জীবনপ্রবৃত্তি (এরস) ও মৃত্যুপ্রবৃত্তি (থ্যানাটোস) মানুষের মনে পাশাপাশিই থাকে কিন্তু কখনও বা একটি অপরটিকে ছাপিয়ে যায়। এই দুই প্রবৃত্তি বস্তুর সাথে সংযোজিত হয়ে মানুষের মধ্যে আসে। যে-পদ্ধতিতে এগুলো বস্তুকে অবলম্বন করে, তাকে বলা হয় ক্যাথেক্সিস বা আধানশক্তি যা দু ধরনের: বস্তুকেন্দ্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক। মৃত্যুপ্রবৃত্তি বেশি হলে ব্যক্তি হয়ে ওঠে ধ্বংসাত্মক ও মৃত্যুআক্রান্ত।

ফ্রয়েড তাঁর এই রচনায় বলেছেন, প্রথমত শোকের ক্ষেত্রে অহম্ চেষ্টা করে তা পুনরুদ্ধার করতে যা জীবনের সাথে একাত্মকরণের মাধ্যমে হারিয়ে যায় আর তারপর হারানো বস্তুকে নিজের মধ্যে সংযুক্ত করতে চায়। শোকগ্রস্ত ব্যক্তি হারানো বস্তুকে তার নিজ অহমের সাথে যুক্ত করতে চায়, যেন তা ব্যক্তির নিজ অংশ হিসেবে থাকতে পারে। স্বাভাবিক শোকের ক্ষেত্রে বেদনার পদ্ধতি ধীরে অগ্রসরমাণ, কারণ সে জানে ভালোবাসার বস্তু বাইরের জগতে আর নেই বরং অহমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, ফলে তার শোক ক্ষতিপূরণ পায়।

অন্যদিকে, ভুক্তভোগীর বিষাদের (ম্যালানকলিয়া) ক্ষেত্রে, অপরাধবোধ ও বৈরিতা অতি তীব্র মাত্রায় থাকে। বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তি ভাবে যে, যা-কিছুই মৃত্যু বা বিচ্ছিন্নতা বা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে হারিয়ে যায়, তা যে-কোনোভাবেই হোক তার নিজের কারণে বিলুপ্ত হয়। এবং তা অতঃপর অভ্যন্তরীণ অত্যাচারী হিসেবে ফিরে আসে এবং শাস্তি ও প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয়ে পড়ে। সিলভিয়া প্লাথের "ড্যাডি" কবিতার উল্লেখ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক:

> যদি আমি একজনকে খুন করে থাকি, হয়তো করেছি দুজনকে
> ভ্যাম্পায়ার যে বলেছে তা আসলে ছিলে তুমি
> আর এক বছর ধরে পান করেছ রক্ত আমার,
> সাত বছর, যদি তুমি জানতে চাও।
> ড্যাডি, তুমি এখন গা এলিয়ে দিতে পারো।
> তোমার কৃষ্ণ চর্বিবহুল হৃদয়ে গেঁথে আছে একটি খুঁটি।

মৃত পিতার বিষয়ে এখানে একাধারে অপরাধ ও নিরপরাধবোধের প্লাথের বিষাদকে চিহ্নিত করা যায়। এই প্রসঙ্গে আলভারেজ বলেছেন:

> এই হলো বিষাদের দুষ্টচক্র, যেখানে একজন মানুষ তার প্রিয়তম মানুষের মৃত্যুতে নিজেকে যুক্ত করে সেই কাল্পনিক অপরাধবোধে, যা থেকে প্রায়শ্চিত্তের লক্ষ্যে নিজ জীবনের সমাপ্তি টানতে পারে, কারণ সে অনুভব করে যে মৃত ব্যক্তি তার নিজের মধ্যে বাস করে, চিৎকার করে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, ঠিক হ্যামলেটের অন্তরে হ্যামলেটের পিতার মতো।"[৩৬]

ফ্রয়েড পরবর্তীকালে তাঁর *দি ইগো অ্যান্ড দি ইদ*-এ সুপার-ইগো ধারণার সূত্রপাত ঘটান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিশু ও তার পিতামাতার সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একাত্মকরণের দ্বারা সুপার-ইগোর জন্ম হয়। এই ধারাবাহিকতায় মনঃসমীক্ষক মিসেস ক্ল্যাইন বলেন, নির্জ্ঞান সুপার-ইগো ফ্রয়েড যেভাবে চিন্তা করেছেন তারও আগে তা জীবনের মধ্যে জন্ম নেয় জন্মের দুই-তিন বছরের মধ্যে নয় বরং কয়েক মাসের মধ্যে। যখন শিশু বাহ্যিক জগতে বস্তুর পৃথক অস্তিত্ব বুঝতে সক্ষম হয় তখনই তার মধ্যে সুপার-ইগোর জন্ম হয়। অতএব শিশুর আদি ও অগ্রিম অভিজ্ঞতা হলো এই "অংশ বস্তু" যা তার আনন্দ ও বেদনার, আশা ও হতাশার, প্রেম ও উম্মার, ভালো ও মন্দের উৎস। ফ্রয়েড আত্মস্থকরণের যে কথা বলেছেন তা হলো— প্রতিক্ষেপণে যেমন নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়, তেমনি আত্মস্থকরণে তার উল্টোটি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অহম্ অন্যের দোষ নিজের মধ্যে এবং প্রত্যাশিত বস্তুকে নিজের মধ্যে নিয়ে আসে। জটিল প্রতিরক্ষণ কৌশলের প্রতিক্ষেপণ আর আত্মস্থকরণ ক্রিয়ায় মনের প্রতিনিয়ত অভেদীকরণ, প্রত্যাখ্যান, বিযুক্তকরণ কাজ করে থাকে এবং আত্মহত্যাকে এর সাথে মিলিয়ে দেখলে হয়তো কোনো অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে মনোজগতের কোনো জটিল দিক উন্মোচিত হতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের উভবলতার কথা বলেছেন ফ্রয়েড। জীবনশক্তি ও মৃত্যুশক্তি ছাড়াও এই তালিকায় আছে সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তা, পৌরুষ-নারীত্ব, সুখনীতি-বাস্তবনীতি ইত্যাদি। এদের মাধ্যমে আরও আত্মপ্রকাশ করে বাস্তববোধ-আত্মবোধ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ঘৃণা। আর এগুলোর নেপথ্যে ক্রিয়াশীল থাকে এরস আর থ্যানাটোস। এই উভবল অবস্থা থেকে যখন সমশক্তির বিপরীত ইচ্ছাগুলো প্রত্যেকে তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি পেতে চায়, তখন অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং চূড়ান্তে একে অপরকে দমনের মাধ্যমে একক তৃপ্তিলাভ করতে চায়।

ম্যাকবেথ-এর পঞ্চম অঙ্ক অষ্টম দৃশ্যে ম্যাকবেথের উক্তিটি ছিল: রোমান যোদ্ধার মতো মরব না নিজের অসিতে। এর অর্থ হলো প্রাচীন রোমে পরাজয় বা গ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রোমান যোদ্ধারা নিজের তরবারির আঘাতে আত্মহত্যা করত। এক্ষেত্রে সহকারী বা অন্য কেউ তরবারি ধরে রাখত সোজা করে আর যোদ্ধাটি দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত। এর সাথে মিল আছে জাপানি আত্মহত্যা হারা-কিরির। কথা হলো, এসব বিষয় কি কোনো আত্মহত্যার প্রত্নরূপ বা ঝোঁককে প্রতিষ্ঠিত করে? সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে, মাউন্ট ফুজির নিকটস্থ কুঞ্জবনকে বেছে নিয়ে জাপানিরা ব্যর্থতার গ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করছে। অথবা ফ্রান্সের স্যেন নদীতে ঝাঁপিয়ে পরে একদা অনেকে আত্মহত্যা করত। কেন এই বিশেষ স্থান নির্বাচন করা? তা কি কোনো প্রবণতা বা আত্মহত্যাকারীদের বিশেষ মনস্তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুপ্রবণতার এক ধরনের সংরাগ? এই ধারার আরও অনেক উদাহরণ আছে: সপ্তদশ শতাব্দীতে হাজার হাজার রুশ কৃষক গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করে এই বিশ্বাসে যে জিশু-বিরোধীর আগমন ঘটতে যাচ্ছে। প্রবেশ নিষিদ্ধ না করা পর্যন্ত হাজার হাজার জাপানি এক সময় মিহারা-ইমা আগ্নেয়গিরির মুখে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। অথবা শিকাগোর "সুইসাইড

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্রিজ” থেকে পড়ে অনেকে নিজেদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে যতদিন না কর্তৃপক্ষ জনগনের প্রবেশের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। প্যারিসের লা ইনভেলিদেস হাসপাতালে, ১৭৭২ সালে, পনেরো জন আহত সৈনিক একই আংটা থেকে ঝুলে আত্মহত্যা করে; আংটাটি খুলে ফেলার পর এই ধারাবাহিক আত্মহত্যার সমাপ্তি ঘটে। এছাড়া দেখা গেছে, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সংঘটিত আত্মহত্যার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি পরিবারের বা গোত্রের প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়।

মৃত্যু-ঝোঁক নিয়ে, কাকতালীয় হলেও সত্যি যে, কিছু আপতন চোখে পড়ে। কিছু লেখকের জীবনে এই আচ্ছন্নতা ও অনুবর্তন দৃষ্টিগোচর হয় যার পেছনে ছিল তাঁদের পূর্বপুরুষের অকালমৃত্যু বা আত্মহত্যা। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম ও প্রখ্যাত আত্মহত্যাকারী কবি টমাস চ্যাটারটন—আঠারো বছর বয়সে যিনি আত্মহত্যা করেছিলেন—এর পিতা তাঁর জন্মের আগেই মারা গিয়েছিলেন। হেমিংওয়ে, মায়াকোভ্স্কি, পাভেজে, প্লাথ সবাই তাঁদের শিশু-বয়সে পিতাদের হারান। হেমিংওয়ের পিতা গুলি করে আত্মহত্যা করেছিলেন যার অনুবর্তন লক্ষ করা যায় ছেলের মধ্যে: হেমিংওয়েও অবশেষে গুলি করে আত্মহত্যা করেছিলেন। এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল জন বেরিম্যানের ক্ষেত্রেও। তাঁর পিতাও আত্মহত্যা করেছিলেন, এবং পিতার অনুসরণে তিনিও পরবর্তীকালে আত্মহত্যা করেন। ২৬ জুন ১৯৬২-এ, তাঁর পিতা জন অ্যালিন স্মিথের আত্মহত্যা সারাজীবন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এবং তিনি এই বিচ্ছেদ ও হারানোর বেদনা থেকে কখনোই বিমুক্ত হতে পারেননি। এগারো বছর বয়সি ছেলের কাছে তাঁর পিতার আত্মহত্যা এতটাই আঘাতমূলক ছিল যে, এই মৃত্যুকে তিনি শুধু অবদমিতই করেননি, বরং তাঁর পিতার সব স্মৃতিচিহ্নকেও তিনি অবদমিত করতে চেয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর কবিতায় এই শোক কুয়াশার মতো ছেয়ে ছিল। সিলভিয়া প্লাথের মতোই অনেক কবিতায় বেরিম্যান নিজেকে হত্যার অভিলাষের কথা ব্যক্ত করেছেন এবং অবশেষে তিনি তা-ই ঘটিয়েছেন। আসলে মৃত্যুপ্রবণতায় তাঁরা ছিলেন আশ্লিষ্ট যার উপাদান বা আকুলিত ভাবকে অন্য-নিকটজনের মৃত্যু থেকে তাঁরা দৃঢ়ীকরণ করেছিলেন নিজেদের মধ্যে।

এসবই হতে পারে কোনো দুর্বল অনুষঙ্গ বা ছুতো আর এর ফাঁকেই আত্মহত্যা-সংক্রান্ত মনোবিশ্লেষণিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা দৃশ্যত সবলভাবে প্রতিভাত হয়। কারণ মনঃসমীক্ষণ আত্মহত্যার কৃৎকৌশল বা অনিবার্যতা বিষয়ে কোনো সাধারণ ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারে না। ফলে এভাবে আত্মহত্যার যথার্থ বিশ্লেষণ এক সংশয়াতুর বিষয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে নিকটবর্তী ঘটনাগুলোকে কোনো ক্ষেত্রে যত বিবেচনায় আনা হয়, ততই তা আরও জটিল হয়ে ওঠে আর প্রকৃত কারণ-অন্বেষণ পথ হারিয়ে বসে। আলভারেজ এ বিষয়ে বলেছেন: “উদ্দেশ্যের গভীর দ্ব্যর্থকতাকে তা আলোকিত করতে পারে বড়োজোর, এমনকি যখন তা বড়োই সোজাসুজি বলে মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে।”[৩৭] অর্থাৎ বিষয়ের চেয়ে এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা জটিল ও দুর্বোধ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে; কিন্তু প্রকৃত নিপতিত রহস্যের জট খোলা রুদ্ধ হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রয়েডের এ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনায় আমরা পাই দুই বিরুদ্ধশক্তির দ্বন্দ্বের কথা আর এরই বিবর্তনে তিনি অবশেষে উপনীত হয়েছিলেন "মৃত্যুপ্রবৃত্তি" ধারণায়। বিভিন্ন অন্তর্বাহে ফ্রয়েড তাঁর এই ধারণা বা তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন যাকে তিনি বলেছেন এক কামহীন "প্রাথমিক আগ্রাসন" যা জীবনের শুরু থেকে বহমান থেকে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যায়, ধ্বংস করে, ফিরে ফিরে আসে জীবন-ইচ্ছার অজৈব অবস্থায়। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে, ফ্রয়েড মনে করেছেন যে, বিষাদগ্রস্ততায় মৃত্যু-ইচ্ছা সুপার-ইগোর এক অসুস্থতার জায়গা নিয়ে নেয়। অসুস্থতা যতই মারাত্মক হবে, আত্মঘাতী রূপ দেখা দিতে থাকবে ততই কঠোরভাবে। ইগো যতই ভঙ্গুর হবে ততই সুপার-ইগোর ভেদ্যতা বেড়ে যাবে। ফ্রয়েড বলেছেন: "বিষাদগ্রস্ততায় মৃত্যুভয় একটি ব্যাখ্যাকে অনুমোদন করে যা হলো, ইগো নিজেকে পরিত্যাগ করে, কারণ সে নিজেই অনুভব করে যে সে সুপার-ইগো কর্তৃক ভালোবাসা ব্যতীত, অত্যাচারিত ও ঘৃণিত।"[৩৮] ফ্রয়েড তাঁর এই মৃত্যুপ্রবৃত্তিতত্ত্বকে তাঁর *বিয়নড্ দ্য প্লেজার প্রিন্সিপল*-এ রূপদান করেন, যা তিনি ১৯১৯ সালে লেখা শুরু করেন আর ১৯২০-এ সমাপ্ত করেন। লেখার সময়কাল গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হত্যা ও বিভীষিকা তাঁকে এ ব্যাপারে প্রভাবিত করেছিল মারাত্মকভাবে। ফ্রয়েড আতঙ্করোগ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, তিন সত্তা—ইদ, ইগো ও সুপার-ইগোর মধ্যে ভয় বা আতঙ্ক ইগোসত্তার সাথেই জড়িত। ফ্রয়েড বলেছেন, আতঙ্ক রোগীর অতীত গ্লানি অবদমন থেকে উদ্ভূত হয়। এই গ্লানির অবদমিত রূপ যখন অবচেতন থেকে চেতনে ফিরে আসে, তখন রোগী তাকে চিনতে পারে। ফলে রোগীর মনে অপরাধবোধের জন্ম হয় যা তার মনে গভীর ভয়ের সৃষ্টি করে। এই নিউরোটিক আতঙ্ক যখন সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তিত্বের কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং এরই ফলে জীবনধ্বংসী উপাদান তার মনে জমা হতে থাকে।

আত্মহত্যার যৌক্তিক ভিত্তি কী? প্রাচীনকালে, বিশেষত রোমানদের মধ্যে এবং স্টোয়িক ধারণায় আত্মহত্যার কঠোর যৌক্তিক দিকটি উন্মোচিত হতে দেখা যায় কিন্তু বর্তমান সময়ে তা অনেকটা বিমূর্ত, মূলত কোনো সুনির্দিষ্ট একমুখী যৌক্তিক ব্যাখ্যায় বর্তমান সময়ের আত্মহত্যাকে দাঁড় করানো যায় না। গ্রিক, রোমান ও স্টোয়িকেরা আত্মহত্যার শৃঙ্খলার দিকটিকে কঠোরভাবে বিবেচনায় রাখতেন যৌক্তিক বিকল্পের মধ্যে, যৌক্তিক পছন্দ হিসেবে। ১৭৩৫ সালে একজন সুইডিস-জার্মান দার্শনিক, জন রোবেক, আত্মহত্যার সপক্ষে এক স্টোয়িক সমর্থন দাঁড় করান, তিনি অতঃপর তাঁর সৃষ্ট নীতিকে বাস্তবে রূপদান করতে সচেষ্ট হন এবং পরিণামস্বরূপ জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। তাঁর এই স্বেচ্ছামৃত্যু সে-সময় তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। ভলত্যের এই মৃত্যুতে তাড়িত হয়েছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *কাঁদিদ*-এর "বৃদ্ধার দুর্ভাগ্যের আরও বৃত্তান্ত" শিরোনামের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে একটি বৃদ্ধার চরিত্রের মাধ্যমে বলেন: "ভাগ্যচক্রে আমি যত দেশে গিয়েছি এবং যত সরাইখানায় কাজ করেছি, সর্বত্রই এমন লোক অসংখ্য দেখেছি যারা জীবনের প্রতি ঘোরতরভাবে বিতৃষ্ণ, কিন্তু মাত্র বারোজনকে আমি দেখেছি যারা স্বেচ্ছায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাদের দুর্দশার সমাপ্তি ঘটিয়েছে: তিনজন কাফ্রি, চারজন ইংরেজ, চারজন জেনেভাবাসী এবং রোবেক নামে এক জার্মান অধ্যাপক।"[৩৯] বৃদ্ধার মুখে ভলত্যের শোনালেন সেকালের সংঘটিত আত্মহত্যার কথা—রোবেকের আত্মহত্যার কথা। একই অধ্যায়ে ভলত্যের আত্মহত্যার যৌক্তিক দিকটিকে দেখাতে চেয়েছেন, বলতে চেয়েছেন যে জীবনের কোনো মুহূর্তে আত্মহত্যাচিন্তা সবলভাবে আবির্ভূত হতে পারে। ভলত্যেরের বৃদ্ধা বলছেন:

> আমি শতবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছি, কিন্তু জীবনকে তবু ভালোবেসেছি। এই হাস্যকর দুর্বলতা বোধ হয় আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক প্রবণতার অন্যতম। কারণ যে-বোঝাকে সব সময় মাটিতে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে তাকে ক্রমাগত বয়ে নিয়ে যেতে চাওয়া, এর চেয়ে মূর্খতা আর কী হতে পারে? নিজের অস্তিত্বকে অভিশাপ মনে করা অথচ নিজের অস্তিত্বকে আঁকড়ে থাকা অর্থাৎ যে-সাপ আমাদের গিলে খাচ্ছে, সে আমাদের হৃৎপিণ্ড খেয়ে না ফেলা পর্যন্ত তাকে আদর করা, এর চেয়ে মূর্খতা সত্যি আর কী হতে পারে?[৪০]

ভলত্যের হয়তো এক যৌক্তিক আত্মহত্যার কথা বলতে চেয়েছেন, যা মূলত ব্যর্থ হয় জীবনের সংরাগ ও মোহের কাছে। তিনি হয়তো প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন আত্মহত্যার সম্ভাব্যতাকে, ক্ষেত্র-বিশেষে যা আবির্ভূত হতে পারে সমূহ যৌক্তিকতা নিয়ে। কিন্তু মৃত্যুর যুক্তি অনেকাংশেই জীবনের মাধ্যাকর্ষণের কাছে পরাজিত হয়, যেমনটি হয়েছে ভলত্যেরের বৃদ্ধাটির কাছে যে যৌক্তিকভাবে আত্মহত্যাকে বিবেচনা করেছিল কিন্তু জীবনের ভালোবাসা তাকে এ কাজ থেকে বারিত করে, যদিও তা অযৌক্তিক মর্মে সে মনে করে। এর অর্থ জীবনের মুহ্যমান ও অর্থহীন অবস্থায় আত্মহত্যা যৌক্তিক ও সঠিক মর্মে ভলত্যের বলতে চেয়েছেন।

আর-বিরুনির *কিতাবুল হিন্দ*-এও ভারতবর্ষীয় আত্মহত্যার কথা বলা আছে যা ইউথানেজিয়া বা অনুকম্পাজনিত সহায়ক মৃত্যুর যুক্তিপাটাতনের ওপর স্থাপিত। আল-বিরুনি বলেছেন:

> জীবিত মানুষের অগ্নিদগ্ধ করার কথা হিন্দুরা ভাবতেও পারেন না, তবে ব্যতিক্রম কিছু আছে। যেমন কোন বিধবা যদি মৃত স্বামীর শবদেহ অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হন অথবা যাঁরা দুরারোগ্য রোগে ক্লান্ত হয়ে বা শুধুই বার্ধক্যের কারণে অথবা দেহের অনপসারণীয় অপগুণের জন্য দেহত্যাগে উৎসুক। সাধারণত কোন সসম্মানীয় ব্যক্তি এই ভাবে আত্মহত্যা করেন না। এই জীবনের পরিবেশের তুলনায় পরবর্তী জীবনে উন্নততর অবস্থার আশায় বৈশ্য এবং শূদ্রেরা করেন উপযুক্ত শুভগ্রহের সূচনায়। বিশিষ্ট আইনানুযায়ী ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ। সেই জন্য আত্মঘাতী হতে হলে তাঁরা গ্রহণের সময় হয় অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করেন আর না হয় লোক ভাড়া করেন যাঁরা গঙ্গার জলে জোর করে ডুবিয়ে রাখেন জলমগ্ন হয়ে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত।[৪১]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আল-বিরুনি আরও বলেছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা বটবৃক্ষের ওপর থেকে প্রবাহিত গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েও আত্মহত্যা করে।[৪২] এখানে আত্মহত্যার যৌক্তিকতা হলো জীবনের অনপসারণীয় বোঝা, যা থেকে মুক্তির আশাতেই সংঘটিত হয় আত্মহত্যা। কিন্তু আধুনিক সংঘটিত আত্মহত্যা স্টোয়িকদের মতো যৌক্তিক হয় না কখনও কখনও। আবার পদ্ধতিগত দিক থেকে তা হতে পারে উদ্ভট ও বিস্ময়জনক। আলভারেজ উল্লেখ করেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, সত্তর-বছর-বয়স্ক এক ভিয়েনাবাসী তিন ইঞ্চি লম্বাকৃতির সাতটি পেরেক হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে তার মাথায় বসিয়ে দেন।[৪৩] কিন্তু যে-কারণেই হোক তাড়াতাড়ি তার মৃত্যু না হওয়ায় সে মন পরিবর্তন করে বসে এবং রক্তাক্ত মাথায় হাসপাতালে এসে হাজির হয়। আবার ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বেলফাস্টের একজন ব্যবসায়ী ড্রিল মেশিন দিয়ে মাথায় নয়টি ছিদ্র করে আত্মহত্যা করে বসে। এক পোলিশ বালিকা, প্রেমে অসুখী হওয়ার দরুণ, পাঁচ মাসে চারটি চামচ, তিনটি ছুরি, উনিশটি মুদ্রা, বিশটি পেরেক, সাতটি জানালার বল্টু, একটি পিতলের ক্রুস, একশ একটি পিন, একটি পাথর, তিন-টুকরা কাচ এবং জপমালার দুটি গুটি খেয়ে ফেলে। এই তিনটি ক্ষেত্রেই আত্মহত্যার বিকৃত উপায় বেশি পরিদৃষ্ট হয়। এটা তখনই বেশি সংঘটিত হয় যখন মানুষ মানসিক অভিক্ষেপবশত গন্তব্য অপেক্ষা উপায়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেয় এবং এই ধারণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আত্মহত্যা আপতিক বিষয় এবং তা সাময়িক হতাশারই বহিঃপ্রকাশ। মৃত্যু এক্ষেত্রে শুধু বাগাড়ম্বর নিয়ে হাজির হয়। বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনোবিশ্লেষকেরা এভাবে বলেন যে, একজন ব্যক্তি নিজেকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয় এজন্য নয় যে সে মরতে চায় বরং এজন্য যে একটি একক বিষয় তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় যাকে সে সহ্য করতে পারে না। এ ধরনের আত্মহত্যাকারী হলো পূর্ণতাবাদী, যে সামান্যতম বিচ্যুতিকেও সহ্য করতে পারে না। দস্তইয়েফস্কির *দ্য পোজেজড্*-এর কিরিলোভের ক্ষেত্রে এই অবস্থা দেখা যায়। কিরিলোভ নিজেকে হত্যা করতে চায়, কারণ সে মনে করে সে নিজেই ঈশ্বর। কিন্তু গোপনে সে নিজেকে হত্যা করে কারণ সে জানে যে সে ঈশ্বর নয়। কাম্যু বলেছেন, "এক ধারণা, এক ভাবনা যার জন্য সে মৃত্যুর জন্য তৈরি হতে থাকে।"[৪৪] আর তার চিন্তার রূপটি হয়ে ওঠে: "ঈশ্বর হওয়ার জন্য সে হত্যা করতে চায় নিজেকে।"

কাম্যু বলেছেন, "যুক্তিটি হলো স্বচ্ছতার মধ্যে ধ্রুপদি রূপ। যদি ঈশ্বর না-ই থেকে থাকে, তাহলে কিরিলোভই ঈশ্বর। যদি ঈশ্বর না থেকে থাকে, কিরিলোভ অবশ্যই নিজেকে হত্যা করবে। ঈশ্বর হবার জন্য কিরিলোভ অবশ্যই নিজেকে হত্যা করবে।"[৪৫] এভাবেই দস্তইয়েফস্কি আত্মহত্যার এক আধিবিদ্যক যুক্তিকে খুঁজে বেড়ান এবং অবশেষে উপসংহারে উপনীত হন, কাম্যুর ভাষায়, "যদি ঈশ্বর থেকে থাকে, তাহলে সবকিছুই তাঁর ওপর নির্ভরশীল এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারি না। যদি ঈশ্বর না থেকে থাকে, সবকিছুই আমাদের ওপর নির্ভর করে।"[৪৬] হ্যামলেটও বলেছিল যে আত্মহত্যার একমাত্র বাধা হলো পরকালের ভয়,

~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বই এক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক, যদিও শেক্সপিয়রের অন্যান্য নাটকের রোমান মহৎ আত্মহত্যার তুলনায় এই উক্তি অত্যন্ত ক্লিশে এবং এক খ্রিস্টীয় উক্তি। কিন্তু সত্যিকারভাবে দেখলে মনে হবে ঈশ্বর নয় বরং জীবন ও তার চারপাশের সুখদ বাস্তবতাই আত্মহত্যার জন্য বড়ো বাধা: রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন, সকালের উৎফুল্ল চড়ুই, গাছের পাতায় সবুজের আলপনা, আলোর আপতন, তারাভরা রাত, মেঘের রহস্যময় ভেলা, সংগীত, কর্মময় মানুষ ইত্যাদি কি জীবনের জন্য এক অপরূপ ক্ষেত্র তৈরি করে রাখেনি, যাকে অস্বীকার ও অতিক্রম করে যাওয়া অসম্ভব? ফ্রয়েড সম্ভবত একেই বলেছেন, আত্মরতিময় সন্তুষ্টি (ইগো) যা জীবন থেকে উদ্ভূত। এগুলোই মনের বিকাশের দিকে লক্ষ রেখে মনের কাঠামোকে ঠিক করে। আর নিরন্তর নানা প্রতিরক্ষণ-কৌশলের মাধ্যমে মানবমন জীবনপ্রক্রিয়াকে বহমান রাখে।

কিন্তু এ ক্রিয়ারও ভঙ্গুরতা দেখা দেয়। ইদ, ইগো, এবং সুপার-ইগোর সংঘর্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রতিরক্ষণের কৌশল ভেঙে পড়তে পারে। ফলে একজনের মধ্যে দেখা দিতে পারে অসহ্য অবস্থা যা তাকে নিষ্ক্রমণের জন্য উৎসারিত করে। এ জাতীয় অবস্থায় ব্যক্তি যাচাই করে না আধিবিদ্যক নীতিবোধ বা ধর্মীয় অনুশাসনকে, বরং জীবন ও মৃত্যুর দোলাচলে সে তাড়িত হয়ে পড়ে এবং বেছে নেয় দ্বিতীয় বিকল্পকে। হয়তো বিশ্বাসও তাকে আর সাহায্য করে না।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের আত্মহত্যার প্রস্তুতির মধ্যেও দীর্ঘসূত্রিতা থাকে: পুঞ্জিভূত হতাশা, ক্ষোভ, উৎকণ্ঠা, বিষণ্নতা, দুঃখ, অর্থহীনতা থেকে এক সময় বেজে ওঠে আত্মহত্যার সতর্কঘণ্টি। ১৯৫০ সালের ১৬ আগস্ট, আত্মহত্যার দশ দিন আগে, পাভেজে তাঁর নোটবুকে লেখেন "আজ আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ১৯২৮ সাল থেকে এখন অব্দি আমি এই ছায়ার নীচে বেঁচে রয়েছি।"[৪৭] পাভেজে বোঝাতে চেয়েছেন মৃত্যুর ছায়াকে। কিন্তু ১৯২৮-এ তাঁর বয়স যখন ছিল কুড়ি, তখন থেকেই তাঁর ওপর এই ছায়ার বিস্তার। কিন্তু আমরা যদি তাঁর বঞ্চিত শৈশব—ছয় বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু, তাঁর মা ছিলেন কর্কশ ও উগ্র—অনুধ্যান করি তাহলে দেখব যে এই ছায়ার বিস্তার আরও আগ থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর জীবনে, বিশ বছর বয়সে তিনি তাকে বুঝতে শুরু করেছিলেন মাত্র। আল আলভারেজ বলেছেন, "এই জাতীয় আত্মহত্যা সৃষ্ট নয়, জাত।"[৪৮] আলভারেজ আরও বলেছেন,

...তাঁর সমগ্র জীবন হলো এক ধীর নিম্নগামী বক্ররেখা, সমাপ্তির দিকে যা ঢালু হয়ে গেছে, যার দিকে জ্ঞানত তিনি ধাবিত, নিজেকে থামাতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক। কোনো সাফল্যই তাঁকে পরিবর্তিত করেনি। মৃত্যুর আগে পূর্বের যে-কোনো সময়ের চেয়ে পাভেজে ভালো লিখছিলেন—অত্যন্ত ঐশ্বর্যের সাথে, শক্তির সাথে, স্বাভাবিকতার সাথে।"[৪৯] মৃত্যুর আগে তাঁর বিখ্যাত একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল; মৃত্যুর একমাস আগে পেয়েছিলেন ইতালির সম্মানজনক স্ত্রেগা পুরস্কার। সে-সময়ের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আমি কখনোই এত প্রাণবন্ত ছিলাম না" লিখেছেন তিনি, "ছিলাম না এত তরুণ।"[৫০] কিন্তু আশ্চর্য

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হলো, এর কিছুকাল পরই তিনি করলেন আত্মহত্যা। এ বিষয়ে আলভারেজ বলেছেন "সম্ভবত তাঁর সৃষ্টিশীল ক্ষমতার এই মাধুর্য তাঁর সহজাত বিষাদবায়ুকে সর্বত দুর্বহ করে তুলেছিল কোনোভাবে। এগুলো হলো তাঁর কিছু অন্তর্গত অংশের সাথে সংযুক্ত সেই শক্তি এবং পুরস্কার যার ফলে তিনি নিজেকে পুনরুদ্ধার-অসাধ্য বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।"[৫১] আলভারেজ তাঁর আত্মহত্যাকে আরও বললেন, "পরবর্তী সূর্যোদয়ের মতোই তা ছিল এক অপরিহার্য ঘটনা।"[৫২]

তাঁর আত্মহত্যাতে অনেকেই বিচলিত হয়েছিল এ কারণে যে তাঁর উপন্যাসগুলো জীবনের প্রবল উদ্দীপনাকেই উপস্থাপন করেছিল। তিনিও বলেছিলেন যে তাঁর সব কাজই, "ঘটিত বিষয়ের ছন্দোস্পন্দ।"[৫৩] তাঁর সব কাজেই ছিল আশা ও প্রেম ধ্বনিত। ডওলিং-এর সাথে তাঁর মাখামাখি ও একমুখী প্রেম সত্যিকারভাবে আত্মহত্যার মতো বিবেচিত বিষয়কে খুব একটা প্রতিষ্ঠা দেয় না। ডওলিং পরবর্তীকালে জানিয়েছেন, তিনি জানতেন না পাভেজে এত বড়ো লেখক, এমনকি তাকে উদ্দেশ করে লেখা কয়েকটি কবিতা ছাড়া ডওলিং তাঁর কোনো লেখাই পড়েনটি। ডওলিং-এর প্রত্যাখ্যান তাঁর আত্মহত্যার কারণ হিসেবে তাই শক্ত খুঁটি পায় না। কিন্তু আর কী কারণ থাকতে পারে?

একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, পাভেজের রাজনৈতিক বিশ্বাসও এক্ষেত্রে তাঁর আত্মহত্যার কারণকে সহায়তা করে না। কারণ আপাতদৃষ্টে তিনি ছিলেন সাম্যবাদী। তবে গভীর সত্য এই যে, পাভেজে যদিও নিজেকে কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচয় দিতেন তবু তাঁর সৃজনঋদ্ধ কল্পনাশীল সাহিত্য এবং ব্যক্তিগত নোটবুক কোনোটাই তাঁর এই মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। হয়তো তাঁর এই রাজনীতিমনস্কতা ছিল একধরনের মানবিক পছন্দের সাথে সংহতি প্রকাশ। তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন এ কারণে নয় যে এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস কাজ করেছিল, বরং হয়তো এ জন্য যে ফ্যাসিস্টরা তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল, সাম্যবাদে খুঁজে পেয়েছিলেন একটি বিকল্প আশ্রয়। ১৯৩৫ সালে তাঁকে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য গ্রেফতার করা হয় এবং কালব্রিয়ার ব্রাঙ্কলিয়নে দশ মাসের নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়াও মুসোলিনির সময়ে তাঁর অনেক বন্ধুকে ফ্যাসিস্টরা অত্যাচার করে মেরে ফেলেছিল। যুদ্ধ শুরু হলে তিনি দেখলেন, প্রতিরোধ যুদ্ধে, বিশেষত তুনিন-এ অক্ষশক্তির বোমা নিক্ষেপণের সময়ে তাঁর আরও কিছু বন্ধু মারা গেল, তিনি তখন পালিয়ে দূরে পাহাড়ে গিয়ে দুই বছর বিচ্ছিন্ন জীবন কাটান। এই অভিজ্ঞতার কথা বলা আছে তাঁর উপন্যাস *দা হাউস অব দ্য হিল*-এ। অতএব সাম্যবাদী হিসেবে তাঁর পরিচিতি একটি আপতিক পরিচয় বলে আমরা ধরতে পারি, কারণ পরবর্তী সময়ে তাঁর এই সাম্যবাদী পরিচয় জীবনের জন্য উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারেনি। অতএব তাঁকে বিবেচনা করা সঠিক হবে সময়ের স্পর্শকাতর ও ভঙ্গুর মানুষ হিসেবে যিনি একাধারে সন্দেহবাদী, বাস্তববাদী, উন্মুল, ধর্মে ও দলে মূলত অসংস্থিত। সুতরাং তাঁর জীবনমুখিতা কতটুকু ব্যবস্থিত বা তাঁর নোটবুকের নাম *দ্য বিজনেস অব লিভিং* কতটুকু যৌক্তিক, তা ভেবে দেখার মতো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বরং এক্ষেত্রে আমরা অবিচলিতভাবে দ্যুরকহাইম কথিত "অ্যানোমি"কে বিবেচনায় আনতে পারি, যা আশাহীন অবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিশ্বাসহীন আবহের উপজাত। পাভেজে তাঁর *অ্যামোং ওমেন অনলি* উপন্যাসে এই "অ্যানোমি"-সৃষ্ট আত্মহত্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপন্যাসের তরুণী রোসেতা তার দৈনন্দিন জীবনে অসন্তুষ্ট ও বীতরাগ হয়ে শেষে আত্মহত্যা করে। তার আগে সে একবার আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিল। এই গ্রন্থে পাভেজে এই অভিমতকে তুলে ধরেছেন যে, যখন কেউ অস্তিত্ব দ্বারা পূর্ণ ও তৃপ্ত হয়ে পড়ে, তখনই আত্মহত্যার মতো কিছু ঘটতে পারে। ব্যক্তি যখন পূর্ণতার তুঙ্গে পৌঁছে, তখন সে নিজেকে ধ্বংস করতে চায় যেমন ফল পাকলে গাছ থেকে ঝরে পড়ে। যদি কেউ একবার আত্মহত্যায় ব্যর্থ হয় তাহলে সে আবারও চেষ্টা চালায় যতক্ষণ না সে সক্ষম হয়। আত্মহত্যা মূলত অভীপ্সার ফল আর এই অভীপ্সা মুহুর্মুহু পরিণাম খোঁজে। পাভেজে তাঁর এই উপন্যাসে দেখান, রোসেতাও বিশেষভাবে দুঃখী বা অসুখী নয়, বরং, সময়ে সময়ে সে উজ্জ্বল ও আনন্দময়। মূলত এই দর্শনের সাথে আমরা পাভেজের আত্মহত্যার মিল খুঁজে পেতে পারি। সৃষ্টিশীলতার পূর্ণ পরিপৃক্তিতেই পাভেজে আত্মহত্যা করেন যদিও অতীতজীবন ও সাম্প্রতিক প্রেমে ব্যর্থতা তাঁর ভঙ্গুর, ভেদ্য ও অ্যানোমি-উদ্ভূত বৈশিষ্ট্যকে আংশিকভাবে প্রকাশ করে।

আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ঘটনের উপায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা। কীভাবে বা কোন উপায়ে ঘটবে আত্মহত্যা? প্রাচীনকালে আত্মহত্যার উপায়গুলো ছিল ভয়ংকর ও বিভীষিকাময়: ফাঁসি, বিষপান, জলে ডোবা, ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া, শরীর বা রগ কর্তন, উদ্যত অস্ত্রে বা তরবারিতে ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদি। আর এগুলোর সাথে কমবেশি জড়িত থাকে নিষ্ঠুর যন্ত্রণাভোগ ও অস্বাভাবিকতা। এই পদ্ধতিতে সংঘটিত আত্মহত্যায় পরিলক্ষিত হয় দৃশ্যমান বিভীষিকা আর এর কারণেই আত্মহত্যার মৃত্যুকে আমাদের দেশে অপমৃত্যু হিসেবে দেখা হতো, কারণ তা শারীরিক বিকৃতাবস্থাকেও উপস্থাপন করত। বর্ণিত উপায়ে সংঘটিত মৃত্যুর পর মৃতদেহ একটি অস্বাভাবিক শারীরিক অবস্থায় উপনীত হয় যা প্রায়শই জনমানুষের কাছে ভীতিকর হয়ে ওঠে। এক ধরনের আধিভৌতিক পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে মৃতদেহকে কেন্দ্র করে যা অনেকাংশেই অসহনীয়। কিন্তু আধুনিক সময়ে আত্মহত্যার উপায়গুলো একটু ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। ফলে মৃত্যু সৌম্যময় হওয়ায় বাহ্যিকভাবে মৃতদেহ অনেকটা সহনীয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ড্রাগ বা অন্যভাবে সংঘটিত আত্মহত্যা কম যন্ত্রণাহীন হয়েছে এবং এর দ্বারা দ্রুততম সময়ে মৃত্যুকে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। কাম্য মৃত্যু বিভীষিকাহীন, যন্ত্রণাহীন এবং সৌম্যরূপ লাভ করতে পেরেছে। অতীতে আত্মহত্যার জন্য যেখানে দীর্ঘ শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি এবং প্রয়োজনীয় আঙ্গিক নির্ধারণের দরকার হতো, বর্তমানে ন্যূনতম প্রস্তুতি নিয়েই তা সম্পন্ন করা সম্ভব। রবার্ট লওয়েল একদা বলেছিলেন, যদি বাহুতে কোনো বোতাম থাকত যা টিপে একজন অতি দ্রুত ও ব্যথাহীনভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারত, তবে প্রত্যেকেই আজ অথবা কাল যেদিনেই হোক একদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মহত্যা করত। কথাটির সত্যতা বিষয়ে পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ব্রিটেন-ফ্রান্স-জার্মানি-জাপানে ড্রাগের মাধ্যমে আত্মহত্যার ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। দস্তইয়েফ্স্কির কিরিলোভ বলে যে, কেবল দুটি কারণ রয়েছে যার জন্য আমরা আত্মহত্যা করি না, তা হলো যন্ত্রণা ও পরকালের ভয়; কিন্তু আধুনিক মানুষ কমবেশি দুটি থেকেই অব্যাহতি পেয়েছে। অতএব আধুনিককালে আত্মহত্যা অনেক বেশি নিশ্চিত, কম যন্ত্রণানির্ভর এবং ইহজাগতিক, আর এ কারণেই অনেকের কাছে হতে পারে পছন্দের।

আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ড্রাগের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে দিল আত্মহত্যার প্রাচীন ভয়ংকর পদ্ধতিগুলোকে। কমে গেল ফাঁস দেওয়া, ডুবে-মরা, গুলি, আঘাত, লাফ ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মহত্যা। এর অর্থ আত্মহত্যা সংঘটনের ক্ষেত্রে একটি শৈলীগত পরিবর্তন দেখা দিল, পরিবর্তিত হলো তার আঙ্গিক। ক্লাসিক আত্মহত্যার যে পদ্ধতিগুলো ছিল—যেমন হেমলক পানে আত্মহত্যা, উদ্যত তরবারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, উপবাস করে আত্মহত্যা, স্নানঘরে রগ কেটে ফেলা বা ক্লেওপাত্রার মতো সর্পদংশনে আত্মহত্যা—তা একনিমিষে অন্তর্হিত হলো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আত্মহত্যার পদ্ধতি শ্রেণিভেদে ভিন্ন হয়ে গেল: উচ্চবর্গের মানুষেরা সে সময়ে সাধারণত পিস্তল দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করত আর নিম্নবর্গের মানুষ ফাঁসিতে। পরবর্তীকালে জলে ডুবে বা আর্সেনিক খেয়ে আত্মহত্যাও জনপ্রিয় হয়। ফ্লবেরের *বাদাম বোভারির* নায়িকাকে দেখা যায় আর্সেনিক খেয়ে আত্মহত্যা করতে, আবার গ্যোয়েটের "তরুণ হের্বের্টের"কে দেখা যায় পিস্তল দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করতে। কিন্তু আধুনিক ড্রাগ এবং গৃহস্থালির গ্যাস এই সবকিছুকে বদলে দিয়েছে অনেকটা। একজন লোক যখন ছুরি নিয়ে নিজ গলা কেটে ফেলে, তখন তা মনে হয় এক হত্যা, যেন সে হত্যা করছে ঠান্ডা মাথায়; কিন্তু যখন একজন ঘুমের বড়ি খায়, তখন মনে হয় সে মরছে না বরং কিছুক্ষণের জন্য বিস্মরণকে খুঁজছে, সুষুপ্তিতে ডুবে যেতে চাইছে। আগে বিষ ছিল একান্তই বিষ, ওষুধ বিষ ছিল না; এখন ওষুধই বিষ হয়ে যেতে পারে। প্রয়োজনীয় ওষুধই অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করলে তা নীরব বিষ হয়ে উঠতে পারে, যদিও তা শারীরিক প্রতিক্রিয়াহীন এবং সৌম্য। ঘুমের ওষুধ মাত্রামতো খেলে তা হয়ে ওঠে প্রশান্তিদায়ক আবার বেশি মাত্রায় খেলে তা হয় জীবনহানিকর। তবে প্রয়োগগত ভিন্নতা ছাড়াও বিষ এবং ওষুধ এখনও সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন। ওষুধ কখনোই জীবননাশক হিসেবে ব্যবহৃত হতো না বা হয়ও না, যদিও এর অতিমাত্রা জীবনহানি ঘটাতে পারে। এ বিষয়ে ডা. নিল কেসেল তাঁর বিখ্যাত রচনা "সেল্ফ-পয়েজনিং"-এ চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, চিকিৎসা-বিপ্লবের কারণে বিষ এখন সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ও তুলনামূলক সংরক্ষণযোগ্য, ফলে আত্মবিষ-প্রয়োগের ক্ষেত্রও অনেকের কাছে অধিক প্রসারিত।

সুতরাং ভালোভাবেই মনে করা যায়, আত্মহত্যা বর্তমানে অনেক স্থিতাবস্থ, তার রূপ কোমল ও মহনীয়। যে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে সহজে ও সময়কে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলোড়িত না করেই, যদিও সময়ের গভীরেই সে প্রত্যাগমন করে। মানুষের মৃত্যু মূলত এক অন্তর্হিত সময়সত্তা। ধর্ম ও দর্শন মৃত্যুকে রহস্যময় করে রেখে দিতে ভালোবাসে। শিল্প ও সাহিত্য ব্যক্তির প্রতিস্বকে দেখাতে গিয়ে একে ভাস্বর ও গ্রহণীয় করে প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে আত্মহত্যাকে বিশ্লেষণ করতে চায়। চায় এর ব্যক্তিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ উদ্‌ঘাটন করতে। ফলে আত্মহত্যা পায় নতুন বিবেচনার ক্ষেত্র। আসলে জীবন ও মৃত্যুর মিলিত সিম্ফনিই হলো আত্মহত্যা। ব্যক্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন বিবেচনাবোধ থেকে তা না-ও উঠে আসতে পারে। জীবনের ক্ষেত্রে মৃত্যুর কি কোনো আবাহন নেই? হয়তো কখনও, বিলম্বিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে, আত্মহত্যা অপরিহার্যভাবেই নতুন এক পথের সন্ধান দেবে। অনেকেরই হয়তো প্রয়োজন হয়ে পড়বে তাকে, কারণ ভুলভাবে হলেও মানুষ তা করবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাত্রামানব ও ইচ্ছামৃত্যুর কথকতা

রজনিতে দেওয়া হবে না একটি তারাকেও চলে যেতে
রাত্রিকেও আর দেওয়া হবে না হতে অপসৃত
আমি মরবই—সঙ্গী করব
অসহ্য বিশ্বের ভার।
সম্মার্জিত করব পিরামিড, বৃহৎ চিত্রকলা
দেশ-মহাদেশ এবং মুখমণ্ডলী।
মুছে দেব স্তূপীকৃত অতীত
তৈরি হবে ইতিহাসের ধুলো, ধুলো আর ধুলো আর ধুলো
অস্তায়মান সূর্যাস্তের পানে স্থিরভাবে তাকাই, পলকহীন
শুনছি শেষ পাখির ডাক
কিছুই শেষমেশ রেখে যাব না কারও জন্য

হোর্হে লুইস বোর্হেস

মৃত্যুবরণ
এক শিল্প, অন্য সবকিছুর মতোই
আমি তা করি চমৎকারভাবে।

সিলভিয়া প্লাথ

মৃত্যু হলো চিরতরে থেমে যাওয়া, আর তা জীবনের চূড়ান্ত মাত্রা নির্ধারণ করে। আত্মহত্যা হলো নিজ জীবনের মাত্রা নিজেই টেনে দেওয়া। আত্মহত্যাকারী হনন করেন নিজেকে। মাত্রা টানেন তার নিজ জীবনের। ব্যক্তি যখন নিজেই নিজের জীবনের মাত্রা টানেন তখন তাকে বলা যায় মাত্রামানব। মাত্রামানব আসলে মাত্রাবিনাশকারীও। কারণ চূড়ান্ত মাত্রাটি স্থাপনের জন্য তারা জীবনের নানা বাঁকের সম্বন্ধস্থাপিত অনেক মাত্রার অপনোদন করেন, জীবনের প্রাকৃতিক মাত্রার নিয়তিকে অস্বীকার করেন। তারা অবচেতনের বরপুত্র। মনোজগতের রাজাধিরাজ। এই অবচেতনের অয়দিপুসদের ভেতর এক অদম্য আত্মহননস্পৃহা, যদিও তার মাত্রাগত পার্থক্য থাকে। মূলত তাদের কাছে আত্মহত্যা তাদের জীবনের প্রকাশ যা আবার ধ্বংস করে জীবনকে।

ইয়ুং বলেছেন, মানব-মন হলো সকল শিল্প ও বিজ্ঞানের জরায়ু।[১] এখান থেকেই জন্ম নেয় শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-চিত্রকলা। শিল্পচর্চা হলো এক বিশেষ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চর্চা।[২] শৈল্পিক সৃষ্টিশীলতার অনুভব, তাঁর কথায়, একদিকে মনস্তত্ত্বীয় অন্যদিকে দুরদৃষ্টিময়।[৩] সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব হলো, ইয়ুং-এর ভাষায়, এক ধাঁধা যাকে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি কিন্তু ব্যর্থ হই।[৪] এই সৃষ্টিশীল লোকদের মধ্যে দেখা যায় পরস্পর বিপরীত গুণাবলির সংশ্লেষণ: একদিকে ব্যক্তিক জীবন নিয়ে সে মানুষ, অন্যদিকে তার নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টি-প্রক্রিয়া। মানুষ হিসেবে সে হতে পারে ভালোমন্দের, কিন্তু শিল্পী হিসেবে তার সার্থকতা নিরূপিত হবে তার সৃষ্টিশীলতা দ্বারা। উচ্চতা ও নিম্নতার বিচারে সে হতে পারে ফাউস্ট বা মেফিস্টোফেলিস, কিন্তু শিল্পের ঐশ্বর্য দ্বারাই বিচার হয় তার সৃষ্টিশীলতার।[৫]

মাত্রামানব হতে পারেন সৃষ্টিশীল। অথবা আমরা বলতে পারি, সৃষ্টিশীল মানব যখন স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নেন তখন তাকে বলা যায় মাত্রামানব। এক মনস্তাত্ত্বিক চর্চার ভেতর দিয়েই এগিয়ে যায় তাঁদের জীবন। তাঁদের মৃত্যুও আসলে এক মনস্তাত্ত্বিক চর্চার ফলাফল। ফলাফল যদিও এক তবু তার উপক্রমণিকায় বিভাব আছে, মাধুর্য ও মাত্রিকতা আছে। এই জাতের মাত্রামানবদের মৃত্যুর রূপ-নকশাকে আমরা দেখতে পারি। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু অনাদৃত কিন্তু মাত্রামানবেরা কখনও সজ্ঞানে কখনও বা অবচেতনে অনবরত নিজেদের মৃত্যুর আঙ্গিককে নির্ধারণ করেছেন। কখনও সুস্থির মনোপ্রবণতায় ঘটনার বহির্কাঠামোকে রূপায়িত করতে আন্তরিক হয়ে ওঠেন তাঁরা, কখনও বা অপরিণামদর্শীভাবে মুখোমুখি হন ঘটনাদিগন্তের। যা কিছুই হোক, তাঁরা প্রেরণা পেয়েছেন তাদের অবচেতন থেকে। হয়তো অবচেতনই তাঁদের ঈশ্বর। অবচেতনের এক সংহত আচ্ছন্নতায় অবশেষে তাঁরা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন। অমূলপ্রত্যক্ষণ আর ভ্রমাত্মক চিন্তার সহযোগে অবশেষে তাঁরা করে বসেন সেই কাজটি। অধিকাংশই মনে মনে দীর্ঘদিন ধরে লালন করেন আত্মহত্যা অভীপ্সাকে;[৬] অতঃপর নির্ধারণ করতে থাকেন প্রকৃত দিনক্ষণটির।

ভার্জিনিয়া উল্ফ (১৮৮২-১৯৪১), বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম স্থপতি, ১৯৪১ সালের ২৭ মার্চ মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়লেন শেষবারের মতো। এর আগেও কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে বিফল হন।

সূর্যের প্রখর আলোয় উদ্ভাসিত এক সকালে তিনি আউজ নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। হয়তো এটি ছিল এক প্রস্তুতিময় আত্মহত্যা যার মাধ্যমে তিনি অর্জন করলেন সেই অভিজ্ঞতা যার বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, ''যা আমি কখনোই বলে যাব না।''[৭]

পাউল সেলান (১৯২০-১৯৭০), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি, মিরাবো সেতু থেকে স্যেন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। আত্মহত্যার আগমুহূর্তে নিজের লেখার টেবিলে পড়েছিলেন জার্মান মহৎ কবি হ্যোল্ডারলিনের জীবনী, যেখানে সেলান রেখাঙ্কিত করেন এই পঙ্ক্তিটি: "কখনও কখনও এই মনীষী চলে যান গভীরে আর ডুবে যান হৃদয়ের মর্মভেদী কূপের ভেতর।"[৮] এই ইহুদি-জার্মান কবি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কাটিয়েছেন দুঃসময়।

গেয়র্গ ট্রাকল (১৮৮৭-১৯১৪), জার্মান ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, জন্মগ্রহণ করেন ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭ জাল্‌সবুর্গে শহরে। ১৯১৪ সাল, শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। মেডিক্যাল কোরে তাঁকে ডাকা হলো। গ্রোডেকের[৯] ভয়াবহ ও ভয়ংকর যুদ্ধের পর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গোলাঘরে শায়িত নব্বইজন আহতকে দেখার দায়িত্ব তাঁর ওপর পড়ল। আহতদের অসহ্য কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না তিনি, ঘোষণা দেন জীবন সমাপ্ত করার। মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁকে পাঠানো হলো সামরিক হাসপাতালে। সেখানে ডাক্তারেরা তাঁকে স্কিট্সোফ্রেনিয়াগ্রস্ত রোগী বলে চিহ্নিত করল। রাখা হলো অন্য এক রোগীর সাথে সেলে। ১৯১৪ সালের ৩ নভেম্বর অতিরিক্ত কোকেন সেবনের মাধ্যমে তিনি আত্মহত্যা করেন। ট্রাকল ছিলেন উৎকেন্দ্রিক ও ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ।

হার্ট ক্রেন (১৮৯৯-১৯৩২), বান্ধবীকে নিয়ে সমুদ্রপথে মেক্সিকো যাচ্ছিলেন। সমুদ্রভ্রমণ পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে হয়ে উঠল বিষাদময়। কাউলির কথায় আঘাত পেয়ে জাহাজের রেলিং থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন, স্টুয়ার্ড এসে সেযাত্রা রক্ষা করল। অতঃপর আকণ্ঠ মদ্যপান করলেন। কাউলিকে গিয়ে বললেন "বিদায়", তারপর জাহাজ থেকে সমুদ্রে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

কনস্টানস এফ উলসন (১৮৪০-১৮৯৪), তাঁর মা ছিলেন জেমস ফেনিমোর কুপার-এর ভ্রাতুষ্পুত্রী। তাঁর বাবা ছিলেন বায়ুরোগী। পরবর্তী সময়ে তিনিও তাঁর পিতার মতো আক্রান্ত হন বিষাদগ্রস্ততায়। তিনি বলতেন যে, এটি তাঁর পারিবারিক রোগ। দীর্ঘদিন কাটান একাকিত্বময় জীবন।

১৮৯৩ সালের জুন মাসে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত উলসন ইংল্যান্ড ত্যাগ করে ইতালির ভেনিসে যান, সেখানে তিনি এক হোটেলে ওঠেন যেখান থেকে ভেনিসের সুদৃশ্য খালের সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। গ্রীষ্মের মাসগুলোতে তিনি সকাল ৪.৩০ টায় উঠে প্রাতঃরাশের সময় পর্যন্ত একটানা লিখে যেতেন, এরপর কিছুটা সময় বিরতি দিয়ে আবার বিকেল পর্যন্ত লিখতে থাকতেন। তারপর গন্ডোলা নিয়ে তিনি লিডোতে চলে গিয়ে স্নান সারতেন। তারপর হোটেলে ফিরে এসে খেয়ে-দেয়ে আবার খালগুলোতে ঘুরে ঘুরে সংগীত উপভোগ করতেন আর মার্বেল প্রাসাদগুলো দেখতেন। এই জীবনযাপনের ভেতর দিয়ে এক-একটি বই লিখে ফেলার পর তিনি আক্রান্ত হতেন বিষাদ আর হতাশায়, ঠিক এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সক্রিয়তা, যেমনটি হতো ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ও অন্য অনেকের। উলসন স্বীকার করেছিলেন, তাঁর নিয়মিত প্রার্থনা ছিল যেন বৃদ্ধা হয়ে তাঁকে বাঁচতে না হয়। ১৯৯৪-এর জানুয়ারির মাঝামাঝিতে উলসন পুনরায় আক্রান্ত হন ইনফ্লুয়েঞ্জা ও জ্বরে। নার্স ডাকা হলো। ১৮৯৪ সালের জানুয়ারির ২৪ তারিখে উলসন ছুতো করে নার্সকে নিকটস্থ ড্রয়িংরুম থেকে তাঁর জন্য কিছু পত্রিকা আনতে বলে পাঠিয়ে দেন। নার্স চলে যেতেই উলসন বিছানা থেকে উঠে জানালা খুলে লাফ দেন খোয়া-বিছানো রাস্তায়। কিন্তু বেঁচে থাকলেন। দুজন পথচারীর সাহায্যে তাঁকে নিয়ে আসা হয় তাঁর ঘরে। ডাক্তার ডাকা হয়। দিন না যেতেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।

ভ্লাদিমির মায়াকোভ্‌স্কি (১৮৯৩-১৯৩০) আত্মহত্যাকে খুব ঘৃণা করতেন। ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে কবি সের্গেই এসেনিন আত্মহত্যা করলে তিনি তার মারাত্মক সমালোচনা করেন। বলশেভিক বিপ্লবের সমর্থক বিপ্লবোত্তর সময়ে নির্মোহ হন এই বিষয়ে। লিখতে থাকেন চিত্রকল্পময় নিয়ো-রোমান্টিক কবিতা। ১৯২৩ সালে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইসাডোরা ডানকানের সাথে বিয়ের ব্যর্থতায় এসেনিন হয়ে ওঠেন খিটখিটে মেজাজি। হয়ে পড়েন অ্যালকোহল ও ড্রাগ-আসক্ত। তলস্তোয়ের নাতনিকে দ্বিতীয় বিয়ে করে পুনঃ সুখী হতে চান কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। নিজের রক্ত দিয়ে লেখেন আত্মহত্যা-প্রতিবেদনের কবিতা, তারপর ৩০ বছর বয়সে এসেনিন লেনিনগ্রাদে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। অস্পষ্ট শেষ কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি ছিল: "এই জীবনে মৃত্যু নয় নতুন কিছু/আর, প্রকৃতপক্ষে, বাঁচাও নয় নবতর কিছু।" মায়োকোভ্‌স্কি, পরে, তাঁর লেখা "সের্গেই এসেনিনের প্রতি" কবিতায় এই পঙ্‌ক্তিগুলোকে উল্লেখ করেন অন্যরকম করে।

এর পাঁচ বছর পর মায়োকোভ্‌স্কি নিজেই শেষ করেন নিজের জীবন। তরুণ বয়সে লিখেছিলেন: একটি বুলেটের অপেক্ষায় রয়েছে হৃদয়:/ক্ষুরের হিম স্পর্শ চায় কণ্ঠনালি। ১৯৩০ সালের ১৪ এপ্রিল তিনি তাঁর রিভলভারে একটি বুলেট ঢোকান, তারপর তাঁর হৃৎপিণ্ডের দিকে তাক করে ট্রিগার টানেন। এটা ছিল তাঁর তৃতীয় প্রচেষ্টা, তিনি এই খেলায় হেরে গেলেন। কার্তুজ ভরার আগে তিনি পরিবর্তন করেন তাঁর গায়ের জামা। পুরোনো রুশ প্রবাদ অনুযায়ী নতুন লিনেন কাপড় পড়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার নিয়ম রয়েছে। মৃত্যুর আগে লেখেন একটি কবিতা ও চিঠি। চিঠি লেখা হয় "সকলকে" উদ্দেশ করে: "মৃত্যুর জন্য আমাকে আর দোষ দেবেন না, আর হ্যাঁ, আড্ডা দেবেন না প্লিজ। এ জাতীয় কাজ মৃতরা অপছন্দ করে। মা, বোন, কমরেড্‌স, আমাকে ক্ষমা করো... আমাকে ভেবো না দুর্বল চিত্তের। সত্যি সত্যিই বলছি, এছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। শুভকামনায়।"[১০]

সিলভিয়া প্লাথ (১৯৩২-১৯৬৩), পিতা অটো এমিল প্লাথ, স্বামী বিখ্যাত কবি টেড হিউজ, নিজেকে ভাবতেন "লেডি ল্যাজারাস" একাধিকবার সচেষ্ট ছিলেন আত্মহত্যায়। "লেডি ল্যাজারাস" কবিতায় তিনি বলেছেন যে প্রতি দশ বছরে কমপক্ষে একবার আত্মহত্যায় তিনি আগ্রহী হয়ে উঠতেন, এবং দেখা যায়, তাঁর প্রথম ব্যর্থ আত্মহত্যার চেষ্টার ঠিক দশ বছর পর ১৯৬৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি আত্মহত্যায় সফল হন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে লেখা কবিতা "প্রান্ত"-এ তিনি লেখেন যে মৃত্যু একজন নারীকে পূর্ণতা দেয়;[১১] তার প্রত্যেকটি স্তন এক মৃতশিশু। আত্মহত্যার আগে দুই শিশুসন্তান নিয়ে তিনি ছিলেন ভাবিত, সময়টা ছিল শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি মারাত্মক শীতকাল, বলা হয় যে গত দেড়শ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ শীতকাল।

সকাল ৬ টায় বাচ্চাদের শয্যাপাশে দুধ আর ব্রেড ও বাটার রেখে রান্নাঘরে ঢুকে বন্ধ করে দেন দরজা-জানালা। জানালার ফাঁকগুলো টেপ দিয়ে এবং দরজার নীচটা টাওয়েল দিয়ে বন্ধ করে দেন যাতে গ্যাস ঢুকতে না পারে বাচ্চাদের ঘরে। গ্যাসের চুলায় মুখ দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।

স্বামী টেড হিউজকে নিয়ে তিনি ছিলেন অসন্তুষ্ট। ভারতীয় কবি ডেভিড উইভিলের পত্নী আসিয়া উইভিলের সাথে টেড হিউজের সম্পর্ক হওয়ায় সিলভিয়া প্লাথ মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৮-১৯৬১) ভাবতেন যে জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে, বেঁচে থাকাও তাই চূড়ান্ত অর্থহীনতার বহিশ্চারণা। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পিতার আত্মহত্যার[১২] মতোই এক ধরনের "দুর্বলতা" সুপ্তভাবে সক্রিয় ছিল তাঁর মধ্যে। জীবনে তিনি বিয়ে করেছিলেন চারটি;[১৩] সবগুলো সম্পর্কই ছিল অশান্তির। ১৯৫৪ সালে *দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি*র জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান। শেষ সময়ে শারীরিক ও মানসিক অবসাদে তিনি ভাবতেন, তাঁর লেখার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। লেখা তাঁর জন্য এক অনিবার্য কষ্টকর কাজ, যদি দিনে পাঁচশ শব্দও লেখা যায় তবেই তিনি ভাগ্যবান। মৎস্য-শিকার, ষাঁড়ের যুদ্ধে অংশ নিতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির পদাতিক বাহিনীতে অ্যাম্বুল্যান্স ড্রাইভারের কাজ নিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়ে দেশে ফেরেন। যুদ্ধের প্রভাব তাঁর জীবনকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও তিনি সাংবাদিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের প্রতি তাঁর ছিল এক অনিবার্য মোহ। তিনি ছিলেন শারীরিক শক্তির পূজারী। নিট্‌শের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুবিহীন শারীরিক আঘাত জীবনকে চাঙা করে তোলে। ১৯৫৪ সালে আফ্রিকার জঙ্গলে দুইবার বিমান ভেঙে পড়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হন। মৃত্যু আর জীবনের সংগ্রামকেই তিনি তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। দৈহিক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে তাঁর জীবন অগ্রায়িত হয়েছে। জীবিতাবস্থায় শুনেছেন নিজ মৃত্যুর খবর প্রচার হতে। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন অনেকবার। পিতাও আত্মহত্যা করেছিলেন, সারাজীবন তিনি তাড়িত ছিলেন এই ঘটনায়।

বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়ে যান। ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে, স্থানীয় এক হাসপাতাল থেকে আসার পর এক সকালে ঘরের কোণে শর্টগান নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। ২ জুলাই ভোরে উঠে ভূতলের স্টোররুম থেকে বন্দুক নিয়ে বন্দুকের বাট মেঝেতে রেখে ব্যারেলে মাথা ঠেকিয়ে দুইবার ট্রিগার টিপেন।

অ্যান সেক্সটন (১৯২৮-১৯৭৪), অ্যামেরিকান কনফেশনাল কবি, নিজ কবিতায় প্রকাশ করেছেন তাঁর নিজ মৃত্যু-অভীপ্সাকে।[১৪] ছিলেন মানসিকভাবে অসুস্থ, যা তাঁর কবিতাকে উর্বর করেছে। বহুবার চেষ্টা করেছেন আত্মহত্যার, সার্থক হন ৪ অক্টোবর, ১৯৭৪। তাঁর মৃত্যুতে কেউ আশ্চর্য হয়নি। সারাজীবন ছিলেন ধ্বংসকামী ও মৃত্যুপাগল। স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্ত, এমনকি প্রথম কন্যার সাথে যৌন-সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যত।

মৃত্যুর দিন, অ্যান সেক্সটন জাপানি লেখক ইউকিয়ো মিশিমার মতোই, তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সহকর্মী-লেখক এবং শুভানুধ্যায়ী ম্যাক্সিন কুমিনের সাথে মধ্যাহ্নভোজে যান এবং তাঁর সর্বশেষ কবিতাগ্রন্থ *দ্য অ্যাফুল রোয়িং টুওয়ার্ড গড*-এর গ্যালির প্রুফ দেখেন ও সংশোধন করেন। তার আগে, সকালে, তিনি তাঁর থেরাপিস্ট বারবারা সোঁয়ার্জস-এর সাথে দেখা করে তার উদ্দেশে লেখা কবিতা "দ্য গ্রিন রুম" তাকে দেখান। নয় মাস ধরে সেক্সটন তার অধীনে চিকিৎসারত ছিলেন। থেরাপিস্টের ঘরে তিনি তাঁর সিগারেট ও লাইটার ফেলে আসেন। এটা কি কোনো তাৎপর্যময় সংকেত ছিল? মধ্যাহ্নভোজ সেরে কুমিনকে বিদায় জানিয়ে তিনি ঘরে ফিরে আসেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আঙুল থেকে আংটি খুলে পার্সে ঢুকিয়ে রাখলেন, তারপর তাঁর মায়ের এক পুরোনো আঙ্‌রাখায় নিজেকে মুড়ে নিলেন, যেন জরায়ুবস্থায় ফিরে গেলেন। তারপর ভোদ্‌কা গিলে আর এক গ্লাস সাথে নিয়ে গ্যারেজের সামনে গিয়ে তাঁর লাল কগার গাড়ির সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ করে গাড়িতে উঠে রেডিয়ো ছেড়ে দিয়ে গ্যাস বিস্ফোরণ ঘটান তিনি। কোনো আত্মহত্যালিপি রেখে যাননি।

জন ডেভিডসন (১৮৫৭-১৯০৯) স্কটিশ কবি, নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক; ১৯০৯ সালের ২৩ মার্চ, মঙ্গলবার, বিকেল ৬.৩০ টার দিকে তাঁর ভাড়া করা বাসা ৬ কাউলসন্ ট্যারেস, পেনজানস, ইংল্যান্ড থেকে বের হয়ে যান কর্নওয়াল উপকূলের দিকে। তিনি শেষ করে উঠেছিলেন তাঁর নতুন কাব্য *ফ্লিট স্ট্রিট অ্যান্ড আদার পোয়েমস*। বাসা থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন, ঝোঁক বশতই, এই পাণ্ডুলিপি আর পাঠকের প্রতিবেদন-সংক্রান্ত আর একটি পাণ্ডুলিপি তাঁর লন্ডনের প্রকাশক গ্র্যান্ড রিচার্ডস-এর কাছে পার্সেল করার জন্য। তাঁর স্ত্রী ম্যাগি তা-ই ভেবেছিলেন। পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে শুধু পাঠকের প্রতিবেদন-সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপিটিই রিচার্ডস-এর কার্লটন স্ট্রিট অফিসে পৌঁছেছিল। লোকজন ডেভিডসনকে দেখেছিল পোস্ট অফিসে, তারপর স্টার হোটেলে, যেখানে তিনি হুইস্কি খেয়েছিলেন এবং তারপর সিগার টানতে টানতে ঘরমুখী হয়েছিলেন। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ক্যাবল অফিসের তারবার্তা-প্রেরণকারীও দেখেছিল যে তিনি হোটেল থেকে চলে যাচ্ছিলেন। এই ছিল একান্ন বছর বয়সি কবির অন্তর্ধানের শেষ সাক্ষ্য। সারাদিন লেখালেখির পর তিনি বিকেলবেলায় হাঁটতে বেরুতেন। ঘরে না ফিরে আসায় তাঁর স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ডেভিডসন হয়তো হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত বা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছেন। খোঁজ করা হলো কিন্তু কোনো ফল পাওয়া গেল না। প্রকাশক রিচার্ডসকে ম্যাগি টেলিগ্রাম করলেন; ম্যাগি ভেবেছিলেন যে হয়তো তাদের না জানিয়ে ডেভিডসন লন্ডনে গিয়েছেন। ফেরত তারবার্তায় রিচার্ডস জানালেন যে তারা কবির একটি পার্সেল পেয়েছেন। পুলিশকে ঘটনা জানানো হলো। পুলিশ বাসায় এসে জানতে চাইল যে কোনো আত্মহত্যাপত্র পাওয়া গেছে কি না।

দীর্ঘদিন ধরেই ডেভিডসন মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। তিনি ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন আর শারীরিকভাবে ভুগছিলেন হাঁপানিতে। তিনি বিশ্বাস করতেন, জীবন এক মহান মহাজাগতিক ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।[১৫] অস্তিত্ব শরীর ও মন, মানব ও মানবী, স্থান ও কাল, রাত ও দিনের মিথ্যা দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। মৃত্যুতেই এই দ্বৈততার অবসান হয়। জগতের ধাঁধা নীহারিকা-সংক্রান্ত তত্ত্বের মাধ্যমেই উত্তরযোগ্য। মহাজগৎ বৈজ্ঞানিক নিয়ম-কানুনে পরিচালিত, বস্তুগত সত্যকে তাই অস্বীকার করা যায় না। ডেভিডসন বিশ্বাস করতেন, মানুষ সুপ্তভাবে বিলুপ্ত হতে কাঙ্ক্ষাবোধ করে আদি অবস্থানে ফিরে যাবার জন্য, যা আন্তঃনাক্ষত্রিক অসীমতার মধ্যেই অবস্থান করে। সব কষ্টকর দ্বন্দ্বেরই সমাধান সৃষ্টির অবচেতন শক্তির মধ্যে নিহিত।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৯, দুই জেলে ভাসমান কিছু দেখতে পায়? সমুদ্রে গাঙচিল যা নিয়ে জটলা করছিল — তারা দ্যাখে, প্রায় বিগলিত একটি শব, কালো কোটে আবৃত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোটের পকেটে ছিল পাইপ, ছুরি, এক পেকেট তামাক, আর একটি রুপার দেশলাই-বাক্স। জন ডেভিডসনের ইচ্ছা ছিল সমুদ্রে সমাধিস্থ হওয়ার। প্রায় ছয় মাস তাঁর দেহ সমুদ্রেই ছিল।

ইউকিয়ো মিশিমা (১৯২৫-১৯৭০) বিশ্বাস করতেন, সুন্দর বস্তু ধ্বংসক্ষণেই তার পূর্ণ মহিমায় বিভাসিত হয়।[১৬] তাঁর গল্প-উপন্যাসে নির্দয় ও বন্যতাকে মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন মিশিমা। তিনি বলেছেন, রক্ত ও নিষ্ঠুরতা অবচেতন থেকে আসে। সামুরাই যোদ্ধাদের মতোই ছুরি দিয়ে পেট চিরে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁর মৃত্যু মানুষের মাঝে এক আধ্যাত্মিক জাগরণের সৃষ্টি করবে, ফিনিক্স পাখির ছাই থেকে জন্ম নেবে এক নতুন জীবনের। মিশিমা বিংশ শতাব্দীর জাপানি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখক, জন্মগত নাম ছিল কিমিতাকে হিরাওকা। ছিলেন কবি-নাট্যকার-অভিনেতা-চলচ্চিত্র পরিচালক। তিনবার মনোনয়ন পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কারের জন্য, ১৯৬৮ সালে প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন কিন্তু নিজ দেশীয় ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার কাছে পরাজিত হন। ১৯৭০ সালের ২৫ নভেম্বর সেপ্পুকু রীতির আত্মহত্যা করে জীবনাবসান ঘটান। আত্মহত্যার ঠিক আগে তিনি লিখে শেষ করেছিলেন তাঁর রচনা *উর্বরতার সমুদ্র*। যুদ্ধোত্তর সময়ে তিনি ছিলেন জাপানি ভাষার সবচেয়ে নতুন ধারার একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। ১৯৮৮ সাল থেকে তাঁর সম্মানে চালু হয় মিশিমা পুরস্কার।

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা (১৮৯৯-১৯৭২) ১৯৬৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান।[১৭] ১৯৭২ সালের ১৬ এপ্রিল ৩ টায় ঘর থেকে বেরিয়ে যান হাঁটার জন্য। তিনি বাস করতেন সমুদ্র-তীরবর্তী বিশাল বুদ্ধমূর্তির জন্য বিখ্যাত শহর কামাকুরুতে। ৭২ বছর বয়স্ক কাওয়াবাতা ছিলেন অসুস্থ, তাঁর স্ত্রীকে বলে গিয়েছিলেন, একটু পরেই ফিরে আসবেন। সূর্যাস্তের পরও তিনি না আসাতে মিসেস কাওয়াবাতা এক কাজের মহিলাকে পাঠান নিকটবর্তী জুসি শহরে। সেখানে কাওয়াবাতা সমুদ্রমুখী একটি অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে একটি ঘর নিয়ে থাকতেন এবং তিনি তাঁর লেখালেখির কাজ করতেন। মহিলাটি এসে দেখল ঘর ভেতর থেকে বন্ধ, সে গ্যাসের গন্ধ পেল। তাড়াতাড়ি পুলিশ ডাকা হলো। দরজা ভেঙে দেখা গেল কাওয়াবাতার দেহ বাথরুমের দরজার কাছে পড়ে রয়েছে, মুখের ভেতর গ্যাসের নল ঢুকানো[১৮]। যদিও সচরাচর কাওয়াবাতা পরতেন ঐতিহ্যবাহী জাপানি কিমোনো, কিন্তু সেদিন পরেছিলেন বিজনেস স্যুট ও ওয়েস্টার্ন পোলো শার্ট। পাশে ছিল মুখ-খোলা একটি হুইস্কির বোতল। মৃত্যুর আগে নিশ্চয়ই একটু হুইস্কি পান করেছিলেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম জাপানি ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা।

জন বেরিম্যান (১৯১৪-১৯৭২), সারাজীবন ছিলেন পিতার আত্মহত্যায় তাড়িত।[১৯] ১৯২৬ সালের ২৬ জুন যখন তাঁর পিতা জন অ্যালাইন স্মিথ আত্মহত্যা করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ১১ বছর। বহুবার আত্মহত্যায় ছিলেন উদ্‌যোগী। ১৯৭০ সালে লেখেন কবিতা "অব সুইসাইড"। সেখানে তাঁর একটি পঙ্‌ক্তি এরকম: "আত্মহত্যা বিষয়ে আমি অবিরত ভাবছি।"[২০] বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ তাঁকে ভাবিয়েছে। তাঁর মতে, এই শতাব্দী কবিদের জন্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শত্রুভাবাপন্ন। ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি এক বোতল হুইস্কি কিনে তিনি পান করতে লাগলেন আর ওয়াশিংটন অ্যাভিনিউ ব্রিজ থেকে লাফ দিয়ে জীবন শেষ করতে মনস্থ করলেন। ৫ জানুয়ারি বিকেলে রান্নাঘরে চিরকুট লিখলেন: "আমি এক ন্যুইসেন্স।" দুই দিন পর ৭ জানুয়ারি সকালবেলা, এক তীব্র ঠান্ডা দিনে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন যে তিনি তাঁর অফিস পরিষ্কার করতে ক্যাম্পাসে যাচ্ছেন। আরও বললেন যে, "তুমি আর আমার জন্য দুঃখ কোরো না।" সকাল ৯.৩০ টায় তিনি ব্রিজে পৌঁছোলেন, উত্তর-পার্শ্বের বুক-সমান রেলিংয়ে চড়ে বসলেন। লাফ দিয়ে ১০০ ফুট নীচে বাঁধের ওপর তিনি পড়লেন। পকেটের নোটবইয়ে রক্ষিত খালি চেকটি পেয়ে পুলিশ লাশ শনাক্ত করল।

ভ্যাশেল লিন্ডসে (১৮৭৯-১৯৩১), কবি, বাথরুমে লাইসন বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন। টি-গ্লাসে বিষ ঢেলে খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। শব্দ পেয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন এবং বমি করাবার চেষ্টা করেন। ডাক্তার ম্যাকমিনকে টেলিফোন করা হলো; তখন লিন্ডসে ছিলেন অর্ধ-চেতনাবস্থায়। ডাক্তার এলেন, দেখলেন লিন্ডসের নিশ্বাস বন্ধ, মুখ নীল, নাড়ির গতি মৃদু। কয়েক মিনিট পরই ১৯৩১ সালের ৫ ডিসেম্বর বেলা ১ টার দিকে লিন্ডসে মারা যান।

সারা টিসডাল (১৮৮৪-১৯৩৩), ১৯৩৩ সালের ২৯ জানুয়ারি আত্মহত্যা করেন। সকাল ৯ টায় তাঁর ব্যক্তিগত নার্স মিস রিটা ব্রাউন নিউ ইয়র্ক সিটির ফিফ্থ অ্যাভিনিউর বাথটাবের গরম জলে ডুবন্ত অবস্থায় তাঁকে আবিষ্কার করেন। তিনি ছিলেন অসুস্থ। গত সেপ্টেম্বর থেকে, যখন টিসডাল ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় ফিরে আসেন, নার্স রিটা ব্রাউনই তাঁর দেখাশোনা করছিলেন। ইংল্যান্ডে কবি ক্রিশ্চিয়ানা রসেটির প্রস্তাবিত জীবনী রচনার লক্ষ্যে তিনি গবেষণার কাজে ছিলেন এবং মৃত্যুর আগে সূচনাংশের ৪০ পৃষ্ঠা লিখতে পেরেছিলেন। লন্ডনে তিনি মারাত্মকভাবে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং আমেরিকায় ফিরে আসেন। মৃত্যুকে তিনি মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তিনি ছিলেন গভীর ডিপ্রেশনে আক্রান্ত।

ক্লাউস মান (১৯০৬–১৯৪৯), বিখ্যাত লেখক টমাস মানের পুত্র, যিনি নিজেও ছিলেন লেখক, ১৯৪৯ সালের ২১ মে ফ্রান্সের ক্যানেসে অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর পিতা টমাস মান, মা কাতিয়া মান, বোন এরিকা অভেন গ্রেট ব্রিটেন থেকে সুইডেনে এসে এই খবর পান। *নিউ ইয়র্ক টাইমস* এই বলে খবর ছাপে যে, বেয়াল্লিশ বছর বয়স্ক ক্লাউস মান হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এবং তাঁর মাতা-পিতা তাঁর মৃত্যুতে যারপরনাই খুশি হয়েছেন।[২১] এটা ছিল ক্লাউস মানের আত্মহত্যার দ্বিতীয় উদ্‌যোগ; এর আগে, ১৯৪৮ সালের ১১ জুলাই ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টামোনিকাতে তিনি প্রথমবারের মতো আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।[২২] যুবক বয়স থেকেই মৃত্যুর সাথে অন্তরঙ্গ আশ্লিষ্টতা তাঁর।[২৩] তাঁর ছিল মনোরোগ; ছিলেন সমকামীও। তাঁর কাছে জীবন কিছুই না, শুধু কষ্টের, আর মৃত্যু হলো সুখদ পরিসমাপ্তি। যুদ্ধোত্তর ঠান্ডা লড়াইও তাঁকে ব্যথিত করেছিল।[২৪] লেখায় সার্থকতা না পেয়ে তিনি ড্রাগে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

রোজ লকরিজ (১৯১৪-১৯৪৮), কথাসাহিত্যিক, ১০৬৬ পৃষ্ঠার একমাত্র বিশাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস *রেনট্রি কাউনটি* প্রকাশের দুই মাস পর, ৬ মার্চ, ১৯৪৮, তেত্রিশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। তাঁর ওপর জেমস জয়েসের প্রভাব ছিল অসীম, এবং *ইউলিসিস*-এর মতোই একদিনের ঘটনা নিয়েই *রেনট্রি কাউনটি*। এই উপন্যাসটি লেখার পর লকরিজ ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হন। ডাকঘরে যাবার ভান করে লকরিজ তাঁর ইন্ডিয়ানার ব্লুমিংটনের বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। ৬ মার্চ, ১৯৪৮ বেলা এগারোটার একটু আগে, দেরি দেখে তাঁর স্ত্রী ভারনিস লকরিজ গ্যারেজে গিয়ে দেখেন, গাড়ি গ্যারেজে আছে ঠিক ঠিক কিন্তু এঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে। গাড়ির দরজা খুলে লাইট জ্বালিয়ে দেখেন, পেছনের আসনে তাঁর স্বামী সোজা বসে আছে। গ্যাসে পূর্ণ হয়ে গেছে গ্যারেজ। কার্বন-মনো-অক্সাইডের বিষক্রিয়ায় রোজ লকরিজের মৃত্যু হয় এভাবেই।

চিজারে পাভেজে (১৯০৮-১৯৫০), ইতালির বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, ২৬ আগস্ট, ১৯৫০, বেয়াল্লিশ বছর বয়সে অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার কারণ হিসেবে তিনি এক আমেরিকান মহিলার সাথে অসুখী প্রেমকে দায়ী করেছেন।[২৫] ডায়েরিতে তিনি লিখেছিলেন : "শব্দ নয়। কাজ। আমি আর কখনও লিখব না।"[২৬]

চার্লস জেকসন (১৯০৩-১৯৬৮), আমেরিকান লেখক, ১৯৬৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে নিউ ইয়র্কে চেলসিয়া হোটেল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তাঁকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তিনি মৃত্যু অবধি অচেতন ও কোমা অবস্থায় ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন ৬৫ বছর বয়স্ক। তাঁর সাহিত্যিক এজেন্ট জানান, মৃত্যু ছিল দুর্ঘটনাবশত; আত্মহত্যার কোনো ইচ্ছা ছিল না তাঁর। যদিও তাঁর বহু উপন্যাস ও গল্পে আত্মহত্যা ভাব ও অনুষঙ্গ হিসেবে অলংকৃত। ১৯০৩ সালের ৬ এপ্রিল তাঁর জন্ম হয় নিউজার্সিতে। ১৯২৭ সালে জেকসন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। ১৯২৯-এ তিনি সুইটজারল্যান্ডের দাবোস-এ চিকিৎসার জন্য যান, যেখানে টমাস মান তাঁর *ম্যাজিক মাউন্টেন*-এর কাহিনি ফাঁদেন। মানের নায়ক হ্যান্স কাসটোর্পের মতো সাত বছর স্যানাটারিয়ামে ছিলেন না জেকসন, ছিলেন ১৯৩১ সালের জুলাই পর্যন্ত।[২৭] তাঁর উপন্যাসগুলোতেও তিনি আত্মধ্বংসী চরিত্র চিত্রণে নিয়োজিত ছিলেন।

রোঁমা গ্যারি[২৮] (১৯১৪-১৯৮০), ঔপন্যাসিক-কূটনীতিক ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসময়ের চলচ্চিত্রের নায়ক, ২ ডিসেম্বর ১৯৮০, তাঁর প্যারিসের অ্যাপার্টমেন্টে, নিজের মাথায় বন্দুক দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর আগ সময়ে উদ্বেগ ও স্নায়ুগত উত্তেজনা-রোগে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তাঁর শেষের স্ত্রী, আমেরিকার সিনেমা-তারকা জা সেবার্গও, ১৫ মাস আগে, ১৯৭৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ৪০ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন, মদ ও ঘুমের ওষুধের অতিরিক্ত পানে তাঁর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু গ্যারিকে বিষাদিত করেছিল। তাঁর মৃত্যুর কারণ নির্বেদ, নিঃশেষ মনোভার ও অপরিত্রাণণীয় বেদনা।

আর্থার কোয়েস্টলার[২৯] (১৯০৫-১৯৮৩), হাঙ্গেরিতে জন্মগ্রহণকারী ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক, ১৯৮৩ সালের ২ মার্চ, তাঁর তৃতীয় স্ত্রী সিনথিয়া জেফারিসসহ, একসাথে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। কাজের মহিলা এমিলিয়া মেরিনো পরের দিন কাজ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এসে চেয়ারের মধ্যে বসা অবস্থায় মৃতদেহ দুটি দেখতে পায়। মৃত্যুর আগ সময়ে ৭৭ বছর বয়স্ক কোয়েস্টলার পারকিনসন ও লিউকেমিয়া রোগে ভুগছিলেন।[৩০] চিরকুট লিখে কাজের মহিলাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে ফোন করার জন্য।

স্টেফান ৎসভাইগ (১৮৮২-১৯৪২), জার্মানভাষী ইহুদি লেখক ও নাট্যকার, ১৮৮২ সালের ২৮ নভেম্বর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়, জন্মগ্রহণ করেন। নিজেকে তিনি ভাবতেন দেশহীন এক ভ্রাম্যমাণ ইহুদি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথমে ইংল্যান্ডে তারপর আমেরিকায় এবং সর্বশেষে ব্রাজিলে বসবাস করেন। ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরোর সন্নিকটে পেট্রোপলিশে প্রথম স্ত্রীর সাথে বসবাস করছিলেন তিনি। ১৯৪২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রিও ডি জেনেরোর বিশ্ববিখ্যাত কার্নিভালে তিনি অংশগ্রহণ করেন। পরের দিন তাঁরা শোনেন যে সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে: শুনেই তাঁরা পেট্রোপলিশে ফিরে আসেন এবং দুজন একসাথে আত্মহত্যার সন্ধিতে আসেন। পাঁচদিন ধরে তাঁরা আত্মহত্যার প্রস্তুতি নেন। ২২ ফেব্রুয়ারি রাতে অথবা ২৩ ফেব্রুয়ারি সকালে তাঁরা অত্যধিক মাত্রার ভেরোনাল খান। বিকেল ৪ টায় পুলিশ আসে। দিনে একজন কাজের লোক তাঁদের দরজা অনেকবার ধাক্কা দেয় কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। উপায়ান্তর না দেখে সে প্রতিবেশীকে ডাকে। পরে যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা দরজা ভাঙা হলে দেখা যায়? বিছানায় শায়িত দুটি মৃতদেহ জড়াজড়ি করে রয়েছে। বিছানার পাশে টেবিলে দুটি খালি গ্লাস। অনেক চিঠির মধ্যে পাওয়া যায় একটি চিঠি যা ৎসভাইগ লিখেছিলেন সিনেটর ক্লদিও দ্য সুজাকে।[৩১] চিঠির শেষ অংশটি ছিল এরকম :

> "আমার সকল বন্ধুকে অভিবাদন! দীর্ঘ অমানিশার পর প্রত্যয়িত সূর্যোদয় দেখার জন্য তারা বেঁচে থাকুক! আমি সকল অস্থিরতা নিয়ে একা চলে যাচ্ছি।"[৩২]

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট গেতুলিও ভার্গুস সরকারি খরচে তাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের নির্দেশ দেন এবং অনেক গণ্যমান্যদের মতো তিনিও মৃত্যুতে আশ্লিষ্ট দেহ দুটি দেখতে যান। আত্মহত্যার কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি সমাপ্ত করেন আত্মজীবনী *দ্য ওয়ার্ল্ড অব ইয়েসটারডে*, মৃত্যুকালীন সময়ে তিনি রচনা করছিলেন বালজাকের জীবনী যা ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, বন্য আগ্রাসন এবং দুর্দমনীয়তার বিরুদ্ধে সুস্থ মানবতা ও সংবেদনশীলতা টিকতে পারে না। শেষ চার মাসে লেখা উপন্যাস *দা রয়েল গেম*[৩৩]-এ তিনি তাঁর নিজের পরাজয়ের কথাই বলেছেন।

জার্সি কোসিনস্কি (১৯৩৩-১৯৯১), ঔপন্যাসিক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, যখন তাঁর বয়স ৬ বছর, একজন ইহুদি হিসেবে তাঁর শৈশবের কাহিনিকে, তাঁর উপন্যাস *দ্য পেইন্টেড বার্ড*-এ তুলে ধরেছেন। ২৪ বছর বয়সে কোসিনস্কি পালিয়ে পোল্যান্ড থেকে নিউ ইয়র্কে চলে যান। একবার মাত্র, ১৯৮৮ সালে, কমিউনিস্ট সরকারের আমন্ত্রণে একজন বিখ্যাত আমেরিকান-লেখক হিসেবে পোল্যান্ডে এসেছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি যখন নিউ ইয়র্কে আসেন তখন তিনি কোনো ইংরেজি জানতেন না। কিন্তু পরে জোসেফ নোভাক ছদ্মনামে ইংরেজিতে বইও লেখেন। ১৯৬২-এ তিনি বিয়ে করেন মৌর হাইওয়ার্ড ওয়েরকে, কিন্তু ১৯৬৬-এ দুজনের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ১৯৬৩-এ শুরু করা উপন্যাস *দ্য*

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পেইন্টেড বার্ড ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় যা তিনি তাঁর স্ত্রীকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই উপন্যাসটি তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল, পেয়েছিল ফরাসি শ্রেষ্ঠ বিদেশি বইয়ের পুরস্কার।

মৃত্যুর আগে দু-দুবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন তিনি। অবশেষে এল চূড়ান্ত মাহেন্দ্রক্ষণ ১৯৯১ সালের ২ মে, বৃহস্পতিবার তিনি ছিলেন খুবই সুস্থ মনোভাবে। রাত ৯ টায় তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ফন ফ্রাউনহোফারকে বিদায় জানান। তাঁদের ছিল আলাদা শোবার ঘর। আলাদা বাথরুম। চোদ্দো ঘণ্টা পর তাঁর স্ত্রী কোসিনস্কির বাথরুমে গিয়ে দেখেন বাথটাবের অর্ধপূর্ণজলে নগ্ন কোসিনস্কি পড়ে আছেন, একটি প্লাস্টিক শপিং ব্যাগে তাঁর মাথা বাঁধা। আত্মহত্যালিপিতে তিনি লিখেছেন: "স্বাভাবিক অপেক্ষা এক দীর্ঘ ঘুমে নিজেকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। শাশ্বত সময়কে আহ্বান।"[৩৪] পরে প্রদত্ত এক প্রেসরিলিজে ফ্রাউনহোফার জানান, তার স্বামী দীর্ঘকাল ধরে "কাজ করার অক্ষমতা"র কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন,[৩৫] হৃদ্‌রোগেও তিনি ভুগছিলেন, শ্বাসকষ্টের সমস্যাও তাঁর ছিল এবং স্ত্রী ও বন্ধুদের বোঝা হয়ে উঠবেন এই চিন্তায় কোসিনস্কি সব সময় উদ্বেগে থাকতেন।

ম্যালকম লওরি (১৯০৯-১৯৫৭), ইংল্যান্ডের নিউ ব্রাইটনে ২৮ জুলাই ১৯০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব ও কৈশোরে তাঁর মধ্যে মানসিক বিচ্ছিন্নতা কাজ করেছিল। মদ্যপানে ছিলেন আসক্ত। ১৯২৯ সালে জার্মানিতে গিয়ে জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট সিনেমার প্রতি আকর্ষিত হন এবং সিনেমার টেকনিক মন্তাজ তিনি তাঁর লেখায় প্রয়োগ ঘটান। ১৯৫৪ সালে, তিনি স্ত্রীসহ, কানাডা থেকে ইউরোপে ফিরে আসেন, কিছুদিন ইতালিতে বাস করে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। এই সময় স্ত্রীর প্রতি মারাত্মক আক্রমাণাত্মক হয়ে ওঠেন তিনি। ২৬ জুন ১৯৫৭, লওরি আত্মহত্যা করেন। *অক্টোবর ফেরি টু গ্রাব্রিওলা*[৩৬]-তে লওরি লেখেন যে, স্বর্গ ও নরক মূলত একই জায়গায়।

জ্যাক লন্ডন (১৮৭৬-১৯১৬), আমেরিকান ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্প লেখক, ১৯১৬ সালের ২২ নভেম্বর রাত ৭.৪৫টায় অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। চাকর পরদিন সকালে তাঁর ঘরে অচেতন অবস্থায় আবিষ্কার করেন তাঁকে। ডাক্তার ডাকা হলে চিকিৎসা প্রদান করা হয় কিন্তু তাঁর আর জ্ঞান ফিরে আসেনি।

১৮৭৬ সালের ১২ জানুয়ারি সানফ্রান্সিসকোতে তাঁর জন্ম হয়। ৪০ বছর বয়সে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর রয়েছে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ও ছোটোগল্পের সংকলন: *দ্য সন অব দ্য উল্‌ফ, দ্য গড অব দ্য ফাদার্স, দ্য কল অব দি ওয়াইল্ড, হোয়াইট ফ্যাং, দ্য সি উল্‌ফ*।

সের্গেই আলেকজান্দ্রারোভিচ এসেনিন (১৮৯৫–১৯২৫), রুশ চিত্রকল্পবাদী, কবি, ৩০ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি তাঁর কবজি কেটে ফেলেন এবং নিজ রক্তে লেখেন অস্পষ্ট আত্মহত্যালিপি। রক্ত ঝরা বেড়ে গেলে তিনি ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুকালীন সময়ে তিনি স্নায়ুবৈকল্যে ভুগছিলেন। প্রথমে বিয়ে করেছিলেন ইসাডোরা ডানকানকে, তারপর লিয়েফ তলস্তোয়ের নাতনিকে[৩৭] বিয়ে করেন। লেনিনগ্রাদে তিনি আত্মহত্যা করেন। "অন্তিম বিদায়ের কবিতা"য় তিনি বলেছিলেন: এ জীবনে মৃত্যুবরণ করা তেমন নতুন কিছু নয়,/ কিন্তু সারাজীবন বেঁচে থাকা তা-ই

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্লান্তিময়। মায়াকোভ্‌স্কি মেনে নেননি তাঁর আত্মহত্যাকে, লিখেছেন তাঁর স্মরণে দীর্ঘ এলিজি। "সের্গেই এসেনিনের উদ্দেশে" নামীয় কবিতায় মায়াকোভ্‌স্কি লিখেছেন: এই জীবনে মৃত্যুবরণ তেমন কঠিন কিছু নয়/নতুন জীবন গড়াই কঠিন, সেখানেই জীবন সংগ্রামময়।

শার্লট মিউ (১৮৭০-১৯২৮) লন্ডনের ব্লুমসবেরিতে, ১৫ নভেম্বর, ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর কাজে থাকতেন রীতিমত অতৃপ্ত; নিজের অনেক লেখাই তিনি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। এমিলি ডিকিনসনের সাথে ছিল তাঁর অনেক মিল:[৩৮] দুজনেই ছিলেন সর্বতোব্যক্তিগত, স্বশিক্ষিতা, অবিবাহিতা। টমাস হার্ডি তাঁকে বলেছিলেন: "দ্বিধাহীনভাবে আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি।" তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ *দ্য রেম্বলিং সেইলর*,[৩৯] ১৯২৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় যার পাণ্ডুলিপি তিনি পুড়িয়ে ফেলতে পারেননি। স্যার সিডনি ককেরাল তাঁকে অন্যতম মহৎ জর্জীয় কবি বলে মহিমান্বিত করেছেন। মৃত্যুর আগে, স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধারকারী বাড়িতে ৮৭ বছর বয়স্ক টমাস হার্ডির কাছ থেকে তিনি একটি কবিতা পেয়েছিলেন, যা ছিল পৃথিবী থেকে পাওয়া তাঁর শেষ উপহার।

আর্নেস্ট টোলার (১৮৯৩-১৯৩৯), জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট নাট্যকার ও কবি, ১ ডিসেম্বর ১৮৯৩ পূর্ব প্রুশিয়ার (বর্তমান পোল্যান্ডের অংশ) সামোটশিনে এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কমিউনিস্ট সন্দেহে তিনি ১৯১৪ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত কারাবরণও করেন। হিটলারের অভ্যুত্থানের সময় তিনি ইংল্যান্ড, রাশিয়া ও সুইটজারল্যান্ডে নির্বাসিতের জীবন কাটান। ১৯৩৫ সালে তিনি শরণার্থী অভিনেত্রী ক্রিশ্চিয়ানা গ্রাউটোফকে বিয়ে করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ১৯৩৯ সালে তিনি নিউ ইয়র্কে বসবাস করতে থাকেন। এ সময়ে তিনি মারাত্মক নিদ্রাহীনতায় (ইনসোমনিয়া) আক্রান্ত হন এবং লিখতে অসমর্থ হয়ে পড়েন। আর্থিক সমস্যাও দেখা দিয়েছিল তাঁর।

মে মাসের প্রথম দিকে তিনি আন্তর্জাতিক প্যান-কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন ও বক্তৃতা দেন এবং ১১ তারিখে তিনি ও অন্য আমন্ত্রিতরা হোয়াইট হাউসে রুজভেল্ট-এর সাথে দেখা করেন। তিনি ও ক্লাউস মান ফিরতি ট্রেনে নিউ ইয়র্ক ফিরে আসেন। এ সময় ক্লাউস মানকে তিনি তাঁর মারাত্মক নিদ্রাহীনতার কথা জানান। ২১ মে তারিখে টোলার বন্ধু মারকিউসের বাসায় একসাথে খাওয়া-দাওয়া সেরে আলাপ করছিলেন। আলাপের এক পর্যায়ে মারকিউস বলেন, প্রত্যেকেরই তার নিজের জীবন শেষ করার অধিকার আছে। টোলার তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেন। পরের দিন, মে ফ্লাওয়ার হোটেলের নিজ কক্ষের বাথরুমে তিনি ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। নিজ ড্রেসিং গাউনের ফিতা দিয়ে তিনি গলায় ফাঁস লাগান। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত কাব্য *দ্য স্যাডো বুক* তাঁকে গীতিকবি হিসেবে খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

স্টুয়ার্ড ইঙ্গস্ট্রান্ড (১৯০৪-১৯৫৫), আমেরিকান ঔপন্যাসিক, ১৯০৪ সালের ১৩ মার্চ শিকাগোতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর লজ এঞ্জেলেসের ম্যাকআর্থার পার্কের হ্রদে ডুবে তিনি আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার দিন, তাঁর শেষ উপন্যাস *মোর ডেথ্‌স দেন ওয়ান* বাজারে বিক্রির জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। হ্রদ থেকে তাঁর মৃতদেহ টেনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোলার পর তাঁর শ্যালক এসে মৃতদেহ দেখে তাঁকে শনাক্ত করেছিলেন। মৃত্যুর আগের দিন স্ত্রী সোফিয়া তাঁর নিখোঁজ হওয়া বিষয়ে থানায় মামলা করেছিলেন; তিনি তখন জানান যে, ইঙ্গস্ট্রান্ড মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন এবং আত্মহত্যার ইচ্ছা পুনঃপুন ব্যক্ত করছিলেন।

অঁরি দ্য মঁতেরলাঁ (১৮৯৫-১৯৭২), ফরাসি লেখক, তাঁর আত্মহত্যালিপিতে জানান: "প্রিয় ক্লদ, আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমি নিজেকে হত্যা করছি। আমার জন্য তুমি যা করেছো তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার মা আর তুমি আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী।" নিজের সম্পর্কে তিনি তেমন কিছুই জানাননি। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে তাঁর মাতামহের মৃত্যুর পর তিনি ইতালি ও উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণ করেন আর লেখালেখিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। লেখালেখিকে তিনি বলতেন "অপ্রয়োজনীয় কাজ"। সমালোচকদের বিচারে তাঁর রচিত নাটকগুলোই শ্রেষ্ঠ। ১৯৭২ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন।

উইলিয়াম ইনজে (১৯১৩-১৯৭৩), আমেরিকান লেখক, ১০ জুন ১৯৭৩, গাড়িতে, চালকের আসনে বসা অবস্থায় আত্মহত্যা করেন। তাঁর বোন হেলেন কোনেল, সকালে এঞ্জিনের শব্দ পেয়ে, দৌড়ে গ্যারেজে গিয়ে তার ভাইকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করেন। কয়েক মাস ধরেই ইনজে অবসাদে ভুগছিলেন। ২ জুন ঘুমের ওষুধ খেয়ে একবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা চালান। তখন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে পাম্প করে পেট পরিষ্কার করা হয়। অতঃপর তাঁকে হাসপাতালের মানসিক বিভাগে স্থানান্তর করা হলে চিকিৎসকদের সাথে কথা কাটাকাটি করে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। ৩ মে, ১৯১৩ তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

রিচার্ড ব্রটিগান (১৯৩৫-১৯৮৪), ষাটের দশকের শেষের এবং সত্তরের প্রথমার্ধের আমেরিকার অন্যতম মৌলিক ঔপন্যাসিক, ১৯৮৪ সালে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের বলেছিলেন যে, তিনি এক শিকারের উদ্দেশ্যে কোথাও যাচ্ছেন, কিছুদিন যাবৎ থাকবেন না। আগেও, উপন্যাস লেখা শুরু করার পর, তিনি প্রায়শই মাঝেমধ্যে উধাও হয়ে যেতেন। ১৯৮৪ সালেও তিনি উপন্যাস লেখা শুরু করেন এবং শিকারোপলক্ষ্যে বাইরে যাবার ঘোষণা দেন। এ নিয়ে কারও কোনো উদ্বেগ ছিল না। এ সময়ে কয়েক মাস ধরে, পাঠক কমে যাবার কারণে তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরপর, তাঁর দুজন সহকারী, তাঁর খোঁজে ক্যালিফোর্নিয়ার বলিনাসে তাঁর নির্জন বাড়িতে গিয়ে তাঁর গলিত লাশ উদ্ধার করেন। মাথায় গুলি করে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *ওয়াটারমেলন শুগার*-এর প্রথম পাতায় মৃত্যুর নৈকট্য নিয়ে তিনি লেখেন:

> মৃত্যুর সন্নিকটে এক কুটিরে আমি বাস করি। জানালা দিয়ে মৃত্যুকে দেখি। তা সুন্দর। আমি চোখ বন্ধ করলেও তাকে দেখি আর তাকে ছুঁই। এখন তা হিম-শীতল এবং শিশুর হাতে একটা কিছুর মতো। আমি জানি না তা কী। মৃত্যুতে আছে এক তৃপ্ত সুষমা। তা আমাদের উৎকৃষ্টভাবে মানিয়ে যায়।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রাইমো লেভি (১৯১৯-১৯৮৭), ইহুদি লেখক, নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে, ৬৭ বছর বয়সে, তাঁর বাড়ির সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর আগে তিনি ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন। আউশহ্বিৎস ও নাৎসিদের হত্যাযজ্ঞ তাঁকে তাড়িয়েছিল জীবনভর। যুদ্ধের পর ইতালিতে ফিরে তিনি কেমিস্ট হিসেবে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। আউশহ্বিৎস ও নাৎসিদের হত্যাযজ্ঞের পর তিনি উপলব্ধি করেন: "লেখা এক পরম প্রয়োজন। কেবল নৈতিক কারণেই নয় বরং মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনেও।" গল্প-উপন্যাস ছাড়াও তিনি নিয়মিত তুনিন থেকে প্রকাশিত পত্রিকা *লা স্তাম্পা*তে কবিতাও লিখতেন। ১৯৭৯ সালে তিনি স্ট্রেগা পুরস্কার পান এবং ১৯৮৫ সালে সল বেলোর সাথে যৌথভাবে পান কেনেথ বি স্মাইলেন পুরস্কার।

ব্রুনো বেটেলহাইম (১৯০৩-১৯৯০), ২৮ আগস্ট ১৯০৩ সালে ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শৈশব ছিল অসুখী। সারাজীবনই দীর্ঘমেয়াদি বিষণ্ণতায় তিনি আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর জানা যায়, যৌবনে তিনি ফ্রয়েডের অনুরাগী ছিলেন এবং চোদ্দো বছর বয়সে তিনি অধিকাংশ মনোবিকলন সাহিত্য অধ্যয়ন করে ফেলেন। ১৯৪৪-এ, তিনি শিকাগোর সোনিয়া সাঙ্কম্যান অর্থোজেনিক স্কুল-এর পরিচালক হন যা তাঁর পরিচালনায় অটিস্টিক শিশুদের একটি প্রধান চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। তাঁর লেখায় ফিরে ফিরে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্যাম্প-অভিজ্ঞতা; তিনি বলেছেন, "একবার তুমি ক্যাম্পে এলে তার নির্মমতা থেকে আর নিস্তার নেই তোমার।" আত্মহত্যা করেই তিনি অবশেষে নিস্তার লাভ করেন।

মাইকেল ডরিস (১৯৪৫-১৯৯৭), ১৯৯৭ সালের ১১ এপ্রিল, ৫২ বছর বয়স্ক ন্যাশনাল বুক পুরস্কারজয়ী এই লেখক, নিউ হ্যাম্পশায়ার-এর এক মোটেল কক্ষে ভোদ্‌কা ও ঘুমের ওষুধের ককটেল খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এর কিছুদিন আগে একবার, ২৮ মার্চ, আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি।

জন কেনেডি টুল (১৯৩৮-১৯৬৯), আমেরিকান ঔপন্যাসিক, ৩১ বছর বয়সে নিজ গাড়িতে গ্যাসপূর্ণ হয়ে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার সময়ে তিনি ছিলেন নিউ অরলিনস কলেজের পিএইচডি পরীক্ষার্থী।

১৯৭৬ সালে, লয়োলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়েটিভ রাইটিং সেমিনারে পড়ানোর সময়, অধ্যাপক ওয়াকার পার্সি এক উৎকেন্দ্রিক বৃদ্ধার কাছ থেকে ক্রমাগত ফোন পেতে থাকেন, যাকে তিনি চিনতেন না। সেই বৃদ্ধার নাম থেলমা ডুয়োকোয়িং টুল। তিনি তার মৃত ছেলের উপন্যাস *আ কনফেডারেসি অব ডান্সেস*[৪০] পড়ে দেখার জন্য তাঁকে নিরন্তর অনুরোধ করতে থাকেন যা ষাটের প্রথমার্ধে লেখা হয়। এটাই জন কেনেডি টুল-এর উপন্যাস যার পাণ্ডুলিপি, আত্মহত্যার পর, তাঁর মা রেখে দেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, মিসেস টুলের অবিরাম অনুরোধে পার্সি পাণ্ডুলিপিতে চোখ বুলোতে সম্মত হন। মিসেস টুল বারে বারে বলছিলেন, এটি একটি "ম্যাগনাম ওপাস"। প্রথমে বিরক্তি ও হতাশা এবং অবশেষে উত্তরোত্তর বিস্ময়বিহ্বলতায় দাখিলকৃত "খারাপ আঠালো দাগে পূর্ণ, প্রায় দুষ্পাঠ্য কার্বন" পাণ্ডুলিপিটি পড়ে তিনি আর ঠিক থাকতে পারলেন না। তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন সাথে সাথেই তিনি লুসিয়ানা স্টেট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইউনিভার্সিটিকে, ১৯৮০ সালে, উপন্যাসটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানান। পরের বছরই উপন্যাসটি পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করে এবং কয়েকটি বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়।

জন কেনেডি টুল ১৯৬৩ সালে উপন্যাসটি শেষ করেন কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে থেলমা টুল বলেছিলেন যে, প্রকাশক না পাওয়ার ব্যর্থতাই জন কেনেডি টুলকে আত্মহত্যার পথে পরিচালিত করে। জন কেনেডি টুলের লেখা সুইসাইড নোটও থেলমা ধ্বংস করে ফেলেছিলেন। ২৬ মার্চ, ১৯৬৯, জন কেনেডি টুল আত্মহত্যা করেছিলেন।

জর্জ স্টার্লিং (১৮৬৯-১৯২৬), আমেরিকান কবি। ১ ডিসেম্বর ১৯৬৯, নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পায়াডমন্ট লেখক গ্রুপের প্রধান এবং তাঁর বাড়িতেই বসত এই গ্রুপের সভা। এই গ্রুপ বিশ্বাস করত আত্মহত্যার অধিকারে। জর্জ স্টার্লিং নিজেও সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন ১৭ নভেম্বর, ১৯২৬ সালে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য হলো *টেস্টিমনি অব দ্য সান্স*। পায়াডমন্ট গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে আত্মহত্যার পক্ষে স্টার্লিং ছিলেন সবচেয়ে সোচ্চার। এই দলের আরেক কবি নোরা মে ফ্রেন্স-ও স্টার্লিং-এর কারম্যাল-এর বাড়িতে আত্মহত্যা করেছিলেন। স্টার্লিং আত্মহত্যার আগে আলসার রোগে ভুগছিলেন।

হ্যারি ক্রসবি (১৮৯৮-১৯২৯), মৃত্যুর আগের এক দশক ধরে মুত্যু-আশ্লিষ্টতা নিয়ে তিনি অনেক লেখা লিখেছেন। ১৯২৯ সালে তিনি তাঁর গৃহকর্ত্রী মিসেস জোসেফিন রোচ বিগেলোর সাথে এক আত্মহত্যা-চুক্তি সম্পাদন করেন; তাঁদের মাথায় ছিল শতবর্ষ আগে প্রুসীয় নাট্যকার হাইনরিশ ফন ক্লাইস্ট ও হাইনরিখা ফোগেলের যৌথ আত্মহত্যার স্মৃতি ও কিংবদন্তি। আত্মহত্যার ২৪ ঘণ্টা আগে, বিগেলো ক্রসবিকে দেন তার নিজের লেখা একটি কবিতা, যার সমাপ্তি অংশ ছিল এরকম: "মৃত্যুই মোদের বিবাহ।" পরের দিন তাঁরা দুজনে তাঁদের বন্ধু স্টানলি মরটিমার-এর নিউ ইয়র্কের হোটেলের সুইটে যান। তাঁরা জুতা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়েন। তারপর ক্রসবি .২৫ ক্যালিবার ব্যারেলের পিস্তল ফোগেলের মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করেন। দু-ঘণ্টা ধরে তাঁর দেহ ধরে ক্রসবি গলাগলি ও চুমো খান। তারপর নিজের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে তিনি গুলি করেন।

মৃত্যুর পর তাঁর প্রকাশিত কাব্য—*ট্রানজিট অব ভিনাস*। টি. এস. এলিঅট তাঁর সম্পর্কে লেখেন, ...তিনি ছিলেন লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন, গন্তব্য সম্পর্কে নন। কেবল সচেতন ছিলেন যে, সময় স্বল্পস্থায়ী, প্রান্ত দীর্ঘপথের শেষ।" ক্রসবি জানতেন কোথায় তাঁকে যেতে হবে: "চাই সূর্যস্থিত এক দীর্ঘ সরল পথ।" তিনি লিখেছিলেন :

আমি এক নতুন সূর্যবিশ্বের অগ্রদূত
এনেছি নতুন সঙ্গমের বীজ

পুনরুত্থিত করি মর্ত্যমন
পৃথিবীতে বিদ্ধ করি আমার নগ্ন তরবারিতে
করি হত্যা পৃথিবীকে।[৪১]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হত্যা" কবিতায় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন : "আমি হত্যাকারী পৃথিবীর, ভবিষ্যতে হত্যা করব নিজেকে। আমি আমার হৃদয়কে কেটে দুই হাতে নিয়ে তারপর সূর্যের দিকে হেঁটে যাব বিরামহীন যতক্ষণ না মরে ঢলে পড়ে যাই।"

রবার্ট ই. হাওয়াড (১৯০৬-১৯৩৬), লিখেছিলেন *কোনান দ্য বারবারিয়ান*, যা গভীরভাবে পছন্দের ছিল তাঁর মায়ের। বাবা চিকিৎসক হিসেবে প্রায়ই বাইরে থাকতেন, তাই ছেলেকে নিয়ে আনন্দে সময় কাটাতেন মিসেস হাওয়াড। ছেলেকে পড়ে শোনাতেন ছড়া, কবিতা আর দেশ-বিদেশের রূপকথা। দশ বছর বয়সে হাওয়াড ভারোত্তোলন শুরু করেন। শরীরচর্চায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে নিজের শরীরকে এক পৌরুষময় ক্রীড়াবিদের শরীরে পরিণত করেন। পূর্ণবয়স্ক হিসেবে তিনি ছিলেন ২০০ পাউন্ড ওজনের ৬ ফুট লম্বা এক সুদর্শন ব্যক্তি। মধ্যতিরিশে হাওয়াড-এর মা মারাত্মক অসুস্থতায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং ১১ জুন ১৯৩৬, ডাক্তারেরা তার বিষয়ে শেষ কথা বলে বসলেন। একই দিনে, ডাক্তারদের কথা শুনে হাওয়াড গাড়ি করে বাড়ি এসে গাড়িতে বসে থাকলেন। তারপর বন্দুক দিয়ে নিজের মাথায় গুলি করেন। পরের দিন তাঁর মাও মারা গেলেন। টেক্সাসের ব্রাউনউড-এ, হাওয়াড পরিবারের গ্রিলিফ সমাধিতে উৎকীর্ণ এপিটাফটি এ রকম:

> জীবনে তারা ছিল সুন্দর আর আনন্দময়
> আর মৃত্যুতেও হয়নি তারা বিচ্ছিন্ন।[৪২]

ক্যারোল লেন্ডিস (১৯১৯-১৯৪৮), হলিউড অভিনেত্রী হিসেবে সমধিক পরিচিত, ছিলেন লেখকও। তাঁর লেখা গ্রন্থের নাম, *ফোর জিলস ইন আ জিপ*।[৪৩] ১৯৪২ সালে, জাতিসংঘের কর্মসূচির আওতায় ভ্রমণের অংশ হিসেবে সহকর্মী অভিনেত্রী মার্থা রায়া, কে ফ্রান্সিস এবং মিটজি মেফেয়াবের সাথে তিনি বারমুডা, উত্তর আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে আমেরিকান সৈন্যদের স্বাগত জানান। ১৯৪৩ সালে আমেরিকায় ফিরে তিনি বই লেখা শুরু করেন। এই বছরের শেষের দিকে তিনি আবার ভ্রমণে বের হন এবং ভ্রমণের সময় উত্তর আফ্রিকাতে আমাশয় এবং দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। নিউ গায়ানাতে নিউমোনিয়ায় তিনি প্রায় মরতে বসেন। এরপর ১৯৪৮ সালে তিনি অতিমাত্রায় সেকোনাল খেয়ে আত্মহত্যা করেন। কারণ ছিল যে, তাঁর প্রেমিক রেক্স হ্যারিসন তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাঁকে বিয়ে করতে অসম্মতি জানিয়েছিল। লেন্ডিস-এর আত্মহত্যায় হলিউডে আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে যার একধরনের প্রভাব ষাট দশক পর্যন্ত বজায় ছিল।[৪৪]

টি. ও. হেগেন (১৯১৯-১৯৪৯), আমেরিকান লেখক, ২৩ ডিসেম্বর ১৯১৯ আয়ওয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে তিনি ব্যাচেলর অব আর্টস ডিগ্রি লাভ করেন। জাপানিদের পার্ল হারবার আক্রমণের পর তিনি আমেরিকার নৌবাহিনীতে যোগ দেন এবং ৫ বছর ধরে চাকরি করেন সমুদ্রে সমুদ্রে। যুদ্ধের পর হেগেন *রিডার্স ডাইজেস্ট*-এ যোগ দেন এবং সমুদ্র-অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে শুরু করেন।

১৯৪৯ সালের ১৯ মে, কাজের লোক, তাঁর নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টের[৪৫] বাথটাবে মৃত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পায়। তাঁর দেহ টাবের জলের চোদ্দো ইঞ্চি নীচে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডুবন্ত ছিল। প্রায় ১১ ঘণ্টা যাবৎ তিনি মৃত অবস্থায় টাবে পড়েছিলেন। পুলিশ টাবের নীচে একটি রেজার খুঁজে পায় কিন্তু তাঁর দেহ ছিল কাটাকাটিহীন। ওয়াশস্ট্যান্ডে একটি বোতল পাওয়া যায় যেখানে ৬টি ট্যাবলেট অবশিষ্ট ছিল। ধারণা করা হয় সেখানে ছিল ৫০টি ট্যাবলেট, ছয়টি বাদে অবশিষ্টগুলো তিনি খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তিনি একই অ্যাপার্টমেন্টে ডরেথি পার্কার-এর প্রাক্তন স্বামী চিত্রনাট্যকার অ্যালেন ক্যাম্পবেল-এর সাথে বসবাস করতেন। মৃত্যু-সংবাদ শোনার পর ক্যাম্পবেল বলেন, হেগেন একটি নতুন নাটক নিয়ে অতি পরিশ্রমরত থাকার কারণে ডাক্তারের পরামর্শে প্রতি রাতে একটি করে ঘুমের বড়ি খেতেন। তিনি ধারণা করেন যে, সেদিন অধিক ঘুমের জন্য অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে তিনি স্নানের সময় অচেতন হয়ে পড়ে দুর্ঘটনাবশত মারা যান। ক্যাম্পবেল বলেন, "গতকালকেও আমি তাঁর সাথে কথা বলেছি। তিনি ছিলেন খুবই চমৎকার, ফুরফুরে মেজাজে এবং জানান যে তাঁর কাজ ভালোভাবেই এগোচ্ছে। অর্থ, সফলতা, ব্যস্ততাসম্পন্ন তাঁর মতো একজন তরুণ মানুষ কখনোই আত্মহত্যা করতে পারেন না।"[৪৬] সত্যিই মৃত্যুর আগে তাঁর কোনো আর্থিক কষ্ট ছিল না।[৪৭] তার উপন্যাস *মিস্টার রবার্টস* ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হলে ভালো বিক্রি হয়,? যুক্তরাষ্ট্রে এক লক্ষ কপি বিক্রি হয়; আত্মহত্যার আগের মাস পর্যন্ত সর্বমোট সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়।

এফ. ও. মাটথিইসেন (১৯০২-১৯৫০), আমেরিকান সমালোচক ও হার্বার্ট অধ্যাপক, বোস্টনের মাংগার হোটেলের ১২ তলা থেকে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।[৪৮] ১৯৪৫ সালে তাঁর প্রেমিকা রাসেল চেনির মৃত্যুর পর, পাঁচ বছর ধরে তিনি ছিলেন মারাত্মকভাবে অবসাদগ্রস্ত।[৪৯] আত্মহত্যালিপিতে তিনি লেখেন :

> "আমি নিঃশেষিত। গত কয়েক বছর যাবৎ মারাত্মক বিষণ্ণতায় আক্রান্ত আমি, ফলে আর বিশ্বাস করতে পারছি না যে, চাকরি ও বন্ধুদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারি। আশা করি আমার বন্ধুরা বিশ্বাস করতে সক্ষম হবে যে আমি এখনও, এই বেপোরোয়া কাজ সত্ত্বেও, তাদের ভালোবাসি।"[৫০]

লওইস ভারনিউইল (১৮৯৩-১৯৫২), ফরাসি নাট্যকার, আসল নাম লুইস কলিন-বারবি দ্যু বোকেজ, নিজে ও জর্জ বার-এর সহযোগে, ৬০টিরও বেশি নাটক রচনা করেন। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের অন্যতম সার্থক নাট্যকার, নিজে নির্দেশনা দিতেন এবং অভিনয়ও করতেন। ৩ নভেম্বর ১৯৫২, ৫৯ বছর বয়সে তিনি আত্মহত্যা করেন। বাথরুমে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

উইনফিল্ড টাউনলি স্কট (১৯১০-১৯৬৮), আমেরিকান কবি, ঘুমের ওষুধ ও অ্যালকোহল একসাথে খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। এক ডজনেরও বেশি, ৫০০ মি.গ্রা. প্লাসিডিল খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। ৫৮তম জন্মদিনের দুইদিন পর তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর কবিতার বইয়ের মধ্যে অন্যতম *দ্য ডার্ক সিস্টার*, *স্ক্রিমসো*, *চেঞ্জ অব ওয়েদার*, *টু মেরি স্ট্র্যাঞ্জার*, *দ্য সোর্ড অন দ্য টেবল*, *ওয়াইড দ্য ক্লক*।

টম ম্যাকহাল (১৯৪২-১৯৮২) ৩০ মার্চ ১৯৮২, ৪০ বছর বয়সে, ফ্লোরিডাতে কার্বন-

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনো-অক্সাইড বিষক্রিয়া ঘটিয়ে আত্মহত্যা করেন। প্রথম দিকে তাঁর মৃত্যুকে হৃদ্‌রোগজনিত কারণে মৃত্যু বলে মনে করা হয়েছিল; কিন্তু মৃত্যুর একমাস পর দেখা গেল যে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক। তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলো হলো: *ডলিস ডিল্যুশন* (১৯৭১), *আলিংকিস ডায়মন্ড: আ লাভ স্টোরি* (১৯৭৪), *স্কুল স্পিরিট* (১৯৭৬), *আর দ্য লেডি ফ্রম বোস্টন* (১৯৭৮)।

জেম্‌স টিপট্রি জুনিয়র (১৯১৫-১৯৮৭), আমেরিকান সাইন্স-ফিকশন লেখক। তাঁর আসল নাম আলিস সেলডন। ১৯৮৭ সালে, তিনি ছিলেন রোগাক্রান্ত, তাঁর দ্বিতীয় স্বামী ছিল আলঝেইমার রোগী; তিনি তাঁর স্বামীকে প্রথমে গুলি করেন। তারপর নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন।

লিউস বি পুলার জুনিয়র (১৯৩৬-১৯৯৪), আমেরিকান লেখক, ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে শত্রুপক্ষের মাইনের আঘাতে তিনি তাঁর দুটি পা হারান। ১৯৯২ সালে পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁর আত্মজীবনী *ফরচ্যুনেট সন*-এ তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন। পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়ার দুই বছর পর, ১৯৯৪ সালে তিনি গুলি করে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি পেন্টাগন থেকে ছুটিতে ছিলেন। তাঁর পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি কীভাবে দুঃখ, হতাশা ও মদাসক্ততা থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছিলেন। আরলিংটন জাতীয় সমাধিতে পূর্ণ সামরিক পদমর্যাদায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

জে অ্যান্থনি লুকাস (১৯৩৩-১৯৯৭), দু-বার পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক, ১৯৯৭ সালের ৫ জুন, নিউ ইয়র্ক শহরে, নাড়ি টিপে ধরে নিজের রক্ত-চলাচল বন্ধ করে আত্মহত্যা করেন।

পর্তুগিজ কবি মারিউ দ্য সা-কার্নাইরুর (১৮৯০-১৯১৬) জন্ম লিসবনে। ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম প্রভাববিস্তারী কবিদের অন্যতম। ফের্নান্দো পেসোয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই কবি শৈশবে অত্যন্ত আদরে বড়ো হন, হয়তো এই অত্যধিক আদরই তাঁর ভেতরে জন্ম দিয়েছিল আত্মদম্ভ ও অসম্ভব আত্মমগ্নতার। পেসোয়ার সাথে মিলে সংবেদনবাদ নামের নতুন সাহিত্যধারার জন্ম দেন পর্তুগিজ সাহিত্যে। তীব্র সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষার কারণে তিনি পারিতে চলে যান এবং সেখানেই হোটেলের কক্ষে আত্মহত্যা করেন ১৯১৬ সালের ২৬ এপ্রিল। এর দশ বছর পর, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি ফের্নান্দো পেসোয়া বন্ধুর মৃত্যুদিনে এ মৃত্যু নিয়ে লিখলেন কবিতা ''ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কিল ইউরসেল্ফ'', বললেন সেখানে: ''তারপর তুমি ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়ে গেলে।/ বছরে দু বার তোমাকে স্মরণ করা হয়:/ একটি তোমার জন্মদিনে অন্যটি মৃত্যুদিনে।/ এই তো। এই তো। এই তো সবকিছু।/ বছরে দু বার তারা তোমাকে নিয়ে ভাবে।/ তোমাকে যারা ভালোবাসত তারা বছরে দু বার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে,/ আর কিছু দুর্লভ আয়োজনে বোধ করি তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারে, কেউবা তোমার নাম নিতে পারে।''

ওসামু দাজাই (১৯০৯-১৯৪৮) ছিলেন জাপানি সাহিত্যের বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান গল্পকার, ঔপন্যাসিক। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল শুজি সুশিমা। ১৯২৯ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন তিনি। ১৯৩৫ সালের ১৯ মার্চ

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফাঁস দিয়ে দ্বিতীয়বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন তিনি, তার আগে লেখেন *দ্য ফাইনাল ইয়ারস*। তৃতীয়বারের মতো আত্মহত্যাচেষ্টার তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি অ্যাপেনডিসাইটিস রোগে আক্রান্ত হন এবং হাসপাতালে ভরতি হন, সে সময়ে তিনি পাবিনাল নামক মরফিন জাতীয় বেদনানাশক ওষুধে আসক্ত হয়ে পড়েন। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁকে মানসিক হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর স্ত্রী হাতসুয়ো তাঁরই ঘনিষ্ট বন্ধুর সাথে দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে দাজাই তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে দ্বৈত আত্মহত্যার চেষ্টা চালান, কিন্তু সে-যাত্রায় দুজনেই বেঁচে যান। ১৯৪৮ সালের ১৩ জুন অবশেষে তিনি তোমিকে সাথে নিয়ে আত্মহত্যায় সফল হন। তাঁর বাড়ির কাছে অবস্থিত তামাগাওয়া খালে ডুবে তিনি আত্মহত্যা করেন। সে সময়ে তিনি লিখছিলেন নভেলা *বিদায়* যা অসমাপ্তই থেকে যায়।

রাইয়্যুনোসুকে আকুতাগাওয়া (১৮৯২-১৯২৭) তাইশো সময়পর্বের একজন জাপানি লেখক। তাঁকে জাপানি ছোটোগল্পের পিতা বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁর নামেই আকুতাগাওয়া সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। আকুতাগাওয়া পশ্চিমা ও জাপানি সংস্কৃতির মেলবন্ধনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একশ পঞ্চাশটিরও বেশি ছোটোগল্প লিখেছেন তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে। আকিরা কুরোসাওয়ার *রশোমন* চলচ্চিত্রটি তাঁর গল্প অবলম্বনে তৈরি হয়েছিল। শেষ জীবনে তিনি অমূলপ্রত্যক্ষণ ও স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এই ভয়ে যে তাঁর মায়ের মানসিক রোগে বুঝিবা তিনিও আক্রান্ত হবেন। ১৯২৭ সালে তাঁর স্ত্রীর এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা চালান এবং ব্যর্থ হন, কিন্তু একই বছর ২৪ জুলাই অতিমাত্রার ভেরোনাল খেয়ে তিনি আত্মহত্যায় সক্ষম হন। উইল অনুসারে তাঁর মৃত্যুকালীন অনুভূতি ছিল ভবিষ্যতের জন্য এক ''অস্পষ্ট অনিরাপত্তা''।

হোরাসিয়ো কুইরোগা (১৮৭৮-১৯৩৭) ছিলেন উরুগুয়ের কবি-নাট্যকার-ছোটো গল্পলেখক। জঙ্গলের সব আশ্চর্য অতিপ্রাকৃতিক বিষয় আর তাকে সঙ্গী করে মানুষ ও প্রাণীর সংগ্রাম ও বেঁচে থাকাকে উপজীব্য করে লিখেছেন তিনি। বন্ধুদের নিয়ে স্থাপন করেছিলেন ''দ্য কনসিসটরি অফ গে সাইন্স'' যার উদ্দেশ্য ছিল নিরীক্ষামূলক লেখার পরীক্ষাগার তৈরি করা যেখান থেকে আধুনিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁরা নিজেদের প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। ১৯০৬ সালে কুইরোগা তাঁর প্রিয় জঙ্গলে ফিরে গিয়ে বিশাল এলাকা নিয়ে ফার্ম গড়ে তোলেন, শিক্ষা দিতে থাকেন সাহিত্য। সেখানেই আনা মারিয়া সিরেস নামের তাঁর এক অল্পবয়সি ছাত্রীর প্রেমে পড়েন তিনি, তাকেই উৎসর্গ করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস *হিস্ট্রি অব দ্য ট্রাবলড্ লভ*। পরে তাকে বিয়েও করেন। কিন্তু তাঁদের পরবর্তী জীবন হয়ে ওঠে ঝঞ্ঝামুখর যার পরিণতিতে আনা মারিয়া অতিমাত্রার মার্কারি ক্লোরাইড খেয়ে বসেন। কিন্তু সাথে সাথে না মারা গিয়ে আট দিন পর স্বামীর বাহুতে মাথা রেখে মারা যান তিনি। কুইগোরা পরে আবার অবশ্য তাঁর কন্যার সহপাঠীকে বিয়ে করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি প্রোস্টেট রোগে আক্রান্ত হন। এক পর্যায়ে অবস্থা খারাপ হলে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তাঁকে জঙ্গলে একা ফেলে রেখে চলে যান। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিনি ১৯৩৭ সালে বোয়েনস আইরেসে যান চিকিৎসার জন্য, সেখানে ধরা পড়ে যে তিনি প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত, যা অচিকিৎস্য, অপারেশনঅযোগ্য। জরুরি বিভাগে

~ www.amarboi.com ~

অবস্থানকালীন তিনি শোনেন, ব্যাজমেন্টে এক কিম্ভূত আকৃতির রোগীকে আটকে রাখা হয়েছে। তিনি গিয়ে তাকে তাঁর কক্ষে নিয়ে আনেন, এবং অনুরোধ করেন আত্মহত্যার জন্য তাঁকে সহায়তা করতে। প্রিয় লেখকের অনুরোধে সে অবশেষে রাজি হলো। তাঁর সহায়তায় এক গ্লাস সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন কুইরোগা।

বর্ণিত আত্মহত্যাগুলো সংঘটিত হয়েছে ১৮৯৪ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে। এই তালিকায় আরও সংযুক্ত আছে কিছু সম্ভাব্য আত্মহত্যা: অ্যামব্রোস বায়ার্স,[৫১] টি. ই. লরেন্স,[৫২] জেম্‌স ডব্লিও জনসন,[৫৩] জন হর্ন বার্নস,[৫৪] রান্ডাল জারেল,[৫৫] সেথ মর্গান,[৫৬] ইউজিন ইজ্জি,[৫৭] এবং জীবনানন্দ দাশ!

বিংশ শতাব্দীর আগের ঠিক সময়টাতে আত্মহত্যার ঘটনাকে ব্যক্তিক পর্যায়ের ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব, কারণ আত্মহত্যাকারী কবি-লেখক-শিল্পীদের সংখ্যা সত্যিই ছিল নগণ্য ও ব্যতিক্রম, এবং আত্মহত্যা ছিল না কোনো সৃজিত চেতনায় উদ্বোদ্ধিত, বরং ছিল ব্যক্তিক সিদ্ধান্তের ফল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই পরিস্থিতি বা অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়; যিনি যত গুণী (শিল্পী) তিনি তত আত্মহত্যায় ভেদ্য হয়ে ওঠেন, যদিও তা একমাত্র কঠোর নিয়মে আবির্ভূত হয়নি। তবু বলা যায়, সংখ্যায় এক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দী সবচেয়ে ঘটনাবহুল ও উল্লেখ্য। প্রাচীনকালেও আমরা কবি-লেখকদের আত্মহত্যা দেখি; গ্রিক কবি সাফো সম্ভবত আত্মহত্যা করেছিলেন; রোমকদের মধ্যে কবি লুকান, লেখক পেত্রোনিয়ুস, সেনেকা, নাট্যকার তেরেন্স, কবি লুক্রেতিয়ুস, গেইয়ুস কর্নেলিয়ুস গাল্লুস[৫৮] প্রমুখ আত্মহত্যা করেছিলেন।

আত্মহত্যাকারী কবি-লেখক-শিল্পীর সংখ্যা অসংখ্য। আত্মহত্যা করেন অনেকে, যেমন আমেরিকান লেখক লুইস অ্যাডামিক,[৫৯] সোভিয়েত ঔপন্যাসিক আলেকজান্দার আলেক্সজান্দ্রেভিচ ফেদিয়েভ,[৬০] ইংরেজ কবি টমাস লভেল বেডস,[৬১] স্পেনিশ প্রাবন্ধিক মারিয়ানো হোর্হে দ্য লারা,[৬২] ইংরেজ কবি-নাট্যকার হেনরি কারে[৬৩]। এঁদের মধ্যে দুজন, অ্যাডামিক ও ফেদিয়েভ, বিংশ শতাব্দীর; অন্যদের মধ্যে হেনরি কারে অষ্টাদশ শতাব্দীর, আর অন্য দুজন ঊনবিংশ শতাব্দীর। এই তালিকায় আরও আছেন কলম্বীয় কবি হোর্হে আসুনশিয়ন সিলভা, নাট্যকার ইউজিন ও'নিল প্রমুখ। ফরাসি কবি-লেখক-অনুবাদক জেরার দ্য নেরভাল—যিনি হাঁটতে ভালোবাসতেন, আজীবন তাড়িত ছিলেন মনস্তাত্ত্বিক উন্মাদনায়, তীব্র দারিদ্র্যে কাটিয়েছেন জীবন, মনে করতেন স্বপ্নই দ্বিতীয় জীবন—আত্মহত্যা করেন ১৮৫৫ সালের ২৬ জানুয়ারি, রু দ্য লা ভ্যিলে লেঁতার্ন-এর সরু পথের পয়ঃপ্রণালির গরাদ থেকে ফাঁসিতে ঝুলে পড়ে, মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে। মৃতদেহ নামানোর পর দেখা গেল মাথার টুপি যেমনটি ছিল তেমনটিই রয়েছে মাথায় সেঁটে, আর তাঁর পকেটে পাওয়া গেল অসমাপ্ত রচনা *অরেলিয়া*র পাণ্ডুলিপি। আত্মহত্যালিপিতে তিনি বলেছিলেন: আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে থেকো না, কারণ রাত তো হয়ে উঠবে সাদা-কালো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংরাগ ও সৌন্দর্য

কিন্তু, অন্যদিকে, এই জগতে হঠাৎই
মায়া ও আলো হতে বঞ্চিত হয়ে, মানুষ
নিজেকে অনুভব করে বিচ্ছিন্ন, আগন্তুক।
তার নির্বাসনের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই
যেহেতু সে এক হারানো ঘরের স্মৃতি বা
প্রতিশ্রুত দেশের আশা হতে বঞ্চিত। মানুষ
ও তার জীবনের মধ্যে যে বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ অভিনেতা
ও তার মঞ্চের মধ্যে, এ-ই যথাযথভাবে নিরর্থকতার
অনুভব। সকল স্বাস্থ্যবান মানুষেরই
তাদের নিজ আত্মহত্যার ভাবনা থাকে—
দেখা যায় কোনো রকম অধিকতর ব্যাখ্যা
ছাড়াই—যে এই ভাবনা এবং মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষার
মধ্যে এক সরাসরি যোগাযোগ বিদ্যমান।

আলব্যের কাম্যু

বিনাশের সংরাগ অবশ্যই এক
সৃষ্টিশীল সংরাগ।

মাইকেল বাকুনিন

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কিছু কিছু কম্পিত সময় এসেছে, যখন আত্মহত্যার বিভাবে ও সৌন্দর্যে উদ্বেলিত হয়েছে সেই কাল। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে আত্মহত্যার নানা উদ্ভাস ও প্রতিভাস। বিংশ শতাব্দীতে আত্মহত্যা দেখা দিয়েছিল এক তীব্র আসক্তি ও সংরাগ হিসেবে। এ সময়ে আত্মহত্যা আবির্ভূত হয় আধুনিক সংস্কার হিসেবে। অনেক বিখ্যাত ও মহতেরা ঘটিয়েছেন আত্মহত্যা, পাশাপাশি ঘৃণ্য কয়েকজনও ঘটিয়েছেন আত্মহত্যা। পাউল সেলান, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ প্রমুখের সমান্তরালে চোখে পড়ে হিটলারের আত্মহত্যাও। আত্মহত্যা এক অহমের যোজন ও বিয়োজন—প্রকাশ ও বিলুপ্তি। তাই দেখা যায়, বিংশ শতাব্দীর এক অনমনীয় সংহারক অডোল্‌ফ হিটলারকে আত্মহত্যা করতে। ১৯৪৫ সালের বসন্তে সোভিয়েত বাহিনী যখন বার্লিনমুখী, ঠিক সে-সময়ই হিটলার আত্মহত্যার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। শত্রুকে সে ধরার সাফল্য দিতে চায়নি। সায়ানাইড আনা হলো এবং তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হলো তার প্রিয় কুকুর ব্লন্ডির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওপর—তার প্রিয় জার্মান শ্যাফার্ড যে কয়েক দিন আগে মাত্র প্রসব করেছে কয়েকটি ছানা। মায়ের মৃত্যুর পর তাদেরও মেরে ফেলা হলো; অটো গোয়েনশ্চ গুলি করে বাচ্চাগুলিকে মেরে ফেলে। ফুয়েরারের চিতার জন্য সে আনল ২০০ লিটার গ্যাসোলিন। শেষবারের মতো খাবার খেয়ে হিটলার তার বান্ধবী ও সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী ইভা ব্রাউনকে নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে। শেষ মুহূর্তে, জার্মানির প্রচারমন্ত্রী, ব্যর্থ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার ইয়োসেফ গোয়েবল্‌স-এর স্ত্রী মাগদা গোয়েবল্‌স তাদের বিরত করার চেষ্টা করেন। মাগদা দৌড়ে দরজা পর্যন্ত যান যেখানে দণ্ডায়মান ছিল গোয়েনশ্চ। বললেন, এখনও সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি, আশা এখনও আছে। গোয়েনশ্চ দরজা খুলে হিটলারকে জিজ্ঞেস করলেন মাগদা গোয়েবল্‌সকে ভেতরে আসতে দিবেন কি না। হিটলার নিষেধ করল। একই সাথে সায়ানাইড ক্যাপসুল কামড়ে ও গুলি করে হিটলার এবং ইভা ব্রাউন আত্মহত্যা করল। তাদের মৃতদেহ চ্যান্সেলারি গার্ডেনে নেওয়া হলো, শোয়ানো হলো এক শবাধারে। তারপর সোভিয়েত বাহিনীর বন্দুক যখন নিকটেই গর্জে উঠছিল ঠিক তখনই আগুন দেওয়া হলো। গোয়েবল্‌স তার শেষ প্রচারে জানাল ফুয়েরারের মৃত্যু সংবাদ। অসংখ্য মানুষের হত্যাকারী অবশেষে আত্মহত্যা করল, এছাড়া কীই-বা আর গতি হতে পারত তার।

হিটলারের আত্মহত্যা কলঙ্কিত করেছে অন্যান্য মহৎ আত্মহত্যাকে। কোটি কোটি হত্যাযজ্ঞের নায়ক হিটলার তার নিজ আত্মহত্যার দ্বারা রেহাই পেতে চেয়েছিল মানুষের হাত থেকে। শাসনকালে নিজে হত্যা করেছিল বহু লেখককে। অথচ কী আশ্চর্য, সে রচনা করেছিল ৭৮১ পৃষ্ঠার এই বই *আমার সংগ্রাম* যা ইহুদি বিদ্বেষের এক কৃষ্ণগ্রন্থ। একদা জার্মানিতে হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল এই গ্রন্থ আর এখন কেউ তা পড়ে না, বা পড়লেও পড়ে তীব্র ঘৃণাভাবে। মহৎদের আত্মহত্যার পাশে, বিংশ শতাব্দীতে, হিটলারের আত্মহত্যা এক কলঙ্ক। তার রচিত বইটি মানবসভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিধনযজ্ঞের তাত্ত্বিক সূত্র হিসেবে ঘৃণ্য এক গ্রন্থ আজ। আর জীবনের মতো মৃত্যুতেও হিটলার চরম নিষ্ঠুর।

সাহিত্যে আত্মহত্যা শুধু বিষয় হিসেবেই উজ্জ্বল নয়, বরং আঙ্গিক ও বোধনেও তা আলেখ্যময় ও স্মরণীয়। আত্মহত্যা সবলভাবে এসেছে বিভিন্ন লেখকের লেখায়: কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে। ধর্মগ্রন্থ-পুরাণেও পাওয়া যায় আত্মহত্যার অভিভাব। বিভিন্ন বীরেরা আত্মহত্যা দ্বারা অবলুপ্ত করেছেন নিজেদের। হয়তো এর পেছনে মনস্তত্ত্ব ছিল ভিন্ন ভিন্ন রকম। গ্রিক পুরাণ উল্লেখযোগ্য আত্মহত্যায় ভরপুর। গ্রিক পুরাণে দেখা যায় প্রেম, বিরহ, ঘৃণা থেকে সংঘটিত আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যা কখনও কখনও মহিমান্বিত, কখনও বা মনস্তাপিত সৌন্দর্যে ভাস্বর।

সিফালাস ও প্রক্রিস স্বামী-স্ত্রী, সুখের দাম্পত্য জীবন তাদের। কিন্তু উষাদেবী ইওস এতে বাধ সাধল। একদিন ইওস সিফালাসের কাছে প্রেম নিবেদন করলেন। প্রক্রিসে একমাত্র অনুরক্ত সিফালাস প্রত্যাখ্যান করলেন ইওসের প্রেম। ইওস সিফালাসকে বললেন, যাকে সে একমাত্র ভালোবাসে, সেই প্রক্রিস মূলত অসতী। শুনে প্রাথমিক অবিশ্বাস সত্ত্বেও সিফালাসের মনে সন্দেহের বীজ উপ্ত হয়। একদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষা করার জন্য এক স্বর্ণকারের ছদ্মবেশে সিফালাস প্রক্রিসের কাছে এসে স্বর্ণালংকার উপহার দিয়ে প্রক্রিসকে দেহমিলনের প্রস্তাব দেয়। অলংকারের লোভে প্রক্রিস সাড়া দিয়ে ছদ্মবেশী সিফালাসের সাথে দেহমিলনে রত হয়। মিলনের পর সিফালাস স্ত্রী প্রক্রিসের কাছে নিজের আসল রূপ দেখিয়ে প্রতারণার জন্য তাকে ত্যাগ করেন। এরপর প্রক্রিস ক্রিতের রাজা মাইনসের আশ্রয়ে গিয়ে মাইনসের কাছ থেকে একটি দৈব কুকুর ও দৈব বর্শা উপহার হিসেবে নিয়ে তার সাথে মিলিত হন। রাজা মাইনসকে অরণ্যদেবী আর্তেমিস দান করেছিলেন এই দৈব কুকুর ও বর্শাটি। কিছুকাল পর প্রক্রিস ক্রিতে পরিত্যাগ করে পুনরায় স্বদেশে ফিরে এসে মাইনস থেকে প্রাপ্ত দৈব কুকুর ও বর্শা সিফালাসকে দিয়ে তার সঙ্গে পুনঃসম্পর্ক স্থাপন করেন। দেবী আর্তেমিস ক্ষিপ্ত হলেন প্রক্রিসের ওপর, কারণ প্রদত্ত কুকুর ও বর্শাকে কাজে লাগিয়ে প্রক্রিস ব্যভিচার করে যাচ্ছেন। সিফালাস অন্য নারীতে আসক্ত, এই সন্দেহের বীজ তিনি প্রক্রিসের মনে বপন করলেন। একদিন সিফালাস রাতে শিকারের লক্ষ্যে বাইরে গেলে প্রক্রিস তাকে অনুসরণ করল। চাঁদের আলো দেখে নিজেকে আড়াল করার জন্য সিফালাস মেঘকে বললেন, "নেফেলি এসো"; প্রক্রিস ভাবল সিফালাস কোনো নারীকে ডাকছে। প্রক্রিস সিফালাসের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সিফালাস ভাবল শিকার তার দিকে আসছে। ফলে ছুড়ে দিল দৈববর্শা। আঘাতে মারা গেল প্রক্রিস। কাছে এসে দেখলেন প্রক্রিস বর্শার আঘাতে মারা গেছে। এরপর শোকে অনুশোচনায় সিফালাস আত্মহত্যা করে নিজের জীবন শেষ করেন।

বিখ্যাত গ্রিক বীর থিসিউস: ইথ্রা ও অ্যাথেন্সের রাজা ইজিউসের ঔরসে তার জন্ম। অ্যাথেন্স থেকে যাত্রার সময় তার পিতার নির্দেশে শোকচিহ্ন হিসেবে কালো রঙের পাল টাঙিয়ে দিয়েছিল। কথা ছিল যে সুখের সময় সাদা-রঙের পাল আর দুঃখের সময় কালো রঙের পাল টাঙাবেন। আরিয়াতানিকে নাক্সোস দ্বীপে ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে আসায়, পিতার কথা ভুলে, থিসিউস জাহাজে কালো পাল টাঙিয়ে দিয়েছিল। পুত্রের অপেক্ষায় অ্যাথেন্সের সমুদ্র-উপকূলে অপেক্ষমাণ ইজিউস যখন দেখল প্রত্যাবর্তনরত থিসিউসের জাহাজে কালো পাল, তখন শোকে তিনি অথই জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। পুত্রের ভুলে মৃত্যু হয় পিতার। তার অনেক পর আত্মগ্লানিতে থিসিউসও আত্মহত্যা করে।

ব্যাবিলনীয় পুরাণের প্রেমকাহিনির বিখ্যাত চরিত্র পাইরামাস ও থিসবি। একই ছাদের নীচে দুই বাড়িতে তারা বসবাস করত। পাইরামাস অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষ, প্রাচ্যে তার মতো সুদর্শন আর একটিও ছিল না। থিসবি বনদেবীর মতো অপূর্বসুন্দরী। প্রতিবেশী থেকে তাদের সম্পর্ক রূপ নেয় গভীর প্রেমে। একই ছাদের নীচে দুই ঘরের মাঝখানের দেয়ালে ছিল এক ছোটো সরু ছিদ্র, এই ছিদ্র দিয়েই তারা দেখাদেখি ও প্রেমালাপ করত। একদিন এই ছিদ্র দিয়েই কথা বলে ঠিক করল চূড়ান্ত মিলনের জন্য তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে নিনাসের নির্জন স্মৃতিসৌধের কাছে গিয়ে দুজনে মিলিত হবে। সেই রাতেই বের হবে বলে স্থির করল তারা। থিসবি প্রথমে বেরিয়ে গিয়ে নিনাসের স্মৃতিসৌধের কাছে ঝরনার পাশে এক মালবেরি গাছের নীচে দাঁড়াল। পাইরামাস তখনও আসেনি, হঠাৎ এক সিংহের গর্জন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুনতে পেয়ে তাড়াহুড়ায় নিজ ওড়না ফেলে রেখেই থিসবি দ্রুত সরে গেল সেখান থেকে। অন্য এক শিকার খেয়ে সিংহী সেখানে বিশ্রাম নিল এবং পড়ে থাকা ওড়না দেখে দৌড়ে এসে ওড়নাটা রক্তাক্ত মুখে ছিড়ে ফেলল, তারপর চলে গেল। একটু পরেই সেখানে এসে পাইরামাস দেখল থিসবি সেখানে নেই। দূরে সিংহীর গর্জন শুনল পাইরামাস, আর দেখল রক্তমাখা ছিন্ন থিসবির ওড়না। সিংহীর হাতে থিসবির মৃত্যু হয়েছে ধারণা করে পাইরামাস থিসবির ওড়না জড়িয়ে নিজের তরবারি বুকে বসিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করল। সকাল হলে থিসবি বেরিয়ে এল নিরাপদ স্থান হতে। দেখল, মালবেরি গাছের নীচে পাইরামাসের মৃতদেহ। তারপর মাইরামাসকে আলিঙ্গন করে তার বুকে বিদ্ধ তরবারিটি টান দিয়ে খুলে নিজের বুকে বসিয়ে আত্মহত্যা করল থিসবি। তারপর দেবীর নির্দেশে তাদের রক্তে রঞ্জিত মালবেরির ফল হয়ে গেল লাল। ওভিদ এই কাহিনি বর্ণনা করেছেন *মেটামরফসিস*-এ। তিনি লিখেছেন :

> মালবেরির সাদা রং হয়ে পড়ে দ্রুত অপসৃত
> আর পেকে বিষণ্নতায় হয় গাঢ় লাল:
> যেন তাদের পিতা-মাতা রোদন করে হারানো সন্তানের জন্য
> আর এক সুবর্ণ ভস্মাধারে একীভূত হয় তাদের দেহভস্ম।[২]
> সুবর্ণভস্মাধারে মিলিতভাবে ঠাঁই হলো তাদের।

গ্রিক অমর প্রেমকাহিনির নায়ক-নায়িকা লিয়ান্দার ও হিরো। হিরো ছিলেন দেবী আফ্রোদিতের মন্দিরের পূজারিনী, এক নির্জন টাওয়ারে বাস করত হিরো। তার প্রেমিক লিয়ান্দার। তারা দুজনে বাস করত দুই তীরে, মাঝখানে সমুদ্র। প্রতি রাতে হিরো টাওয়ারে একটি মশাল জ্বেলে দিলে অপর পার থেকে প্রেমিক লিয়ান্দার এই প্রজ্জ্বলন্ত মশাল দেখে নিশানা ঠিক করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে হিরোর কাছে আসত আর তাদের মিলন হতো। একবার হিরো রাতে মশাল জ্বালায়, কিন্তু প্রচণ্ড ঝড় এলে মশালের আলো নিভে যায়। বৃষ্টির কারণে হিরো আর মশাল জ্বালাতে পারেনি। প্রথম বারে জ্বলন্ত মশাল দেখে লিয়ান্দার সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় কিন্তু পরবর্তী সময়ে মশাল নিভে গেলে সে সমুদ্রে নিশানা হারিয়ে মৃত্যুবরণ করে। সমুদ্রস্রোতে ভেসে তার দেহ পড়ে থাকে হিরোর টাওয়ারের নীচে। পরদিন লিয়ান্দারের মৃতদেহ দেখে দুঃখে তার প্রেমিকা হিরো টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

বাইবেল-এও পাওয়া যায় আত্মহত্যার কাহিনি। জিশু খ্রিস্টকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বারো শিষ্যের একজন—জুদাস (যিহুদা): "পরে সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই বারো জন শিষ্যের সহিত ভোজনে বসিলেন। আর তাঁহাদের ভোজন সময়ে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে সমর্পণ করিবে।"[৩] "তখন যে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, সেই যিহুদা কহিল, রাব্বি, সে কি আমি? তিনি তাহাকে কহিলেন, তুমিই বলিলে।"[৪] জুদাস জিশুর দণ্ডাজ্ঞার অনুশোচনায় গৃহীত তিরিশ রৌপ্যমুদ্রা প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গের নিকটে ফিরিয়ে দিয়ে বলল যে নির্দোষ জিশুকে ধরিয়ে দিয়ে সে পাপ করেছে। যাজকেরা তখন বলল, "আমাদের কি? তুমি তাহা বুঝিবে।"[৫] তখন জুদাস রৌপ্যমুদ্রাগুলো মন্দিরের মধ্যে ফেলে দিয়ে অন্যত্র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল।[৬] পরে যাজকেরা সেই মুদ্রা নিয়ে ভাবল যে তা গ্রহণ করা ঠিক নয়, কারণ তা জিশুর "রক্তের মূল্য"। পরে তারা মন্ত্রণা করে বিদেশিদের কবর দেবার জন্য তা দিয়ে "কুম্ভকারের ক্ষেত্র" ক্রয় করল। *প্রেরিতদের কার্য*-এ বলা আছে, জুদাস অধোমুখে ভূমিতে পতিত হলে তার উদর ফেটে গিয়ে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে সে মারা যায়।[৭]

বাইবেল: পুরাতন নিয়ম-এর শমূয়েল পুস্তকে আছে যে রাজা শৌল পলেস্টীয়দের তাড়া খেয়ে খড়ুগ দিয়ে আত্মহত্যা করে: "আর পলেষ্টীয়েরা শৌলের ও তাঁহার পুত্রগণের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িল এবং পলেষ্টীয়রা যোনাথন, অবীনাদব ও মলকী-শূয়, শৌলের এই পুত্রদিগকে বধ করিল। পরে শৌলের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম হইল, আর ধনুর্ধরেরা তাহার লাগাল পাইল; সেই ধনুর্ধারিগণ হইতে শৌল অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইলেন। আর শৌল আপন অস্ত্রবাহককে কহিলেন, তোমার খড়ুগ খুলো, উহা দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করো; নতুবা কি জানি, ঐ অচ্ছিন্নত্বকেরা আসিয়া আমাকে বিদ্ধ করিয়া আমায় অপমান করিবে। কিন্তু তাঁহার অস্ত্রবাহক তাহা করিতে চাহিল না, কারণ সে অতিশয় ভীত হইয়াছিল, অতএব শৌল খড়ুগ লইয়া আপনি তাহার উপরে পড়িলেন। আর শৌল মরিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার অস্ত্রবাহক ও আপন খড়ুগের উপর পড়িয়া তাঁহার সহিত মরিল।[৮] এভাবেই শৌল ঈশ্বরের অনুজ্ঞা লঙ্ঘনের কারণে মারা যান।

লাতিন ভাষায় রচিত মহাকাব্য *ইনিদ* প্রাচীন রোমের বিখ্যাত কবি ভির্গিলিয়ুস (ভার্জিল) কর্তৃক রচিত। এর এক মহৎ নারী চরিত্র দিদো। দিদোর প্রভাব দেখা যায় পরবর্তী সাহিত্যে: শেক্‌সপিয়রের *হ্যামলেট*-এর ওফেলিয়া এবং তলস্তোয়ের *আনা কানেনিনার* আনা চরিত্রে দিদোর ছায়াসম্পাত দেখা যায়। দিদো কার্থেজের রানি, বিধবা। ইনিয়ুস দৈব নির্ধারিত ভূমির খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে কার্থেজে এলে রানি দিদো তাকে আশ্রয় দেন। পরে, ভিনাস (প্রেমের দেবী) ও জুনোর (জুপিটারের মহিষী, স্বর্গের রানি, নারীর বিবাহ ঘটানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত) সহায়তায় দিদো এবং ইনিয়ুসের মধ্যে প্রেম হয়। কিন্তু দৈবনির্ধারিত ভূমির সন্ধানের জন্য, জুপিটারের নির্দেশে, দিদোর কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও, ইনিয়াস কার্থেজ ত্যাগ করলে শোকে দিদো আত্মহত্যা করেন। *ইনিদ*-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দিদো। ভার্জিল (খ্রি. পূ. ৭০-খ্রি. পূ. ১৯) *ইনিদ* শেষ করে যেতে পারেননি। *ইনিদ*-এর পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেলার জন্য তিনি বন্ধুদের বলেছিলেন, কিন্তু বন্ধুরা তাঁর এই কথা রাখেননি।

সোফোক্লেস-এর গুরুত্বপূর্ণ নাটক *অয়দিপুস*। গ্রিক সাহিত্যের অন্যতম মহৎ ট্রাজেডি এই *অয়দিপুস* নাটক। নিয়তি দ্বারা চালিত রাজা অয়দিপুস, যার জন্মের আগেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। থিবির রাজা লেয়াসের পুত্র অয়দিপুস। দৈববাণী হয় যে লেয়াস তার নিজ পুত্র কর্তৃক নিহত হবেন। ফলে রানি ইয়োকাস্তার গর্ভে অয়দিপুসের জন্ম হলে তাকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে, দৈববাণীর ভয়ে, রাজা লেয়াস অয়দিপুসকে হত্যার জন্য মেষপালকের হাতে তুলে দেন। কিন্তু সেই মেষপালক সিথেরনের চারণক্ষেত্রে অন্য এক মেষপালকের (করিন্থীয় দূত) হাতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অয়দিপুসকে লালনপালনের জন্য তুলে দেয়। এরপর বড়ো হলে, দেলফি থেকে ফেরার পথে প্রকৃত পিতা লেয়াসকে তিনি হত্যা করেন। পরে থিবিতে এনে থিবিকে স্ফিংক্সের অত্যাচারমুক্ত (স্ফিংক্সের ধাঁধার উত্তর দিয়ে) করলে বিধবা রানি ইয়োকাস্তার (নিজ মাতা) সাথে তার বিয়ে হয় এবং তিনি থিবির রাজা হন। পরে, অনেক কাল পর, অয়দিপুস উপনীত হন সত্যের মুখোমুখি: তিনি জানতে পারেন যে দৈববাণীই সত্য, তিনি হত্যা করেছেন আপন পিতা লেয়াসকে এবং তার আপন স্ত্রী হলো তার নিজ মাতা। ইয়োকাস্তা ঘটনা জেনে প্রসাদাভ্যন্তরে ছুটে গিয়ে আত্মহত্যা করলেন গলায় দড়ি দিয়ে। ইয়োকাস্তার আত্মহত্যার পর তার পোশাকে আঁটা সোনার কাঁটা দিয়ে অয়দিপুস নিজ চোখ বিদ্ধ করে অন্ধ হয়ে যান। *অয়দিপুস* নাটকের প্রতিহারীর বক্তব্যে তার বর্ণনা আছে:

> তখন আমরা দেখলাম একটি ঝুলন্ত দড়ির ফাঁস,
> দেখলাম শ্বাসরুদ্ধ একটি নারী আমাদের চোখের
> সামনে ঝুলে আছে।
> রাজাও দেখলেন, মর্মভেদী আর্তচিৎকার করে
> খুলে দিলেন
> সেই রজ্জুর ফাঁস। তারপর মাটিতে শোয়ালেন তাঁকে।
> কিন্তু আরো বীভৎস দৃশ্য দেখা তখনও বাকি ছিল।
> রাণীর পোশাকে আঁটা ছিল কয়েকটি সোনার কাঁটা
> রাজা দুহাতে দুটো দীর্ঘ কাঁটা খুলে নিলেন এবং
> যতদূর বাহু প্রসারিত করা যায় ততদূর থেকে
> বিদ্ধ করলেন নিজেরই দুই চোখে।[৯]

আত্মহত্যায় মহিমান্বিত অনেক মহৎ সাহিত্য। আত্মঘাতী অভিঘাতে মন্দ্রিত হয়ে ওঠে চরিত্রগুলো। মহৎ কিছু উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরিণতি হয় আত্মহত্যার মাধ্যমে, মৃত্যুতে। উপন্যাসে প্রকৃতিবাদের স্রষ্টা গুস্তাফ ফ্লবের-এর বিখ্যাত উপন্যাস *মাদাম বোভারি*। তার প্রধান চরিত্র এমা রুয়ো বিয়ের পর হয় মাদাম বোভারি। বিয়েতে সে সন্তুষ্ট নয়, ভিন্ন দুজনের সাথে তার প্রেম-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চমৎকার আসবাবপত্র, ভালো খাদ্য, রুচিশীল সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ কেনার নেশায় সে মশগুল হয়। ঋণ করে সে ভোগী জীবন যাপন করতে চায়; প্রেমও পূর্ণতা পায় না। একসময় প্রেমিক রোদলফ-এর কাছে টাকা চেয়েও সে টাকা পায় না। স্বামীর এক নোটারির কাছে সব সম্পত্তি বন্ধক, টাকার প্রয়োজন। ডাক্তার স্বামীর রোগীরাও টাকা দিচ্ছে না। জমিজমার ব্যাপারও নিষ্পত্তি হয়নি; সব জিনিসপত্র বিক্রি হওয়ার উপক্রম। প্রেমিক রোদলফ তাকে বলে যে, তার "টাকাটা নেই"। এমা দিশেহারা হয়ে যায়। নিজ রক্ত চলাচলের শব্দ শোনে সে। অতঃপর এমা আত্মঘাতী হয়ে ওঠে। সে আর্সেনিক খায়। ভাবে: "আঃ মৃত্যুটা তাহলে এমন কোনো ভয়ংকর ব্যাপার নয়।" "আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে তারপর সব শেষ।" স্বামী শার্লকে সে চিঠি লিখে জানায় "কেউ দোষী নয়"। তার মৃত্যুতে স্বামী শার্ল হয়ে পড়ে বিহ্বল। প্রণয়ীরা এমাকে দিতে পারেনি নিখাদ ভালোবাসা। ভালোবাসার অভাবেই যেন সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ্যোয়েটের *ফাউস্ট*-এও দেখা যায়, জ্ঞানবিদ্যার যে বিপুল অহংকারের মধ্যে জীবগত অস্তিত্বের সমস্ত সম্পর্ককে কেন্দ্রীভূত দেখেছিল ফাউস্ট, তার অপূর্ণতা ও অসফলতায় ফাউস্ট হয়ে উঠল শোকাহত। হতাশার ফলে আত্মহত্যার কথাও ভাবল ফাউস্ট। গ্যোয়েটের একটি উপন্যাস *তরুণ হ্বের্টেরের দুঃখ*-এর মূল উপজীব্য আত্মহত্যা: নায়ক হ্বের্টেরের আত্মহত্যা। নায়ক হ্বের্টের ছবি আঁকে আর নিবিড় নির্জন মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের পটভূমিতে তার অনুভূতির ঘনীভূত অবস্থায় নিজ জীবনের একটি বিশেষ দশা উন্মোচিত হয়। লোট্টের প্রতি হ্বের্টেরের ব্যর্থ প্রেম অবশেষে তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। প্রেমিকা লোট্টের স্বামী আলবার্টোর কাছ থেকে সে আনে দুটি পিস্তল যেন পিস্তলে লোট্টের পরশ সে পায়। সে ভাবে চোখে জল ভরে আসে, যেহেতু শান্তি নেই তার কোথাও, তখন পৃথিবী হতে চলে যাওয়াই ভালো। সে ভাবে, লোট্টে তাকে যে মরণের পেয়ালা তুলে দিয়েছে, সে তা প্রাণভরে পান করবে। সে লোট্টের জন্যই মৃত্যুবরণ করবে। সে এ কথা ভেবে আনন্দ পাচ্ছে যে প্রেমিকার জন্যই সে আত্মহত্যা করছে। সে আরও ভাবে, প্রিয়জনের জন্য জীবনদান কোনো নতুন ঘটনা নয়। লোট্টে তাকে জন্মদিনে যে-গোলাপ দেয়, সে-গোলাপসহ তাকে সমাহিত করার আকাঙ্ক্ষা সে ব্যক্ত করে। তারপর রাত বারোটায়, "বিদায় লোট্টে, বিদায়" বলে হ্বের্টের গুলিভরতি পিস্তল চালিয়ে আত্মহত্যা করে। পরের দিন সকাল ৬টায় চাকর ঘরে ঢুকে মেঝেতে রক্ত-ঝরা অবস্থায়, "তরুণ হ্বের্টের"কে আবিষ্কার করে। সমালোচকেরা বলে থাকেন, গ্যোয়েটে নিজেও একবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন, এরই প্রতিফলন তাঁর এই উপন্যাস। এই উপন্যাস বের হলে ইউরোপে আত্মহত্যার হার বেড়ে যায়। আত্মহত্যা যেন এক ফ্যাশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ইউরোপে।

বুড়ো বয়সেও তলস্তোয়ের এই বিশ্বাস ছিল যে, আত্মহত্যা প্রত্যেক মানুষের এক অনপসারণযোগ্য অধিকার। তাঁর সৃষ্ট অনেক চরিত্রই আত্মহত্যার অভিঘাতে তাড়িত। *আনা কারেনিনার* ভ্রোন্‌স্কি ও লেভিন, *যুদ্ধ ও শান্তির* পিয়ারে বেজুখোভ, *পুনরুত্থান*-এর কেতারিনা মাসলোভা উদ্যোগী বা অনুধ্যানী ছিল আত্মহত্যায়, যদিও অবশেষে তাদের হতাশাকে তারা অপসারিত করতে পেরেছিল এবং আত্মহত্যা থেকে তারা বিরত ছিল। কিন্তু আনা কারেনিনা নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। রেলগাড়ির নিচে পড়ে আনা কারেনিনা আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার আগে সে ভাবে: এখন মৃত্যুচিন্তা আর ভয়ংকর ও ভিন্ন বলে মনে হয় না; এবং মৃত্যু নিজেও আর অপরিহার্য নয়।[১০] আত্মহত্যার ঠিক প্রাকমুহূর্তে সে ভীত হয়ে ওঠে এই ভেবে যে, সে কী করছে! সে ভাবে—"আমি কোথায়? আমি কী করছি? কেন করছি?"[১১] সে উঠতে চেষ্টা করে, পেছনে নিজেকে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ততক্ষণে একটি বিশাল কঠিন কিছু তার মাথায় আঘাত করে এবং সে নীচে পড়ে যায়। তখন সে মৃদুস্বরে বলে: "ঈশ্বর, আমার সবকিছু ক্ষমা করো।"[১২] আনার জীবন ব্যর্থ প্রেমের জীবন: আত্মহত্যাতেই যার সমাপ্তি হয়। মৃত্যুর আগে সে ক্ষমা চেয়ে নেয় ঈশ্বরের কাছে। এখানে স্মরণযোগ্য যে, তলস্তোয় এই উপন্যাস লেখার সময় ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন বিষাদে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সোক্রাতেসের মৃত্যুকেও কেউ কেউ বলতে চান এক প্রচ্ছন্ন আত্মহত্যা। সোক্রাতেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হলো যে, তিনি দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে নষ্ট করছেন এবং এক নতুন ধর্ম (ডিভিনিটি) প্রচার করতে চাইছেন। অভিযোগকারীদের ইচ্ছা ছিল, সত্তর বছর বয়স্ক সোক্রাতেসকে নির্বাসনে পাঠানো। জুরিদের রায়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলো। জুরিদের মধ্যে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এই রায় ঘোষিত হলো। তৎকালীন বিচারের রীতি অনুযায়ী বিকল্প কোনো দণ্ড ভোগ করতে চায় কি না—এ বিষয়ে সোক্রাতেসের মতামত চাওয়া হলো। যেহেতু সোক্রাতেস দোষী নন, তাই তিনি এক "মিনা" জরিমানা প্রদানে রাজি হলেন, পরে শিষ্যদের অনুরোধে তিনি তিরিশ "মিনা" পর্যন্ত দিতে রাজি হলেন। বিচারকগণ এতে অত্যন্ত অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হলো, এবং দণ্ড হিসেবে এই তুচ্ছ অর্থ প্রদানের কথা বলাকে আদালত অবমাননা হিসেবে বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ডের রায়কে বহাল রেখে দিল। এরপর রায় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত সোক্রাতেস কারাগারে ছিলেন এবং নিয়মিত তাঁর শিষ্যদের সাথে বসে সময় কাটাতেন। শিষ্যরা তাঁর জীবন রক্ষার্থে কারাগার থেকে গোপনে বের করে দেওয়ার প্রস্তাবও তাঁকে দেন, কিন্তু এ প্রস্তাবে তিনি রাজি হননি। সোক্রাতেস প্রচলিত আইনকে শ্রদ্ধা করতে চাইলেন এবং শিষ্যদের শত অনুরোধ ও চেষ্টাকে উপেক্ষা করে নির্ধারিত দিনে হেমলক পান করে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুবরণের পূর্ব মুহূর্তে বলেছিলেন: বিদায়মুহূর্ত আগত। আমি মরতে যাচ্ছি? আপনারা বেঁচে থাকবেন, কোনটা ভালো তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। "আমি মরতে যাচ্ছি" কথাটির মধ্যে আত্মহত্যার অভিভাব নিহিত। প্রচলিত আইনকে শ্রদ্ধার জন্য, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে রক্ষা না-করে, স্বেচ্ছায় ধীরেসুস্থে, প্রস্তুতিতে, হেমলক পান করে মৃত্যুবরণ করা নিশ্চয়ই এক স্বেচ্ছামৃত্যুসম আচরণ বলে অনেকে ব্যাখ্যা দেন।

গ্রিক পুরাণে অয়দিপুসের মাতা ও স্ত্রী ইয়োকাস্তার আত্মহত্যার কথা বলা আছে, কিন্তু ইয়োকাস্তার ভাই ক্রেয়ন-এর পুত্র হাইমোনের আত্মহত্যার কাহিনিও বর্ণিত আছে। অয়দিপুস-পুত্র ইতিওক্লেস ও পলিনেইসিস থিবির সিংহাসন নিয়ে লড়াইয়ে একে অন্যের হাতে নিহত হলে ক্রেয়ন থিবির সিংহাসন দখল করেন। ক্রেয়ন পলিনেইসিসের মৃত্যুদেহ সৎকার না করার নির্দেশ জারি করেন কিন্তু আন্তিগনি সেই নির্দেশ অমান্য করলে ক্রেয়ন আন্তিগনিকে জীবন্ত সমাধি দেন। আন্তিগনির প্রেমিক ক্রেয়নের পুত্র হাইমোন এই ঘটনা জানতে পেরে শোকে-দুঃখে আত্মহত্যা করেন। হাইমোনের আত্মহত্যার সংবাদে তার মা-ও আত্মহত্যা করেন।

শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডিগুলোতে মৃত্যুময়তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। *ওথেলো*, *অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা*, *হ্যামলেট*, *রোমিও ও জুলিয়েট*, *জুলিয়াস সিজার*, *ম্যাকবেথ* প্রভৃতি নাটকে ঘটে মৃত্যুর অনিবার্য উপস্থিতি। অনেকগুলোতে আত্মহত্যার মহৎ রূপ উদ্ভাসিত হয়। *রোমিও ও জুলিয়েট*-এ মন্তেগোপুত্র রোমিও এবং ক্যাটুলেটকন্যা জুলিয়েট আত্মহত্যা করে জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন ঘটানোর জন্য ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে মৃত্যু হয়েছে বলে কবরখানায় নিয়ে আসা হয়। রোমিও জুলিয়েটের মৃত্যুসংবাদ শুনে বিষপানে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মহত্যা করে। জুলিয়েট নির্ধারিত সময়ের পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে মৃত রোমিওকে দেখে বলে, "To make me die with a restorative" এই বলে রোমিওর ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করে। ধর্মযাজক ফ্রায়ার লরেন্স জুলিয়েটকে বলে:

> Lady come from the nest
> of death contagion, and
> unnatural sleep;

কিন্তু ঘুম ভাঙে না জুলিয়েটের। ফ্রায়ার লরেন্সের পরামর্শে রোমিওর সাথে মিলনের জন্য সে ওষুধ খেয়ে অচেতন হয়, সবাই ভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু এই নকল মৃত্যুই মৃত্যু ঘটায় রোমিওর, কারণ রোমিও ঘটনার বার্তাটি পায়নি। আর এভাবেই, আত্মহত্যার দ্বারা দুজনের মৃত্যু ঘটে। জুলিয়েট আত্মহত্যা করে কারণ সে ভাবে, এখন মরলে পৌঁছাতে পারবে রোমিওর কাছে। আত্মহত্যা করেই জুলিয়েট মৃত রোমিওর সাথে মিলতে চেয়েছিল। আর জুলিয়েট মারা গেছে ভেবেই রোমিও আত্মহত্যা করেছিল।

ফ্রানৎস কাফকার "মেটামরফসিস" প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বলুপ্তির আকাঙ্ক্ষার এক ভয়াবহ আখ্যান। গ্রেগর জাম্‌জা অবলুপ্ত করতে চায় নিজ বর্তমান অস্তিত্বকে। তার ঘৃণ্য আত্মনাশিতা আর স্বর্ণকেশী বোন গ্রেটের প্রতি তার কামনা নয় শুধু, প্রকারান্তরে নিজের মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা ও পরিবারকে নিজ-জীবনের বিভীষিকাময় উপস্থিতি ও বোঝা থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য তার রূপান্তর প্রয়োজন হয়ে ওঠে। এই রূপান্তর এক অস্তিত্ব থেকে নিরুদ্যম অন্য এক অস্তিত্বে গমন: "একদিন ভোর পাঁচটায় গ্রেগর জাম্‌জার ঘুম ভাঙল কিছু এলোমেলো স্বপ্ন দেখে। সে দেখল সে তার বিছানায় একটা বিরাট পোকা হয়ে শুয়ে আছে। সে যেন তার বর্ম-আচ্ছাদিত শক্ত পিঠের ওপরে শুয়ে আছে।"[১৩]

গ্রেগর জাম্‌জার রূপান্তর তার আকাঙ্ক্ষা, তার এক মৃত্যুময়তার স্বপ্ন, যখন সে মূলত বর্তমান অস্তিত্বের অনিবারণীয় বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায়। তার পরিণামকে বলা যায় এক জাড্যাবস্থা: "গোধূলির আগে গ্রেগর ঘুম থেকে উঠল না। তার দীর্ঘ ঘুমকে মূর্ছা বলা যেতে পারে, একে ঠিক ঘুম বলা যায় না।"[১৪] বোন গ্রেটেকে সে আকাঙ্ক্ষা করে, তার বেহালা বাজানোকে সে উপভোগ করতে চায়: "গাঢ়ভাবে এবং বিষণ্ণভাবে তার চোখ দুটি সংগীতের ধ্বনিকে অনুসরণ করছিল। গ্রেগর একটু নিচু হয়ে সামনের দিকে হামাগুড়ি দিল এবং মাটিতে শুয়ে সে চাইছিল, তার চোখ যেন বোনের চোখের সঙ্গে মিলিত হয়। যখন সংগীতের তার ওপর এরকম একটা প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছিল, তখন কি সে কোনো প্রাণী হয়ে গিয়েছিল? তার মনে হলো, তার চোখের সামনে যেন অজানা সৃষ্টি উন্মুক্ত হলো, যা সে চাইছিল। সে এতদূর পর্যন্ত নিজেকে ঠেলতে লাগল, যাতে বোনের কাছে পৌঁছানো যায়।"[১৫] গ্রেগর জাম্‌জার অস্তিত্ব পরিবর্তন তার এক আত্মবিনাশিত অবস্থা। একাকিত্বাবস্থার প্রতি এক দুর্মর আসক্তিই ফুটে উঠেছে এই গল্পে। এক অন্তঃসারহীন, শূন্যগর্ভ এবং অপব্যবহৃত জীবন থেকে মুক্তিই গ্রেগর জাম্‌জার এই রূপান্তর। গ্রেগর জাম্‌জা আত্মহন্তারক। সে গোপন অন্ধকার-বিবরে চলে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেতে চায়, সে ভাবে যে এই জীবন—"স্থবিরতা এর চেয়ে ভালো": "একদিন গ্রেগরের রূপান্তরিত হবার প্রায় একমাস বাদে যখন তার উপস্থিতিতে তার বোনের চমকাবার কোনো কারণ ছিল না সে অন্যদিনের থেকে একটু আগে এল। সে দেখতে পেল, গ্রেগর জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে একেবারে বিহ্বল হয়ে এবং সে যেন ঠিক জায়গায় আটকে যাওয়া একটা ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।"[১৬]

অন্যান্য পুরাণের মতোই ভারতীয় পুরাণে আত্মহত্যার ঘটনা রয়েছে। তবে গ্রিক ও রোমান পুরাণ যেখানে আত্মহত্যায় উদ্বেলিত সেখানে ভারতীয় পুরাণে এর কোনো বাড়াবাড়ি রূপ চোখে পড়ে না। ভারতীয় পুরাণে রয়েছে ইচ্ছামৃত্যুর বর্ণনা। আত্মহত্যা ও ইচ্ছামৃত্যু বাস্তবে সমার্থক কিন্তু পুরাণে বর্ণিত ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষেত্রে আত্মহননের বিষয়টি থাকে না, যা ঘটে তা হলো ব্যক্তির ইচ্ছায় সঠিক সময়ে প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে তার মৃত্যু। এজন্য যা সাধারণভাবে আত্মহত্যা পুরাণে তা-ই ইচ্ছামৃত্যু। ইচ্ছামৃত্যু দেখা যায় পুরাণে; জীবনের ক্ষেত্রে ইচ্ছামৃত্যু বলে কিছু নেই, সম্ভব নয়। ভারতীয় পুরাণে আত্মহত্যা নেই কিন্তু ইচ্ছামৃত্যু রয়েছে, কারণ দেবতাধন্য বা দেবতাময় মানবেরা আত্মহত্যা করেন না, তাঁরা ইচ্ছামৃত্যু নেন। ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্য *রামায়ণ ও মহাভারত*-এ দুটি বিখ্যাত ইচ্ছামৃত্যু রয়েছে যা অত্যন্ত মহৎ আপ্লুতি নিয়ে বিরাজমান ভারতীয় জনজীবনে এখনও। এছাড়া নানা আত্মবলিদানের উল্লেখ আছে ভারতীয় পুরাণ-সাহিত্যে। *রামায়ণ*-এ সীতা: মৈথিলী বৈদেহী—মিথিলারাজ জনকতনয়া, যার জন্য সংঘটিত হয় রাম-রাবণ যুদ্ধ। যুদ্ধের পর সীতাকেও রামের কাছে দিতে হয় সতীত্বের পরীক্ষা। রামচন্দ্র বললেন, "তোমরা ভগবান বাল্মীকির কাছে গিয়ে আমার এই নিবেদন জানাও যে সীতা যদি শুদ্ধচারিণী পাপহীনা হন তবে তিনি মহামুনির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করুন।"[১৭] আয়োজিত আত্মশুদ্ধি (অগ্নিপরীক্ষা) অনুষ্ঠানে সীতা "কৃতাঞ্জলি হয়ে অধোবদনে নিম্নদিকে চেয়ে বললেন", "যদি আমি রাঘব ভিন্ন কাকেও মনে মনেও চিন্তা না করে থাকি তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন। যদি মনে কর্মে বাক্যে রামকে অর্চনা করে থাকি তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন। রাম ভিন্ন আর কাকেও জানি না—এই কথা যদি আমি সত্য বলে থাকি তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন।"[১৮] অতঃপর সীতা শপথ করলে ভূতল থেকে সুন্দর আশ্চর্য এক সিংহাসন উঠে এল। ধরণী দেবী সম্ভাষণে মৈথিলীকে (সীতা) অভিনন্দিত করলেন এবং তাঁকে সিংহাসনে বসালেন। তারপর সীতা পাতালে চলে গেলেন। সীতা আসলে অন্তর্হিত/প্রবিষ্ট হতেই চেয়েছিলেন; তাঁর প্রতিজ্ঞার ভাষা চলে যাওয়ার ভাষা: "যদি মনে কর্মে বাক্যে রামকে অর্চনা করে থাকি তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন।"[১৯] সীতা বলেননি রাম ছাড়া অন্য কাউকে অর্চনা করার কথা; অর্থাৎ পাতালে প্রবেশ করতেই তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছেন। এই পাতালে প্রবিষ্ট হওয়া এক ইচ্ছামৃত্যু। তাঁর এই ইচ্ছামৃত্যু আন্তরিক। যে-রামচন্দ্রকে তিনি প্রাণাধিক ভালোবাসতেন, তাঁর প্রতিও রইল না তাঁর (সীতা) কোনো আকর্ষণ। মূলত রামের সন্দেহই সীতাকে বাধ্য করেছিল ইচ্ছামৃত্যু বরণ করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মহাভারত-এ আর-একটি ইচ্ছামৃত্যুর ঘটনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও আকর্ষণীয় তার আধিভৌতিক বাতাবরণের জন্য। তা হলো ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুঘটনা। শিখণ্ডী সহায়তায় অর্জুন ভীষ্মকে আক্রমণ করেন। শিখণ্ডী নয়টি তীক্ষ্মবাণ দিয়ে ভীষ্মের বুকে আঘাত করে, এতে ভীষ্ম কাবু না হওয়াতে অর্জুন ভীষ্মের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলেন। "সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে অর্জুনের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভীষ্ম পূর্বদিকে মাথা রেখে রথ থেকে পড়ে গেলেন। আকাশে দেবগণ এবং ভূতলে রাজগণ হা হা করে উঠলেন। উন্মুলিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভীষ্ম বনভূমি অনুনাদিত করে নিপতিত হলেন, কিন্তু শরে আবৃত থাকায় তিনি ভূমি স্পর্শ করলেন না। দক্ষিণ দিকে সূর্য দেখে ভীষ্ম বুঝলেন এখন দক্ষিণায়ন। তিনি আকাশ থেকে এই বাক্য শুনলেন—মহাত্মা নরশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় দক্ষিণায়নে কি করে প্রাণত্যাগ করবেন। ভীষ্ম বললেন, ভূতলে পতিত থেকেই আমি উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করব।"[২০] এভাবেই উত্তরায়ণের অপেক্ষায় থেকে ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যুকে বরণ করেন, কারণ, পিতা শান্তনুর বরে মৃত্যু ছিল তার ইচ্ছাধীন। ভীষ্ম বাধ্য হয়ে ইচ্ছামৃত্যুকে বরণ করেন, কারণ এছাড়া তার কিছুই করার ছিল না। তিনি মৃত্যুবরণ করতে চাননি, কিন্তু শরাঘাতে পতিত অবস্থায় থেকে মৃত্যুকে দীর্ঘায়িত করেছেন।

শেক্সপিয়রের অন্যতম ট্রাজেডি নাটক *অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লেওপেট্রাতে* আত্মহত্যার অবলম্বিত বিভাব চোখ পড়ে। ১৬০৭ সালে রচিত এই নাটকের প্রধান পুরুষচরিত্র মার্ক আন্তনি রোমান জেনারেল। তাঁর প্রণয়িনী মিশরের রানি ক্লেওপাত্রা। মিশর থেকে রোমে ফিরে এসে আন্তনি হঠাৎ করে ওক্তাভিয়ুস সিজারের বোন ওক্তাভিয়াকে বিয়ে করে বসে সাম্রাজ্যের অন্যতম শাসক ওক্তাভিয়ুস সিজারকে খুশি করার জন্য। কিন্তু আবারও আন্তনি ফিরে যায় মিশরে ক্লেওপাত্রার প্রেমের টানে এবং তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীকে সেখানে যেতে নিষেধ করে বসে। ওক্তাভিয়ুস সিজার আন্তনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। নৌযুদ্ধে অংশ-নেওয়া আন্তনির জয় প্রায় নিশ্চিত অবস্থায় ক্লেওপাত্রা হঠাৎ করেই জাহাজ নিয়ে চলে আসে; আন্তনি তাঁকে অনুসরণ করে। আবার যুদ্ধে আন্তনি নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়, ফলে আন্তনি মনে করে যে ক্লেওপাত্রা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এবং আন্তনি ক্লেওপাত্রাকে হত্যা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এদিকে আন্তনির ক্ষোভ প্রশমনের লক্ষ্যে ক্লেওপাত্রা তাঁর সম্মানে নির্মিত মনুমেন্টে নিজেকে বন্দি করে রেখে আন্তনিকে বার্তা পাঠায় যে ক্লেওপাত্রা আত্মহত্যা করেছে। এই বার্তা পেয়ে আন্তনি দুঃখে তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারী এরসকে আদেশ দেয় যে, একটি তরবারি দিয়ে তাঁকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু বিশ্বস্ত এরস আন্তনিকে না মেরে সেই তরবারি দিয়ে নিজেকেই হত্যা করে। নিজের পাঠানো মিথ্যা খবরে অনুতপ্ত হয়ে ক্লেওপাত্রা আবার আন্তনিকে বার্তা পাঠায় যে সে বেঁচে আছে। কিন্তু বার্তা পৌঁছানোর আগেই আন্তনি নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দেন। মুমূর্ষাবস্থায় আন্তনিকে ক্লেওপাত্রার মনুমেন্টে নিয়ে যাওয়া হলে ক্লেওপাত্রার বাহুতে মাথা রেখে আন্তনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ক্লেওপাত্রা অক্তাভিয়ুস কর্তৃক বন্দি হবার পর বুকে বিষধর সাপের কামড় খেয়ে তার প্রেমিকের পথ অনুসরণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্লেওপাত্রার বাহুতে মাথা রেখে আন্তনি বলেছিল:

> আমি মরতে যাচ্ছি, মিশরবাসী, মরতে যাচ্ছি
> আমাকে একটু মদ দাও, আর একটু বলতে দাও কিছু।

টমাস মান-এর *ডেথ ইন ভেনিস*-এর নায়ক মিউনিখবাসী লেখক গুস্তাফ ফন আশেনবাখ ভেনিসের সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে এসে সেখানে ঘুরতে আসা চোদ্দো বছরের বালক তাদৎসিও-র সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তিনি অলক্ষ্যে তাকে অনুসরণ করতে থাকেন। শহরে মহামারী দেখা দেওয়ার পরও আশেনবাখ শহর ছেড়ে যান না এবং অবশেষে বালকের সৌন্দর্য দেখতে দেখতেই, সমুদ্রসৈকতে বালক তাদৎসিও-কে দর্শন করতে করতেই মৃত্যুবরণ করেন। আশেনবাখ মরতেই চেয়েছিলেন ভেতরে ভেতরে আর এইজন্যই তিনি প্লেগ দেখা দেওয়ার পরও শহর ছেড়ে যেতে অস্বীকৃতি জানান, কারণ বালক তাদৎসিও-ও তখন সেখানে অবস্থান করছিল। আশেনবাখের মৃত্যু মূলত সৌন্দর্যের জন্য প্রস্থান। কারণ তাঁর নিকট জীবন অপেক্ষাও শিল্পের গুরুত্ব বেশি। শিলার বলেছেন, জীবন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শিল্পের গুরুত্ব তার চেয়েও বেশি এবং এই বিশ্বাসেই নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত আশেনবাখ বুঁদ হয়ে থাকেন সৌন্দর্যে। সুন্দরকে অনুসরণ করার জন্য আশেনবাখ রোগ ছড়ানো শহরের কেন্দ্রপরিধিতে ঘুরতে থাকেন। মৃত্যুআচ্ছন্নতা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল, সৌন্দর্য দেখতে দেখতে তিনি এক মনস্তাত্ত্বিক আত্মহত্যাকে স্বাগত জানিয়েছেন নিজ জীবনে। উপন্যাসের শেষ অংশে আছে আশেনবাখের ফায়েদ্রুসের সংলাপের স্মরণ, প্লাতোন যা বর্ণনা করেছেন, সেখানে সোক্রাতেস ও ফায়েদ্রুস (সোক্রাতেস-শিষ্য, লেখক) সৌন্দর্যপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছেন:

> কারণ সৌন্দর্য—ভালো করে শোনো—কেবল সৌন্দর্যই একই সাথে একই সময়ে অপার্থিব ও দৃশ্যময়, অতএব এই পথ সব সংবেদনশীল শিল্পীদের, শোনো ছোট্ট ফায়েদ্রুস, আত্মিক উৎকর্ষের। তুমি কি মনে করো, বৎস এই ইন্দ্রিয়োপলব্ধির মাধ্যমেই আত্মিক উৎকর্ষের জন্য এ পথেই যে কারোর জ্ঞানার্জন ও মর্যাদা? অথবা কি মনে করো (তোমার ওপরই সমস্ত সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিচ্ছি) যে এই এক মারাত্মক পরমানন্দময় পথ, বাস্তবিকই এক পাপ ও ভ্রান্তির পথ যা প্রায়শই বিপথে যায়? কারণ তুমি জান যে এরস আমাদের সঙ্গে না এলে এমনকি আমাদের নেতা না হলে, আমরা কবিরা এই সৌন্দর্যের পথে চলতে পারি না।

বইটির ভাবসূত্র সম্পর্কে মান বলেছিলেন, এটা "মৃত্যুমুগ্ধতা, শৃঙ্খল জীবনের ওপর বিশৃঙ্খল জীবনের জয়।"[২১]

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে রচিত সোফোক্লেস-এর বিখ্যাত নাটক *আন্তিগোনি*, যেখানে আত্মহত্যার এক অসাধারণ সৌন্দর্যের রূপ উদ্ভাসিত। আন্তিগনি রাজা অয়দিপুসের কন্যা। অয়দিপুসের মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছেলে পলিনেইসিস ও ইতিওক্লেসের মধ্যে থিবসের সিংহাসন নিয়ে তীব্র বিরোধ দেখা দেয় এবং অবশেষে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অয়দিপুসের ভাই ক্রেয়নের মধ্যস্থতায় এক আপোষ-মীমাংসা হয়। মীমাংসা হয় যে দুই ভাই পালাক্রমে এক বছর পরপর সিংহাসনে বসবে এবং যখন একজন সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন করবে তখন অন্যজন রাজ্যের বাইরে থাকবে। প্রথমে ইতিওক্লেস সিংহাসনে বসল কিন্তু তার পালা শেষ হওয়ার পর সে অপর ভাই পলিনেইসিসকে সিংহাসন ছেড়ে দিল না। ফলে ক্ষুব্ধ পলিনেইসিস অন্যের (তার শ্বশুর) সহায়তায় থিবস রাজ্য আক্রমণ করলে যুদ্ধে দুই ভাই-ই নিহত হয়। তখন ক্রেয়ন রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সিংহাসনে বসেই তিনি আদেশ জারি করেন যে, পলিনেইসিস দেশদ্রোহী, অতএব তার মৃতদেহের কোনো সৎকার হবে না! আন্তিগনি এই ঘোষণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মৃত ভাই পলিনেইসিসের মৃতদেহের সৎকার সম্পন্ন করে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রেয়ন আন্তিগনিকে বন্দি করে গুহায় রাখে এবং তার জীবন্ত সমাধির আদেশ দেয়। আন্তিগনির প্রেমিক ছিল ক্রেয়নপুত্র হাইমোন; তিনি পিতার নিকট আন্তিগনির প্রাণভিক্ষা করলে ক্রেয়ন অবশেষে তা মেনে নেন। হাইমোন এই সংবাদ আন্তিগনির কাছে নিয়ে গেলে দেখে যে আন্তিগনি ইতিমধ্যে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে। দয়িতাকে মৃত দেখে হাইমোনও বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করে। এই সংবাদ শুনে ক্রেয়ন-স্ত্রী রানি অয়ুরদিকেও আত্মহত্যা করেন। ক্রেয়ন কর্তৃক রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে আন্তিগোনি বলেছেন:

জানি যে মানুষ মরে, আমাকেও মরতেই হবে
আজ না-হয় তো কাল, কাল যদি না-হয় পরশু,
শেষের প্রহর তাই ঘনাবার আগে আমি যদি
পালা শেষ করি তবে জয় হবে আমার জয় হবে,
জ্বালাযন্ত্রণায় ঘেরা যার রাত্রিদিন, তার কাছে
মৃত্যুবরণের চেয়ে মহত্তর আর কিছু নেই।[২২]

শেক্সপিয়রের *হ্যামলেট* নাটকেও আছে আত্মহত্যা এবং আত্মহত্যার কথা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধে উন্মাদ হ্যামলেট। বিষাদাক্রান্ত হ্যামলেট জীবনের অর্থহীনতার কথা ভাবে। ওফেলিয়া—নরম, উষ্ণ, কোমল, ভঙ্গুর; ভালোবাসে হ্যামলেটকে, কিন্তু হ্যামলেট তাকে প্রত্যাখ্যান করে। তৃতীয় অঙ্ক: প্রথম দৃশ্যে তাই দেখা যায় হ্যামলেট ওফেলিয়াকে বলছে: "আমি তোমাকে ভালোবাসি না, গেট দি ট্যু আ নানারি।" ফলে ওফেলিয়া উন্মাদিনী হয়ে এক পর্যায়ে জলে ডুবে আত্মহত্যা(?) করে। ওফেলিয়ার মৃত্যু আত্মহত্যা না কি স্বাভাবিক মৃত্যু এই নিয়েও সন্দেহ ঘণীভূত হয়: এই সন্দেহের জন্য তার মৃতদেহ সমাধিস্থ হয় খ্রিস্টীয় নিয়ম পালন ছাড়া। তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে হ্যামলেটের স্বগতোক্তিতেও ধ্বনিত হয় আত্মহত্যার কথা:

জীবন অথবা মৃত্যু—এই প্রশ্ন
নিষ্ঠুর ভাগ্যের তীব্র আঘাত মুখ বুজে সহে যাওয়া
অথবা বিপদ-সাগরের মুখে অনড় দাঁড়িয়ে
জীবনের বিলুপ্তি টানা।
মৃত্যু শুধু ঘুম, এছাড়া আর কিছুই নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুঃখে আত্মহত্যা করার মধ্যে আছে প্লিইআদিজ, আরাকনি, ব্রুনহিল্ড, ডায়াগ্রে প্রমুখ। গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী বিখ্যাত টাইটান আতলাস ও ওসেনাস-এর সাত কন্যা—ইলেকত্রা, মাইয়া, অ্যালসিওন, তাগেত, সেলিনো, স্তেরোপি, মেরোপি—প্লিইআদিজ নামে পরিচিত। কোনো কোনো মতে তারা তাদের পিতার দুর্ভাগ্য এবং বোন হাইয়াদিস-এর মৃত্যুর কারণে আত্মহত্যা করে।

আরাকনি বিখ্যাত সীবনশিল্পী—তরুণী রাজকুমারী। তিনি ছিলেন সীবনশিল্পে অত্যন্ত দক্ষ ও গর্বিতা এবং চারুশিল্পের দেবী আথেনিকেও প্রতিযোগিতায় আহ্বান জানান। প্রতিযোগিতায় আথেনি দেবদেবীদের শৌর্যবীর্যের নানা কাহিনি ফুটিয়ে তোলে আর আরাকনি দেবদেবীদের অপকর্মের কাহিনি নকশায় ফুটিয়ে তোলেন। আথেনি রেগে সরঞ্জাম আরাকনির মাথায় ছুড়ে মারেন এবং তাকে অভিশাপ দেন। আরাকনি এতে মর্মাহত হয়ে আত্মহত্যা করলে আথেনি তাকে মাকড়সায় পরিণত করেন।

বাইবেল-এর *বিচারক কর্তৃগণের বিবরণ*-এ অবিমেলকের আত্মহত্যার কাহিনি বর্ণিত আছে। যিরুব্বালের পুত্র অবিমেলক তার সত্তর জন ভাইকে মেরে শিখিমের রাজা হয়। অবিমেলক ইস্রায়েলের ওপর তিন বছর রাজত্ব করে। "পরে ঈশ্বর অবীমেলকের ও শিখিমের গৃহস্থদের মধ্যে মন্দ আত্মা প্রেরণ করিলেন, তাহাতে শিখিমের গৃহস্থেরা অবীমেলকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল।"[২৩] অবিমেলক পরে তেবেস নগরের এক দুর্গের (যেখানে নগরের সকল গৃহস্থ আশ্রয় নিয়েছিল ও দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল) কাছে গিয়ে তা পুড়িয়ে দেওয়ার উদ্‌যোগ গ্রহণ করলে তখন একজন স্ত্রীলোক যাঁতার ওপরের অংশ অবিমেলকের মাথায় নিক্ষেপ করলে অবিমেলকের মাথার খুলি ভেঙে যায়। এতে স্ত্রীলোকের আঘাতে মৃত্যু হয়েছে এই অপবাদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবিমেলক তার অস্ত্রবাহক যুবককে ডেকে খড়্গ খুলে তাকে হত্যা করতে বলে এবং তারপর যুবকের আঘাতে অবিমেলক মারা যায়। অবিমেলকের মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয়েছে: "এই রূপে অবীমেলক আপনার সত্তর জন ভ্রাতাকে বধ করিয়া আপন পিতার বিরুদ্ধে যে দুষ্কর্ম করিয়াছিল, ঈশ্বর তাহার সমুচিত দণ্ড তাহাকে দিলেন।"[২৪]

২-*শমূয়েল*-এ বর্ণিত আছে আরও একটি আত্মহত্যার কথা: অহিথোফেলের আত্মহত্যার কথা। অহিথোফেল রাজা দাউদের পরামর্শদাতা ছিলেন। দায়ুদের পুত্র অবশালোম তার পরামর্শ শুনে তা গ্রহণ না করায় অহিথোফেল গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।[২৫]

গ্রিক পুরাণের মহিমান্বিত ও গরিমাময় আত্মহত্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যাজাক্স ও অ্যাম্ফিয়নের আত্মহত্যা। অ্যাজাক্স ট্রয়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত বীর। অ্যাকিলিসের মৃত্যুর পর তার অস্ত্রশস্ত্র ওদুসসেউস না অ্যাজাক্স পাবে এই দ্বন্দ্বে গ্রিকেরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। আথেনির নির্দেশে আগামেমনন এগুলো ওদুসসেউসকে প্রদান করলে অ্যাজাক্স রেগে মত্ত হয়ে একপাল ভেড়াকে, ওদুসসেউস ও আগামেমনন এবং তাদের দেহরক্ষী মনে করে নিধন করে। কিন্তু পরে বুঝতে পেরে গ্লানিতে অ্যাজাক্স আত্মহত্যা করেন।

অ্যাম্ফিয়ন ছিলেন থিবিসের রাজা, অ্যান্তিওপি ও জিউসের পুত্র, অরফিয়ুসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমতুল্য বীণাবাদক। থিবিস নগরীকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অ্যাম্ফিয়নের বীণাবাদনে প্রস্তরখণ্ড একত্র করে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। তান্তালাসকন্যা নাইওবির সাথে তার বিয়ে হয়। নাইওবির গর্ভে তার সাত পুত্র ও সাত কন্যার জন্ম হয়। চোদ্দো সন্তানের গর্বে নাইওবি দেবী লেতোকে অপমান করলে অ্যাপোলো ও আর্তেমিস তার পুত্র ও কন্যাদের হত্যা করলে শোকে অ্যাম্ফিয়ন সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

দস্তইয়েফস্কির উপন্যাসেও আছে আত্মহত্যা। তাঁর উপন্যাস *দি পোজেজড়*-এ প্রকৌশলী কিরিলোভ নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করে। তাঁর এই আত্মহত্যা ছিল দস্তইয়েফস্কি কথিত "যৌক্তিক আত্মহত্যা"। *দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ*-এ দেখা যায়, বৃদ্ধ কারামাজোভ কৃপণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত। তার তিন ছেলে: দমিত্রি বা মিতিয়া, আইভান বা ভানিয়া, অ্যালেক্সি বা আলোয়শা। এছাড়া তার আছে এক অবৈধ পুত্র স্মেরদিয়াকভ যে কারামাজোভের বাড়িতে চাকরের কাজ করে। বড়ো ছেলে মিতিয়া প্রণয়িনী গ্রুশেঙ্কার সাথে ফুর্তি করে টাকা উড়িয়েছে; সে টাকা তার নয়। কাতেরিনাকে বিয়ে করবে বলে তার পিতার কাছ থেকে টাকা এনে উড়িয়েছে সে। এখন টাকা পরিশোধের জন্য পিতার কাছে টাকা চাইলে পিতা তা দিতে অস্বীকার করে। এভাবে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় ভাই ভানিয়াও তার পিতার ওপর খুশি ছিল না; সেও বলত, বাবার মৃত্যু হলে ভালো হয়। এই কথা স্মেরদিয়াকভ শুনেছে বহুবার। ফলে তার অসুস্থ মনে দেখা দেয় প্রতিক্রিয়া। সে বৃদ্ধ কারামাজোভকে হত্যা করে নিজেও ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার পূর্বে বৃদ্ধের অপহরিত অর্থ দিয়ে যায় ভানিয়াকে, যার প্রয়োজন ছিল টাকার।

দিয়ানাইরা বীর হারকিউলিসের স্ত্রী। দিয়ানাইরাকে বিয়ে করে ক্যালিদন ত্যাগের পথে হারকিউলিসকে এক স্রোতস্বিনী নদী পার হতে হয়। নদী পার হওয়ার সময় সেন্টর নেসাস সাহায্যকারী হিসেবে এসে দিয়ানাইরাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে থাকলে হারকিউলিস নেসাসকে লক্ষ করে এক বিষাক্ত তির ছুড়ে মারে। তিরের আঘাতে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নেসাস দিয়ানাইরাকে এক ভানের কথা বলে। বলে যে, যদি কোনোদিন দিয়ানাইরা হারকিউলিসের ভালোবাসা হারায় তাহলে তার এই রক্তমাখা জামা হারকিউলিসকে পরিয়ে দিলে তাহলে দিয়ানাইরা হারকিউলিসের ভালোবাসা ফিরে পাবে। দিয়ানাইরা নেসাসের এই প্রতারণার কথা বিশ্বাস করে তার রক্তাক্ত জামা রেখে দেয়। বেশ কিছুদিন পর হারকিউলিসের সাথে থেসালির রাজার বন্দিনি কন্যা আয়োলের ঘনিষ্ঠতা হতে দেখে দিয়ানাইরা ভালোবাসা পুনরুদ্ধারের জন্য নেসাসের রক্তমাখা জামা কৌশলে হারকিউলিসকে পরতে দেয়। জামা পরার সাথে সাথে অসহ্য যন্ত্রণায় একপর্যায়ে হারকিউলিস মারা যায়। এ খবর দিয়ানাইরা শুনে তীব্র আত্মগ্লানিতে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে।

উপর্যুক্ত আত্মহত্যাগুলোতে যা পরিলক্ষিত হয় তা হলো, সংরাগের শুদ্ধতা যা থেকে নিজেকে নির্বাপণের ইচ্ছা ও বাস্তবায়ন ঘটে। এটাও প্রতিষ্ঠিত হয় যে স্মরণাতীত কাল থেকেই আত্মহত্যা বজায় রেখেছে তার শাশ্বত প্রবহণ। বিলুপ্তির যে মাহাত্ম্য, নিজেকে অপসারণের মাধ্যমে যে আলোড়নের জন্ম দেওয়া, তা মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার সাথে সেঁটে আছে সর্বাবস্থায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাত্রামানব: ধ্রুপদি বিষণ্নতা বা সেই চমৎকার পাগলামো

> যদি আত্মহত্যাকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও
> স্বতন্ত্র বিবর্তন সহযোগে মানসিক
> রোগ হিসেবে দেখানো যায়, তাহলে
> জিজ্ঞাসার অপনোদন হয় এভাবে যে প্রত্যেক আত্মহত্যাকারীই
> একজন পাগলমানব।
>
> **এমিল দ্যুরকহাইম**

> যখন বুঝব, আমার দুঃখের শেষ নেই, তখন জীবন
> থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াব।
>
> **সেনেকা**

> আত্মহত্যার বহুবিধ কারণ রয়েছে, সাধারণত
> কোনো একটিই নিশ্চিত প্রধান ও শক্তিশালী
> কারণ নয়। প্রতিফলনের মাঝ দিয়ে
> সংঘটিত আত্মহত্যা বিরল (অধিকন্তু
> প্রকল্পটি বাতিল হয় না)। কী থেকে
> সংকটের উদ্ভব তা প্রায়শই থাকে অনির্ণেয়।
>
> **আলব্যের কাম্যু**

স্থান-কালের এই মহাবিশ্ব, এই মহাবিশ্বের এক অণুবিশ্ব এই পৃথিবী; তার ভেতর মানবের কম্পিত জীবন। জীবনের শেষ তো মৃতুই। মৃত্যু অনিবার্য এবং মৃত্যু হয়তো-বা প্রয়োজনও। একজন ব্যক্তি একমাত্র আত্মহত্যার মাধ্যমেই মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারে যখন-তখন; অন্যথায় তাকে অপেক্ষা করতে হয় প্রাকৃতিকভাবে বা দুর্ঘটনাজনিত জীবনাবসানের জন্য। অথবা বলা যায়, কেউই মৃত্যুর জন্য আসলে অপেক্ষা করে না, বরং মৃত্যুই হানা দেয় তাকে নিয়ে যেতে। আত্মহত্যা এক মাত্রাময় পরাগতি, এক স্বখাতসলিল যাতে একজন ডুবে মরে। জীবন জড় থেকে ভিন্ন কারণ তা স্বতঃস্ফূর্ত, বিচিত্র এবং অনবলম্বিত; অপরদিকে জড় হলো সমরূপী। কিন্তু প্রশ্ন আসে, জীবনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যা কি এক যাত্রাবিরতি নাকি যাত্রাভঙ্গ? মৃত্যু এক মাত্রা যদ্যপি জীবন থামে, আর আত্মহত্যা এক অনন্য মাত্রা যেখানে জীবনকে থামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ তাকে থামায় না, সে নিজেই যাবতীয় চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে নিজেকে স্তব্ধ করার খেলায় মেতে ওঠে। এ এক হাহাকার যা রচনা করে এক নৈঃশব্দ্যিক পরিসর, এক সামাজিক-পারিবারিক অন্ধকারের। আত্মহত্যা একক সিদ্ধান্ত, তার উদ্দেশ্য-বিধেয়

~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও গোপনতাগামী। আত্মহত্যাকারী এক ভিন্নমাত্রায় নিজ জীবনকে সার্থক করতে চায় ইচ্ছার মাত্রারোপের মাধ্যমে। সে নিজেই নিজের জন্য মাত্রারোপ করে, আর তা করে সে হয়ে ওঠে মাত্রামানব।

খুব অন্তর্মাধুর্য দিয়েই কখনও কখনও বলা হয় যে, লেখক বা শিল্পী হলেন আত্মরতিবাদী, তাঁরা আত্মপ্রেমিক, তাঁরা বহিরস্থিত কালপুরুষ। নার্সিসাস: এক সুন্দর সুদর্শন পুরুষ। নিজের রূপের প্রশংসায় মুখর যা তাকে করে তোলে নিরেট অহংকারী। বনদেবী ইকোর আলিঙ্গনকে তাই রূঢ়ভাবে প্রত্যাখান করে সে। ফলে প্রেমের দেবী আফ্রোদিতের অভিশাপে তৃষ্ণার্ত হয়ে ঝরনার জলে নিজের প্রতিবিম্ব দ্যাখে, আর নিজেই নিজের প্রেমে পড়ে। স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে প্রতিফলিত নিজের প্রতিবিম্বের দিকে, আর এভাবেই তাকিয়ে থাকতে থাকতে মৃত্যুবরণ করে নার্সিসাস। নার্সিসাসের এই মৃতুকে কী বলা যায়? তা কি এক অপেক্ষমাণ মৃত্যু নাকি এক পরোক্ষ আত্মহত্যা? অবচেতনে আত্মহত্যার স্পৃহাই কি কাজ করেছে নার্সিসাসের ক্ষেত্রে! না হলে কেন এই প্রত্যাখ্যান? এক অর্থে বলা যায়, এ-ই হলো জীবন থেকে চলে-যাওয়া, শিল্পের জন্ম দেওয়া। লেখকও নার্সিসাস, নিজের জীবন থেকে শিল্পের জন্ম দেয়। এই এক মাত্রা, এক জীবন-মৃত্যুর মাত্রা। শিল্পীরা এই অর্থে এক মাত্রামানব। নার্সিসাসের মৃত্যুকে বলা চলে এক মনস্তাত্ত্বিক আত্মহত্যা। জীবন থেকে শিল্পে রূপান্তর।

বিংশ শতাব্দীকে বলা হয় আত্মহত্যার শতাব্দী, বলা হয় এই অর্থে যে, এ শতাব্দীতে কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা দেয় আত্মহত্যা। এই শতাব্দীতে আত্মহত্যা করেছেন অসংখ্য লেখক, শিল্পী। *দ্য স্যাভেজ গড*-এ আলভারেজ[১] বলেছেন, "এই শতাব্দীর শিল্পের অন্যতম স্মরণীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শিল্পীদের তাৎক্ষণিক, দ্রুতহারের দুর্ঘটন।"[২] তিনি আরও বলেন, "বিংশ শতাব্দীর আগে...আত্মহত্যা করা বা করার চেষ্টা করা শিল্পীরা ছিল ব্যতিক্রম।"[৩] আলভারেজ দাবি করেন, বিংশ শতাব্দীর আগে শিল্পীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার ছিল খুবই কম, মূলত বিংশ শতাব্দীতেই এই হার অপেক্ষাকৃত দ্রুত বেড়ে যায়। এর নেপথ্যের কারণ উদ্‌ঘাটনে নেমে অনেকেই এর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমিটির রূপান্বেষণে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। অনেকে বলে বসেন, সৃষ্টিশীলতা আর ম্যানিক-ডিপ্রেশনের সহসম্পর্কের কথা।

এই শৈল্পিক সৃষ্টিশীলতা আর ম্যানিক ডিপ্রেশনের বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, কে. জামিসন-এর *টার্সড বাই ফায়ার: ম্যানিক ডিপ্রেশন অ্যান্ড দি আর্টিস্টিক টেম্পারামেন্ট* আর জুলিয়ান লাইব ও ডি. জাবলো হার্সম্যান-এর *ম্যানিক ডিপ্রেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি* এর মধ্যে অন্যতম। লাইব ও হার্সম্যান তাঁদের সিদ্ধান্তে জানান যে, ম্যানিক-ডিপ্রেশন প্রায় ক্ষেত্রেই, প্রতিভাবানদের এক অপরিহার্যতা। পৃথিবীর এক শতাংশ লোক এই ম্যানিক-ডিপ্রেশনে আক্রান্ত। ম্যানিয়া ও ডিপ্রেশন, উন্মাদনা আর অবসাদ, এই দুই বিরুদ্ধ উপস্থিতির কারণে মস্তিষ্কের রসায়নে ঘটে এক সূক্ষ্ম পরিবর্তন যার ফলে দেখা দেয় এক মানসিক রোগ, যাকে আগে থেকে অনুমান করা দুষ্কর। ম্যানিয়া সব সময় ডিপ্রেশনের জন্ম দেয় না, আবার ডিপ্রেশনও নয় সবসময় ম্যানিয়া-আক্রান্ত; কেউ কেউ বেশি মাত্রায় উন্মাদনাময়, কেউবা অবসাদময়। কারও কারও থাকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অল্প উন্মাদনা, কেউ বা বেশি মাত্রায় হন উন্মাতাল। কারও কারও ক্ষেত্রে থাকে বিষাদের মাত্রার রকমফের। ভুক্তভোগীর ভাব এবং আচরণও তাই হয়ে পড়ে নাটকীয়।

উন্মাদ-দশায় ব্যক্তি হয়ে ওঠেন অতিসৃষ্টিময়। তার সৃষ্টি ও সামর্থ্যের বিবেচনায় এক উচ্চতম অবস্থানে ব্যক্তি অবস্থান করেন। যেন দেবতার স্বর্গীয় আগুন তার ভেতর প্রকাশিত, যেন জিউসের বজ্রে আলোকিত সত্তা, এক উদ্ভাসিত ব্যক্তিত্ব। এভাবেই অনেকে তাদের নিজস্ব শক্তিকে সৃষ্টিশীলতায় রূপায়িত করেন বলে ধারণা করা হয়। আর এ প্রক্রিয়ায় কেউ কেউ খোঁজ করেন উত্তেজকের—মদ অথবা ড্রাগের আশ্রয় নেন যাতে তারা পৌঁছাতে পারেন উচ্চতম স্তরে, বোদল্যের-কথিত কৃত্রিম স্বর্গে। আর এই স্তরে আরোহণ করে ব্যক্তি মনে করতে থাকেন যে তার রয়েছে অসাধারণ জীবনীশক্তি ও সামর্থ্য। তিনি হয়ে ওঠেন এক অন্ধ-আশাবাদী; মদ অথবা জুয়ায় নিঃশেষ করেন নিজেকে। জগৎ যেন এক শুক্তি। তিনি তার অন্তর্গত মুক্তা। তখন ঈশ্বর আর সংগীতের দেবতা তার কানে কথা বলতে থাকে।[৪] কিন্তু তিনি যখন আক্রান্ত হন অবসাদ দ্বারা, তখন তার আত্মসম্ভ্রম কমে যায়; আত্মশক্তি সম্পর্কে তার চেতনায় চিড় ধরে, তিনি হয়ে পড়েন সৃষ্টিশীলতাহীন। এ অবস্থা থেকে উৎক্রমণের জন্য ব্যক্তি আবার মদ-ড্রাগ-জুয়ার আশ্রয় নেন। হয়ে পড়েন জড়তাগ্রস্ত। ঘুমও তাকে ছেড়ে যায়, অথবা দেরিতে ঘুমে যেতে হয় তাকে। ঘুম বাড়াতে চান তিনি চারপাশের অন্য সব বেদনাকে ভুলে থাকার জন্য। আবার সময়ান্তরে হয়ে পড়েন জীবন সম্পর্কে ক্রমাগত উদাসীন। যা তাকে আগে উত্তেজিত ও উদ্‌বেলিত করত এখন তাতে তিনি থাকেন নির্লিপ্ত, ভাবলেশহীন। যখন এই আবেগের দোলন থেমে যেতে থাকে, তখন ম্যানিক-ডিপ্রেশনউদ্ভূত সৃষ্টিশীলতা তার ছন্দ হারায়। ব্যক্তি হয়ে পড়েন নিজের সৃষ্টি বিষয়ে অতি সমালোচনাময় এবং নৈরাশ্যবাদী। সৃষ্টিশীল লেখক এই অবস্থায় মুশকিলে পড়ে যান। তিনি তখন পারেন না আর সৃষ্টিশীল হতে। এই অবস্থা যেন কাম্যুর উপন্যাস *দ্য প্লেগ*-এর কেরানি জোসেফ গ্রাঁ-এর মতো, যে অনেক বছর ধরে কাজ করছে কিন্তু তার পদোন্নতি হয়নি। অফিস থেকে ফিরে তিনি তার কল্পিত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসেন, কিন্তু লেখা হয় শুধু প্রথম বাক্যটি। বছরের পর বছর প্রত্যহ তিনি একটি বাক্যই নতুন করে লেখেন, তার বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। খসড়ার পর খসড়ার স্তূপ করেছে হয়তো একটি সর্বনাম বা ক্রিয়ার পরিবর্তনে, কিন্তু সমাপ্ত করতে পারেন না। উন্মাদাক্রান্ত লেখক অবশেষে হয়ে পড়েন বিরক্তি আর বিবমিষায় আক্রান্ত, অতৃপ্তিতে ভরপুর।

ম্যানিক অপেক্ষা ডিপ্রেশন অধিক স্থায়ী এবং এর থেকে জন্ম নেয় বিভ্রম ও বিকারের। আক্রান্ত ব্যক্তি ভাবতে থাকেন, তিনি এক অমোঘ ও অপরিত্রাণনীয় পাপে বা অপরাধে অপরাধী। জগতের সব ভুলের জন্য অতঃপর দায়ী করেন তিনি নিজেকে। এই অপরাধবোধ পাথরের মতো চেপে থাকে তার বুকে। ডিপ্রেশনে আক্রান্ত অনেকের মধ্যে শুরু হয় আত্মঘৃণা, অনেকের মধ্যে জন্ম নেয় হার্সম্যান ও লাইভ কথিত "ঋণাত্মক মহনীয়তা"র[৫], মনে হয় ঈশ্বর ভ্রূতে খোদাই করে দেয় কেইনের ভাগ্য আর তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে রাখে। তারা তখন মনে করতে থাকে যে তারা ঈশ্বর কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত। তারা মনে করতে থাকে, তারা বাইবেলের জবের মতোই দুঃখভোগকারী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফলে দেখা দেয় ভ্রান্তিজনিত মস্তিষ্কবিকৃতি। তারা ভাবে—পরিবার, সমাজ, নিকটজন সবাই তাদের শত্রু। কপর্দকহীন হয়ে তারা ধরে নেয়—বিপর্যয় বা দেউলিয়াপনা তাদের নিয়তি। এই ভাবে অবসাদগ্রস্ত মানুষ হাইপোকন্ড্রিয়া[৬] ও হ্যালুসিনেশনে আক্রান্ত হয়। আতঙ্ক আর অমূলপ্রত্যক্ষণের বিভ্রমের মধ্যে তারা অনেকে অসাড় হয়ে পড়ে, ফলে অনেকে উদ্‌যোগী হয় আত্মহত্যায়। অনেকে পৌঁছে যায় এক অদৃষ্টবাদিতায়। তারা মৃত্যুকে মনে করে অমোঘ ও অপরিত্রাণনীয়। এর ফল হিসেবে অনেকে হয়ে পড়ে অতি সচেতন, মনে করে এ এক অর্থহীনতা, বেছে নেয় নিজেকে ধ্বংস করার উপায় হিসেবে আত্মহত্যার পথ, দেরি না করেই।

হার্সম্যান ও লাইভ তাঁদের *ম্যানিক ডিপ্রেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটিতে* দেখাতে চেয়েছেন প্রতিভার সাথে উন্মাদনার সম্পর্কসূত্র। প্রাচীন গ্রিস থেকে এ সময় পর্যন্ত প্রতিভাবান ও পাগলামোর এক নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কের কথা তাঁরা বলেছেন। সোক্রাতেস বলেছেন, কবি "যতক্ষণ পর্যন্ত না হয় অনুপ্রাণিত ও চেতনোর্ধ্ব, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো আবিষ্কার সম্ভব নয়।"[৭] গ্রিক চিকিৎসক হিপ্পোক্রাতেস ও আরিতিউস প্রথম ম্যানিয়া ও ডিপ্রেশনকে ডাক্তারি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৮] আরিতিউস ধরে নেন, ম্যানিয়া ও ডিপ্রেশন একই ব্যক্তিকে পর্যায়ক্রমে আক্রান্ত করতে পারে।[৯] রেনেসাঁর যুগে বিষাদগ্রস্ততা আর প্রতিভা ছিল পরস্পর অবিভাজ্য। তখন প্রতিভাবান মাত্রই ধরা হতো বিষাদাক্রান্ত। আলোকপ্রাপ্তির যুগের যুক্তিবাদীরা, যারা বলেন যে যুক্তি জ্ঞানের প্রধান শর্ত, এই ধারণার অবমোচনে সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু, আলভারেজ জানান, এই অনুষঙ্গ থেকে যায় অন্য এক আঙ্গিকে, ভিন্ন নামে। বিষাদ পরিণত হয় বিমর্ষতায়।[১০]

রোম্যান্টিকদের মধ্যে বুদ্ধি ও যুক্তির পরিবর্তে জায়মানিত হয় অসাধারণ কামনা ও আবেগায়িত ধারণার। তারা মনে করতেন, প্রতিভাবানেরা একান্তভাবে বিজড়িত দুঃখকষ্ট ও অপরিণত মৃত্যুর সাথে। রোম্যান্টিক আদর্শ অনুযায়ী কবি তাঁর স্বল্পস্থায়ী দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করেন মগ্নতা আর ধ্যানে। সত্তার বিষাদগ্রস্ততা সংরাগের এবং তীব্রতার জন্য তাঁদের জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। শিল্পের জন্য তার যে আকাঙ্ক্ষা, এর জন্য দুর্দশা ও কষ্টকে পুনঃপুন আহ্বান জানান কবিরা। দীর্ঘজীবনের কোনো প্রত্যাশাই তাঁদের থাকে না। সে মুহূর্তে জ্বলে ওঠে তারপর তার "স্ফুলিঙ্গহীন ভস্ম"-কে "বিলাপহীন ভস্মাধার"-এ পরিণত করেন তাঁরা। হার্সম্যান ও লাইভ মনে করেন, "প্রতিভার রোমান্টিক ধারণা" হলো "এক ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ লক্ষণের চিহ্ন...।"[১১] রোম্যান্টিক উক্তি, রোমান্টিক ধারণা ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিল্পী-ইমেজকে মহিমান্বিত করেছে দারুণভাবে, বলা যায়।

লাইভ ও হার্সম্যান বলেন, ম্যানিক-ডিপ্রেশন এক দীর্ঘ শৈল্পিক রোগ। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের সৃষ্টিশীল জীবনে এর উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। নিউটন, বিটোফেন, ডিকেন্স, ভ্যান গঘ, কোলরিজ, রুসো, বায়রন, গ্যোয়েটে, জনাথন সুইফ্‌ট, শার্লোট ব্রন্টি, চোপিন, হ্বাগনার, দ্য মুস্যে, দস্তইয়েফ্‌স্কি প্রমুখ বরেণ্যদের জীবনে এর অভিঘাত ছিল সুদূরপ্রসারী। অনেক প্রতিভাবান লেখকই ছিলেন ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ, তবে তাঁরা মারা যান স্বাভাবিকভাবেই। রোম্যান্টিকদের মধ্যেও আত্মহত্যা খুবই বিরল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিট্‌স, শেলি, বায়রন কবিদের আদর্শ-বয়স অর্থাৎ তরুণ বয়সে মারা যান। তাঁদের এই মৃত্যু হয়তো এক মনস্তাত্ত্বিক আত্মহত্যা। আবার রোম্যান্টিক যুগের অনেক বিখ্যাত, যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, গ্যোয়েটে বেঁচেছেন দীর্ঘকাল। অতি সরলীকরণ না করেও বলা যায়, ম্যানিক-ডিপ্রেশন অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত বিংশ শতাব্দীর অনেক বিখ্যাতদের আত্মহত্যায়, যার ব্যাপ্তির পেছনে রয়েছে আধুনিক জীবনের অনন্বিত অবস্থা। তাছাড়া বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবহুল দিগন্তও প্রভাবিত করেছে অনেককে। বিশাল অর্থনৈতিক মন্দা, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র ও তার প্রসার, অশান্তি, ক্ষোভ, নিরাশা প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে অনেক ক্ষেত্রে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ও ৎসভাইগ মনে করতেন, এই অসভ্য বর্বর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়তর। মায়াকোভ্‌স্কি ও কোয়েস্টলার বিপ্লব ভুল হওয়ার বেদনায় আত্মহত্যা করেন। তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এবং পরবর্তী সময়ের নিয়ন্ত্রণবাদী সমাজব্যবস্থার বলি। ট্রাকলের আত্মহত্যা যুদ্ধের বিভীষিকার ফল। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ক্ষতবিক্ষত করেছে এবং আত্মহত্যার ইন্ধন যুগিয়েছে বায়ার্স, লরেন্স, হেমিংওয়ে, ক্রসবি, টোলার, গ্যারি, পাভেজে, হেগেন, জারেল, লুইস পুলার প্রমুখকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন মিশিমা ও কাওয়াবাতার আত্মহত্যাকে প্রভাবিত করেছে বলে এখন নতুন করে ভাবা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আমেরিকা ও রাশিয়ার দ্বন্দ্ব ক্লাউস মানকে তাড়িত করেছে আত্মহত্যায়। আণবিক বোমার বিলোপের অসম্ভাব্যতা প্রভাবিত করেছে ম্যালকম লওরি ও অন্য অনেককে। ১৯৪২ সালে স্টেফান ৎসভাইগ বলেন— তাঁর যৌবনের দেখা পৃথিবী, ইউরোপীয় সভ্যতা, যাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, অন্তর্হিত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব কারণেই এবং এ প্রেক্ষাপটেই আত্মহত্যা এখনকার সময়ে বহুমাত্রিকতায় উদ্ভাসিত ও প্রকটিত।

আত্মহত্যাকারী এই মাত্রামানবদের নিয়তি কি সিসিফাস-নিয়তি? তাঁদের উন্মাদরোগের বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই মনোব্যাধি-চিকিৎসকেরা নানাবিধভাবে উপস্থাপন করবেন। খেদোন্মত্ত বাতুলতার (ম্যানিক ডিপ্রেসিভ) কারণ হিসেবে ক্ষণিক উদ্ভাসিত ও নিরানন্দময় হয়ে পড়ার প্রবণতা অনেকাংশেই ছিল এই মাত্রামানবদের বৈশিষ্ট্য। বিষাদবায়ুর হাত ধরে ক্রমবর্ধমান সংহতিচ্যুতি অবধারিতভাবে বুদ্ধিবিলোপে পর্যবসিত হয়। এইভাবেই ঘটতে থাকে ব্যক্তিত্বের বিয়োজন। মাত্রামানব আত্মকেন্দ্রিকতার হাত ধরে এগিয়ে যায়। আসে ক্যাটাটোনিয়াগত[১২] মানসিক অব্যবস্থা, ঘটে ভারসাম্যহীনতা। ঘটে চূড়ান্ত বিনাশের ঘটনা। মাত্রামানব হলেন অভিশপ্ত শিল্পী, ট্র্যাজেডির নায়ক।

মাত্রামানবদের কাছে "মৃত্যুবরণ করা কষ্টের, কিন্তু জীবন আরও কষ্টের।"[১৩] ১৮৯০ সালে ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ প্যারিস শহর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণে গ্রামের পাশে এক খেতে নিজের দেহে গুলি করেন। তারপর কোনোমতে টলতে টলতে যে সরাইখানায় তিনি থাকতেন, সেখানে ফিরে এসে দোতলায় উঠে পরবর্তী দুই দিন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকলেন। তারপর এই মাত্রামানব চলে গেলেন। এর আগে তিনি বলেছিলেন, "আমার অসুস্থতা কোনো দুর্ভাগ্য নয়।" নয়, কারণ "হাসির চেয়ে দুঃখ ভালো।" "অসুস্থতার দিনগুলোতে নতুন পরিকল্পনা, নতুন ইচ্ছার সাধ জাগে। অসুস্থ

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না হলে এসব আসতই না। অসুস্থতা শরীর পবিত্র করে, আমাদের ভালো থাকতে শেখায়।"[১৪] অতএব খোদোন্মত্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে জীবন অপেক্ষা মৃত্যুর প্রতি অধিক আবেশ দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। অসুস্থতাই তাদের সৃষ্টিশীলতার বীজতলা। আর এই মাত্রামানবেরা এক অর্থে মৃত্যুতাড়িত ব্যক্তি। অর্থাৎ তাঁদের জীবন আসলে মৃত্যুরই সূচনাংশ, আর জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গে কম্পমান স্পন্দিত ছায়া থাকে জলের গভীরে।

আবারও প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, মাত্রামানবদের জীবন কি সিসিফাসের নিয়তি? সিসিফাস করিন্থের রাজা, দেবতা হেদিস মৃত্যুর পর সিসিফাসকে এক শাস্তি দেন: পাহাড়ের পাদদেশে পড়ে থাকা এক প্রস্তরখণ্ড চূড়ায় তুলে নিয়ে যেতে পারলে তবেই সিসিফাসের মুক্তি। সিসিফাস যতবারই পাথরখণ্ডকে পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি নিয়ে যান, ততবারই পাথরখণ্ডটি গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়। সিসিফাসের মুক্তি আসে না; পাথর ঠেলে ওপরে তোলা, আবার তা পেছনে ছুটে নেমে আসাই হলো সিসিফাসের নিয়তি। জীবন আসলে এক অর্থহীন আবর্ত; অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্যর্থ প্রয়াসই জীবন। এক অন্ধশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে জীবনকে, এর হাত থেকে মুক্তি নেই। মানুষ বন্দি অসম্ভবতার ঘেরাটোপে। জীবন বাধার সম্মুখীন, তা যুক্তিউর্ধ্ব, অব্যাখ্যাত, ফলত তা নিরর্থকতা। নিরর্থকতার সঙ্গে সংগ্রাম করে কোনো ফল থাকে না, শুধু সংগ্রাম করে যাওয়া। নিরর্থকতার বাধা থেকে আসে আত্মহত্যাস্পৃহা। মাত্রামানব এই অর্থহীনতা ও অসম্ভবতায় আক্রান্ত।

ম্যানিক-ডিপ্রেশনকে আত্মহত্যার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও আরও অনেক কারণ রয়েছে এক্ষেত্রে। মনঃসমীক্ষক ও মনোরোগ-বিশেষজ্ঞগণ তাদের অধীনে চিকিৎসারত রোগীদের—যারা পরবর্তী সময়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বা আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছিলেন, অথবা বলা যায় আত্মহত্যার ঝুঁকিতে ছিলেন—রেকর্ডপত্র পুনঃনিরীক্ষা করে এক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। জিলবোর্গ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে দেখেন যে আত্মহত্যাকারীদের অনেকেই অবসাদজনিত মানসিক অসংগতি, স্নায়বিক উদ্বায়ু এবং স্কিট্‌সোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। এর থেকে উপসংহারে তিনি বলেন, বস্তুত মনোরোগ-চিকিৎসাশাস্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে আত্মহত্যাজনিত প্ররোচনের ক্ষেত্রে কোনো একক কারণকে চিহ্নিত করা যায় না। তাঁর মতে, আত্মহত্যা মানসিকভাবে দুর্বল লোকের মাঝেই প্রতিভাত। জিলবোর্গ বলেন: "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা পরিষ্কার যে আত্মহত্যা-সমস্যা বস্তুত এখনও সমাধানহীন। সাধারণ বা ক্লিনিক্যাল সাইকোপ্যাথলজিও এর কারণ বা ঠিকঠাক গবেষণালব্ধ সমাধান বা উত্তর দিতে অক্ষম।"[১৫] ১৯১৮ সালে, আত্মহত্যা বিষয়ে মনঃসমীক্ষণসংক্রান্ত ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামে ফ্রয়েড বলেন: মূল্যবান উপাত্ত পাওয়া সত্ত্বেও আমরা কোনো সুনির্দিষ্ট উপসংহারে আসতে সফল হইনি,... অতএব মতামত প্রদান থেকে আমরা বিরত থাকছি যতক্ষণ না অভিজ্ঞতা দ্বারা এর সমাধান সম্ভব হয়।"[১৬] যদিও তারপর ফ্রয়েড, জিলবোর্গ, আব্রাহাম, মেনিংগার, ব্রিল এবং অন্যান্য অনেকের দ্বারা আত্মহত্যা-সংক্রান্ত প্রচুর কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তবু বলা উচিত, ব্যক্তির আত্মহত্যার কারণ এখনও অনেকটা ঘটনোত্তর ব্যাখ্যা-নির্ভর।

~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ এটাই বলা শোভা পায় যে, আত্মহত্যাকারী ছাড়া কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয় যে কী সেই অব্যর্থ কারণ ছিল যার জন্য সংঘটিত হয়েছে আত্মহত্যা। কাম্যু একেই বলেছেন সেই রহস্যময় পোকা যা কারণের জন্য দায়ী।

কিন্তু যেখানে গবেষণা আছে, সেখানে ফলাফলও থাকতে হবে, সে যত অযথার্থই হোক না কেন। আবার একে অযথার্থও বলা যাবে না, যেহেতু আত্মহত্যাকারীর কাছ থেকে সত্যিকারভাবে কোনোকিছু জানার আর পথ নেই। অতএব আত্মহত্যার কারণ হিসেবে অনেকগুলো বিবেচনা কাজ করে বা এককভাবে দু-একটি বিষয় অধিক গুরুত্বশীল থাকে বলে যখন বলা হয়, তখন তা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা বলে মনে হতেই পারে। হয়তো এমনই একটি বিবেচনা এরকম যে, প্রতিভাবান লেখকদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা লক্ষণীয়। প্রতিভাবানেরা খেদোন্মত্ততায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন আর খেদোন্মত্ততাই চূড়ান্তভাবে আত্মহত্যায় চালিত করে তাঁদের। অনেকে আবার পাগলামোর সাথে প্রতিভার সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়েছেন। যেভাবেই দেখা হোক না কেন, বিংশ শতাব্দীতে আত্মহত্যা যে এক ভিন্ন মাত্রায় উদ্ভাসিত তা অনেকে জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন। আত্মহত্যা এক পূর্ণমাত্রা, এক স্বকৃত যবনিকাপাত; এর সাথে অংশত জড়িত হয়ে আছে “মনস্তাত্ত্বিক আত্মহত্যা” ও “আংশিক আত্মহত্যার” মতো বিষয় যেখানে অবচেতনপ্রবাহ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সচেতন ও অবচেতনভাবেই এর উদ্ভাসন চোখে পড়ে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কাজ করে এক নিস্পেষণ, একে কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজন ফ্রয়েড যাকে বলেছেন, “প্লেজার প্রিন্সিপল”-কে “রিয়ালিটি প্রিন্সিপল” দ্বারা অবদমন। এই অবদমনের মাত্রাভেদেই অনেক সময় দেখা দেয় অসুস্থতা। এর আরেক নাম “নিউরোসিস।”[১৭] ব্যাখ্যাকারেরা তাই মানুষকে বলেন “নিউরোটিক অ্যানিমেল”। মানুষের ক্ষেত্রে নিউরোসিস ও সৃষ্টিশীলতার এক ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে, আবার আছে ঋণাত্মক সম্পর্কও।

অনেক গবেষক দেখিয়েছেন, অতি সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের মধ্যে—যেমন শিল্পী, সংগীতকার, লেখক, কবি—বাইপোলার ডিসঅর্ডার সামান্য থেকে ব্যাপক মাত্রায় বিদ্যমান থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে দ্বিপ্রান্তীয় অসুস্থতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ ম্যানিয়াই তাঁদের সৃষ্টিশীলতাকে ত্বরান্বিত করে। যেমন বলা যায়, এই বাইপোলার ডিসঅর্ডারে আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন কবি লর্ড বায়রন ও অ্যান সেক্সটন, লেখক ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ও আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, সংগীতকার পিটার ইলিচ চাইকোভ্স্কি, সের্গেই রাচমানিনোফ, চিত্রকর আমেদেয়ো মোদিল্লেয়ানি, জ্যাকসন পোলক প্রমুখ। তবে এই উপসিদ্ধান্তের সমালোচনাকারীগণ বলেছেন, অনেক সৃষ্টিশীল ব্যক্তিই এই সমস্যায় ভোগেননি, আর বাইপোলার ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত অনেকেই সৃষ্টিশীল নন মোটেই। অতএব দেখা যাচ্ছে, ম্যানিক-ডিপ্রেশন ও সৃষ্টিশীলতার ধনাত্মক সহসম্পর্কের বিষয়টি তর্কাতীত নয়, বরং প্রতর্কআশ্রিত। তবে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের মধ্যে মেজাজের দোলা লক্ষণীয়ভাবে অনেক সময় দৃষ্টিগোচর হয় যা আবার বাইপোলার ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। সৃষ্টিশীলতা ও বাইপোলার ডিসঅর্ডারের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক কিছু কিছু গবেষণায় পাওয়া যায়। তবে অনেক গবেষক মনে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেন, এ জাতীয় গবেষণার তত্ত্বপ্রণালিতে ভুল থাকায় প্রাপ্ত ফলাফল ছিল অনেকটা বিভ্রান্তিকর। ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে, *ডিসকোভার ম্যাগাজিন*-এ নৃতত্ত্ববিদ জো অ্যান সি. গুটিন এ সম্পর্কিত কিছু গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন যাতে সৃষ্টিশীলতা ও মানসিক অসুস্থতার সম্পর্কটিকে অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। তাঁর প্রবন্ধটির নাম "দ্যাট ফাইন ম্যাডনেস" যাতে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করে এঁদের জীবনে এই সহসম্পর্কের ব্যাপারটির অবতারণা করেন।[১৮] তিনি লেখাটি শুরু করেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফকে নিয়ে এভাবে:

> ৫৫ বছর আগে, মার্চের এক প্রাণবন্ত সকালে, ঔপন্যাসিক ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাঁর ইংল্যান্ডের সাসেক্সের রোডমেনের গ্রামের বাড়ি থেকে বের হয়ে নিকটস্থ আউজ নদীর ধারে হেঁটে চলে এলেন। এসে তিনি তাঁর হাঁটার ছড়িটি রেখে একটি বড়ো পাথর তুলে নিলেন। জোর করে তাঁর কোটের পকেটে রাখলেন, তারপর তিনি হাঁটতে লাগলেন। পাথরটি তার কৌশলটি পালন করল, এটা ছিল দূরবর্তী উপকূলে তাঁর দেহ ভেসে ওঠার তিন সপ্তাহ আগের ঘটনা।

ম্যান্টালপিসের ওপর রাখা স্বামী লেনার্ডের উদ্দেশে লেখা চিরকুট তিনি রেখে গেলেন। লিখলেন: "প্রিয়তম, আবারও পাগল হয়ে যাওয়ার মতো নিশ্চিত একটা কিছু টের পাচ্ছি... এবার আর রক্ষা করতে পারব না। ডাক শুনতে শুরু করেছি, আর আমি নিজেকে একাত্ম করতে পারছি না... এই ভয়ংকর রোগে আক্রান্ত হবার পর দুটি মানুষ সুখী হতে পারত বলে আমি মনে করি না... ভি।" ১৯১৫ সাল থেকে আত্মহত্যার চারদিন আগ পর্যন্ত যে-দিনপঞ্জি উল্‌ফ লিখেছেন, তা থেকে ধরে নেওয়া হয় যে "ভয়ংকর রোগ" বলতে তাঁর ম্যানিক-ডিপ্রেশনকেই বোঝায়, যাকে এখন বাইপোলার অসুস্থতাও বলা হয়। মনোচিকিৎসকগণ এই অবস্থাকে একটি মানসিক ভাবের অব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করেন, যখন মানসিকতার অনবরত ধারাবাহিক উত্থান-পতন ঘটতে থাকে—কখনও উচ্চ কখনও নিম্নপর্যায়ে, কখনও বা একসাথে। ভুক্তভোগী কখনও গভীর ডিপ্রেশনে বা কখনও অপেক্ষাকৃত কম ম্যানিক দশায় থাকে, কখনও বা কম বা ক্ষণস্থায়ী ডিপ্রেশন ও বেশি ম্যানিক অবস্থায় থাকে, যা জন্ম দেয় অমূলপ্রত্যক্ষণের। উল্‌ফের এই অবসাদ-অধ্যায় ছিল চমৎকার—কখনও ঋতুভিত্তিক, কখনও বা একটি লেখা লিখে সমাপ্ত করার সাথে সম্পর্কিত। তবে এই ম্যানিয়া ও ডিপ্রেশনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে তিনি থাকতেন অপূর্ব সৃষ্টিশীল ও সদানন্দময়। "তাঁকে ছেড়ে আসার সময় আমার অনুভূতি হতো যেন আমি ততক্ষণ দুই গ্লাস চমৎকার শ্যাম্পেন পান করলাম।" "সে ছিল এক আয়ু বর্ধিষ্ণুকারিণী"—তাঁর বন্ধু নিগেল নিকোলসন তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন এই কথাগুলো।

উল্‌ফের ক্ষেত্রে বাইপোলার ডিসঅর্ডার ও তাঁর সৃষ্টিশীলতার সম্পর্কের বিষয়টিকে অনেকে আলো ফেলে দেখার চেষ্টা করেছেন। অনেকে বিশ্বাস করেন, তাঁর এই ধরনের অসুস্থতাই তাঁকে উচ্চতম সৃষ্টিপর্যায়ে নিয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরেই মনস্তত্ত্ববিদ, মনোচিকিৎসক এমনকি স্নায়ুবিজ্ঞানীরাও বলতে শুরু করেছেন যে, বাইপোলার বা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বিপ্রান্তীয় অসুস্থতা শিল্পসৃষ্টিক্ষমতাকে কখনও কখনও কোনো না কোনোভাবে বৃদ্ধি করে, যদিও আবার অনেকে একে রহস্যময় ও কল্পিত এক যোগসূত্র হিসেবেই বিবেচনা করে থাকেন। অনেকে বলে থাকেন, অধিকাংশ সৃষ্টিশীলতাই বস্তুতপক্ষে মানসিক অসুস্থতা-নিরপেক্ষ, আবার অধিকাংশ মানসিক অসুস্থতাই সৃষ্টিশীলতা-নিরপেক্ষ।

অনেকে একে কাকতালীয় হিসেবে দেখেছেন। বলেছেন, বিষয়টি অনেকটাই আপতিক, পাশ্চাত্যের অনেক বিখ্যাতদের জীবন ও কর্মই বাইপোলার অসুস্থতার ধরনকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও ঠিক মৌলিক অর্থে তা যথার্থ সম্পর্কশীল নয়।

জন হপকিন্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ববিদ কে. রেডফিল্ড জামিসন এই শিল্প-পাগলামো-সম্পর্কিত যোগসূত্র নিয়ে কাজ করেছেন; তিনি প্রস্তুত করেছেন এই ক্ষেত্রে বিবেচিত একটি তালিকা: কবি উইলিয়াম ব্লেইক, জন কিট্‌স, পার্সি বিসি শেলি, অ্যাডগার এলেন পো, এমিলি ডিকিনসন এবং অ্যান সেক্সটন; ঔপন্যাসিক এমিল জোলা, মেরি শেলি, লিয়েফ তলস্তোয়, ম্যাক্সিম গোর্কি, এবং রবার্ট লুইস স্টিভেনসন; নাট্যকার ইউজিন ও'নিল; চিত্রশিল্পী মিকেলেঞ্জেলো, থিওডর গেরিকল্ট, এডভার্ড মাঞ্চ, পল গগাঁ, ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ, মার্ক রোথকো এবং জর্জিয়া ও'ক্লিফ; আর সংগীতকার হ্যান্ডেল থেকে চার্লি পার্কার। জামিসন, প্রকৃতপক্ষে সব বিখ্যাত যন্ত্রণাক্লিষ্ট শিল্পীদেরই এই তালিকায় রেখেছেন। তবে এই তালিকা নিয়ে কথা উঠেছে। সন্দেহবাদীরা অভিযোগ করেছেন, মৃত শিল্পীদের ভূতাপেক্ষ মনোরোগ নির্ণয়কে প্রামাণিক হিসেবে বিবেচনা করা একটি বৈঠকখানার খেলা, কোনো বিজ্ঞান নয়। সানফ্রান্সিসকোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ফ্রাঙ্ক জনসন বলেন, স্বর্গীয় প্রেরণা লাভের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। চিকিৎসা-সাহিত্যে এই বিষয়টির অতি আধুনিক রূপই পাগলামোকে কবিতা লেখা বা দর্শনচর্চার অবস্থা দেয়। জনসন বলেন, বাইপোলার অসুস্থতাই সৃষ্টিশীলতার সাথে সম্পর্কিত জৈবিক অবস্থার বিবেচনায় একমাত্র ও সর্বশেষ বিষয়, যা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এর আগে, ষাটের দশকে, মাদকাসক্তিকে সাহিত্যিক রোগ হিসেবে ধরা হতো। তারও আগে মৃগী ও সিফিলিসকে সৃষ্টিশীলদের সাথে যোগসূত্র হিসেবে দেখা হতো। সুসান সনটাগ তাঁর "রূপক হিসেবে অসুস্থতা"য় পর্যবেক্ষণ করেছেন এই প্রশ্ন রেখে যে, সম্ভবত পাগলামোই কি কেবল আত্ম-উৎকর্ষের ইহজাগতিক পুরাণের বর্তমান যান? এই আত্মগরিমা-কাহিনির সমালোচকগণ বলেন, বাইপোলার তালিকায় যেসব সৃষ্টিশীলদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা মানসিক রোগী নন, বরং তখনকার সময় রহস্যময় ও মারাত্মক রোগ হিসেবে বিবেচিত যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। ম্যানিক-ডিপ্রেশনের মতোই যক্ষ্মারোগেও মানসিক সক্রিয়তা ও বিষণ্ণতা পর্যায়ক্রমে ব্যক্তিকে তাড়িত করে; মনে করা হয় যে এই রোগ রোগীর মানসিক উৎকর্ষ ঘটায় এবং এক ধরনের ব্যতিক্রমী অন্তর্দৃষ্টির জন্ম দেয়। এখানে অন্য ধরনের আপত্তিও দেখা যায়, অনেকে বলে থাকেন, সাধারণত ১০-১৫% বাইপোলার অসুস্থতায় মারাত্মকভাবে আক্রান্ত লোক অবশেষে আত্মহত্যা করে থাকে। যদি শিল্প ও পাগলামোর মধ্যে সম্পর্ক থেকেও থাকে, তাহলেও এই অল্পের অল্পসংখ্যক যদি সৃষ্টিশীল হয়ই তাতে কী। এই জাতীয় যোগসূত্র, এই জাতীয় গুরুত্বারোপ আত্মহত্যাকারীকে এক

~ www.amarboi.com ~

ধরনের মহিমা দেয়, ধ্বংসের ওপর এক মধুর প্রলেপ লেপন করে।

সৃষ্টিশীল-প্রতিভাবান ও পাগলামোর মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি পশ্চিমি ভাবনায় দীর্ঘকাল ধরে প্রভূত শিকড় বিস্তার করে আছে। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কাব্যকলা দেবীর (মিউজ) উন্মাদনা পাওয়ার বিষয়ে প্লাতোন বলেছেন। তিনি বলেছেন, কাব্যদেবী মিউজের উন্মাদনার ছোঁয়া ছাড়া, কবিতা, অনুপ্রাণিত পাগলের ভূমিকায় সর্বদাই রাহুগ্রস্ত। আরিস্তোতল আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কেন এমন হয় যে, যারা দর্শন, কবিতা বা শিল্প বিষয়ে বিশিষ্ট, তারা বিষাদগ্রস্ত হয়?[১৯] প্রাবন্ধিক জোনাথান রিচার্ডসন ১৭১৫ সালে লেখেন—একজন চিত্রকরের একটি সুন্দর এবং সুখীপ্রবণ মন থাকা উচিত যাতে মহৎ ও সুন্দর ভাবনাগুলো সেখানে অভ্যর্থিত হতে পারে।[২০] বিখ্যাত লেখক-প্রাবন্ধিক চার্লস ল্যাম মন্তব্য করেন, "এক পাগল শেক্সপিয়রকে কল্পনা করা এক অসম্ভব ব্যাপার" যা প্রতিভা ও সুস্থতার যোগসূত্র বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চারণ। এখানে বলা প্রাসঙ্গিক যে ল্যাম নিজেই আক্রান্ত হয়েছিলেন উন্মাদনায়। বংশগতভাবে ল্যাম (১৭৭৫-১৮৩৪) উন্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন, এবং পাগলাগারদেও তাঁকে থাকতে হয়। ল্যামের বোন মেরিও ছিলেন উন্মাদ, একবার খাবার-টেবিলে ক্ষিপ্ত হয়ে মাংস-কাটার ছুরি দিয়ে তার মাকে মেরে বসেন। ল্যামের পিতাও ছিলেন মানসিকভাবে অসুস্থ। সুতরাং পশ্চিমা সংস্কৃতিতে ভুক্তভোগী শিল্পী ও তাঁদের অতিক্ষমতার বিষয়টি প্রণিধান পাচ্ছিল দীর্ঘকাল ধরেই। ব্যঙ্গ-লেখক জনাথান সুইফ্‌টও উন্মাদ হয়ে ১৭৪৫ সালে মারা গিয়েছিলেন। কে. জামিসন বলেছেন, ডিপ্রেশনকে শ্রদ্ধা করা যায় কিন্তু ম্যানিয়াকে নয়। কারণ ম্যানিয়া পাগলামির পর্যায়ে পড়ে যা চূড়ান্ত বাড়াবাড়িতে পর্যবসিত, কিন্তু ডিপ্রেশনে আছে বিষণ্নতা যা মাধুর্যময় ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। কিয়েের্কেগার্দ তাঁর অন্যতম প্রধান গ্রন্থ *আইদার/অর*-এর শুরুতে বলেন কূটাভাসময় কিছু কথা, যার একটা এরকম: "অন্যান্য পরিচিতজনের মধ্যে আমার অতি-অন্তরঙ্গ একজন আছে—আমার বিষণ্নতা। আমার আনন্দ ও কাজের মাঝে সে আমাকে আন্দোলিত করে, ডেকে নিয়ে একপাশে বসায়, এমনকি যদিও আমি অনড় থাকি। আমার বিষণ্নতা জানা মতে আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্ত্রী; তারপর আর আশ্চর্যের কিছু নয় যে তাকে আমি প্রতিদানে ভালোবাসব।"[২১] বিষণ্নতা অন্য অনেকের মতোই অন্বিষ্ট ছিল কিয়েের্কেগার্দের যদিও তিনিও যৌবনলগ্নে, ২১-২২ বছর বয়সে, আক্রান্ত হয়েছিলেন উন্মাদনায়। অর্থাৎ ডিপ্রেশনকে তিনি সবসময় বহন করতেন আর ম্যানিয়ায় কখনো বা আক্রান্ত হতেন।

১৯৭৪ সালে, ন্যান্সি অ্যানড্রিয়াসেন আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখক-ওয়ার্কশপে ৩০ জন ফ্যাকাল্টি সদস্যদের মধ্যে স্কিট্‌সোফ্রেনিয়া ও সৃষ্টিশীলতার সম্পর্কটি পরীক্ষা করার লক্ষ্যে পর্যবেক্ষণ চালান। তিনি লেখক ছাড়াও শিল্প-বহির্ভুত পেশায় নিয়োজিত অন্যদের সাথেও এর তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করেন। দেখা যায়, অংশগ্রহণকারী ৮০% লেখকই বলেছেন যে তারা ডিপ্রেশন বা ম্যানিক-ডিপ্রেশনে ভুগেছেন, তুলনায় শিল্প-বহির্ভূত পেশার ৩০%-এর ক্ষেত্রে পাওয়া যায় এই ক্ষেত্রে সদর্থক উত্তর। এর মধ্যে দুজন লেখক আত্মহত্যাও করেছিলেন পরবর্তীকালে। অ্যানড্রিয়াসেন বলেছিলেন যে, বাইপোলার যোগসূত্রটি তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। ১৯৮৭ সালে তাঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গবেষণার ফলাফল প্রকাশ পায় যখন, তখন কিন্তু তা সকলকে তাড়িত করেনি। রোথেনবার্গ অ্যানড্রিয়াসেন শিল্প-বহির্ভূত পেশার সাথে জড়িত সদস্যদের বিষয়ে আপত্তি তোলেন এবং বলেন যে, লেখকদের সাথে এদের তুলনা সঠিক হয়নি। তিনি আরও বলেন, অ্যানড্রিয়াসেন নিজেই সদস্যদের সাক্ষাৎকার নেন এবং নিজেই রোগ-নির্ণয় করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি লক্ষ্য সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য কোনো বিভিন্ন উপায়ে প্রাপ্ত ফলাফলের বিশুদ্ধতা যাচাই করেননি। রোথেনবার্গ আরও বলেন যে, তিনি ৩০ বছর ধরে নোবেল ও পুলিৎজারজয়ী সৃষ্টিশীল মানুষদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং তিনি ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, সৃষ্টিশীলতা অসুস্থতায় নয় বরং মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাবিত হয়। কিন্তু অ্যানড্রিয়াসেন, রোথেনবার্গের মতোই, নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন; তিনি বলেন, বাইপোলার অসুস্থতা ও সৃষ্টিশীলতার মধ্যে সম্পর্ক যথার্থ ও দুর্দান্ত। কিন্তু অ্যানড্রিয়াসেনের গবেষণা অপেক্ষা রেডফিল্ড জামিসনের একই বিষয়ে ১৯৮৯ সালে করা গবেষণাটি অধিক মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাঁর গবেষণাটি ছিল সৃষ্টিশীল মানুষের মানসিক অবস্থার সমস্যা-সংক্রান্ত। অক্সফোর্ডে, কোনো এক বাৎসরিক ছুটির সময়, জামিসন ব্রিটেনের বিখ্যাত লোকদের ওপর মানসিক অবস্থার দোলাচলতা ও সৃষ্টিশীলতা-সম্পর্কিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে কাজ শুরু করেন। গবেষণায় তিনি পান যে, বাইপোলার অসুস্থতা ঘুরে বেড়ায় প্রায় ১% সাধারণ লোকের মধ্যে, ৫-১০% লোকের মধ্যে মারাত্মক ডিপ্রেশন দেখা যায়। শিল্পীদের মধ্যে ৩৮% শিল্পী সাধারণ ও মারাত্মক মাত্রার ডিপ্রেশন ভোগেন। তবে জামিসন স্বীকার করেন, প্রতিটি শ্রেণিতেই শিল্পীদের সংখ্যা ছিল কম—আটজন ঔপন্যাসিক, আটজন নাট্যকার। তিনি তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কে বলেছেন যে, বিষয় হলো কোনো প্রবণতা পাওয়া গিয়েছে কি না যা লক্ষ্যাভিমুখী, যদি তা হয়ে থাকে তাহলে অন্যূন বলা যায় যে গবেষণা বা পরীক্ষা সঠিক ছিল। তবে এ বিষয়ে সর্ববৃহৎ গবেষণাটি হয়েছিল আর্নল্ড লুডভিগ দ্বারা, তাঁর পুস্তকটির নাম *দ্য প্রাইজ অব গ্রেটনেস*, আর এর বিষয় হলো: পাগলামো ও সৃষ্টিশীলতার বিতর্কের পুনঃসমাধান। এক দশক ধরে লুডভিগ ও তাঁর গবেষণা সহযোগীরা ১০০৪ জন বিখ্যাত নর-নারীর ২২০০টি জীবনী ঘেটে উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিশীলতার উপাদানগুলোকে ধরার চেষ্টা চালান। মাধ্যমিক উৎস থেকে এবং জামিসন ও অ্যানড্রিয়েসেনদের নমুনা সমস্যার ভুলক্রটিগুলো দূর করে তিনি অগ্রসর হন এবং এক্ষেত্রে তিনি জীবনীর পক্ষপাতিত্বের বিষয়টিকেও বাতিল করেন ও বলেন যে, প্রণীত প্রশ্নমালার মাধ্যমে যে জরিপ-উপাত্ত সংগ্রহ হয় তা অপেক্ষা দীর্ঘকাল ধরে লেখা জীবনী অনেক বেশি যথাযথ ফলাফল দেয়। তিনি বলেন, মোটের ওপর ক্লিনিক্যাল সাক্ষাৎকার থেকে যা পাওয়া যেতে পারে তা হলো আত্মজীবনী, যা সবার জন্য সবচেয়ে বড়ো এক অযথার্থ রেকর্ড। তিনি ক্লিনিক্যাল সাক্ষাৎকার থেকে গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন জীবনীর, যা একজন জীবনীকারের দীর্ঘ শ্রম ও গবেষণার ফল। লুডভিগ তাঁর গবেষণায় দেখান, সুনির্দিষ্ট কাঠামোগত চাকরিতে কর্মরত সৃষ্টিশীলদের অপেক্ষা চাকরিহীন পরিপূর্ণ সৃষ্টিশীল শিল্পীদের মধ্যে মানসিক রোগের উচ্চহার লক্ষণীয়। কৈশোর পর্যায়ে, ২৯% থেকে ৩৪% বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে মনোরোগের উপসর্গ দেখা যায়, যার পরিণতিতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনোবিকার-সংক্রান্ত অমূলপ্রত্যক্ষণ প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। তুলনায়, ভবিষ্যৎ ব্যবসায়-বিজ্ঞান-খেলাধুলায় যারা বিখ্যাত হবে, তাদের মধ্যে এই হার ৩-৯%। পূর্ণ বয়স্কদের মধ্যে কবি-গল্পলেখক-সংগীতশিল্পীদের ক্ষেত্রে এই হার থাকে ৭০-৭৭% আর চিত্রশিল্পী, সংগীতকার ও অন্যান্য লেখকদের মধ্যে এই হার ৫৯-৭৭%; বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী, রাজনীতিক, স্থপতি ও ব্যবসায়ী লোকের ক্ষেত্রে এই হার ১৮% থেকে ২৯%। বাইপোলার অসুস্থতা শিল্পবীক্ষাকে বৃদ্ধি করে, জামিসন ও অ্যানড্রিয়াসেন-এর এই ধারণা থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন লুডভিগ। তিনি বলেন যে মনোরোগে আক্রান্ত সৃষ্টিশীল ব্যক্তিরা, ব্যবসায় বা বিজ্ঞান অপেক্ষা শিল্পে, নিজেদের খুঁজে পান বেশি। তিনি যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, বিজ্ঞানবিশ্বে যুক্তি, ধৈর্য, বিচারবোধ, অধ্যবসায় ছাড়া গত্যন্তর নেই; পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কাজের কোনো ভিত্তি নেই। বুনো উদ্যমের পরিবর্তনশীল অধ্যায় বা নিস্তেজক ডিপ্রেশন, যাকে বলা যায় বাইপোলার অসুস্থতা, তা বৈজ্ঞানিক অর্জনের বা সাফল্যের জন্য মারাত্মক বাধা হয়ে ওঠে; কিন্তু একজন শিল্পী আবার এগুলো থেকে পেতে পারেন প্রেরণা। লুডভিগ, এসব কারণ ছাড়াও, বলেছেন এক সাংস্কৃতিক কারণের কথা; তিনি বলেছেন, একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী কবি তার তরঙ্গায়িত আচরণকে দমন করার জন্য কম প্রেরণা বা শক্তি পান। একজন রাজনীতিক যদি মদ্যপান করেন বা অবসাদগ্রস্ত হন, তাহলে তিনি তা গোপন করতে চান, কারণ তিনি মনে করেন এতে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে, কিন্তু একজন কবি মদ্যপান করেছে বা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়েছে বলে কেউ শুনলে সে ভাবে, "এটা কি নতুন কিছু?" অর্থাৎ কবির জন্য এটাই স্বাভাবিক। জনগণও এটাকে স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেয়।

ম্যানিক-ডিপ্রেশনের দোলা ও অভিঘাত, সমস্ত সন্দেহ বা অস্বচ্ছতা সত্ত্বেও, লেখকশিল্পীদের মধ্যে জিজ্ঞাসমান একটি ব্যাপার। এর নজির দেখা দেয় কবি-শিল্পীদের মধ্যে। এর সাথে রয়েছে কিয়ের্কেগার্দ কথিত "নান্দনিক হতাশা"[২২]-র গভীর সম্পর্ক। ক্লাসিক্যাল ম্যালানকলি বা ধ্রুপদি বিষাদ এবং সৃষ্টিশীল উন্মাদনার এক অপ্রতিহত ও সংবর্ধিত প্রবাহ দেখা দেয় ব্যক্তির মধ্যে যার ফলে ব্যক্তি হয়ে ওঠেন সৃষ্টিশীল ও স্তবকিত। ধ্রুপদি বিষাদ থেকে জন্ম নেয় একাকিত্ববোধের, যার শ্রেষ্ঠ রূপ দেখা যায় কিট্‌স, রিলকে, জীবনানন্দ দাশ, উল্‌ফসহ অনেক বিখ্যাতদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে; আবার চমৎকার উন্মাদনার ও মহৎ সৃষ্টিশীলতার প্রকার দেখা যায় বোদল্যের, হ্যোল্ডারলিন, শেলিসহ অনেকের মধ্যে। হয়তো অনেক সময় তা চূড়ান্তভাবে পথ খোঁজে ব্যক্তি-নিষ্ক্রমণে—আত্মহত্যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবি: আত্মপ্রেমী ও আত্মবিনাশী অর্ফিক

কবি কী? এমন একজন অসুখী মানব যে তার হৃদয়ে
গভীর যন্ত্রণা লুকিয়ে রাখে, কিন্তু তার ঠোঁটদ্বয় এমনভাবে
সুগঠিত যে যখন দীর্ঘশ্বাস আর কান্না তা দিয়ে
বেরিয়ে আসে, তখন তা মনে হয় সুমধুর সংগীত।

কিয়েরেকেগার্দ

সংসারে প্রকৃত কবি বড় বিরল, তাই কবিকে
দেখিয়া মানুষ বিস্মিত হইয়া যায়।
কবি বড় আশ্চর্য মানুষ। যৌবনে
সে যৌনধর্মকে কেন্দ্র করিয়া লয় না,
যৌবনান্তে বিষয় ধর্মে তাহার রুচি নাই,
ধর্মকর্মেও তাহার সমান অরুচি। তাই সংসারী
তাহাকে অকর্মণ্য বলিয়া গালি দেয়, ধার্মিক
গালি দেয় দুষ্ট বলিয়া।... সে কোন সংসারের
সমুদ্রতীরে নুড়ি কুড়াইতেছে, আর দেখিতেছে
উহা পরশপাথর কিনা। বেশির ভাগ কবির
জীবন নিষ্ফল অন্বেষণেই শেষ হয়,
কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের জীবন
নিষ্ফল নয়। তাহাদের খোঁজার ইতিহাসই কাব্য।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা... বাক্‌ ও লেখায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত
এক অনুপম আবিষ্কার,
মনই যাকে আবিষ্কার করে। ঈশ্বরের
অন্তর থেকে তা উৎসারিত, আর স্বল্প-সংখ্যকদের
হৃদয়েই এই দান জন্মে। বস্তুত তা এমন এক
আশ্চর্যজনক উপহার যে, সত্যিকার কবি মানবকুলের
মধ্যে অত্যন্ত বিরলতম।

গিয়োভানি বোক্কাচিও

কবি এক ব্যতিক্রমী বিরল সত্তা। কবিচারিত্র্যের এত ভিন্নতা ও এত পরস্পরবিরোধী উদ্ভাসন, তবু কোনো এক জায়গায় তারা অভিন্ন রূপবন্ধে ভাস্বর, তারা অন্যদের মতো নয় স্বাভাবিক, স্বতশ্চল; তারা অসুখী, বাতুল; তারা খ্যাপা।[১] তবে কবি মানসিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্রাট: ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর*-এ দেখা যায় নায়ক "সুন্দর" তার রাজপুত্র পরিচয় গোপন করে কাব্যে "বিদ্যা"র মন ভোলায়। কবিপত্নী তাই বলে ওঠে:

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে ॥
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে ॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে ॥
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে ॥
কামশাস্ত্র জানে কত কাম্য অলঙ্কার ॥
কতমত করে রতি বলিহারি তার ॥
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ী না পড়িনু কভু ॥
কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু ॥

টমাস লাভ পিকক-এর "দ্য ফোর এজেস অব পোয়েট্রি"[২]-র জবাব হিসেবে ১৮২১ সালে শেলি লেখেন "আ ডিফেন্স অব পোয়েট্রি" নামীয় প্রবন্ধটি, যাতে তিনি বলেন, কবিতা বস্তুতপক্ষে একপ্রকার স্বর্গীয় বিষয়, এটা জ্ঞানের কেন্দ্র ও পরিধি; এটা সকল বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তিনি আরও বলেন, একজন কবি সর্বোচ্চ জ্ঞানের ধারক।

কবি এক অধীশ্বর আর এজন্যই কবি প্রান্তিকায়িত সত্তা সত্ত্বেও অনেকের প্রতিদ্বন্দ্বী। কোনো কোনো গ্রন্থে কবিকে বলা হয় মিথ্যাবাদী[৩], কারও কারও মতে কবি মিথ্যা অনুকরণকারী।[৪] কেউবা দুর্বোধ্যতার অনুযোগে কবিকে বাতিল করেন।[৫] কিন্তু একটি সত্য ইত্যবসরে দাঁড়িয়ে যায়, প্রান্তিক সত্তা হলেও কবির শক্তি অনেকের নিকটই অসহ্যকর। কবি সবাইকে ছাড়িয়ে যান এই তার দোষ। এর কোনো উত্তরবিন্দু নেই। ধর্মশাস্ত্রগুলো এত শক্তিশালী শুধু তাদের শব্দভাষ্যের দ্বারা, কবিও তাঁর উচ্চারণের জন্যই শক্তিমান হয়ে ওঠেন, আবার দোরিয়াম নদীর তীরে হরিৎ প্রশস্ত প্রান্তরে চারণ কবি থামাইরিসের মতোই তার কণ্ঠ চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়! নিকৃষ্ট পৃথিবী, নোংরা রাজনীতি, অসহিষ্ণু ধর্মনীতি এভাবেই তার ওপর প্রতিশোধ নেয়। থামাইরিস[৬] চেয়েছিলেন পারঙ্গমতায় সংগীতকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী জিয়ুস-কন্যাকে ছাড়িয়ে যাবেন। তার আকাঙ্ক্ষাই তার দোষের কারণ, তার সাহসই তার নিয়তি। কবিরও নিয়তি তাঁর উচ্চারিত শব্দ। কবির আকাঙ্ক্ষা, তার জয় করার অভীপ্সাই তার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যায় এবং প্রকারান্তরে তার অস্তিত্বলোপের কারণ হয়ে ওঠে।

অন্তরঙ্গতমের জন্যই আকুল কবিরা; নিজের অন্তরঙ্গতমকে আবিষ্কারই তাঁর বাসনা, আর তাকে কত বিচিত্র অঙ্গরাগে বিভাসিত করা যায় তাও তাঁর বিবেচনা। এই বিকাঙ্ক্ষায় অনুরণিত হন কবি। কবিতা কি শ্রবণ, দর্শন, কল্পনা, স্মৃতির এক নির্বেদ সাফল্য, নাকি এগুলোর এক সংরাগময় সংস্থিতি! যেভাবেই চিন্তা করা হোক না কেন, কবিতা রচনা করতে গিয়ে কবিরা ভর করেন কিছু উৎকেন্দ্রিক নিবিড় অভ্যাসে: শিলার কবিতা লেখার সময় পচা আপেলের গন্ধ শুঁকতে ভালোবাসতেন; ওয়াল্টার ডেলামেয়ার অবিরাম ধূমপান করতেন; অডেন অবিরাম চা খেতেন আর স্টিফেন স্পেন্ডার খেতেন কফি সহযোগে দুই-তিনটি সিগারেট পরপর। কিন্তু এগুলো নিশ্চিতই অবচেতনিক নির্ভরতা এর নেই কোনো যথার্থ বিশ্লেষণসূত্র। হতে পারে এগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনোযোগের এক আবাহন যেমন অনেকে লেখেন দ্রুত ও অখণ্ড সঞ্চরণে, কেউবা লেখেন ধীরে ধীরে স্তরসম্পূর্ণতায়—সংশাধনের ভেতর দিয়ে। যেমন মোৎসার্ট ও বিটোফেন: মোৎসার্ট তাঁর সিম্ফনি, কোয়ার্ট্রেট বা অপেরার দৃশ্য মস্তিষ্কের দ্বারা চিন্তা করতেন—কখনও ভ্রমণের সময়, কখনও বা মানসিক উদ্বেগকাতর মুহূর্তে। তারপর তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কাগজে লিখে রাখতেন। আর বিটোফেন তাঁর ভাবগুলোকে বিক্ষিপ্তভাবে নোটবুকে লিখে পাশে রেখে দিতেন। তারপর দীর্ঘসময় ধরে সংশোধন-সংযোজনের দ্বারা এদের মানোন্নয়ন ঘটাতেন। কখনও কখনও প্রাথমিক খসড়াগুলো এত বেশি অসম্পূর্ণ মনে হতো যে এগুলো থেকে কীভাবে মুনলাইট সোনাটা বা নবম সিম্ফনির মতো মহৎ জিনিসের জন্ম হতো তা-ই মনে হতো আশ্চর্যের। যেভাবেই প্রথম আবির্ভূত হোক না কেন শুরুটা নিশ্চয়ই জাদুময়। পল ভালেরি বলেছেন une ligne donnee—একটি পঙ্‌ক্তি আসে প্রকৃতি বা ঈশ্বরের কাছ থেকে, অবশিষ্ট কবি নিজে আবিষ্কার করেন।

কিন্তু এসবই এক ধরনের নির্ভরতা যা না হলে কবি উদ্দিষ্ট অন্তরঙ্গতমকে ছুঁতে পারতেন না। এই রচনায় প্রাক-মুহূর্তটি নিশ্চিয়ই উদ্বেলময়, আত্মনিবেদনমুখর। এই রচনামুহূর্তটি উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ, একক উদ্ভাসিত অবস্থা। *ছিন্নপত্রাবলী*তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কবিতা কি কেবল অন্য লোককে শোনাবার জন্য? ওতে তো নিজের একটা খুব আনন্দ আছে। পরের প্রশংসা যদি না মেলে তো সেই নিজের আনন্দই তো আমার মনে যথেষ্ট পুরস্কার।"[৭] বুদ্ধদেব বসুও কবির অন্তর্সত্তার প্রকৃতিকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর "কবি" কবিতায় :

> একা একা কথা কই: —তোমরা সে কথা
> শুনিতে পাও কি?
> তোমরা শুনিতে পাও—একা-একা কত
> বাকি আর ঝকি?
> হৃদয়ে ফুলের মতো ফুটিছে কবিতা
> সূর্যের উদয় হ'তে সন্ধ্যার সময়:
> হৃদয়ে ফুলের মতো কবিতা ঘুমায়
> সন্ধ্যা হ'তে সূর্যের উদয়।
>
> যে-আকাশে, যে-সমুদ্রে আছে যে ঘুমায়ে—
> সে-আকাশ আমার হৃদয়,
> সে-সমুদ্র আমার হৃদয়।[৮]

অন্বেষণ আর মুক্তির, আত্মতা আর উৎকর্ষের নিরন্তর অনুধ্যানে ব্যাপ্ত এই কবিদের কী-বিচিত্র ভিন্নতা, তবু কোথায় যেন তাদের মিল! তারা এক তাঁদের অন্তরঙ্গদের আবিষ্কারে, আর ভিন্ন তাদের সংলগ্নতায়।

১৭৯৫ সালে গ্যেয়েটের বন্ধু কবি-নাট্যকার-প্রবন্ধকার ফ্রিডরিখ শিলার একটি মূর্তিভাঙা প্রবন্ধ লেখেন: "অন নাইভ অ্যান্ড সেন্টিমেন্টিভ পোয়েট্রি";[৯] প্রবন্ধটি, বিশেষত ইংরেজি ভাষাভাষী এলাকায় তার যোগ্য সমাদর পায়নি। প্রচলিত অনেক

~ www.amarboi.com ~

জনপ্রিয় জোড়সূত্রের মধ্যে—যেমন নিট্শের অ্যাপোলোনীয়-দিয়োনেসিও, শ্লেগেলের অ্যান্টিক-মডার্ন, উলফলিনের ক্লাসিক্যাল-ব্যারোক ইত্যাদি—শিলারের বিভাজনটি ছিল অধিক ফলপ্রসূ, বিশেষত, কবি-চারিত্র্যের ব্যাঞ্জনাময় দিককে তা যথাযথভাবে প্রকাশ করেছিল। শিলার বললেন, কবিমাত্র নাইভ অথবা সেন্টিমেন্টাল। নাইভ বলতে শিলার বোঝান সেই জাতের কবিকে, যিনি পরিপূর্ণভাবে প্রকৃতির সাথে ঐকতানময় এবং সুসমঞ্জস, "মহাবিশ্বের সাথে সুর বাঁধা" তাঁর তার। যার ফলে প্রায়শই তিনি হন বিকর্ষী, উড়ুক্কু, অদৃশ্যময়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গ্যোয়েটের "রোমান এলিজির" কথা যা প্রেমিকের অপরাধ নয় বরং প্রেমিকবিশ্বের চিরন্তন মোহন লীলার বিষয়ই ধ্বনিত। অন্যদিকে, সেন্টিমেন্টিভ হলো সে-ধরনের কবিরা, প্রকৃতির সাথে যাঁদের বিচ্ছেদ হয়েছে, এমনকি প্রকৃতিতে যারা বিশ্বাসও হারিয়েছেন। শিলারের মতে নাইভ কবিতার উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে যেমন হোমার-এর লেখা, যেখানে জীবনের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার এক দিক প্রবল, জরুরি, এবং অনুপুঙ্খভাবে উদ্ভাসিত। আর সেন্টিমেন্টিভ কবির দেখা মেলে আকছার, এই কবিরা আত্মসচেতন, বস্তু তাঁকে পুরোদস্তুর অধিকার করতে পারে না। শিলার এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন গ্যোয়েটেকে সামনে রেখে, যার মধ্যে তিনি তাঁর সময়ের এক প্রশান্ত নাইভ কবিকে দেখেছিলেন। গ্যোয়েটে নিজেও এই প্রবন্ধটির ওপর মতামত দিতে গিয়ে বলেন, শিলার নাইভ কবিতা থেকে সেন্টিমেন্টিভ কবিতাকে পরিপূর্ণভাবে পৃথক করতে পেরেছেন। শিলার আবার এ নাইভকেই বলেছেন অবজেকটিভ কবিতা, আদিকালে যা সংস্কৃতির প্রগতি-সরণিতে আবির্ভূত হতো, আর সেন্টিমেন্টিভ বা আত্মসচেতন কবিতাকে বলেছেন সাবজেক্টিভ কবিতা যা বিশেষত সংস্কৃতির পতনকালীন সময়ে লেখা হতো।

গ্যোয়েটে একে সাবলীল করে বলেছেন, পতনকালীন বা ভঙ্গুর অবস্থায় সব যুগের কবিতাই সাবজেকটিভ আর প্রগতিসময়ের সব কবিতাই অবজেকটিভ। হোমার শেক্‌সপিয়রের কবিতায় আছে এক কেন্দ্রাভিক প্রবণতা, গ্যোয়েটে যাকে বলেছেন "স্বাস্থ্যকর" যা অন্তর্মুখী-বহির্মুখীভাবে সঞ্চারশীল; আর শিলার ও তাঁর সমসাময়িকদের এবং তাঁদের উত্তরসূরিদের কবিতায় আছে এক কেন্দ্রাতিক প্রাণময়তা, যা বহির্মুখী-অন্তর্মুখীভাবে সঞ্চারশীল। নাইভ কবি তাঁরাই যাঁদের কল্পনাপ্রতিভা এবং অভিদর্শন অনেকটা কম জটিলতাময় ও প্রত্যক্ষগামী। যন্ত্রণা তাঁকে ছিঁড়ে ফেলে কিন্তু তাঁর লেখাকে নয়। বৌদ্ধিক বিবেচনায় তাঁর জীবনদর্শন বিশৃঙ্খলামুক্ত। এই অর্থে গ্যোয়েটে সকল কবিকেই চূড়ান্তভাবে বলেছেন নাইভ, এবং যিনি যত বেশি নাইভ তিনি তত শক্তিশালী। আবার অন্যভাবে, সত্যিকার অর্থে নাইভ কবিও পাওয়া দুষ্কর। নাইভ কবিরা চিন্তার দ্বারা অগ্রসর হন না। আর সেন্টিমেন্টিভ কবিরা সারস্বত, রুচিশীল, আত্মসচেতন এবং চিন্তাশীল।

শিলারের এই বিভাজনসূত্রের আলম্বনে, "সাইকোলজি অব আর্ট"[১০] আলোচনায়, পৃথক দুটি সৃষ্টি-অভিভাবের প্রসঙ্গে কার্ল গুস্তাফ ইয়ুং "সেন্টিমেন্টাল"-কে বলেছেন "ইন্ট্রোভার্টেড" আর "নাইভ"-কে বলেছেন "একস্ট্রাভার্টেড"। ইন্ট্রোভার্টেড হলো সেই প্রবণতা, যেখানে বস্তুচাহিদার বিপরীতে শিল্পীর সচেতনসত্তার অভীপ্সা ও লক্ষ্য বিষয়ীভূত; পক্ষান্তরে, একস্ট্রাভার্টেড প্রবণতা হলো বস্তুচাহিদার অনুগামী। ইয়ুং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিলারের নাটক ও কবিতাকে ইনট্রোভার্টেড বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন আর *ফাউস্ট*-এর দ্বিতীয় অংশকে এক্সট্রাভার্টেড প্রবণতার উদারহণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই বিভাজনসূত্র ধরে অন্যভাবে বিষয়টা আমরা দেখতে পারি। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন এ ধরনেরই অন্য এক বর্গীকরণের কথা—কবি দুই ধরনের: পোয়েট অব কালচার, পোয়েট অব ন্যাচার। পোয়েট অব কালচার ধরনের কবিরা বস্তুকে দৃশ্যগ্রাহ্য করেন গদ্যে, পরে তাকে কবিতা করেন। পোয়েট অব ন্যাচার-রা প্রকৃতপক্ষে বস্তুকে দৃশ্যগ্রাহ্যই করেন কবিতায়।

অতএব, যত ভিন্নসূত্রই থাকুক না কেন, যত বিভাজনরেখাই থাকুক না কেন, এইরূপ ভিন্নতার পর কোনো কোনো জায়গায় কবিরা একাত্ম হয়ে যান, তখন তাঁদের ভাষা, মিল-এর ভাষায়, অনুধ্যান আর নির্জনতার প্রাকৃতিক ফল; পৃথিবীর সাথে সহ-সম্পর্কায়নের এক বাগ্মিতা। এত সব বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার গভীর সমাবেশ আর কোথাও নেই। সবকিছুই কবিতায় পরিণত। অপরিচিত ভিন্নতা আর গভীর ব্যাপ্তির মাঝেও সবাই হয়ে ওঠে কবি; কারণ, ব্লেইকের ভাষায়, একটি ক্ষমতা এককভাবে পারে একজনকে কবি বানাতে, আর তা হলো—কল্পনা, বা দিব্যদর্শন। এই কল্পনা আর দিব্যদর্শনে প্রত্যেক কবিই একক, অনন্য, ভিন্ন ও অপরূপ।

অসংখ্য কবিদের কবি হয়ে ওঠার ব্যাপারটার আঙ্গিক এক কিন্তু কবি-জীবনের সম্ভাবনা, বিস্তৃতি এবং আরোহণ কোথাও কোথাও ভিন্নতরভাবে অর্থবহ। কেউবা ব্যক্তিঅস্মিতাকে অবরুদ্ধ রাখেন আপন বৃত্তে, কেউবা তার পূর্ণ প্রয়োগে ব্রতী হন। কেউ জীবন ও কবিতাকে একাকার করেন, কেউবা এই দুইয়ের স্পষ্টত বিভাজনকে সযত্নে রক্ষা করেন। কোনোটাই অনিবার্য নয় কিন্তু কোনো কোনোটা অচ্ছেদ্য; জীবন ও কবিতা—একটি অপরটিকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় নিরন্তর প্রচেষ্টা। অথবা একটির পরিপূরকতায় অন্যটির পরিপূরণ। সেই সব কবি-শিল্পী, যাঁরা জীবনের প্রতিমান খোঁজেন শিল্পে, তাঁদের দেখলে মনে পড়ে অবরুদ্ধ হেলেনের কথা, যখন চারদিকে ট্রয়ের যুদ্ধের ঘনঘটা, তখন ঘরে বসে ঈষৎ নীলাভ রঙের মিহি বস্ত্রখণ্ডের ওপর যুদ্ধের কাহিনি-সম্বন্ধের এক সূক্ষ্ম অবয়বকে সূচিশিল্পের অরূপ প্রকাশকলায় হেলেন ফুটিয়ে তুলছিলেন। কবি-শিল্পীরাও এইরকম: জীবন এক ট্রয়ের যুদ্ধ, বিনাশের ওপরে বসে তাঁরা চিত্রিত করেন তার মাধুরিমাকে। জীবন যেন যজ্ঞের সমিধ যার দহনে উঠে আসে সপ্রজ্বল পবিত্র অগ্নি। এই কবিরা তাই আহ্বান জানান কবিতাকে, কাভাফির ভাষায়:

হে কাব্যকলা, আমি তোমার দিকে আসি
কারণ তোমার আছে উপশমের জ্ঞান আর ওষুধ:
ভাষা আর কল্পনার নিশ্চিত ঘুম।

আবার আমাদের এক কবি বলেন:

কেন আমি কাব্য লিখি, জানতে চাহো সেই কথাটাই?
অত কিছু বলা-কওয়ার আজকে, সখা, সময় যে নাই।
তবু যদি নেহাৎ সুধাও, এইটুকু নয় বলে রাখি
জীবনে যে কাব্য লিখে, জীবন তারে দিল ফাঁকি।[11]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিজীবনের এক অন্তর্গূঢ় ট্র্যাজেডি-ভাষ্য দিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ তাঁর এই কবিতাটিতে। কবি ভাবেন না কবিজীবন নিয়ে, তবু যদি সেই ভাবনা উসকে দেয় তাহলে তার উত্তর এরকমই—কবির জীবন এক নিরন্তর ব্যর্থতার জীবন। যে-জীবনের জন্য কবি কবিতা লেখেন, সে-জীবন তাঁকে ফাঁকিই দিয়ে যায়। এটা হলো অভীপ্সা আর ব্যর্থতার এক দীর্ঘ অন্বেষণ। এ হলো এক মহত্তম ট্র্যাজেডি—সপুষ্পক জীবনের স্বপ্নে অপুষ্পক জীবনের আড়ম্বর। এক অপূর্ণের জীবন তাড়িয়ে ফেরে তাঁকে। কবি হলেন সেই "খ্যাপা" যে খুঁজে ফেরে "পরশপাথর":

খ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশপাথর
মাথায় বৃহৎ জটা ধুলায় কাদায় কটা
মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণ কলেবর।

কিন্তু পরশপাথর কি সে পায়?

কেবল অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত কত,
ঠন করে ঠেকাইত শিকলের পর—
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি
কখন ফেলেছে ছুঁড়ি পরশপাথর।

খ্যাপা পরশপাথর খোঁজে কিন্তু পায় না, বা পায় কিন্তু চেনে না। আসলে পাওয়া নয়, না পাওয়া নয়, পাওয়া-না-পাওয়ার অন্বেষণই তার অন্বিষ্ট, সম্পাদন নয় ক্রিয়াই তার আনন্দ। তার আসলে কোনো প্রতিপক্ষ নেই, সে নিজেই নিজের প্রতিপক্ষ। নিজেই অর্থি নিজেই প্রত্যর্থী। কার্যাকার্যই তার উদ্দিষ্ট, তার ফল নয়। এই হলো স্থাপত্যশূন্যতা, কবির জীবনে যার অনিবার্য অথচ নীরব উপস্থিতি রয়েছে। এভাবেই "পাবলিক স্ফিয়ার" আর "প্রাইভেট ওয়ার্ল্ড"—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের কূলসীমানায় কবিসত্তা নিবিড়তা লাভ করে।

র‍্যাঁবো বলেছেন, শিল্পী হলো মহৎ অসুস্থ, মহৎ অপরাধী, মহৎ বহিষ্কৃত ব্যক্তি: কবি এই অভিধায় অভিধামণ্ডিত। কবির জীবন অব্যবস্থিত, ঠিক রবীন্দ্রনাথের "খ্যাপা"র মতোই। কবি একা—নিরালম্ব; কবি ঠিক সেই মানুষ যে কখনও কখনও বড্ড একা হয়ে যায়। অক্তাবিয়ো পাস তাঁর "একাকিত্বের দ্বন্দ্ব" প্রবন্ধে বলেছেন, সব মানুষই, তাদের জীবনের কিছু সময়ে, নিজেকে বড্ড একা ভাবেন, আর বস্তুত তারা তা-ই। একাকিত্ব মানবাবস্থার এক প্রগাঢ় গভীরতম ঘটনা। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে জানে যে, সে একা। জন্ম ও মৃত্যু দুটিই একাকিত্বময় অভিজ্ঞতা। মানুষ একা জন্মে, একাই মৃত্যুবরণ করে। কবি একা তবে কখনও কখনও নয়, সর্বত অর্থেই। অস্তিত্বই মূলত একাগামী। তবে কবির একাকিত্ব অলঙ্ঘ্য ও অপরিহার্য, কেননা এর থেকে পরিত্রাণের উপায় তাঁর জানা নেই, তিনি তার অন্বেষণও করেন না। এই শূন্যতাবোধ, এই একাকিত্বের বেদনা এক অমোঘ অনুধাবন কবির জন্য। জীবনানন্দের ভাষায় :

দ্বীপের মতন একা আমি তুমি;
অনন্ত সব পৃথক দ্বীপের একক মরুভূমি;
যে যার পরিপূর্ণ অবিশ্বাসে রয়ে গেছে;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবির জীবনে এই একাকিত্বের স্বরূপসূত্রটিকে জোসেফ কনরাডের ভাষায় বলা যায়: "একাকিত্ব স্বচ্ছ এবং অভেদ্য, মায়াময় এবং চিরস্থায়ী... যা মানবীয় সত্তাকে ঘিরে থাকে, মুড়ে রাখে, বস্ত্রাবৃত করে রাখে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত, আর সম্ভবত তার পরেও।"[১২]

অতএব, প্রকৃত অর্থেই, কবি বেখাপ্পা, ত্রস্ত, বহিরস্থিত, অনন্দিত, পরিক্ষিপ্ত, খ্যাপা। এক নিয়তমান দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়েই তার দূরতিক্রম যাত্রা। এই দ্বন্দ্ব অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গের—কবিজীবনের সাথে ব্যক্তিজীবনের,[১৩] ব্যক্তি-জীবনের সাথে গৃহস্থালি-জীবনের। কবির কাব্যধারার সাথে জীবনধারার এক অনন্বিত সম্পর্করূপই তাঁর নিয়তি। তাঁর জীবন এক শিল্পমুখিতা আর তাঁর জীবনধারা উন্মুক্ত বাহ্যিকতাস্পর্শে তাড়িত। এই দ্বন্দ্বেরও আছে দুটি স্বরূপ-বিভাজিত অবস্থা: অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব। অন্তর্দ্বন্দ্ব হলো সেই অবস্থা যখন ব্যক্তিসত্তা কবিসত্তার সাথে বাহ্যমান স্থূলসত্তার নিয়ত অসন্নিহিত সংকটাবস্থা। এই হলো অদ্বয়ের দ্বৈরথ অথবা উহ্যমান একাকিত্ব। এই অব্যবস্থিত প্রবণতাই কবিকে জীবনের বেলাভূমিতে কূলপ্লাবী করে তোলে, করে তোলে আত্মঘাতী।

এই অসম্বন্ধসূত্রকে বোঝা যাবে যদি এর কিছু রূপনক্শাকে আমরা আমাদের চৈতন্যে অধিবাসিত করি:

ক. সহে না, সহে না
আর দিনগত পাপের ক্ষালনে নিত্য অনুতাপ;
বদ্ধমুষ্ঠি পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট কুড়ায়ে সধর্মীয়
সঙ্গে বিপ্রলাপ;
[পথ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

খ. সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?
[বোধ : জীবনানন্দ দাশ]

গ. কিছুই আমি করিনি গোপন।
যাহা আছে সব আছে
তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা
তাই তারে বুঝিতে পার না?
[দুর্বোধ : রবীন্দ্রনাথ]

ঘ. ছিন্নপত্রে হারানিধি নাম
চেয়েছি নিশ্চিহ্ন হয়ে-যাওয়া শিল্পে অনন্ত বিশ্রাম।
আর কিছু চাইনি জীবনে।
[কী উপায়ে দেখি : শক্তি চট্টোপাধ্যায়]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঙ. সকলের মতো হয়ে, সকল মানুষের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিশে মিশে, সহজ আমোদ প্রমোদ আনন্দলাভ করবার জন্য আমার মনকে আমি প্রতিদিন দীর্ঘ উপদেশ দিতে থাকি, কিন্তু আমার চারদিকেই এমন একটি গণ্ডি আছে, আমি কিছুতেই সে লঙ্ঘন করতে পারি নে। লোকের মধ্যে আমি একটি নতুন প্রাণী, কিছুতেই তাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না—আমার যারা বহুকালের বন্ধু তাদের কাছে থেকেও আমি দূরে। [*ছিন্নপত্রাবলী* ১৫৬ সংখ্যক পত্র : রবীন্দ্রনাথ]

চ. ভিড়ের সংসর্গ মোরে করে সদা নৈঃসঙ্গ্য বিব্রত।
[সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

ছ. কে কাঁদে অন্তরে মোর
অন্তরে কে কাঁদে মোর
অতিমাত্র একা?
[যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

এই উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশসমূহে উন্মোচিত হয় কবির বিচ্ছিন্ন প্রান্তিক সত্তার রূপ। কবি একা, অতিশয় একা, ভেতরে ভেতরে বড়ো একা। কবি "অতিমাত্র একা", কবি "বহুদূরে"র এক নিঃসঙ্গ সত্তা।

কবিসত্তা এক প্রান্তিক বিচ্ছিন্ন সত্তা: তার শুক্তি হলো নীরবতা আর অন্তঃস্থ মুক্তা হলো তার ভেতর ধীরে ধীরে জন্ম নেয়া বিচ্ছিন্নতাবোধ। কবি মূলত পরিপূর্ণভাবে একা ও বিচ্ছিন্ন। একজন চিত্রশিল্পী, একজন কথাসাহিত্যিকও এই একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতাকে লালন করেন কিন্তু পরিপূর্ণভাবে তাঁরা এর দ্বারা আক্রান্ত হন না। তাঁরা জনসমুদ্রে যান, প্রকৃতির ভেতরেও যান। কিন্তু কবি এগুলো থেকে দূরে সরে আসেন। কবি এমন এক দূরত্বকে ধারণ করেন যা তাঁকে করে তোলে এক স্বতন্ত্র প্রান্তিক সত্তা। কবির অভিদর্শন ভিন্ন ধরনের। কবির পর্যবেক্ষণের ধরন হলো কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাতে নক্ষত্র-সন্দর্শনের মতো। যোজন যোজন দূর থেকে যেমন মহাকাশ-বিজ্ঞানী নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেন, কবিও তেমনি তার বিচ্ছিন্ন ও একাকিত্বময় এককাবস্থা থেকে এই পৃথিবী, মানব ও প্রকৃতিকে অনুধাবন করেন। একজন চিত্রশিল্পীর বেড়ে ওঠার ধরন হলো সূর্যের ছায়ায় বীজের বেড়ে ওঠা, আর কবির বেড়ে ওঠা হলো রাতের গভীরে চন্দ্ররস পান করে নির্জন বাগানে স্থলপদ্মের বিকশিত হওয়ার মতো। বিচ্ছিন্ন সত্তার কারণেই তার বিকাশকাল রাত। দিনের জনতার মিতালিকে তিনি এড়িয়ে চলেন।

এই একা ও বিচ্ছিন্ন সত্তার[১৪] কারণেই কি কবি একাধারে আত্মপ্রেমী এবং আত্মবিনাশী? কবিমাত্রই আত্মরতিবাদী।[১৫] আত্মরতি ছাড়া সম্ভব হয় না কবির সৃষ্টিশীল সত্তাকে গতিশীল রাখা। আত্মরতি এক বিচ্ছিন্নতা যা কবিকে অন্য অনেক কিছু থেকে বিমুক্ত করে। বিচ্ছিন্নতা এক নিরন্তর ক্রিয়ার ফলে, বিচ্ছিন্ন নিরন্তর হতে হতে, কবি হয়ে পড়েন একা ও আত্মআবেষ্টিত। এই আত্মবিবর্ধন তাঁকে গ্রাস করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উদ্যত হয় এবং প্রকারান্তরে এর থেকে জন্ম দেয় এক আত্মবিনাশী চেতনার। কবি নিরন্তর আত্মনাশী ভাবনায় তাড়িত হতে থাকেন। এ আর কিছুই নয়, আত্মরতির মাধ্যমে আত্মপ্রত্যাহার—আত্মবিলোপের এক চূড়ান্ত মগ্ন রূপ। আত্মপ্রকাশ থেকে আত্মবিনাশ—এই হয়ে পড়ে কবির অনিবার্য আত্মনিয়তি। অবিরত এই মনস্তত্ত্বের খেলার ক্রীড়নক হয়ে পড়ে তাঁর জীবন। কবিতা এক "নন-অবজেকটিভ আর্ট" আর তা অঙ্কুরোদ্‌গমিত হয় অন্তর্গত প্রদেশ থেকে। চেতনস্তরের সাথে এই "অন্তর্গত" মিথষ্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় না। চেতনার ঊর্ধ্বে থাকে অবচেতন মন, যা চেতনাকে আক্রান্ত করে নানা দিক দিয়ে। এই "অন্তর্গত" অদৃশ্য, একে উদ্ভাসনের জন্য প্রয়োজন প্রতীক, কারণ বস্তুঅনুষঙ্গে তা অধরা থাকে, ফলে কবি আশ্রয় নেন প্রতীকের। এই প্রতীকের উৎপত্তি বা উৎসস্থল গভীর অন্ধকার সংবেদে যা গভীরভাবে আশ্লিষ্ট অবচেতনের সাথে। এভাবেই কবি হয়ে ওঠেন অবচেতনের রাজাধিরাজ। অবচেতনেই চলে তার বিরতিহীন মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলন, এবং আত্মবিলোপী ধারণার উপলব্ধিতে তিনি মৃত্যুতে তাড়িত হয়ে পড়েন। অতএব অবচেতনেই মৃত্যুকে বড়ো করে চলেন এবং এক সময় তাকে আলিঙ্গন করেন।

প্রকৃতপক্ষে কবি হলেন অবচেতনের আদি সঞ্চালক, তার আদি আবিষ্কর্তা। সত্তরতম জন্মদিনে ফ্রয়েডের ভক্তরা তাঁকে অবচেতনের আবিষ্কর্তা বলে স্বাগত জানালে ফ্রয়েড তাদের ভুল সংশোধন করে দিয়ে বলেন যে, কবি ও দার্শনিকেরা বহু আগেই অবচেতনকে আবিষ্কার করেছেন, তিনি (ফ্রয়েড) একে ব্যাখ্যার এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বের করেছেন মাত্র।[১৬] বস্তুত কবিতা প্রথমত আর কিছু নয়, কবির একধরনের মনস্তত্ত্বচর্চা, আর এর মাধ্যমে কবি মূলত চেতনস্তরে ভাসমান হিমশৈলের নিমজ্জিত অদৃশ্য বিশাল অংশের মতো অবচেতনকেই রূপায়িত করতে থাকেন। মানুষের জীবনের গহন-গভীর তলসমূহই প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির মূল উৎসস্থল। সজ্ঞান উপরিতল মূলত দৃশ্যমান ও বোধগম্য, এবং বিশাল অবচেতন স্তর একে প্রভাবিত করে দারুণভাবে। আর এই রূপ, অরূপ এবং এই দুইয়ের রূপান্তরের বিভাবকেই কবিরা গ্রহণ করেন। কবিরা তাই অবচেতনের রাজাধিরাজ। ফলত নির্জ্ঞানের অভিঘাতে তাঁরা নিজেরাও অনেক সময় আলোড়িত হন। এই অন্তহীন অবচেতনের প্রকৃত অবস্থা পরম সত্যের সঙ্গে অভেদাত্মক। ফলে এর সন্ধানে কবিরা দক্ষ ডুবুরির মতোই অবচেতনের গভীরে ডুব দেন। মনোজাগতিক অনুসন্ধানই তাকে সফলতা দেয় এবং স্বজ্ঞাভাসে কবি উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন, যার ফল দেখা যায় তার জীবনেকাব্যে। কবির এই গভীরতল সচেতনতা থেকেই কবিতায় মরমি ও সংবেদী উপাদানগুলো অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে।

মহত্তম কবি অরফিয়ুসের উত্তরসূরি। তাঁরা অরফিক-কবি। তাঁদের নিয়তি যেন এক অরফিয়ুসের নিয়তি, যেখানে আছে পরিলিখিত প্রাপ্তির ক্ষণেই হারানোর এক নির্মম ট্র্যাজেডি: অরফিয়ুস, বীণাবাদক, তার প্রিয়তমাকে পেয়ে আবার হারান এবং পুনঃ আবার পেয়ে মুহূর্তের প্রাপ্তির আতিশয্যে আবারও হারান। অরফিয়ুসের সংগীত যেন শাশ্বত মূর্ছনায় এই কথাকেই চিরন্তন মাধুর্যে অনুরণিত করে যে, মহত্তম প্রাপ্তিই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আসলে চিরায়ত বেদনার দ্রুতস্পর্শী অধিবাস। তাদের জীবন এক যজ্ঞের সমিধ যার দহনে আবির্ভূত হয় পবিত্র শিল্পের হোমশিখা: এক বিহিত চিত্রকল্পের রুমাল উন্মোচন। কিন্তু কেন এই স্বেচ্ছাকৃত বেদনার আবাহন? কেন দুঃখের দিগন্তের চক্রবালে হেঁটে চলা? দস্তইয়েফ্স্কির "ভূতলবাসীর"র মুখে শোনা গেছে এর এক অদ্ভুত ও কাঙ্ক্ষিত উত্তর: "সুখী না হয়েও ভালোবাসা সম্ভব। ভালোবাসা নিজেই এক চমৎকার সুখের ইঙ্গিত। আমাদের জীবন... কত দুঃখময় তারপরও জীবন মধুর। সুখ ছাড়াই এই জীবন যাপন করা যায়।" অরফিক কবিরা এই সুখহীন জীবনই যাপন করেন। রিলকের ভাষায়, "মৃদু হাতে গোনে সে রাতের পর রাত ধরে প্রাচীন বেদনা।"[১৭] কিন্তু কী এর দার্শনিক কারণ? দস্তইয়েফ্স্কির ভূতলবাসীর মুখেই শোনা যাক পুনঃ এর এক উত্তর: "মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়, সে সৃষ্টিশীল।... পথ ছেড়ে বেপথে পা বাড়িয়েছে সে। কারণ ওই স্খলনই তার ভবিতব্য।" "জীবনের জন্য অসুবিধা ও বঞ্চনাকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা মানুষের আছে, হোক তা ক্ষতিকর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অসুবিধাই জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা হয়।" তো অরফিক কবিরা আসলে এই মহিমান্বিত বেদনারই অন্বেষক। কবি হয়ে ওঠার ক্রিয়াতেই আছে এই জীবনের অভিনবত্ব। রবীন্দ্রনাথও এর মতোই বলেন এক অভিলষিত কথা: "আত্মপীড়নও আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তবু মনে জড়ত্ব চাইনে। এর থেকে বোঝা যায় মানুষ সুখ চায় না, উন্নতি চায়—দুঃখ তার তেমন অপ্রিয় নয় যেমন অবনতি।"

অরফিক—এই শব্দটির স্মৃতিরূপ কী? অরফিয়ুস গ্রিক পুরাণের দেবী ক্যালিওপির পুত্র—বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ, কবি, বীণাবাদক। অ্যাপোলোর কাছ থেকে বর হিসেবে একটি বীণা পেয়ে তাতে ফুটিয়ে তোলেন সুরের আগুন ও সম্মোহন। আর গাছপালা প্রকৃতি, ঝরনাধারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত এই সুরজাদুতে। তার স্ত্রী সুন্দরী বনপরী ইউরিদাইস। দেবতা আরিস্তিউস একদিন তাকে কামনা করলে পলায়নরতা ইউরিদাইস অরণ্যপথে সর্পদংশনে মারা যান। শোকার্ত অরফিয়ুস তার বীণা বাজিয়ে পাতালের রাজা-রানিকে সন্তুষ্ট করে ইউরিদাইসকে মর্ত্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পথে, শর্তের কথা হঠাৎ ভুলে, পাতালপুরী শেষ হওয়ার আগেই, ক্ষণিকের দুর্বলতায় ইউরিদাইসের দিকে তাকালে চিরতরে হারান ইউরিদাইসকে। অরফিয়ুসের সার্থকতাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত। তার নিয়তি বিনাশপন্থী। দিয়োনিসুসের ভক্তরা, তাদের দেবতার কুৎসা গাওয়ায়, অরফিয়ুসকে একদা হত্যা করে দেহ খণ্ড খণ্ড করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। অরফিয়ুসের ছিন্নমস্তক গান গাইতে গাইতে সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে থাকে। অরফিয়ুস বিনাশী কিন্তু শিল্পকে করে তোলেন মহিমান্বিত। যেন শিল্পের জন্যই তার জীবন।

অরফিয়ুসের ভেতর কি কাজ করেছিল আত্মহননবোধ? অরফিয়ুস বিনাশিত হতে চেয়েছিলেন। তার গভীর মনের ভেতর কাজ করেছিল ধ্বংসকাম। এই আদিবিনাশিতাকেই বহন করেন অরফিক কবিরা। অরফিয়ুসের ভেতর কাজ করেছিল যে ধ্বংসকাম, তাকে বলা যায় মৃত্যুর আচ্ছন্নতাবোধ (অবসেশন), যার থেকে জন্ম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেয় "আচ্ছন্ন আত্মহত্যা"; যার কোনো কারণ নেই, নেই মৃত্যুবরণ করার কোনো যুক্তিসূক্ত, তবু এক "মৃত্যু-আচ্ছন্নতা"য় তাড়িত ছিলেন অরফিয়ুস। কবিদের ভেতরেও সুপ্তভাবে ক্রিয়াশীল থাকে এই "আবেশিত আত্মহত্যাস্পৃহা"। একে বলা যায় "স্বয়ংক্রিয়" বা এক "প্রাণন আত্মহত্যাবোধ" যা ঠিক কার্যকারণ ছাড়াই অনির্দিষ্টভাবে, অরফিয়ুসের মতোই, ক্রিয়াশীল থাকে কবিদের ভেতর। হয়তো তা সুপ্ত বা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থাকে বিচ্ছিন্নতা, বিষাদবায়ু, খেদোন্মত্ততা, মতিভ্রম, বিকার ইত্যাদি উপসর্গের সাথে। কবির অতলান্ত অবচেতনে আত্মবিনাশের বীজ উপ্ত। তা ডালপালা ছড়ায় বিভিন্নভাবে। এই বিনাশ নিজেই ঠিক করে তার আঙ্গিক ও শৈলী।

কবির অবচেতনে এভাবেই জাগ্রত হয় আত্মকাম ও আত্মবিনাশের রূপ। এই দুই প্রত্নবৈশিষ্ট্য পাশাপাশি থাকে এবং একপর্যায়ে প্রথমটি পরেরটির সম্পূরণ ঘটায়। আত্মপ্রেমের জোয়ারে সৃষ্টি হয় মহৎ কবিতার, আর আত্মবিনাশিতা কবি-অস্তিত্বকে আঘাত করে। কবি হয়ে উঠতে পারেন আত্মঘাতী। কবির জীবন এই উভবলতার এক অনিঃশেষ আধার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু ও যৌক্তিক আত্মহত্যা: ইভান ইলিচ ও কিরিলোভ

কেউই বিরক্ত করবে না এমন জায়গায়
আমি চলে যাব। একটু
একা থাকতে চাই।

তলস্তোয়

জীবনের সমস্ত হিসাবনিকাশ যদি
মিলে যায় তবে ইন্দ্রিয় দমন
করে ধ্যানে মগ্ন হওয়া ছাড়া আপনার আর
কী করার থাকে?

দস্তইয়েফ্‌স্কি

যা-ই হোক, এ তো জানা বিষয় যে একই ভাব
প্রযুক্ত থাকে, কিন্তু *দ্য পোজেজ্‌ড*-এর
কিরিলোভ, অতি আশ্চর্যজনক
সাধারণত্বের সাথে, একইভাবে যৌক্তিক
আত্মহত্যার ওকালতি করে।
প্রকৌশলী কিরিলোভ কোথাও ঘোষণা
করে যে সে-তার জীবনকে নিতে
চায় কারণ এটা "তার ধারণা"।
স্পষ্টতই শব্দটিকে তার আসল অর্থে
গ্রহণ করতে হয়। এক ধারণা, এক চিন্তার,
যার জন্য সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়।
এটা এক উন্নত আত্মহত্যা।

আলব্যের কাম্যু

"কখনও কখনও অনন্ত বিষাদে মন ভরে ওঠে যখন দেখি একজন মানুষ পৃথিবীতে সম্পূর্ণত একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছে।"[১]—বলেছেন কিয়ের্কেগার্দ। কিয়ের্কেগার্দ পর্যবেক্ষণ করেছেন সত্তার এক সামগ্রিক অবস্থাকে, যার ওপর নির্ভর করে থাকে যাবতীয় দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য। বস্তুত যে-কোনো ধরনের আত্মহত্যার সাথে অনেক সময়ই গুরুত্বপূর্ণভাবে জড়িয়ে থাকে একাকিত্ব, বিষাদ বা হতাশা, যা ব্যক্তির বিলীয়মান সত্তাকে আরও ঢালুতে প্রবেশে সহায়তা করে। ব্যক্তি ধীরে অসম্পৃক্ত হয়ে ওঠেন এবং বিশ্লিষ্ট হতে হতে লক্ষ্যের দিকে চলে যান। কিন্তু এই উদ্ভূত হতাশা কি কোনো স্থায়ী

~ www.amarboi.com ~

অবস্থা? *নোটবুক*-এ কাম্যু এক হতাশাগ্রস্তকে লেখা চিঠিতে বলেন, "হতাশা এক উপলব্ধি, কোনো স্থায়ী অবস্থা নয়।"[২] কাম্যু আরও বলছেন, "বিষণ্ণতাকে দূরীভূত করার আমাদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু মারাত্মক ও কঠিন জিনিসের বিষয়ে আমাদের অভিরুচিকে ধ্বংস করতে হবে। বন্ধুতা নিয়ে আমাদের সুখী হতে হবে, জগতের সাথে ঐকতানবদ্ধ হতে হবে, আর এমন এক পথ অনুসরণ করে সুখ অর্জন করতে হবে, যা কখনোই মৃত্যুর দিকে আমাদের ধাবিত করবে না।"[৩] এ হলো বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র, কাম্যু আশাবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে এ কথাগুলো বলেছেন। কাম্যু বোঝাতে চেয়েছেন—দৃষ্টিভঙ্গি আর জীবনকে একাকার করা যাবে না, বরং দুটি নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। দৃষ্টিভঙ্গি জীবনেরই অংশ, তা হয়তো জীবনকে কখনও কখনও গভীরভাবে প্রভাবিত করে, কিন্তু জীবনকে সরিয়ে দিতে পারে না। কাম্যুর কথার সাথে মিল আছে কিয়ের্কেগার্দ কথিত নান্দনিক হতাশার। হতাশা নিশ্চয় এক উপলব্ধি কিন্তু তা যদি স্থায়ী ও প্রত্যাবৃত্ত ধরনের হয় তবে তার থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী? ক্ষণস্থায়ী হতাশা থেকে আত্মহত্যার উদ্ভাসনের প্রান্তভূমিটিই বা কতটুকু জায়গা দখল করে রাখে? ভলত্যের *কাঁদিদ*-এ এ প্রশ্নটি তুলেছেন, নিজের অস্তিত্বকে অভিশাপ মনে করা আর একই সাথে তাকে আঁকড়ে থাকা—এর চেয়ে মূর্খতা আর কী আছে?[৪] তিনি বলতে চেয়েছেন, অস্তিত্ব অবহনীয় হলে তা থেকে নিষ্কৃতি লাভই আস্তিত্বিক-মঙ্গল। কারণ অস্তিত্ব নিজেই যদি প্রবাহিত হতে না চায় তাহলে কী করে তার প্রবহমানতাকে বজায় করা যায়? আস্তিত্বিক বিলুপ্তি তখন জীবনের দায়, যার সাথে জীবনও বিলুপ্ত হয়।

আশাবাদিতা আর আশাহীনতা—জীবনের এই উভবল পরিস্থিতি একটি দ্বিপ্রান্তীয় সূত্রকেই উপস্থাপন করে যাতে দোল খায় প্রতিটি মানুষ। কিন্তু বিষাদ মূলত আধুনিক মানুষের আবিষ্কার। আধুনিক মানুষের এক দুরারোগ্য ও অনির্ণীত অসুখ হলো বিষাদ বা নৈরাশ্য। মানুষ একে শুধু অনুধ্যানই করে না, লালনও করে, ফলে আধুনিক মানুষের জীবনে নৈরাশ্য অধিকতর ব্যাপ্তি নিয়ে হাজির হয়। নৈরাশ্য হয়তো এক ঋণাত্মক মহনীয়তা, আর তাকে শিরোধার্য করেই সত্যে উপনীত হতে হয়। আধুনিক মানুষের জীবনে নৈরাশ্য এক বিবেচিত অবস্থাও।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে জন-ইতিহাস কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে সাহিত্য ও শিল্প তার ভিত্তি খুঁজতে শুরু করেছে ব্যক্তির আত্মচেতনাতে; ব্যক্তির দুঃখ বা বিষাদের অন্বেষণ হয়ে উঠেছে এর প্রধান অবলম্বন। মহৎ সাহিত্য তা-ই, যাতে প্রতিফলিত হয় গভীর বেদনা। আর এভাবেই প্রতিস্বের আবিষ্কার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে সাহিত্যে। বোদল্যেরের কবিতা বিষয়ে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাই বলেছেন এক অসাধারণ কথা:

> কেউ নেই যে চৈতন্যের দ্বারা আক্রান্ত ও পীড়িত নয়, ভাবনা যা অন্ত্রে-তন্ত্রে দংশন করেনি, কিংবা যার বিবেকের ভার প্রতিভূ-কবি বহন করছেন না। মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী; মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী, মানুষ রুগ্ন কিন্তু সে জানুক সে রুগ্ন; মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> মুমূর্ষু, এবং সে জানুক সে মুমূর্ষু; মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী, এবং সে জানুক সে অমৃতাকাঙ্ক্ষী বোদলেয়ারের সমগ্র কাব্যে, যেমন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে, এই বাণী নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে। সকলে জানবে না, জানতে পারবে না বা চাইবে না; কিন্তু কবিরা জানুন। এই জ্ঞানই আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান।[৫]

বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার হলো এই দুঃখবোধ যার প্রাথমিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বোদল্যের, দস্তইয়েফ্‌স্কি এবং তারও আগের রোম্যান্টিকদের দ্বারা। মৃত্যুদীর্ণতার কথা বলেছেন তাঁরা, আমিত্বের কথা বলেছেন তাঁরা; প্রকৃতির অবিভাজ্য ব্যাপ্তি ও উপস্থিতির ভেতর মানুষের অন্তর্গত সত্তার ঈষৎ বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন তাঁরা। ফলত শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশিত হতে শুরু করল, স্ফটিকায়িত হলো নবতর চিৎপ্রকর্ষ যা ব্যক্তির বিষণ্ণতার গানকে ধ্বনিত করে তুলতে থাকে নতুনভাবে। গ্যোয়েটে ১৭৭৪ সালে প্রকাশিত তাঁর *তরুণ হের্বেটের দুঃখ* উপন্যাসে বলেছেন এই অকারণ দুঃখবোধের কথা, যাতে তিনি নিজেও ছিলেন আক্রান্ত। তিনি বলেছেন: "জীবনে একদিনের জন্য আমি সুখী হতে পারিনি।"[৬] এমনকি তলস্তোয়, যিনি ছিলেন মনেপ্রাণে খ্রিস্টান-ধার্মিক, তিনিও অধিকৃত ছিলেন এই নৈরাশ্যের বিষাদে; জীবনের পঞ্চাশ বছর বয়সে মুখোমুখি হয়েছেন আত্মহনন-তাড়নায়, স্পৃষ্ট হয়েছেন এতে। তাঁর এই অবস্থাকে দীর্ঘভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন *স্বীকারোক্তিতে*, নির্মোহ ও পরিতাপহীনভাবে:

> সত্য কথা এই যে, আমার নিকট জীবন হয়ে পড়ল মূল্যহীন। জীবনের প্রতিটি দিন, তার প্রতিটি পদক্ষেপ, আমাকে খাড়াচূড়ার ধারে এনে দাঁড় করায়, যেখান থেকে আমি পরিষ্কার দেখতাম আমার চূড়ান্ত পতন। দাঁড়িয়ে পড়ার পর পশ্চাদপসরণ করা একেবারেই অসম্ভব; নতুবা পারতাম চোখ বন্ধ করে রাখতে যাতে আমার জন্য একক অপেক্ষমাণ ভোগান্তিকে দেখতে না হতো, ...অতএব আমি, একজন স্বাস্থ্যবান এবং সুখী মানুষ, অনুভব করতে বাধ্য হলাম যে আমি আর বাঁচব না, উপলব্ধি করলাম যে এক অমোঘ শক্তি আমাকে কবরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি না যে আমার আত্মহত্যার ইচ্ছা ছিল। যে শক্তি আমাকে জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তা শক্তিশালী, পূর্ণ এবং অভীপ্সা থেকে অনেক বেশি ফলাফল নিয়ে বিবেচিত হতো; এটা আমার পূর্বতন জীবনসংশ্লিষ্টতার মতোই এক শক্তি, কেবল বিপরীত দিকে ধাবিত। স্বাভাবিকভাবেই আত্মহত্যার চিন্তা আমার মধ্যে এসে পড়ত যেমন আগে আসত জীবনের শুভ বিষয়াদি। এটা আমার নিকট এমনই আকর্ষণীয় মনে হতো যে আমি এক আত্ম-প্রবঞ্চনার নমুনাকে অভ্যাস করতে বাধ্য হতাম, যেন খুব তাড়াতাড়ি আত্মহত্যা করতে না হয় তার জন্য। আমি খুব তাড়াতাড়ি সম্পাদনে অনাগ্রহী ছিলাম, কারণ এই যে আমি প্রথমত আমার চিন্তাভাবনার জটগুলোকে দূর করতে চাইতাম, এবং তা একবার হয়ে গেলেই, আমি নিজেকে হত্যা করতে পারব! আমি ছিলাম সুখী, তবু আমি একটি তারকে আমার পড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> ঘরের কাপবোর্ডের ভেতর লুকিয়ে রাখতাম যাতে ফাঁসি দিতে প্ররোচিত না হই সেই জন্য, সেখানে আমি প্রত্যেক সন্ধ্যায় একা নগ্ন হতাম, আর বন্দুক সাথে নেওয়াও বন্ধ করে দিতাম, কারণ তা-ও জীবন থেকে অব্যাহতি নেওয়ার সহজ রাস্তা দেখাতে পারে। আমি কী চাই তা আমি জানতাম না; জীবন নিয়ে আমি ছিলাম ভীত, হয়তো এমন কোনো কিছু ছিল যা আমি জীবনের কাছে প্রত্যাশা করতাম।[৭]

শুধু এতটুকুই নয়, *স্বীকারোক্তি*র পাতায় পাতায় ধ্বনিত হয়েছে এই শূন্যতা, অর্থহীনতা ও আত্মহত্যার কথা। নানা বিষয়ে, নানা দার্শনিকদের প্রয়োজনীয় উক্তিকে উদ্ধৃত করে তলস্তোয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তাঁর জাগ্রত আকাঙ্ক্ষার কথা। চতুর্থ অধ্যায়ের উপর্যুক্ত বর্ণনার পরপরই তিনি লিখেছেন আত্মহত্যার কথা, আরও দ্ব্যর্থহীনভাবে

> এটা ছিল ভয়ংকর। আর এই ভীতি থেকে নিজেকে রেহাই দেবার জন্য আমি নিজেকে ধ্বংস করতে চাইলাম। আমি এই অপেক্ষমাণ ভয়ংকরকে অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝলাম আর জানলাম, এই ভয়ংকর আমার বর্তমান অবস্থা থেকেও খারাপ কিছু, কিন্তু তবু আমি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারছিলাম না।... অন্ধকারের এই ভয়ার্ততা ছিল অতি বিশাল আর আমি এ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলাম ফাঁস অথবা বুলেট দিয়ে। এটা ছিল সেই উপলব্ধি যা আমাকে দারুণভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল আত্মহত্যায়।

জীবনের অর্থহীনতার কথা বলেছেন তলস্তোয় তাঁর স্বীকারোক্তিতে। তিনি বলেছেন, জীবনের কোনো মানে নেই, বিষয়টি শুধু মনে এলে তা নিয়ে হয়তো জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, একজন মানুষ যে জানে যে সে এমন বনে বসবাস করে যার থেকে কোনো বেরোবার পথ নেই, এবং ব্যাপারটি এমন হলে তাঁর পক্ষে বাস করা সম্ভব হতো, কিন্তু তলস্তোয় বলছেন তাঁর অবস্থা এমন একজনের মতো যে রাস্তা হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত, এবং যে বেরিয়ে যেতে চাইছে কিন্তু কোনোভাবেই বের হতে পারছে না। এরই অনুবৃত্তিতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে সোক্রাতেসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলছেন, শরীরকে নিয়ে এই যে জীবন তা মন্দ ও মিথ্যা, অতএব তার ধ্বংসসাধন এক আশীর্বাদ, এবং আমাদের এই ইচ্ছা পোষণ করা উচিত। এরই উপসংহারে তিনি বলছেন—সুখী সে-ই যে এখনও জন্মায়নি, জীবনের চেয়ে মৃত্যু ঢের ভালো, প্রত্যেকেরই উচিত জীবন থেকে মুক্ত হওয়া।

সুতরাং পথ তৈরি হচ্ছিল এবং এভাবেই মৃত্যুময়তার আরেক বর্ণনায় তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর এই আত্মভাবনার শৈল্পিক উপস্থাপনা আমরা দেখতে পাই তাঁর আরেক গল্পে, যা বিশ্বসাহিত্যে এক অনবদ্য ও উদ্ভাসিত সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গল্পটির নাম "ইভান ইলিচের মৃত্যু"। একজন সাধারণ মানুষ, পেশায় সরকারি অভিশংসক, তার জীবন ও মৃত্যুর কাহিনি অসাধারণ দক্ষতায় ও অভূতপূর্ব মাধুর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তলস্তোয় এই গল্পে। ইভান ইলিচ চিন্তাহীন, উদ্দেশ্যহীন, ধার্মিকতাহীন বা আধ্যাত্মিকতাহীন এক ব্যক্তি, হঠাৎ এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়ে যখন মৃত্যুর মুখোমুখি, তখন তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে পৃথিবী থেকে তার চলে যাবার সময় এসে গেছে। তিনি ছিলেন পরিবারের প্রভু, এখন তিনি সেই পরিবারের সবার এমনকি ভৃত্যটির নিকটও কৃপাপ্রার্থী। তার মৃত্যু, তার নিকট মনে হয় অত্যন্ত তুচ্ছ—কীট-পতঙ্গের মৃত্যুর মতো। যখন তার মৃত্যু হয় তখন তিনি বিচারকমণ্ডলীর সদস্য, বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। সাধারণ ও স্বাভাবিক মানুষের মতোই তিনি ছিলেন পাপ-পুণ্যবোধের রসে আত্মগ্লানিতে ভোগা এবং তার থেকে রক্ষা-পাওয়া একজন। বিবাহিত স্ত্রীর সাথে "অত্যন্ত জটিল ও কঠিন" দাম্পত্য-জীবন সত্ত্বেও সবই চলছিল খুবই সুন্দর—পদোন্নতি, সন্তান, ফ্ল্যাট ইত্যাদি মিলে "সবকিছু চমৎকার"। কিন্তু হঠাৎই ছন্দপতনের সুর বেজে উঠল তার জীবনে: তিনি অসুস্থ হয়ে যেতে লাগলেন। প্রথম প্রথম আগত অসুস্থতাকে পাত্তাই দিতে চাইলেন না তিনি, ভাবলেন, এসব দু-দিনেই সেরে যাবে। কিন্তু সমস্ত চিকিৎসাকে ব্যর্থ করে রোগ তাকে ক্রমশ চেপে ধরতে লাগল। একসময় মৃত্যুচেতনা খুবই কঠিনভাবে তার মধ্যে দেখা দিল; তিনি বিমূঢ় হয়ে ভাবলেন: "আমার অস্তিত্ব আর থাকবে না। কী করব? কিছুই না। অস্তিত্ব শেষ হলে কোথায় যাব আমি? সত্যিই কি এটা মরণ? না, মরতে আমি চাই না।"[৮] তিনি বুঝলেন যে তিনি মরতে চলেছেন। কিন্তু তিনি তা মেনে নিতে পারছেন না: "অন্তরের গভীরে তিনি জানতেন যে মরতে চলেছেন, কিন্তু সেটা মেনে নিতে পারছেন না ; শুধু তা নয়, ওটা বুঝতে পারলেন না, কোনোক্রমে বুঝলেন না।"[৯] মৃত্যুকে নিজের জীবনের ঘটিত বিষয় হিসেবে তিনি কখনও ভাবেননি, তিনি ভেবেছেন এটা অন্যের জীবনের বিষয়। এইভাবে তিনি দেখলেন, তাকে ঘিরে যেসব মানুষ আছে, তারা তার দ্রুত মৃত্যুই কামনা করছে ...রোগের তৃতীয় মাসে কেমনভাবে স্ত্রী-পুত্র কন্যা, চাকরবাকর, বন্ধুবান্ধব, ডাক্তার এবং ইভান ইলিচের নিজের কাছে ধরা পড়ল যে তাঁর বিষয়ে অন্যদের শুধু একটামাত্র ঔৎসুক্য আছে—সেটা হলো কখন তার চাকরিটা খালি হবে, তাঁর উপস্থিতির ভার থেকে মুক্ত হবে জলজ্যান্ত লোকগুলো, কখন নিজের দুর্ভোগ থেকে ছাড়া পাবেন তিনি নিজে।"[১০] এত কষ্ট, এত স্ত্রী-স্বজনাদির ঔদাসীন্যের মাঝে চাকর গেরাসিমের স্বার্থহীন সেবা তাকে মুগ্ধ করে। তিনি হয়ে ওঠেন নিঃসঙ্গ, একা: "কাঁদলেন নিজের অসহায়তার জন্য, নিজের ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার জন্য, লোকজন আর ঈশ্বরের হৃদয়হীনতার জন্য, ঈশ্বরের অনুপস্থিতির জন্য।"[১১] খুব ভয়াবহ অবস্থা তার, তার চেতনা ঈশ্বরকে দোষারোপ করছে: কেন তুমি এরকম করলে? কেন এনেছ আমাকে এ পৃথিবীতে? "হায়, কী করেছি আমি যার জন্য আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ এমন করে।"[১২] তিনি জানেন, এ জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর নেই। নিজের আসন্ন মৃত্যুকে ন্যায়সংগত ভাবতে গিয়ে তিনি পাগল হয়ে উঠলেন। সবার মাঝে থেকেও এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতায় তিনি ডুবে যান: "দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সোফায় শুয়ে নিজের নিঃসঙ্গতার শেষ ক'টা দিনে, জনমুখর শহরের মধ্যে নিজের সব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ের মাঝে নিঃসঙ্গতায়, সমুদ্রের তলে বা পৃথিবীতে, কোনও যার চেয়ে গভীর নিঃসঙ্গতা থাকতে পারে না,—সেই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা শেষ ক'টি দিনে ইভান ইলিচ বেঁচে ছিলেন শুধু

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতীতকে নিয়ে।"[১৩] আর এই নিঃসঙ্গতার অভিব্যক্তি ঘটে তার স্ত্রীর উপস্থিতিতে, তিনি যখন তার স্ত্রীকে চলে যেতে বলেন: "চলে যাও! চলে যাও! একলা থাকতে দাও আমায়!"[১৪] এভাবেই ইভান ইলিচের মৃত্যু এসে যায়, মৃত্যুর মাধ্যমেই তার অন্তিম ভাবনা হয় যে "মৃত্যু আর নেই।"

তলস্তোয় কী অসাধারণ ভাষায় উন্মোচন করেছেন ইভান ইলিচের মৃত্যু, যে প্রথমত মানতেই পারছিল না এত লোক বেঁচে থাকতে কেন, কেনইবা তাঁর মৃত্যু হবে। মৃত্যু কীভাবে নিঃসঙ্গ করে তোলে একজন সুখী সামাজিক মানুষকে, আর মৃত্যুমুখী মানুষ কীভাবে ঈশ্বরকেও সন্দেহ বা অস্বীকার করে বসে, তার এক ভয়াবহ ও অরন্তুদ অবস্থার বিবরণ দেন তলস্তোয় এই গল্পে, যা বিশ্বসাহিত্যে সৌন্দর্য ও অভিজ্ঞানে আজ অব্দি অনুপম হয়ে আছে।

আমরা দেখি, গল্পটি তলস্তোয় লেখেন ১৮৮৬ সালে যখন তাঁর বয়স ৫৮ বছর। এর আগেই ১৮৮৪ সালে বেরোয় তাঁর *স্বীকারোক্তি* যা রচিত হয়েছিল ১৮৭৯-৮০ সময়ে। তাঁর আগে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মহত্যাকেন্দ্রিক উপন্যাস *আনা কারেনিনা* যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ। পরিলক্ষিত হয়, এই লেখাগুলো সমভাবের যখন একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা তাঁর ভেতর কাজ করছিল হাত-ধরাধরি করে। *স্বীকারোক্তিতে* তিনি যে স্বাস্থ্যবান সুখী মানুষের কবরে যাওয়ার কথা বলছেন, তার সাথে ইভানের জীবনের মিল রয়েছে। ইভানও ছিল সুখী প্রাণবন্ত: "এইভাবে জীবন যাপন করতে লাগলেন তাঁরা। এইভাবেই সবকিছু চলল অপরিবর্তিত, সবকিছু চমৎকার।"[১৫] কিন্তু তবু এই "চমৎকারের" মধ্যে মৃত্যু দেখা দেয়। *স্বীকারোক্তিতে* তলস্তোয় নিজের জীবন সম্পর্কে বলেছেন, "যে শক্তি আমাকে জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা শক্তিশালী, পূর্ণ, এবং অভীপ্সা থেকেও অনেক বেশি ফলাফল নিয়ে বিবেচিত,"—ইভানের জীবনেও এই শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণের ফলাফল দেখছি। ইভান চিন্তা করেন "সত্যি, জীবন ছিল বটে এককালে, এখন সেটা চলে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে, রোখার সাধ্য নেই আমার।"[১৬] রোখার সাধ্য নেই, এমনই তার শক্তি। *স্বীকারোক্তিতে* তলস্তোয় ভাবেন জীবন মূল্যহীন আর ইভান ইলিচও তা ভাবে, তবে অন্যভাবে: "কোনো অর্থ নেই! যন্ত্রণা, মৃত্যু... কেন?"[১৭]

আসলে তলস্তোয় এমন জীবনের কথাই বলতে চেয়েছেন যা বস্তুত জীবনকেই ব্যঙ্গ করছে। অর্থহীন জীবনকে নিয়ে দীর্ঘ জীবনের বা মৃত্যুচিন্তাহীন জীবনের স্বপ্ন মূলত তার অন্তঃসারশূন্যতাকেই উদোম করে দেখায়। ইভান ইলিচও যে মৃত্যুচিন্তায় কাতর হয়ে উঠেছিলেন, মৃত্যুমুহূর্তে অনুভব করেন যে সেই ভয় আর নেই: "কোথায় মৃত্যু? মৃত্যু জিনিসটা কী? কোনো প্রকারের ভয় নেই একেবারে, কেননা মৃত্যুই নেই।"[১৮] মৃত্যুর ধ্রুব রূপকে দেখাতে চেয়েছেন তলস্তোয় এই গল্পে, যা তাঁর *স্বীকারোক্তির* আত্মভাবনারই আরেক প্রতিফলন যেখানে পিওৎর ইভানভিচ ইভান ইলিচের শবদেহ দেখে, আর মনে হয় "আরো একটা জিনিস রয়েছে মুখের ভাবে—জীবিতদের প্রতি ভর্ৎসনা বা হুঁশিয়ারী।"[১৯]

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতএব যে ধারা শুরু হলো তা অবশেষে আরও দার্ঢ্য হয়ে উঠল। বিষাদ হয়ে উঠল জীবন ও শিল্প। আলভারেজ বলেছেন, শিল্পের নতুন ও স্থায়ী অবস্থা হলো বিষাদ।"[২০] কিন্তু আরও একটু পেছনে যাওয়া যেতে পারে এক্ষেত্রে। তলস্তোয় যে-নৈরাশ্যের ছবি এঁকেছেন, তারই সমবিস্তারী ছবি আমরা দেখতে পাই আরেক জনের লেখায়; তিনিও ছিলেন গভীরভাবে খ্রিস্টান, এবং তলস্তোয়ের মতোই ছিলেন অনেকটা প্রতিষ্ঠান ও চার্চের বিরুদ্ধভাবাপন্ন। তিনি হলেন সোরেন কিয়ের্কেগার্দ। প্রথমবারের মতো বিষাদ নিয়ে তিনি তাঁর *জার্নাল্স্*-এ বলেন:

> পুরো যুগকেই ভাগ করা যায় যারা লেখে আর যারা লেখে না—এই দুই ভাগে। যারা লেখে তারা নৈরাশ্যকেই উপস্থাপন করে। আর যারা পড়ে তারা তাকে বাতিল করে আর বিশ্বাস করে যে তাদের রয়েছে এক উন্নত প্রজ্ঞা, আর যদি তারা লিখতে সক্ষম হতো, তারা একই কথা লিখত। বস্তুত তারা সবাই একই সমান নৈরাশ্যবাদী।
>
> কিন্তু যখন একজন তার হতাশাকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সুযোগ পায় না, তখন হতাশার সমস্যা ও তার উপস্থাপনা কম মূল্যবান হয়। এটা কি এই যা দিয়ে নৈরাশ্যকে জয় করা যায়?[২১]

আইদার/অর গ্রন্থে এই স্থায়ী বিষণ্ণতার কথা তিনি প্রথমে বলেছেন:

> মনকে উৎফুল্ল করতে পারে না মদ; অল্প মদ্যপানেই আমি বিষণ্ণ হয়ে পড়ি, বেশি খেলে বিষাদাক্রান্ত হই। আমার আত্মা দুর্বল ও ফ্যাকাশে; অর্থহীনভাবেই আনন্দকে জাগানোর জন্য আমি পার্শ্বদেশে খোঁচা মেরে উত্তেজিত করি, তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, আনন্দ জেগে ওঠে না রাজকীয় রূপে। আর এভাবেই আমার সমস্ত অধ্যাসের সমাপ্তি। মিথ্যাভাবেই আমি আনন্দের অন্তহীন সমুদ্রে নিমজ্জিত করি নিজেকে: আনন্দকে বাঁচাতে পারি না।... আমি চিরকালের মতোই একাকী: —পরিত্যক্ত।[২২]

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিয়ের্কেগার্দ জন্ম দিচ্ছেন বিষাদের, এবং শুধু তাই নয়, উপস্থাপন করেছেন এর সূত্রও। তলস্তোয়ের মতো খ্রিস্ট-বিশ্বাসী লেখকের মধ্যে যে নৈরাশ্য, যে আত্মহত্যাস্পৃহার জন্ম হয়েছিল, তার স্বরূপকে চিহ্নিত করতে হলে আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে কিয়ের্কেগার্দের সেই সূত্রটির। ১৮৪৯ সালে কিয়ের্কেগার্দ লেখেন *দ্য সিকনেস আনটো ডেথ* যাকে বলা যায় "নৈরাশ্যপুরাণ", কারণ আধুনিক নিরাশা, হতাশা, উদ্দেশ্যহীনতা থেকে উদ্ভূত ঈশ্বরহীনতার পরিণাম বিষয়ে কিয়ের্কেগার্দ এই গ্রন্থে আলোকপাত করেন। কিয়ের্কেগার্দ বলছেন, আশার অপূর্ণতার থেকে যে হতাশা দেখা দেয় তা মুখ্য নয় বরং ব্যক্তির অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে যে-অভিঘাত পুঞ্জীভূত হয় সেটাই প্রধান বিষয়। ঘটনার সমাপ্তিতে নয়, বরং নৈরাশ্য তীব্র হয়ে ওঠে ঘটনার ফলাফলে ব্যক্তির অবস্থার যে পরিবর্তন হতে পারত, তা হয় না বলে। মৃত্যু যখন কাম্য তখন মৃত্যু আসে না, অন্যদিকে জীবন অসহনীয়, এই অবস্থায় হতাশা নতুন মাত্রা পায়। গ্রন্থের "হতাশার রূপ" আলোচনায় কিয়ের্কেগার্দ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হতাশাকে দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেন: নেতিবাচক ও ইতিবাচক। নেতিবাচক নৈরাশ্যবাদ হলো স্থির ও অনগ্রসর, এক্ষেত্রে ব্যক্তি উক্ত হতাশাকে নিয়েই টিকে থাকে; আর ইতিবাচক নৈরাশ্যবাদ ঈশ্বরে অবিশ্বাস থেকে উত্থিত, যা দীর্ঘপরিণামী হয় এবং যা মানুষকে তার নিজ সত্তার দিকে পরিচালিত করে। তলস্তোয় তাঁর *স্বীকারোক্তিতে* যে নৈরাশ্যের কথা বলেছেন তা ছিল ইতিবাচক নৈরাশ্যবাদ কারণ তা আত্মঘাতী প্রবণতা সৃষ্টি করেছিল তাঁর মনে। আবার সাধারণ হতাশা নেতিবাচক নৈরাশ্যবাদের শ্রেণিতে পড়ে, কারণ তা একরৈখিক ও ক্ষণস্থায়ী। ব্যক্তির যাপিত জীবনের অন্ধগলিতে তা একসময় পথ হারায়। অথবা জীবনের সাথে এক মিলনধর্মী সহবাসে সে বেঁচে থাকে, বংশবিস্তার না করেই। তা হয় না আত্মঘাতী। কিন্তু ইতিবাচক নৈরাশ্যবাদ অভিঘাতসম্পন্ন, তা আত্মঘাতী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ব্যক্তির ভেতরে—কারণ তা অগ্রসরধর্মী ও সঞ্চারমান।

সুতরাং হতাশা বা বিষাদ আধুনিক সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠার ব্যাপারটি আপতিক নয়। দস্তইয়েফ্স্কি ও তাঁর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের মধ্যে এক সামগ্রিক সৃষ্টিশীল শক্তি হিসেবে এর দেখা মেলে। প্রথাগত যে-ধারণা শিল্প সম্পর্কে বিরাজমান ছিল, তা ধসে নতুন প্রতি-ভাবনার সূত্রপাত ঘটে গেল। দেখা দিল আত্ম-ভাবনার সাহিত্য। আলভারেজ বলেছেন, "যদি শিল্পের নতুন বিবেচনা হয় আত্মন, তাহলে শিল্পসম্পর্কিত চূড়ান্ত বিবেচনা, অপরিহার্যভাবেই হলো আত্মার সমাপ্তি; তার মানে, মৃত্যু।"[২৩]

কিন্তু এটা কি নতুন কিছু? আলভারেজ বলেছেন, "সম্ভবত পৃথিবীর অর্ধেক সাহিত্যই হলো মৃত্যুবিষয়ক।"[২৪] যুগ যুগ ধরেই মৃত্যু জায়গা নিয়ে আছে পুরাণে, সাহিত্যে, কাব্যে, ইতিহাসে। কিন্তু যা নতুন তা হলো গুরুত্ব ও পরিপ্রেক্ষিত, এবং এর ব্যাপ্তি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে মানুষ ছিল মৃত্যু দ্বারা আচ্ছন্ন এবং পুরোপুরি মৃত্যুর ক্রীড়নক। তারা মনে করত, মৃত্যু হলো স্বর্গের দরজা—শাশ্বত ও অনন্ত জীবনে গমনের টিকিট। জীবন মূল্যহীন, তা হলো এক ক্ষণস্থায়ী আবাসস্থল। এখানে থাকতে হয় মুসাফিরের মতো। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে দার্ঢ্য হওয়া আধুনিক চিন্তায় মৃত্যু পরকালহীন প্রপঞ্চ হিসেবে আবির্ভূত। পৃথিবীতে তার জীবন পরকালের প্রতিশ্রুতিহীন জীবন, ঈশ্বরহীন জীবন। কাম্যুর "আগন্তুক" মারসোল ভাবে:

> কোনো কিছুরই ন্যূনতম গুরুত্ব ছিল না এবং কেন তা আমি জানি। ওই ব্যক্তিও জানত, কেন। আমার ভবিষ্যতের অন্ধকার দিগন্ত থেকে একটা মৃদু বাতাস অবিরত আমার দিকে বয়ে আসছে, আমার সমস্ত জীবন ধরে এটা এসেছে, যে বছরগুলো আসবে, সেগুলো থেকেও। আর তার পথে সেই বাতাস সে সমস্ত ধারণাগুলো লোকে আমার ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে সেগুলোকে সমতল করে দিয়েছে আর তা ঘটেছে আমার সমানভাবে অবাস্তব সেই বছরগুলোতে, যার মধ্য দিয়ে আমি বেঁচেছি। এগুলো আমার ক্ষেত্রে কি পার্থক্য ঘটাতে পারত, অন্যদের মৃত্যু অথবা একজন মায়ের ভালোবাসা অথবা তার ঈশ্বর।[২৫]

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আগন্তুক উপন্যাসের নায়ক মারসোল পাদরির হাত থেকে বাঁচার জন্য এভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে, কারণ তার জীবনে পাদরির প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল না দোষ-স্বীকারের, কারণ, তার ভাষায়: "আসলে আমি নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলাম, সব কিছু সম্বন্ধে ওর থেকে বেশি নিশ্চিত ছিলাম। আমার বর্তমান জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলাম এবং যে মৃত্যু আসছে, তার সম্বন্ধেও তাই।"[২৬] সুতরাং পাদরির সাহায্যের প্রয়োজন পড়েনি তার, কারণ তার জীবন অর্থহীনতার আবহে জাত। এই অর্থহীনতা কখনও বা উপহার দেয় আত্মহনন। আত্মহত্যা যৌক্তিক প্রয়োজন হিসেবে আবির্ভূত হয়। দস্তইয়েফ্স্কির *দ্য পোজেজড্*-এর কিরিলোভ গুলি করে আত্মহত্যা করে, কারণ তা তার বিবেচনায় এক যৌক্তিক আত্মহত্যা। কিরিলোভ ভাবে:

> আমি আমার অবিশ্বাসকে প্রকাশ করতে বাধ্য... আমার জন্য কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই বা এর চেয়ে কোনো উচ্চতর চিন্তাভাবনা নয়... প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরকে আবিষ্কার করে তাঁকে হত্যা না করে তাঁর সাথে বসবাসের জন্য। এখন পর্যন্ত এ-ই হলো সর্বজনীন ইতিহাসের নির্যাস। এই সর্বজনীন ইতিহাসের আমিই একমাত্র মানুষ যে প্রথমবারের মতো ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে অস্বীকার করছে।[২৭]

আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিরিলোভ বাতিল করছে সম্পর্ক ঈশ্বরের সাথে, কারণ সে কোনো বাহ্যিক নীতিতে বিশ্বাসী নয় যা তার আত্মজ্ঞাত বাস্তবতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তার যুক্তি হলো, যদি ঈশ্বর থেকে থাকেন, তাহলে তিনি নিজে পুরাতন বাইবেলের জিহোবার মতো এক বাহ্যিক বাস্তবতা। কিরিলোভের অস্তিত্ববাদী যুক্তি এ ধরনের ঈশ্বরকে বাতিল করে। কিরিলোভ সকল ইচ্ছাকে তার নিজের ভাবে। কিরিলোভ ধ্বংস করেছে চিন্তন-ধাঁধার প্রকৃতি। স্তাভরোগিন যখন বলে যে সবকিছুই ভালো, তখন উত্তরে সে বলে, "কখন তুমি নিজেকে খুঁজে পেলে খুব সুখী হিসেবে?" আত্মহত্যার দার্শনিকতায় চূড়ান্ত বুদ্ হয়ে যায় সে, যাকে সে মনে করে স্বাধীন হওয়ার পথ। দস্তইয়েফ্স্কির এই যৌক্তিক আত্মহত্যাকে কাম্যু বলেছেন এক আধিবিদ্যক অপরাধ। তিনি বলেছেন, "যদি এই আধিবিদ্যক অপরাধ মানুষের পূর্ণতার জন্য যথেষ্ট হয়, কেন তবে যোগ করা আত্মহত্যা? কেন নিজেকে হত্যা করা, স্বাধীনতা জয় করার পর পৃথিবীকে ছেড়ে যাওয়া? এটা স্ববিরোধময়।"[২৮] কাম্যু বলেছেন, এই আধিবিদ্যক অপরাধের যুক্তি একেবারেই নিরর্থক। দস্তইয়েফ্স্কি কিরিলোভকে বিংশ শতাব্দীর চরিত্রে রূপান্তরিত করেন। *দ্য পোজেজড্* লেখার পাঁচ বছর পর তিনি আবার প্রত্যাবর্তন করেন যৌক্তিক আত্মহত্যার ভাবে, তাঁর অসাধারণ লেখা *দ্য ডায়েরি অব আ রাইটার*-এর মাসিক কিস্তি রচনার সময়। ১৮৭৬ সালে মাঝে-মধ্যেই আত্মহত্যার বিষয়ে তিনি আলোড়িত হচ্ছিলেন, হচ্ছিলেন উদ্বিগ্ন। সংবাদপত্র, দাপ্তরিক প্রতিবেদন তন্নতন্ন করে খুঁজে তিনি অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন এ বিষয়ে। ১৮৭৬ সালের অক্টোবর মাসে পিত্‌রবুর্গের সংবাদপত্রে এরকম একটি খবর প্রকাশিত হয়: গতকাল ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল এগারোটার একটু পরে, মস্কো থেকে আসা এক দরজি, নাম তার মারিয়া বোরিসোভা, কুড়ি নম্বর গালেরনিয়াস্তেফ্ সয়ান্নিকফ বাড়ির ছয় তলা থেকে উঁচু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিলেকোঠার জানালা দিয়ে লাফ দেয়।'' পত্রিকায় আরও বলা হয়, সে ছিল অভাবী, ঠিকমতো খেতে-পরতে পারত না। মনিব-পত্নীকে প্রায়ই সে বলত যে তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। একদিন মনিব-পত্নী বাজারে যাওয়ার উদ্দেশে বের হওয়া মাত্রই বোরিসোভা দু-হাতে মাতা মেরির আইকন আঁকড়ে ধরে ঝাঁপ দেয়। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যায় সে। দস্তইয়েফ্স্কি অক্টোবরের '' ডায়েরি অব আ রাইটার''-এ এর বিবরণ দিতে গিয়ে লিখলেন, হাতে আইকন ধরে থাকার ব্যাপারটি অদ্ভুত এবং ঘটনাটি এক ''সমর্পণধর্মী আত্মহত্যা''র নজির। ''দুটি আত্মহত্যা: একজন লেখকের ডায়েরি, অক্টোবর, ১৮৭৬'' নামীয় এ রচনায় তিনি লেখেন: কিছু কিছু ব্যাপারে, তা যত সাধারণই হোক না কেন, যে কেউ দীর্ঘসময় তা নিয়ে চিন্তা করা ছাড়া উপায় থাকে না আর। সেগুলো আপনার চোখের সামনে ভাসতে থাকবে, মনে হবে যেন আপনিই তার জন্য দায়ী। এই সুশীলা নিজের হৃদয়কে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধ্বংস করল, সে কিন্তু সকলের মনেই কষ্ট দিয়ে যাবে।'' অক্টোবরের পরপরই তিনি পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে লেখেন নভেলা *সেই সুশীলা* (ইংরেজিতে *দ্য মিক ওয়ান* বা *দ্য জেন্টল স্পিরিট*)। এই গল্পে দস্তইয়েফ্স্কি স্বামীর মুখ দিয়ে প্রথমবচনে ছুড়ে দেন সেই আত্মহত্যাবিষয়ক চিরমৌলিক প্রশ্ন: ''কিন্তু কেন সে মারা গেল?'' তিনি আরও করলেন সেই আস্তিত্বিক উচ্চারণ, ''আহ্, অন্ধ শক্তি! আহ্, প্রকৃতি! মানুষ এ জগতে একা, সেটাই তো হলো ভয়ানক।'' দস্তইয়েফ্স্কি বারে বারেই এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, আত্মহত্যা অপরিহার্যভাবেই অমরত্বের বিশ্বাসের সাথে বিজড়িত একটি বিষয়। সতেরো বছর বয়স্ক এক বালিকার আত্মহত্যালিপি পড়েও তিনি এ ব্যাপারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন।[২৯] এই বিষয়টি তাঁকে তাড়িতও করেছিল। তিনি ভাবলেন, যদি আত্মা অমর না হয়, যদি মৃত্যু সবকিছুর ওপর যবনিকাপাত ঘটায়, তাহলে জীবনের সবই অর্থহীন এমনকি তাঁর শৈল্পিক কর্মও। *দ্য ব্রাদারস কারামাজোভ* সম্পর্কে বলতে গিয়েও তিনি লেখেন: "এই গ্রন্থের মাঝ দিয়ে যা খোঁজা হলো তা হলো সেই প্রধান প্রশ্ন—'ঈশ্বরের অস্তিত্ব' যার বিষয়ে সচেতন ও অবচেতনভাবে আমি সারাটি জীবন ভুগেছি।"[৩০]

এই তাড়নায়, এই ভয়ংকর সম্ভাবনার বিবেচনায় তিনি *ডায়েরি অব আ রাইটার*-এ বলেন যৌক্তিক আত্মহত্যার কথা যার সারমর্ম হলো, অমরত্ব ছাড়া মানব-অস্তিত্ব যে-কারও জন্যই এক উচ্চারিত নিরর্থকতা। তিনি যুক্তি দেখান:

> আমি আগামীর শূন্যের ভয়ে সুখী হব না বা হতে পারি না।... [তা] গভীরভাবে অবমাননাকর... এখন, অতএব বাদী ও বিবাদী, বিচারক ও অভিযুক্তের নির্ভুল ভূমিকায়, আমি এই প্রকৃতিকে অভিযুক্ত করি, যা অতি অনানুষ্ঠানিক এবং নির্লজ্জভাবে কষ্টের অস্তিত্বে আমাকে নিয়ে আসে, ধ্বংস করতে, আমার সাথে যুক্ত করতে...আর যেহেতু আমি প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে অপারগ, অতএব আমি কেবল আমাকেই ধ্বংস করছি, তা নিষ্ঠুরতাকে সহ্য করার এক ক্লান্তি যাতে কোনো পাপবোধ নেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুতরাং এভাবেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয় কিরিলোভ, সে অনুভব করে ঈশ্বরকে, তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তাকে। কাম্যু বলেছেন, কিন্তু সে জানে তাঁর অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারে না।[৩২]

সে তখন বিস্ময় প্রকাশ করে আর বলে যে নিজেকে হত্যা করার এটাই কি উপযুক্ত কারণ?[৩৩] কেউ যদি বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তার জীবন চালিত, আর যদি এই ইচ্ছাকে কেউ ভাঙতে চায় এবং নিজের জীবন নিতে উদ্যত হয়, তাহলে তা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এক পাপ। এটা সেই ধ্রুপদি যুক্তি যা প্রয়োগ করেছিলেন অ্যাকুইনাস এবং প্রমাণ করেছিলেন যে আত্মহত্যা এক নরহত্যাতুল্য পাপ। কিন্তু যদি ঈশ্বর না থাকে, তখন মানুষের ইচ্ছা, নিজ জীবনের মতোই, তার নিজস্ব। সে নিজেই তখন তার ঈশ্বর হয়, তার থেকে বেশি বা কম, উচ্চ বা নিম্ন, কিছুই তখন আর নেই। তার নিজ ইচ্ছাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, আর তারই ফলে ঘটে তার মৃত্যু।

হ্বিটগেনস্টাইন এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে চেয়েছেন; এবং বলেছেন যে, আত্মহত্যা হলো সেই ভরবিন্দু যাকে ধরে সব নৈতিক কার্যাকার্য আবর্তিত হয়:

> যদি আত্মহত্যা অনুমোদিত হয়, তাহলে সবকিছুই অনুমোদিত। যদি কোনো কিছুই অনুমোদিত না হয় তাহলে আত্মহত্যাও অননুমোদিত। এটা নৈতিকতার ধরনের ওপর আলো ফেলে, যেহেতু আত্মহত্যা, বলা হয়, প্রাথমিক পাপ। আর যখন কেউ তার অনুসন্ধান চালায়, তা হয় পারদ বাষ্পের অনুসন্ধানের মতো যা বাষ্পের প্রকৃতিকে অনুধাবনের জন্যই করা হয়। নাকি আত্মহত্যা নিজেই না-ভালো না-খারাপ?[৩৪]

হ্বিটগেনস্টাইন বলতে চেয়েছেন আত্মহত্যা-সংক্রান্ত কুহেলিকার কথা যা মূলত রহস্যময়, অধরা, কিন্তু প্রয়োজনীয়, দস্তইয়েফস্কির কিরিলোভ যা দেখিয়েছে আগেই; এই বিশ্বাস যে এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সমাধান নেই, পৃথিবী পরস্পরবিরোধী প্রবাহ ও বিপরীতার্থকতাকে নিয়েই পৃথিবী। কাম্যু বলেছেন, "যুক্তি হলো ক্লাসিক স্বচ্ছতার ভেতর। যদি ঈশ্বর না থাকে, কিরিলোভই ঈশ্বর। যদি ঈশ্বর না থাকে, কিরিলোভ অবশ্যই নিজেকে হত্যা করবে। কিরিলোভ, অতএব, অবশ্যই নিজেকে হত্যা করবে ঈশ্বর হওয়ার জন্য। যুক্তিটি অ্যাবসার্ড, কিন্তু তা প্রয়োজনীয়।"[৩৫]

কিন্তু দস্তইয়েফস্কি ব্যক্তি হিসেবে এই যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণার বাইরে যেতে চাননি। *ডায়েরিতে* তিনি "ভবিষ্যতের শূন্যের" পরিপ্রেক্ষিতকে গ্রহণ করেননি। তরুণী বালিকার উন্নাসিকতার ওপর তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। *ডায়েরিতে* তিনি লিখেছেন: "অতঃপর এটা পরিষ্কার যে, যখন অমরত্বের ধারণা হারিয়ে যায় তখন আত্মহত্যা এক চরম ও অপরিহার্য প্রয়োজন হিসেবে দেখা দেয় সেই লোকের জন্য, যে তার মানসিক উন্নতিতে, গবাদি-পশুর পর্যায় থেকে সামান্যমাত্রই নিজেকে ওপরে তুলতে পেরেছে।"[৩৬]

আত্মহত্যার ক্ষেত্রে, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যে একটি সংযোগ-সেতুর মতো রয়েছেন দস্তইয়েফস্কি। তাঁর চরিত্র বলছে যৌক্তিক আত্মহত্যার কথা, যদিও তিনি নিজে মেনে নিতে পারেননি তাকে। কিন্তু আত্মহত্যার মঞ্চ প্রেক্ষাপট নির্মাণে তাঁর চরিত্র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বতশ্চল হয়ে রইল। বিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখি আত্মহত্যা এক মহামারীর মতো শিল্পীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। এই শতাব্দীতে শিল্পের অন্যতম স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য হলো শিল্পীদের মধ্যে এই হঠাৎ ও তীক্ষ্ণ দুর্ঘটনের প্রবৃদ্ধি। আসলে জীবনকে তুচ্ছ করার দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক সাহিত্যকে অন্য মাত্রায় উদ্ভাসিত করেছে। আধুনিকবাদের অন্যতম পূর্বপুরুষ র‍্যাঁবো কুড়ি বছর বয়সে কবিতাকে এবং কবিজীবনকে ত্যাগ করলেন, ভ্যান গঘ আত্মহত্যা করলেন, স্টিন্ডবার্গ পাগল হয়ে গেলেন। আধুনিকতার অন্যতম স্থপতিপুরুষ কাফকা তাঁর সমুদয় সাহিত্যকীর্তি ধ্বংসের কথা বলে এক শৈল্পিক আত্মহত্যা ঘটালেন। হার্ট ক্রেন তাঁর মহাগণ্ডগোলের জীবনে, সমকামিতা ও মাদকতার আবর্তে আবর্তিত হয়ে একসময় ব্যর্থতার বোঝা সহ্য করতে না পেরে জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলেন। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাঁর অতিসংবেদনশীলতার বলি হলেন জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। ডিলান টমাস ও ব্রেন্ডান বেহান মদ্যপানে মৃত্যুবরণ করলেন। আর্তোও পাগলাগারদে কাটালেন বছরের পর বছর। এই তালিকা, বিংশ শতাব্দীতে আরও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে, যুক্ত হয়েছে আরও অনেক লেখক ও শিল্পীদের নাম। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কাজ করেছে অন্তর্ধানের অন্তর্গত যুক্তি এবং পুনরাবৃত্তিক হতাশা। বিংশ শতাব্দীর আগে হয়তো এ জাতীয় ঘটনার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বা আলোচনা সম্ভব ছিল, যেহেতু তা ছিল অনিয়মিত ও ব্যতিক্রমী, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে দেখা গেছে এর ভেদ্যতা অনেক অনেক গুণ বেশি। কেন এত ভেদ্যতা? হয়তো এর সাথে জড়িত আছে যা আমরা আগেই বলেছি, বিংশ শতাব্দীর শিল্পের ভিন্ন মাত্রার উদ্ভাসন।

তলস্তোয় ও দস্তইয়েফ্‌স্কি—দুজনেরই খ্রিস্টান বিশ্বাস ছিল সাবলীল, যার কারণে তলস্তোয় তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি *আনা কারেনিনা*কে যৌবনের পাপকর্ম বলে মন্তব্য করতে পিছ-পা হননি, কিন্তু দস্তইয়েফ্‌স্কি খ্রিস্টীয় প্রেম ও শুদ্ধতায় বিশ্বাসী হয়েও (মিসেস ফনভিজিনকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, যদি তাঁকে আদেশ করা হতো খ্রিস্ট ও সত্যের মধ্যে যে-কোনো একটিকে বেছে নিতে, তাহলে তিনি খ্রিস্টকেই বেছে নিতেন) ঔপন্যাসিক হিসেবে সৃষ্টি করলেন কিরিলোভ চরিত্র, যে তার পূর্ণ চেতনায় ও নিজ অনপসারণীয় এবং অপরিত্রাণনীয় যুক্তিতে নিজেকে হত্যা করে জয়ী হতে চায়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে দস্তইয়েফ্‌স্কি আত্মহত্যাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং কিরিলোভের যুক্তিকেও বাতিল করে দিয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসে যত খ্রিস্টীয় প্রেম ও অহিংসা প্রতিধ্বনিত, তার চেয়েও বেশি প্রতিধ্বনিত পাপ ও বঞ্চনাবোধ। তিনি বিশ্বাস করতেন, জীবনের সমস্যা বুদ্ধি দিয়ে সমাধান করা যায় না। দস্তইয়েফ্‌স্কির ভেতর বরং অনুতাপ ও দুঃখবোধই বেশি প্রতিধ্বনিত। *ভূতলবাসীর ডায়েরি*তে তিনি বলেন, মৃতের মতোন আরম্ভ, মৃতের মতোন সমাপ্তি, এর মাঝে ছুঁচোর কেত্তন ব-ই আর কী আছে? তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই দেখি, *ব্রাদার্স কারামাজোভ*-এর সন্ত জোসিমার মৃত্যু হলে তার শব দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে। তলস্তোয় গভীর ও কঠোর খ্রিস্টবিশ্বাসী হলেও ব্যক্তিগত জীবনে কামের কাছে বারেবারে পর্যুদস্ত হয়েছে তাঁর খ্রিস্টীয় নীতিবোধ; *ডায়েরি*তে এবং অনেক বিখ্যাত গল্পে তিনি স্বীকার করেছেন এসব বিষয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য ও আত্মহত্যা

আত্মহত্যার চেয়ে রহস্যময় আর কিছুই নেই। আত্মহত্যাকারী ছাড়া
কারও পক্ষে সংঘটিত আত্মহত্যার কারণ জানা অসম্ভব।

মঁতা রলাঁ

এ জীবনে মৃত্যুবরণ কোনো কঠিন কাজ নয়
বরং বেঁচে থেকে নতুন জীবন গড়াই কঠিনতর।

ভ্লাদিমির মায়াকোভ্স্কি

সবকিছুর পর, স্বীকার করতেই হয় যে
আমি একজন ব্যর্থ আত্মহত্যাকারী।
এটা এক নিরানন্দময় স্বীকারোক্তি যে,
বস্তুতই, আত্মনিধন
অপেক্ষা কোনো কাজই সহজ বলে
মনে হয় না।

আল আলভারেজ

এটা বলা ভুল হবে না যে সাহিত্যে আগাগোড়াই আত্মহত্যা প্রবলভাবে উপস্থিত। কারণ আত্মহত্যার বিয়োগান্ত বিভূতি সাহিত্যের প্রতিকর্ষের জন্য উপযোগী। বলা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই আত্মহত্যা অনুষঙ্গ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সাহিত্যে। কিন্তু মধ্যযুগে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে আত্মহত্যার তেমন স্থান নেই, কারণ সে-সময় সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে আত্মহত্যাকে বিবেচনা করা হতো ঘোরতর অপরাধ এবং প্রাণঘাতী পাপ হিসেবে, ফলে জনরুচির ও শাসকের কোপদৃষ্টির আশঙ্কায় সাহিত্যে এর উপস্থিতি কমে যায়। কবি-লেখকেরা এড়িয়ে যান বিষয়টিকে। সেন্ট অগাস্তিন আত্মহত্যাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কৃতকর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, এমনকি ধর্ষণ এড়ানোর জন্যও আত্মহত্যাকে তিনি অনুমোদন করেননি। সেক্সতুস কর্তৃক প্রাচীন রোমান নারী লুক্রেতিয়ার ধর্ষিত হয়ে আত্মহত্যা করার ঘটনাকেও অগাস্তিন অনুমোদন করেননি, কারণ আত্মহত্যা তাঁর বিবেচনায়, যে-কোনো পরিস্থিতিতেই চিরন্তন পাপ।[1]

মধ্যযুগের সাহিত্যে বলা যায়, এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসাও নেই। দান্তের লেখাতেও অপরাধ-সংক্রান্ত গোঁড়া চিন্তাভাবনার বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। কিন্তু তাঁর রচিত *লা দিভিনা কমেদিয়া*তে আত্মহত্যার উল্লেখ আছে। ''ইনফেরনো''র

~ www.amarboi.com ~

গাথা-১৩, সপ্তম চক্র : দ্বিতীয় ঘেরা আত্মহনন ও আত্মধ্বংস-এ মৃত্যুবরণকারীদের শাস্তির বর্ণনা আছে। বলা আছে, আত্মহত্যাকারীদের তপ্ত রক্তের নদীতে সিদ্ধ হওয়ার নীচে, এক অন্ধকার পথহীন বনে আত্মহত্যাকারীদের আত্মা বিষাক্ত মোচড়ানো কাঁটার মতোই অনন্তকালের জন্য বেড়ে যাচ্ছে। সপ্তম চক্রের দ্বিতীয় ঘেরের শুরুতেই দেখা যায়, কবি পথ হারিয়ে এক বনের মাঝে এসে হাজির, যেখানে চারপাশে শুকনো গাছের দ্বারা পরিবৃত আত্মহত্যাকারীদের আত্মারা। সেখানে পিয়ের দেল্লে ভিনিয়ে-র সাথে তাদের সাথে আলাপ হয় এবং দান্তেকে তিনি তার জীবনকাহিনি শোনালেন যার কারণে কাঁটার বৃক্ষে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। পিয়ের দেল্লে ভিনিয়ে ছিলেন সিসিলির নাস্তিক রাজা দ্বিতীয় ফ্রেদেরিকোর আচার্য ও মন্ত্রী। এই বিশ্বাসী মন্ত্রীকে রাজা ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা অভিযোগে বন্দি ও অন্ধ করলে তিনি হতাশায় আত্মহত্যা করেন। কোষাগার-সংক্রান্ত অভিযোগ ও সম্মানহানির জন্য পিয়ের দেল্লে ভিনিয়েকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলে সেই কারণে তার মনে গভীর ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা জন্মে, যার ফলে কারা-প্রকোষ্ঠের দেয়ালে মাথা ঠুকে তিনি আত্মহত্যা করেন। দান্তের জন্মের ষোলো বছর আগে ঘটে এই ঘটনা। পিয়েরের আত্মা যখন জানতে চাইল যে কণ্টকবৃক্ষ থেকে তারা কীভাবে মুক্ত হতে পারবে, তখন দান্তের পথপ্রদর্শক ভার্জিল তাকে জানাল যে যখন কোনো মানুষের আত্মা তার দেহ থেকে জোরে বেরিয়ে আসে, তখন নরকের প্রহরী মাইনস সেই আত্মাকে নিক্ষেপ করে নরকের সপ্তম বৃত্ত এলাকার অতল গভীরে। সেখানে সেই পাপাত্মার জন্য কোনো বিশেষ স্থান থাকে না, সেখানে সে গমের ছোটো চারাগাছের মতো গজায় এবং অবশেষে একসময় কণ্টকবৃক্ষে পরিণত হয়। সেখানকার আর্পিরা[২] সেই বৃক্ষের কৃষ্ণবর্ণের পাতাগুলো ছিঁড়ে খায় এবং সেই গাছের শাখায় বাসা বাঁধে। ফলে কষ্ট পেতে থাকে আত্মহত্যাকারীর আত্মা, বিরামহীনভাবে। তাদের কণ্টকরূপী শরীর থেকে কালো রক্ত ঝরতে থাকে। শেষ বিচারের দিন যখন শরীর ও আত্মা একত্র হবে, তখন অন্যান্য আত্মার মুক্তি হলেও আত্মহত্যাকারীদের আত্মা কখনও এই কণ্টকবৃক্ষ থেকে মুক্ত হবে না। তাদের আত্মা এই কণ্টকবৃক্ষের শাখায় ঝুলে থাকবে। দান্তে এভাবেই এক শুকনো বৃক্ষের বনের কথা বলেছেন যে-গাছের কোনো ফল নেই, যার থেকে ক্রমাগত বিষাক্ত রস নির্গত হচ্ছে। এই বন হলো আত্মহত্যাকারীদের বন, যেখানে তাদের আত্মা কণ্টকবৃক্ষে রূপান্তরিত। দান্তে সেই বৃক্ষের একটি ছোটো শাখা কৌতূহলে ভাঙলে সেই গাছ চিৎকার করে বলল, "কেন তুমি আমাকে ছিঁড়লে?" তার শরীর থেকে তখন নির্গত হচ্ছিল কালো রক্ত। এভাবেই দান্তে আত্মহত্যাকারীদের এক ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর মহাকাব্যে। দান্তে ও ভার্জিল পিয়েরের সঙ্গে কথা বলার পর সেই বনে দুই পলাতক উড়নচণ্ডী আত্মাকে দেখতে পান, তাদের ধাওয়া করছিল কালো গোয়েন্দা কুকুরির পাল। এরা ওই আত্মাদের ধরে ফালা ফালা করে ছিঁড়লেও তারা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়, কারণ আত্মা মৃত্যুহীন। শেষে দান্তে ও ভার্জিল কথা বললেন ফ্লোরেন্সের আর এক নামহীন আত্মঘাতীর সঙ্গে। উল্লেখ্য, ফ্লোরেন্সে সে-সময়ে নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার হুজুগ উঠেছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এটা জলের মতো পরিষ্কার যে আত্মহত্যাসংক্রান্ত দান্তের এই বর্ণনায় খ্রিস্টীয় চিন্তা কাজ করেছে মারাত্মকভাবে। কিন্তু দান্তে কি আত্মহত্যা ধারণায় তাড়িত ছিলেন? দান্তে তাঁর *লা দিভিনা কম্মেদিয়া* লেখা শুরু করেছিলেন খারাপ সময়ে, যখন তিনি তাঁর ৩৭ বছর বয়সে ফ্লোরেন্স থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। মহাকাব্যের শুরুতে তিনি বলছেন:

আমাদের এই জীবনব্রজের মাঝপথে চরণিক,
আমি নিজবোধ ফিরে পাই এক আঁধারবিলীন বনে,
গরল সরণি হারিয়ে গিয়েছে যেখানে বাস্তবিক।

হায় কী কঠিন, মুখের কথায় বলা, তার বিবরণে,
কেমন বন্য সেই অরণ্য, কর্কশ, দুর্গম,
আতঙ্ক যার চিন্তামাত্র নবরূপে জাগে মনে,
এতই তিক্ত, মৃত্যুও তাকে ছাড়াতে পারবে কম,
তবু সেইখানে শুভ যা পেয়েছি, আলোচনা সংসক্ত
বলি আমি তার, হই যত আর নির্ণয়ে সক্ষম।[৩]

দান্তে শুরু করেছেন এই বলে যে তাঁর জীবনের মাঝপথে; তার অর্থ বাইবেলের মতে মানুষের আয়ু ৭০ বছর, সুতরাং অর্ধেক বয়সে তিনি এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন। সপ্তম চক্রের শুরুতেও দেখা যায় এই বর্ণনারই পুনরুক্তি—পথ হারিয়ে বনভূমির মাঝে উপস্থিত হওয়ার কথা আমরা যখন ঠেলে যাই ক্রমান্বয়ে এক বনের ভেতরে/ যার মাঝে কোনো চিহ্ন নেই চলার পথের। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি দান্তের বর্ণনায় তাঁর নিজেরই জীবনের অসহায় আর ক্লান্তির সুর প্রতিধ্বনিত। একজন মনস্তত্ত্ববিদ, এলিঅট জ্যাকস, দান্তের এ জাতীয় ভাবনাকে বলেছেন, "মধ্য-জীবনের সংকট"[৪]। এই দীর্ঘ নৈরাশ্য এবং মতিভ্রম, যাকে বলা যায় পুরুষ-মেনোপজ, যা মধ্য-জীবনে, বিশেষত মধ্য-তিরিশের পর বা চল্লিশের প্রথম দিকে আবির্ভূত হয় যখন যুবক থেকে মধ্য-বয়সের পদার্পণের মোক্ষম ক্রান্তিকাল। এটা হলো মৃত্যু ও মৃত্যু-প্রবৃত্তির মধ্যবর্তী এক ধরনের সংকট এবং এটা সেই সময়েই আবির্ভূত হয় যখন ব্যক্তির পিতা-মাতা মারা যায় এবং সন্তানেরা বড়ো হতে থাকে। ব্যক্তি হঠাৎ করেই নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবতে থাকে এবং মৃত্যুর জন্য এবার নিজের পালা হিসেবে নিজেকে অপেক্ষমাণ ভাবতে থাকে। ব্যক্তি ভাবতে থাকে—তার জীবন আর অর্থময় নয়, সব কিছুই তাকে ছেড়ে যাচ্ছে, সে যেন সত্যিই অপসৃত হতে যাচ্ছে।

সৃষ্টিশীল শিল্পীদের জন্য এটা এক নতুন সংকট নিয়ে হাজির হয়। কেউ কেউ এই সংকটকে মোকাবিলা করতে পারেন না। অধ্যাপক জ্যাকস বলেছেন—মোৎসার্ট, রাফায়েল, চোপিন, শ্যুবার্ত, পাসকাল প্রমুখ তাঁদের তিরিশের কোঠায় মারা যান। জীবনের সৃষ্টিশীলতার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে অর্ধ-জীবনেই তাঁরা পূর্ণ-জীবন যাপন করেছেন। আর যারা বেঁচেছিলেন তারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন—যেমন, সিবেলিয়্যুস বা রোসিনি চল্লিশ বছরের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনো অপেরা লেখেননি। গগাঁ মধ্য-জীবন শুরুর পরই স্বাভাবিক জীবন ত্যাগ করে পলিনেশীয় দ্বীপে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলে গিয়েছিলেন অন্যতর জীবনের খোঁজে। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে, যেমন দান্তে, শেক্সপিয়র, বাখ, ডিকেন্স, বিটোফেনের মধ্যে মধ্য-জীবনের সংকট তাঁদের সৃষ্টিশীলতাকে করেছে পূর্ণ, গভীর ও ট্র্যাজিক।

দান্তে যখন তাঁর *লা দিভিনা কম্মেদিয়ায়* আত্মহত্যাকারীদের জন্য নির্ধারণ করেন এক ভয়ংকর পরিণাম, তখন তিনি তাড়িত হয়েছেন খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শে, কিন্তু তাঁর নিজের জীবনও ছিল অনেকটা তাঁরই উল্লিখিত পিয়ের দেল্লে ভিনিয়ের মতোই। ত্রয়োদশ গাথার শেষে দান্তে যখন বলেন—আমি তাদেরই মতো যারা ব্যাপক আত্মহত্যার প্রবাহে ভেসে বেড়ায়, অথবা আরও বলেন—আমি সেইজন যে নিজের চালা ফাঁসিকাষ্ঠ করে তুলি, তখন নিজ জীবনের চূড়ান্ত যে-অর্থহীনতার কথা তিনি বলেন, তা আত্মহত্যাকারীর মানসাবস্থার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আমরা ভাবতে পারি, এটা এক ধরনের আক্ষেপ যেখানে তাঁর মনের অবস্থাটি প্রতিফলিত।

দান্তে *লা দিভিনা কম্মেদিয়া* লেখা শুরু করেছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমদিকে। তারও দুইশ বছরের কম সময়ের মধ্যে আত্মহত্যা সম্ভাব্য বিষয় হিসেবে সাহিত্যে আবারও আত্মপ্রকাশ করে: স্যার টমাস মোর, তাঁর বিখ্যাত *ইউটোপিয়ায়*, প্লাতোনের মতোই আত্মহত্যাকে এক ধরনের ইচ্ছাকৃত ইউথানেজিয়া হিসেবে অনুমোদন দেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে দেখি যে, অসম্মানের জন্য মৃত্যুবরণ করা এবং প্রেমের জন্য আত্মহত্যা করা কবি ও নাট্যকারদের কাছে এক সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছিল। এলিজাবেথীয় কবিরা লুক্রেতিয়াকেই স্ত্রীর আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করতে লাগলেন যদিও আত্মহত্যা তখনও প্রাণঘাতী অপরাধ হিসেবে সমাজে বিবেচিত হতো। আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার নৈতিক ভিত্তিপ্রদান যদিও তখন শুরু হয়নি, তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আত্মহত্যার উন্নত রূপ ও সম্মান দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। বেকন আত্মহত্যাজনিত মৃত্যু ও স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না; তাঁর কাছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজতাত্ত্বিক মরসেল্লির কথা, "মৃতদেহ মৃতদেহই" —এই নীতিবোধ কাজ করত। মৃত্যু মৃত্যুই, কিন্তু এর সাথে জড়িত থাকে ঘটনার গরিমা এবং মৃত্যুর গৌরবময় রূপ ও শৈলী। শেক্সপিয়রের ট্রাজেডিগুলোর দিকে লক্ষ করলে এই ব্যাপারটি প্রতিভাত হয় সবচেয়ে বেশি। তাঁর ট্র্যাজেডিগুলোতে যে গৌরবময় আত্মহত্যাগুলো চোখে পড়ে, তার মধ্যে শুধু *হ্যামলেট*-এর ওফেলিয়ার আত্মহত্যাটি যাজকীয় সমর্থন পায়নি। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দুই ভাঁড়ের কবরস্থানে আলোপচারিতায় এ বিষয়টি চোখে পড়ে :

১ম ভাঁড়	কথা শোনো। মেয়েটি নিজেই নিজের মৃত্যু এনেছে, তার কি খ্রিস্টান মতে কবর হবে?
২য় ভাঁড়	হ্যাঁ, সে দেখা যাবে। তাড়াতাড়ি কবর খোঁড়ো। সরকার মৃতের দেহ পরীক্ষা করেছে, তারা বলেছে জলে ডুবে মরা। গলায় দড়ি নয়। খ্রিস্টান কবরই হবে।
১ম ভাঁড়	কিন্তু কীভাবে, যদি আত্মরক্ষার জন্য ডুবে না থাকে।
২য় ভাঁড়	না তা-ই, তাই দেখতে পাওয়া গেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১ম ভাঁড়	বটে, তবে সে নিশ্চয়ই আত্মরক্ষার্থে ডুবে মরেছে। এছাড়া আর কী? বিষয়টি হলো, আমি যদি নিজের ইচ্ছায় ডুবে মরি তাহলে তা একটি কৃর্ত্য যা হলো করার ইচ্ছা পোষণ করা, চেষ্টা করা, বাস্তবায়ন করা। অতএব মেয়েটি জলে ডুবে মরেছে স্ব-ইচ্ছায়।
২য় ভাঁড়	না, শোনো বন্ধু কবরখননকারী?
১ম ভাঁড়	না, আমাকে বলতে দাও। সাধু। মানুষটি এখন দাঁড়িয়ে আছে, এখন যদি সে জলের নিকটবর্তী হয় আর ডুবে মরে, তাহলে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সে ডুবল জলে। বুঝতে পেরেছ গোরখননকারী? কিন্তু জল তার সমীপবর্তী হলে এবং তাকে নিমজ্জিত করলে সে জলে ডুবল বলা যায় না। ফলে যে আত্মহত্যার দোষে দোষী নয়, সে নিজ আয়ু কমায় না।
২য় ভাঁড়	এই কি আইন?
১ম ভাঁড়	হ্যা, করোনার সাহেবের আইন।
২য় ভাঁড়	আসল ঘটনা কি জানো? মেয়েটি যদি বড়োলোকের ঘরের না হতো, তাহলে চার্চের বাইরে তার কবর হতো; তখন গির্জার আনুষ্ঠানিকতাও হতো না।
১ম ভাঁড়	খাঁটি সত্য কথা। দুঃখের কথা হলো, ধনবানদের জন্য, অন্যদের চেয়ে, গলায় দড়ি বা জলে ডুবে মরার অনেক সুবিধা।
	আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওফেলিয়ার মৃত্যু সন্দেহের সৃষ্টি করেছে এ বিষয়ে যে তা নিছক আত্মহত্যা নাকি জলে ডুবে মরা? একই দৃশ্যে ওফেলিয়ার ভাই লের্টাস ও পাদরির সংলাপ স্মরণীয়, যার থেকে ওফেলিয়াকে পূর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না দেওয়ার বিষয়টি এবং এর ফলে লের্টাসের আবেগময় ক্ষোভের বিষয়টি ধরা পড়ে:
লের্টাস	কী আচার-অনুষ্ঠানাদি অবশিষ্ট রয়েছে?
১ম পুরোহিত	যতটা সম্ভব, মানা হয়েছে, ধর্মীয় নিয়ম-কানুন। তার মৃত্যু সন্দেহজনক মৃত্যু। রাজাজ্ঞা ব্যতীত, নিয়মমতে গির্জার বাইরে অপবিত্রস্থানে, শেষ পুনরুত্থান পর্যন্ত তাকে রাখা যেত। প্রার্থনার পরিবর্তে ভাঙা কাচ পাথর-নুড়ি মানুষ কবরে নিক্ষেপ করত। তবু তাকে দেওয়া হলো কুমারীর ফুলসাজ, উপযুক্ত পুষ্পবৃষ্টি, পবিত্র গির্জার ঘণ্টাধ্বনি, কবরও হলো গির্জার প্রাঙ্গণে।
লের্টাস	আর কিছুই নেই করার বাকি?
১ম পুরোহিত	না, নেই শান্তিতে মৃত্যুবরণকারীর আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা সংগীত (রেকুইয়াম ম্যাস) বা অন্য নিয়ম পালন করা হলে তা হবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার রীতিলঙ্ঘিত অপরাধ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লের্টাস শুইয়ে দাও কবরে তাকে। তার নিষ্কলঙ্ক সুন্দর দেহ থেকে বের হোক বেগুনি ভায়োলেট ফুল। আমি বলি শোনো, হে নিষ্ঠুর পাদরি, যখন তুমি গর্জন করবে আমার বোন হবে এক স্বর্গের দেবী।

আবার *রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট*-এর পাদরি ফ্রায়ার লরেন্স দুজনের আত্মহত্যার বর্ণনা দেন যেখানে কোনো ঘৃণা বা ক্রোধ ছিল না। জুলিয়েটের মৃত্যুতে তিনি ক্যাপুলেটকে বলেন:

সকলকেই শান্ত হতে হবে।
কান্নাকাটিতে এই দুর্যোগের সমাপ্তি নেই;
এই সুন্দর কন্যাটির ওপর, তোমার ও
ঈশ্বরের অধিকার ছিল,
ঈশ্বর নিয়ে নিল সব অধিকার
কন্যাটির জন্য যা মঙ্গলকর।

*ওথেলো*তেও ওথেলোর আত্মহত্যায় ক্যাসিওর মতো ডেনিশীয় ক্যাথোলিকও এই আত্মহত্যাকে আদর্শজনক ও আদর্শের প্রতীক হিসেবে একে বর্ণনা করেন: "এই ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু চিন্তা করলাম তাঁর কোনো অস্ত্র ছিল না; যেহেতু সে ছিল বিশাল হৃদয়ের মানুষ।"

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডিগুলোতে সংঘটিত মহৎ আত্মহত্যাগুলো ধর্মীয়বোধ দ্বারা তাড়িত নয়। শেক্সপিয়র ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে নিমজ্জন ঘটাননি মহৎ চরিত্রগুলোর, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোমান আদর্শ দ্বারা চরিত্রগুলো গরিমাপ্রাপ্ত। অন্যথায় প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কেন আত্মহত্যাকারী ওথেলোকে চৌমাথায় বুকে খুঁটি গেঁথে কবর দেওয়া হবে না, তা-ই আশ্চর্যের। সমগ্র শেক্সপিয়রে দেখা যায় পঞ্চাশেরও বেশি আত্মহত্যা যা এক অসাধারণত্ব অর্জন করেছে সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে।

অধুনা মৃত্যুর অধিকার, ইউথানেজিয়া বা করুণাকৃত মৃত্যুর যে-বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোড়িত, যৌক্তিক নৈতিকতায় যাকে বৈধ হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে, টমাস মোরের *ইউটোপিয়ায়* যে-আদর্শ রাজ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেখানে আমরা এর দেখা প্রথম পাই। খুবই আশ্চর্য হতে হয় যে যখন আত্মহত্যা এক তীব্র নিষেধাত্মক বিষয় হিসেবে সমাজে বিবেচিত, তখন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে এর এক নৈতিক, যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য তিনি উপস্থাপন করেন। মৃত্যু যখন কাম্য তখন আত্মহত্যাই অন্বিষ্ট—এ কথা তিনি যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেন :

আগেই বলেছি, রোগীদের এ-দেশে খুব দরদ ও সমবেদনার সাথে যত্ন করা হয়। শারীরিক যত্ন ও খাদ্যদ্রব্যের দিক দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে যা দরকার তার কোনও কিছুই অবহেলা করা হয় না। যারা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে, তাদের কাছে বসে, গল্প করে, বা যত দূর সম্ভব সাহায্য করে তাদেরকে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কারও রোগ যদি এমন হয় যে তা কেবল দুরারোগ্যই নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> অসীম কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়কও, তবে তার জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করা হয়। তার কাছে পুরোহিত ও শাসনকর্তা এসে বুঝিয়ে বলে: তুমি তো এখন তোমার জীবনের কর্তব্য করতে আর সক্ষম হবে না, অক্ষম হয়ে বেঁচে থেকে অন্যের কাছে তুমি বিরক্তিকর ও বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়েছ, তাছাড়া তোমার নিজেরও অমানুষিক কষ্ট হচ্ছে; এখন তুমি ভেবে ঠিক করো, তুমি রোগের যন্ত্রণা আরও বেশিদিন ভোগ করবে কি না। তারা যদি দেখে যে জীবন তার কাছে এখন যন্ত্রণাবিশেষ, মরতে সে আর অনিচ্ছুক নয়, বরং সে চায় কোনও রকমে এই নিদারুণ কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে, যেমন কারাগার বা উৎপীড়ন থেকে মানুষ মুক্তি চায়, অথবা কোনও উপায়ে সে নিজেই স্বেচ্ছায় এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবে, তখন তারা তাকে বলে: মৃত্যুই তোমার শ্রেষ্ঠ, এতে তোমার কোনও লোকসান তো নেই-ই, বরং যন্ত্রণার অবসান হবে।... তারা তাকে দেখিয়ে দেয় যে মৃত্যুবরণই তার পক্ষে ধর্ম ও পুণ্যের কাজ। এসব কথায় যারা রাজি হয়, তারা অনাহারে স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবন শেষ করে, অথবা ঘুমের ওষুধ নিয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব না করেই মরে যায়। কিন্তু তারা কাউকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মরতে বাধ্য করে না এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত খুব মন দিয়ে তারা সেবাশুশ্রূষাও করে। স্বেচ্ছা-মৃত্যুকে তারা সম্মানজনক মৃত্যু মনে করে। কিন্তু কেউ পুরোহিত ও উপদেষ্টার পরামর্শের আগেই আত্মহত্যা করলে তাকে সৎকারের অযোগ্য মনে করা হয়। তাকে কবর না দিয়ে বা দাহ না করে কোনও জলাভূমিতে ফেলে দেওয়া হয়।[৫]

টমাস মোরের বক্তব্যে প্রতিধ্বনিত হয় একাধারে রোমান কাল ও আধুনিক কালের ধারণা। আধুনিক কালের ইউথানেজিয়া এবং রোমান কালের রাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে আত্মহত্যার নিয়মটি ধরা পড়েছে তাঁর কথায়। মোরের আদর্শ রাষ্ট্রে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আত্মহত্যা করার কথা বলা আছে, আবার, পুরোহিত বা উপদেষ্টার অনুমতি ছাড়া আত্মহত্যা করলে মৃতদেহ সৎকারহীনভাবে ডোবায় ফেলে দেওয়ার কথা বলা আছে, যা আমাদের রোমান ও মধ্যযুগের এতদ্‌বিষয়ক প্রথার কথা মনে করিয়ে দেয়। হয়তো তিনি সে-সময়ের নিয়ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে জন ডান লেখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *বিয়াথানাটস* যা ইংরেজিতে আত্মহত্যারওপর লেখা প্রথম গ্রন্থ। ১৬০৮ সালে লেখা হয় এটি। গবেষকেরা বলে থাকেন, ডান যা লিখেছেন তা প্রকৃতপক্ষে তিনি বোঝাতে চাননি। আত্মহত্যাসম্পর্কিত চার্চের অসংগতিময় আদেশের তিনি সমালোচনা করেন। অখ্রিস্টীয় সমাজ এবং প্রাণিকুলের সংঘটিত আত্মহত্যার ওপর তিনি নিবিড় জরিপ চালান এবং তাঁর এই গ্রন্থেও পুরোনো ও নতুনের সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হয়। আত্মহত্যাকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেন। আলভারেজ বলেছেন, "সংক্ষেপে, তিনি লেখেন প্রায়-মধ্যযুগীয় এক লেখা যা মিথ্যা প্রমাণ করতে চায় মধ্যযুগীয় বিশ্বাসকে এই কথা বলে যে, আত্মহত্যা কোনো সম্ভাব্য খারাপ বিষয় নয়।"[৬] যখন ডান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর এই লেখা লেখেন তখন তিনি নিজেই আক্রান্ত ছিলেন অসুখী মানসিক অবস্থায় ও গভীর বিষাদে। *বিয়াথানাটস*-এর ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেন এক চিরন্তন আত্মলোপের প্রলোভনের কথা। কিন্তু সম্ভবত আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয় বলে তিনি নিজ চিন্তাকে ধ্রুব করে নেন। ডানের খ্রিস্টান প্রশিক্ষণ ও ত্যাগ-মানসিকতা তাঁর অন্তর্গত হতাশা ও ক্লান্তি থেকে বেশি শক্তিশালী ছিল। যা-ই হোক, ডানের এই পুস্তক মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছিল।

ডানের সমসাময়িক বার্টনের লেখা *অ্যানাটোমি অব ম্যালানকলি* ১৬২১ সালে প্রকাশিত হয়ে তুমুল জনপ্রিয়ধন্য হয়েছিল। জনশ্রুতি আছে যে, বার্টন নিজে তাঁর মৃত্যুর তারিখ-সংক্রান্ত নিজ জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। অনুমিত হয়, তাঁর জন্য আত্মহত্যা ছিল কম-বেশি এক পার্শ্ব-বিষয় বা বিষাদের এক উপজাত। বইটির অতিরিক্ত দুটি সংস্করণ ১৬৩৯ সালে লেখকের মৃত্যুর আগেই প্রকাশিত হয় এবং ওই শতাব্দীতে (সপ্তদশ) বইটির তিনটিরও বেশি সংস্করণ হয়। একজন ভাষ্যকারের মতে, যদি কেউ একজন প্রকাশলগ্নের সার্থকতার দিক থেকে বিচার করে, তাহলে *দ্য অ্যানাটমি অব মেলানকলি*কে শেক্সপিয়রের নাটকের চেয়েও তিনগুণ বেশি জনপ্রিয় বলে মনে করা যায়।[৭] বইটি বার্টনকে খ্যাতি এনে দেয় আর তাঁর প্রকাশককেও করে সৌভাগ্যশালী। ১৬৭৬ সালে বইটির অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে ১৭০০ সালে *বিয়াথানাটস*-এর মাত্র দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আত্মহত্যা বিষয়ে তুলনামূলক কিছু সহনীয় এবং কিছুটা উদারজনক কথাবার্তা বলতে থাকেন মঁতেসকিও, ভলত্যের ও হিউম। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীদের কাছে আত্মহত্যার মতো একটি গতানুগতিক ব্যক্তিগত কার্যকে মারাত্মক অপরাধে স্ফীত করা একেবারেই একটি নিরর্থক ও ধৃষ্ট কাজ বলে মনে করা হতো। হিউম বলেছেন, ব্যক্তির জীবন জগতে একটি ঝিনুকের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। হিউম আত্মহত্যা-সংক্রান্ত নৈতিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিশাল আঘাত হানেন কিন্তু তাঁর এই-বিষয়ক রচনা ১৭৭৭ সালে, তাঁর মৃত্যুর পরের বছরের আগে, প্রকাশিত হয়নি, যদিও তা লেখা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বছর আগে। সেখানে তিনি বলেন, "জীবনের ধ্বংসসাধন পাপকার্য হলে তার সংরক্ষণও সমানভাবে পাপ। আমি যদি একটি পাথরকে আমার মাথার ওপর পড়ছিল দেখে সরিয়ে দিই, তাহলে তো আমি প্রকৃতির গতিকে ব্যাহত করলাম, আর আমি এর দ্বারা নিজ জীবনকে রক্ষা ও দীর্ঘায়িত করে ঈশ্বরের ক্ষমতাতে হস্তক্ষেপ করলাম যা তিনি তাঁর স্বাভাবিক নিয়ম ও গতিতে আমার জন্য বরাদ্দ রেখেছিলেন।"[৮]

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে এডিসন নাটক লেখেন কাতো যা রোমান বিখ্যাত আত্মহত্যা নিয়ে লিখিত। এই নাটকটি এতই সাফল্য পায় যে পোপ এর ভূমিকা লেখেন এবং বন্ধুর কাছে এক পত্রে বলেন, কাতো শুধু তাঁর সময়ের রোমের এক আশ্চর্য ব্যক্তি নয়, যেন নিজেদেরই একজন। ১৭৩৭ সালে ইউস্টেস বাজেল, যিনি এডিসনের সম্পর্কিত ভাই, পকেটে পাথর ভরতি করে টেম্‌স নদীতে ডুবে আত্মহত্যা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেন। রেখে যাওয়া আত্মহত্যালিপিতে তিনি লেখেন, কাতো যা করেছেন এবং এডিসন যার অনুমোদন দিয়েছেন, তা মিথ্যা হতে পারে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আত্মহত্যা হলো কবি টমাস চ্যাটারটনের আত্মহত্যা। তাঁর আত্মহত্যা ছিল সকল সাহিত্যিক আত্মহত্যার মধ্যে বিখ্যাত ও আদর্শস্বরূপ। আর্সেনিক খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন মাত্র আঠারো বছর বয়সে। তাঁর জন্ম ১৭৫২ সালে, তাঁর জন্মের তিন মাস আগেই তাঁর স্কুল-শিক্ষক পিতা মারা যান। চ্যাটারটন ছিলেন অনুভূতিপ্রবণ জেদি ধরনের মানুষ। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা মা কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হন এবং তিনি সীবনের কাজ করে সংসার চালাতে থাকেন। আট বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই চ্যাটারটনকে ব্রিস্টল চ্যারিটি স্কুলে ভরতি করা হয় এবং পরবর্তী সাত বছর তিনি সেখানেই পড়ালেখা করেন। তারপর তিনি ব্রিস্টলের একজন দলিল-মুসাবিদাকারীর কাছে শিক্ষানবিশি শুরু করেন। দু-এক বছরের মধ্যে, তাঁর বয়স সতেরো হওয়ার আগেই, তিনি প্রচুর কবিতা লেখেন পার্চমেন্টের ওপর যা পরে তাঁর *রওলি পোয়েম্‌স* (Rowley poems) বলে খ্যাত হয়। কিন্তু কবিতা লিখে এবং বিভিন্ন প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে তিনি প্রত্যাখ্যাত হতে থাকেন এ সময়। এ পর্যায়েই প্রকাশক হোরেস ওয়ালপোলের সাথে তাঁর ভুল বোঝাবুঝি হয়। ১৭৭০ সালের এপ্রিল মাসের পর তিনি লন্ডন আসেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি লন্ডনে লেখক হিসেবে নিজের ভাগ্য গড়তে পারবেন। খুবই কষ্টকর অবস্থায় মাকে সাথে নিয়ে তিনি বস্তিতে বাস করতে লাগলেন। এ সময় সারারাত ধরে তিনি লিখতেন। যদিও তিনি বিভিন্ন কাগজে লিখতেন কিন্তু সম্পাদকেরা প্রায়শই তাঁকে কম সম্মানী দিয়ে ঠকাত। অবস্থা এমন হলো যে, মাসে সর্বসাকুল্যে তিনি পেতেন ৪ পাউন্ড ১৫ শিলিং-এর মতো এবং এভাবেই লন্ডনে আসার পর তাঁর ভাগ্য কুপোকাত হলো। নিদারুণ অবস্থায় ২৪ আগস্ট রাতে তিনি আর্সেনিক গিলে আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃতদেহের সুরতহালের সময় কেউ তাঁর মৃতদেহকে শনাক্ত করতে আসেনি; এমনকি মৃত্যু-রেজিস্টারে তাঁর খ্রিস্টীয় নামটিও ভুল করে লেখা হয়—উইলিয়াম চ্যাটারটন। অষ্টাদশ জন্মবার্ষিকীর তিন মাস আগেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। চ্যাটারটন ট্র্যাজেডিকে বলা যায় সৃষ্টিশীলতার এক ভয়ংকর অপচয়, প্রতিজ্ঞা ও জীবনীশক্তির এক মারাত্মক বিপর্যয়। তিনি ছিলেন ভয়ানক জেদি, মারা যাওয়ার দুই-তিন দিন আগ থেকে তিনি না খেয়ে ছিলেন। খবর পেয়ে বাড়িওয়ালি মিসেস অ্যাজেল খাবার খাওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালে তিনি এতে আহত ও উষ্মা প্রকাশ করেন এবং বাড়িওয়ালিকে জানান যে তিনি ক্ষুধার্ত নন।

কিন্তু কেন চ্যাটারটন আত্মহত্যা করলেন? এটা কি তাঁর অতি-সংবেদনশীলতা, নাকি অতি-অনুভূতিজাত কোনো ঘটনার পরিণতি? কেন ঘটল সাহিত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত এই আত্মহত্যা? আলভারেজ এর উত্তরে বলেছেন, "এমনকি চ্যাটারটন, সাহিত্যিক আত্মহত্যার মধ্যে যিনি সবচেয়ে বিখ্যাত, বিষপান করলেন তাঁর অতি-উপলব্ধি থেকে গর্ব এবং তিনি লিখে জীবন ধারণে হয়েছিলেন অসমর্থ—এর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিবাদে। পরবর্তী সময়ে রোম্যান্টিকেরা তাঁকে দণ্ডপ্রাপ্ত কবিদের এক প্রতীকে রূপান্তরিত করেন। বস্তুত, তিনি ছিলেন গ্রাব স্ট্রিট সাহিত্যের অবজ্ঞার শিকার।"[৯] আলভারেজ ইঙ্গিত করেছেন আর্থিক দৈন্যের দিকে যার জন্য দায়ী ছিল সমসাময়িক প্রকাশকদের অবজ্ঞা এবং বটতলার প্রকাশকদের বিমাতাসুলভ আচরণ। চ্যাটারটন তাঁর পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘুরেছেন এসব প্রকাশক-সম্পাদকদের দ্বারে দ্বারে, কিন্তু এতে তাঁর প্রাপ্তি ছিল সামান্য কয়েক শিলিং মাত্র। এর ভেতর দিয়ে সম্পর্কের জোড়াতালি, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও গৌণ কবি উইলিয়ামের ভাইয়ের একুশ বছর বয়সে আত্মহত্যা, তাঁর শিক্ষক ও পরামর্শদাতা টমাস ফিলিপস-এর মৃত্যু চ্যাটারটনকে মানসিকভাবে ভঙ্গুর করেছিল বলে মনে করা হয়। এ সময় তিনি তাঁর ছদ্ম-পৃষ্ঠপোষকদের সাথে ঝগড়াও শুরু করে দিয়েছিলেন।

পরবর্তী সময়ে চ্যাটারটন রোম্যান্টিকদের কাছে আরাধ্য দেবতা হিসেবে আবির্ভূত হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ডা. জনসন তাঁর সম্পর্কে বলেছেন: "এই অনন্যসাধারণ যুবক আমার জ্ঞানকে জগতের মুখোমুখি করে দিয়েছে। এটা আশ্চর্যের যে, কীভাবে এই শিশু এ সমস্ত কিছু লিখেছে।"[১০] এক প্রজন্মের মধ্যেই চ্যাটারটন রোম্যান্টিক কবিদের সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিত প্রতীকে পরিণত হন। ওয়াডসওয়ার্থ তাঁকে বলেছেন—অনুপম বালক, অতন্দ্র আত্মা, যে আত্ম-অভিমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। কোলরিজ তাঁর মৃত্যুতে রচনা করেছেন "শোকগাথা", কিট্‌স তাঁর ওপর লিখেছেন সনেট, দ্য ভিগনি রচনা করেছেন নাটক, শেলি তাঁর কিট্‌স-বিষয়ক এলিজিতে আহ্বান করেছেন তাঁকে।

কিন্তু রোম্যান্টিকদের মধ্যে কিট্‌স অসম্ভবভাবে চ্যাটারটন-ভাবনায় তাড়িত হয়েছিলেন। "ট্যু অটাম" লেখার দু দিন পর কিট্‌স তাঁর বন্ধু জন রেনল্ডসকে একটি চিঠিতে লেখেন

> সর্বদাই আমি কোনো না কোনোভাবে
> হেমন্ত আর চ্যাটারটনের মধ্যে সাযুজ্য বোধ করি।
> ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে বিশুদ্ধ লেখক তিনি।

কিট্‌স প্রাণিত হয়েছিলেন চ্যাটারটনের লেখায়। অন্য রোম্যান্টিকদের মতোই তাঁর জীবন ও আত্মনিধনেও তাড়িত হয়েছিলেন কিট্‌স। চ্যাটারটনের আর্থিক দুরবস্থা নয়, বরং তাঁর অপরিণত মৃত্যু, প্রত্যাখ্যান, অস্বীকৃতি ইত্যাদিই রোম্যান্টিকদের তাঁর বিষয়ে অত্যধিক উদ্‌বেলিত করেছিল। সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে অনন্বয় ও বিচ্ছিন্নতাজনিত মৃত্যুর প্রথম উদাহরণ হয়ে রইলেন চ্যাটারটন। সৃষ্টিশীলতা আর বিষণ্নতার যে সহ-সম্পর্ককে অবিচ্ছিন্ন বলে এখন মনে করা হয়, তার সমতুল্য আরেকটি বিভাব এক্ষেত্রে জায়মানিত হয়ে ওঠে যে সৃষ্টিশীলতা আর অপরিণত মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, অন্তত রোম্যান্টিক চিন্তামানসে। রোমান্টিকেরা প্রত্যয়িত করতে থাকেন যে, যৌবন আর কবিতা সমার্থক। ১৮২১ সালে পঁচিশ বছর বয়সে কিট্‌স মারা যান, শেলি তার পরের বছর ঊনত্রিশে, বায়রনও ছত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। কোলরিজের আফিম আসক্তিকেও বলা যায় প্রতীকী আত্মহত্যা. আর কোলরিজ নিজেও মনে করতেন যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টিহীনতা মৃত্যুরই নামান্তর। বোদল্যেরেরও ছিল আফিম আসক্তি, র‍্যাবো তাঁকে বলেছিলেন সাহিত্যের জন্য আত্মহত।

চ্যাটারটনের মৃত্যুর চার বছরের মধ্যে বের হয় গ্যোয়েটের বিখ্যাত উপন্যাস *তরুণ হ্বের্টেরের দুঃখ*। এক প্রেম-বঞ্চিত অতি-সংবেদী যুবকের আত্মহত্যর কাহিনি ইউরোপজুড়ে সৃষ্টি করে এক ভিন্ন ও অনুপম আমেজের, এবং প্লাবনের। তরুণ হ্বের্টের আবির্ভূত হয় যাতনার এক আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিরূপে। রিচার্ড ফ্রেইডেনথাল-এর ভাষায়:

> দেখা দিল এক হ্বের্টের মহামারী: হ্বের্টের জ্বর, এক হ্বের্টের ফ্যাশন, তরুণেরা নীল টেল-কোর্ট আর হলুদ ওয়েস্ট কোট পরতে লাগল, দেখা দিল হ্বের্টের ক্যারিকেচার, হ্বের্টের আত্মহত্যা।...আর তা চলতে থাকল বছর বছর ধরে নয়, দশক দশক ধরে; আর শুধু জার্মানিতেই নয়—ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড এবং উপরন্তু স্ক্যান্ডিনেভিয়াতেও। গ্যোয়েটে নিজেও গর্বের সাথে উল্লেখ করেছেন যে, এমনকি চীনারাও পোর্সেলিনের ওপর লোট্টে ও হ্বের্টেরের ছবি আঁকত; তাঁর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত জয় ছিল যখন রাজসভায় নেপোলিয়ঁ তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি বইটি সাতবার পড়েছেন...[১১]

একটু ভিন্ন মাত্রায় হলেও, দুটি চরিত্র, চ্যাটারটন ও হ্বের্টের, প্রতিভাবানদের এক রীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। একজন কবি—অকাল প্রয়াত, বলা যায় প্রথম যৌবনেই আত্মঘাতী; অন্যজন এক সার্থক বিদগ্ধ কবির সৃষ্ট সাহিত্যিক সত্তা যে চরিত্রের ভেতর দিয়ে আত্মঘাতী।

রোম্যান্টিকদের কাছে মৃত্যু এক সাহিত্যিক সম্পাদন। মৃত্যুময়তায় তাঁরা আশ্লিষ্ট থাকতে ভালোবাসতেন। আলফ্রেদ দ্য মুস্যে, কুড়ি বছর বয়সে এক জায়গার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আনন্দে চিৎকার করে একবার বলছেন, "আহ! নিজেকে হত্যার জন্য এটা বড়ো সুন্দর জায়গা।" জেরার দ্য নেরভালও দানিয়ুবের পারে এক সান্ধ্য ভ্রমণের সময় একই রকম কথা বলেছিলেন। তার এক বছরের মাথায়ই তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ফ্লবেরও তাঁর চিঠিতে স্বীকার করেছেন যে যুবক হিসেবে একদা তিনি আত্মহত্যার স্বপ্ন দেখতেন। তিনি লিখেছেন, আমি ও আমার প্রাদেশিক বন্ধুরা এক আশ্চর্য জগতের বাসিন্দা ছিলাম, "আমি তোমাকে নিশ্চিত করছি, আমরা পাগলামো আর আত্মহত্যায় আন্দোলিত ছিলাম; কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছে... টাই দিয়ে শ্বাসরোধ করেছে, কেউ কেউ একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণের জন্য লাম্পট্যের দ্বারা মরেছে; এসবই ছিল সুন্দর।"

তরুণ রোম্যান্টিকদের কাছে মৃত্যু ছিল "মহৎ প্রেরণাদায়ক" আর "মহৎ সান্ত্বনাদায়ক।" এটার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হয়তো এই ছিল যে মৃত্যু সৃষ্টিশীল কারণ তা করে পারাপার আর তা ভোগান্তিনাশক। ১৮৩০ সালের দিকে ফ্রান্সে রোম্যান্টিকরাই আত্মহত্যাকে জনপ্রিয় করে তুলছিল। এই সব তরুণেরা ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, শিল্পী, মহাপ্রেমিক আর অনেকে আবার ছিল আত্মহত্যা-ক্লাবের সদস্য, তাঁদের অনেকের কাছে নিজের হাতে মৃত্যুবরণ করা ছিল খ্যাতি পাওয়ার এক সহজ, সংক্ষিপ্ত ও নিশ্চিত পথ। অর্থাৎ আত্মহত্যা ছিল তাঁদের কাছে এক অজানা উদ্দীপনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮৪৪ সালে রচিত একটি সমসাময়িক উপন্যাসের নায়ক বলছে, "আত্মহত্যা একজন মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে। নঞর্থকতায় একজন বাঁচে; মৃত্যুতে একজন নায়ক হয়ে ওঠে...সব আত্মহত্যাই সার্থক, খবর তাদের নিয়ে নেয়, তারা নতুন খবর হয়ে ওঠে; মানুষ তাদের নিয়ে ভাবে। আমিও নিশ্চিতভাবেই আমার প্রস্তুতি নিচ্ছি।"[১২] উপন্যাসের নায়ক প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এটাই যথার্থ, যদিও তার কথা উপহাসের মতো শোনায়, কিন্তু বাস্তবতা হলো ডজন ডজন যুবক তা-ই করেছে যা বলেছে উপন্যাসের নায়ক। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে, পত্রিকার পাতা ভরতি থাকত এসব আত্মহত্যার খবরে। ফ্রান্সেই দেখা দিয়েছিল প্রাচীরভাঙা এই আত্মহত্যার প্লাবন।

রোম্যান্টিকদের অনেক পর, ফ্রান্সে আরও একটি শিল্প-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল দাদাবাদ নামে। এই আন্দোলনেরও আরম্ভ ও সমাপ্তি হয়েছিল আত্মহত্যা দিয়ে। দাদাবাদ এক ধ্বংসের নাম, দ্রোহের নাম। শুধু প্রতিষ্ঠান ও বুর্জোয়ার বিরুদ্ধেই নয়, নিজের বিরুদ্ধেও। বলা হয়ে থাকে, যখন কোনো শিল্প-আন্দোলন তার নিজের বিরুদ্ধে যায়, হয় ধ্বংসমুখী ও আত্মপরাজয়গামী, তখন আত্মহত্যা সময়ের ব্যাপার মাত্র। দাদাবাদ থেকে পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিল অত্যন্ত শক্তিশালী আন্দোলন পরাবাস্তববাদ। দাদাবাদ সবকিছুর বিরুদ্ধে যেতে চায়, এমনকি নিজের বিরুদ্ধেও। দাদাবাদীদের কাছে আত্মহত্যা চূড়ান্ত শিল্পকর্মের মতোই এক অপরিহার্য করণীয়তা। দাদাবাদীর কাছে, আর্তাওয়ের ভাষায়, সব লেখাই জঞ্জাল। এর এক প্রতীকী অর্থ হলো, জীবনও আসলে এক জঞ্জাল।

দাদাবাদীদের আদর্শ ছিল জাক ভাশে, আর্দ্রে ব্রেঁত-র ওপর যার ছিল মারাত্মক প্রভাব। ভাশে রহস্য করে বলেছিলেন, "যুদ্ধে মারা যেতে আমার আপত্তি... আমি তখনই মরব যখন আমি মরতে চাইব, আর আমি অন্য কাউকে সাথে নিয়েই মরব। একা মৃত্যুবরণ করা ক্লান্তিকর; আমার প্রিয় কোনো বন্ধুকে নিয়ে আমি মরতে আগ্রহী।"[১৩] আশ্চর্য হলেও সত্যি যে, যেভাবে বলেছিলেন ঠিক সেভাবেই ১৯১৯ সালে, যখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর, তিনি অতিরিক্ত আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেন; একই সময়ে তাঁর কাছে আসা তাঁর দুজন বন্ধুকে—যারা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন মাত্র এবং তাঁদের ছিল না কোনো আত্মহত্যাস্পৃহা—তিনি একই প্রাণনাশক আফিম দেন। এভাবেই জন্ম হয় চূড়ান্ত দাদাবাদের স্পন্দন ও কিংবদন্তির: আত্মহত্যা ও জোড় স্বেচ্ছামৃত্যুর ঘটনাদিগন্তের।

রোম্যান্টিকদের কাছে, বিশেষত তরুণ রোম্যান্টিকদের কাছে আত্মহত্যা, একজন মহৎ শিল্পী হিসেবে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিষয় বা করণীয়তা। ব্যাপক, বিশাল, প্রাণবন্ত, আপ্ত এবং প্রাতিভাসিক ঝোঁক দেখা যায় মৃত্যু নিয়ে তাঁদের মধ্যে; তাঁদের জীবন যেন মৃত্যুর আস্থায়ী রূপ, তাঁদের মৃত্যু যেন জীবনেরই এক সম্প্রসারণ। কিট্সের বিখ্যাত ওড "নাইটিংগেলের প্রতি"তেও দেখি এর আলম্বিত অভিভাব ও উক্তি

অন্ধকার তলে আমি শুনি; কেন না অজস্রবার
জড়িয়ে পড়েছি আমি সহজ মৃত্যুর আধোপ্রেমে,
প্রিয় নাম ধরে তাকে কতোবার ডেকেছি কবিতার পঙ্ক্তিতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার নিঃশব্দ নিশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে দেয়ার জন্য:
যে-কোনো সময়ের থেকে এখন মৃত্যুকে মনে হচ্ছে বেশি বরণীয়
ব্যথাহীন থেমে যাওয়া এই মধ্যরাতে,
যখন তোমার আত্মা ঢেলে দিচ্ছো তুমি
এরকম তুরীয় আবেগে।[১৪]

রোম্যান্টিকদের কাছে তাঁদের জীবন ও মৃত্যু পরস্পর বিকল্প, আর দাদাবাদীদের কাছে জাক ভাশের জীবন ও মৃত্যুই শিল্প। ফলে উত্তরসূরিদের কাছে তাঁর প্রভাব অতুলনীয়। তাঁর সৃষ্টি অপেক্ষা তাঁর জীবনই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জীবনই যেন এক শিল্পবস্তু, আর প্রকৃত দাদাবাদীদের মতোই তিনি চূড়ান্ত বিশ্লেষণে শিল্পকে মনে করতেন মূল্যহীন।

"তীব্রতা, প্রচণ্ড ধাক্কা, মনোব্যাধিগত রঙ্গ এবং আত্মহত্যা—এ-ই হলো দাদাবাদের ছন্দোস্পন্দ", বলেছেন আলভারেজ।[১৫] আরও একজন দাদাবাদী, জাক রিগাও বলেছেন, আত্মহত্যা হলো এক বৃত্তি। জাক রিগাও নিজেও ১৯২৯ সালে আত্মহত্যা করেন এবং বলা হয়ে থাকে যে তাঁর মৃত্যুর সাথে-সাথেই দাদা-অধ্যায়ের যবনিকাপাত ঘটে, অভ্যুত্থান ঘটে ব্রেঁত ও ত্রিস্তাঁ জারার পরাবাস্তববাদের।

রিগাওয়ের মৃত্যুর চার বছর আগে ফিউজিটিভ শিল্প-ম্যাগাজিন *লা রিভ্যুলিউশঁ স্যুররেয়ালিস্ত* এক সিম্পোজিয়ামের ফলাফলের ভিত্তিতে সংকলন প্রকাশ করে যার বিষয় ছিল "আত্মহত্যা কি এক সমাধান?" এর অধিকাংশ উত্তরই ছিল জোরালোভাবে হ্যাঁ বোধক। এই সিম্পোজিয়ামের নিহিতার্থ ছিল পরিষ্কার: আত্মহত্যার গ্রহণযোগ্যতাকে প্রতিপন্ন করা, নতুন শিল্পকে গ্রহণ করা, আভাঁ-গার্দ-এর সাথে নিজেকে শামিল করা। তবে দাদাবাদীদের মতোই দাদাবাদও আত্মঘাতী হয় এক সময়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুলনাচের ইতিকথায়* আমরা একটি অদ্ভুত ও অনন্যসাধারণ ইচ্ছামৃত্যুর আলেখ্য পাই, ত হলো যাদবের ইচ্ছামৃত্যু। যাদবের এই আত্মহত্যাকে আমরা কী বলতে পারি? তাকে হয়তো বলা যায় অধ্যাত্ম-অহংবাদী আত্মহত্যা। যাদব, সূর্যবিজ্ঞান যার করায়ত্ত, সে জানে সবকিছু, বলে " সূর্যবিজ্ঞান যে জানে, তার অসাধ্য কি? অতীত-ভবিষ্যৎ তার নখ-দর্পণে। কবে কি ঘটবে জীবনে কিছুই তার অজানা থাকে না। মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত দশ বিশ বছর আগে থেকে জেনে রাখতে পারে।"[১৬] অতঃপর শশীর আচমকা প্রশ্নে যাদব হঠাৎ করেই বলে নিজ মৃত্যুর দিনক্ষণ:

আপনি জানেন? শশী জিজ্ঞাসা করে।
জানি না? বিশ বছর থেকে জানি।— বলে যাদব।
হাসি পায় বলিয়া শশী ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, কবে?
যাদবও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, রথের দিন। আমি
রথের দিন মরব শশী।[১৭]

এভাবেই নিজের মৃত্যুর তারিখটি কথাচ্ছলে বলে বসেন যাদব আর রথের দিন আসতেই নিজ-মৃত্যুর বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে ওঠেন। মৃত্যুর দিন "দু-চার বছর"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পিছিয়ে দেবার শশীর প্রস্তাবটা তার মনে লাগলেও লোকের কাছে হেয় ও হাসির পাত্র হয়ে যাবেন, এই ভয়ে তিনি তাতে রাজি হন না। অবশেষে নিজের আধ্যাত্মিক প্রতিরূপকে ধরে রাখার এবং তাকে মহিমান্বিত রূপ দেবার জন্য এক অন্ধ অহমের তাড়নায় যাদব রথের দিন সবার অলক্ষ্যে আফিম খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ভক্তরা ভাবে তা এক অতিমানবের দেহত্যাগ, একমাত্র শশীই বুঝতে পারে আফিম খেয়ে তার মৃত্যুর রহস্য:

> সত্যি-মিথ্যায় জড়ানো জগৎ। মিথ্যারও মহত্ত্ব আছে। হাজার হাজার মানুষকে পাগল করিয়া দিতে পারে মিথ্যার মোহ। চিরকালের জন্য সত্য হইয়াও থাকিতে পারে মিথ্যা। যারা যাদব ও পাগলদিদির পদধূলি মাথায় তুলিয়া ধন্য হইয়াছিল, তাদের কে দুজনের মৃত্যুরহস্য অনুমান করিতে পারিবে? চিরদিনের জন্য এ ঘটনা মনে গাঁথা হইয়া রহিল, এক অপূর্ব অপার্থিব দৃশ্যের স্মৃতি-দুঃখ-যন্ত্রণার সময় একথা মনে পড়িবে। জীবন রুক্ষ হইয়া উঠিলে এ আশা করিবার সাহস থাকিবে যে খুঁজিলে এমন কিছুও পাওয়া যায় জগতে, বাঁচিয়া থাকার চেয়ে যা বড়ো। শোক, দুঃখ, জীবনের অসহ্য ক্লান্তি এসব তো তুচ্ছ, মরণকে পর্যন্ত মানুষ মনের জোরে জয় করিতে পারে : কত সংকীর্ণ দুর্বল চিত্তে যে যাদব বৃহতের জন্য, মৃদু হোক, প্রবল হোক, ব্যাকুলতা জাগাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শশী তাই ভাবে। যখন ভাবে, তখন আফিমের ক্রিয়ায় যাদবের চামড়া ঢাকিয়া চটচটে ঘাম, বিন্দুর মতো ছোট হইয়া আসা চোখের তারকা আর মুখে ফেনা উঠিবার কথা সে ভুলিয়া যায়।[১৮]

যাদব আত্মহত্যা করেছে নিজের ওপর আধ্যাত্মিক মহিমা আরোপের জন্য। সকলের সত্যকে, সকলের বিশ্বাসকে, নিজ জীবনের বড়ো একটি মিথ্যায় যাদব স্থায়ী করতে চেয়েছিলেন। তার সূর্যবিজ্ঞান, তার মৃত্যু—এসবই মিথ্যার কারসাজি, যা দিয়ে তিনি গরিমাপ্রাপ্ত হতে চেয়েছিলেন। আমরা জানি দ্যুরকহাইম আত্মহত্যার যে শ্রেণিবিভাগ করেছেন, তার মধ্যে যাদবের আত্মহত্যা পড়ে না। এটা কোনো অহংবাদী, পরার্থবাদী বা অ্যানোমিক আত্মহত্যা নয়। এর স্বরূপ ভিন্ন। এক ধরনের আধ্যাত্মিক উচ্চতাপ্রাপ্তির আশায় অহমের প্রতিক্রিয়ায় এ আত্মহত্যা আয়োজিত। কিন্তু এই আত্মহত্যার আড়ালে কাজ করেছে সামান্য হলেও জীবনের প্রতি মোহ, যা অন্যান্য আত্মহত্যার ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয় না। যাদব বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন, শশীর পুরী চলে যাওয়ার প্রস্তাবে মনের দিক থেকে তার সায়ও মিলেছিল, কিন্তু শশী-ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি পরাজিত হতে চাননি; কারণ একমাত্র শশীই তাকে মান্য করে না। আর শশীকে বিশ্বাস জন্মানোর জন্যই তার স্বেচ্ছামৃত্যু। এটা ছিল শশীর কাছে যাদবের অহম্ প্রতিষ্ঠার শেষ প্রচেষ্টা।

আত্মহত্যার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি—বিষাদ, একাকিত্ব, নৈরাশ্যবাদ ইত্যাদি অন্তর্বাহী উপাদানগুলোর একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মানুষ এই উপাদানগুলোর দীর্ঘসূত্রী উপস্থিতিতে হাহাকার করে ওঠে। ভেবে ভেবে উচ্চকিত হয়—কেন জীবন,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেন বা নয় মৃত্যু। রাসেলের মতো নাস্তিক আশাবাদী ব্যক্তিও তাঁর বিখ্যাত *আত্মজীবনীতে* এই হতাশার আলোকপাত করেছেন:

> প্রত্যেক কয়েদিই বিশ্বাস করে যে তার দেয়ালের বাইরে এক মুক্ত জগৎ অস্তিত্বমান; কিন্তু এখন সারাবিশ্বই এক কারাগার; এখন অন্ধকার—কোনো কিছু ছাড়াই, কিন্তু যখন আমি মারা যাব তখন ভেতরে সবই অন্ধকার। কোথাও দীপ্তি নেই, ব্যাপকত্ব নেই; শুধু মুহূর্তের গতানুগতিকতা, আর তারপর কোনো কিছুই না। কেন এই জগতে বেঁচে থাকা? কেন বা মরা ?[১৯]

রাসেল তাড়িত হয়েছিলেন ক্ষণিক নৈরাশ্যে, নিরর্থকতায়। হয়তো তা আপতিক ছিল তাঁর ওপর। কিন্তু কবিশিল্পীদের মধ্যে তা ব্যাপক সংগতি ও অভিভাবে উপস্থিত হতে দেখা যায়। রোম্যান্টিক কবিরা তাদের অন্তর্নিহিত বিষাদকে দেখেছেন অন্যভাবে। সৃষ্টিশীলতা ও বিষাদের মধ্যকার যে-অন্তরঙ্গতম সম্পর্ক ও সম্মিলন রেনেসাঁ-সময় থেকে উজ্জীবিত হয়েছিল, রোম্যান্টিকেরা তাকে পরিণত করেছিল সৃষ্টিশীলতা ও অকালমৃত্যুর পারম্পর্যে। রোম্যান্টিকেরা মনে করতেন, জীবনের সত্যিকার অনুভূতি মধ্য-বয়স পর্যন্ত থাকে না। অথবা তাঁরা যে "ভিশনারি পাওয়ার" বা পরাদৃষ্টিশক্তির কথা বলতেন, তাকে যৌবনেরই দান মর্মে তাঁরা অনুভব করতেন। অতএব রোম্যান্টিকদের বিশ্বাস যেহেতু যৌবনাশ্লিষ্ট ছিল, তাই যৌবনের স্বাভাবিক সংবহে বিষাদ ও বেদনা তাঁদের অধিকার করে রাখত। এই বিষাদ ও নৈরাশ্য ঠিক অন্যভাবে আধুনিকদের মধ্যেও বহমান হতে দেখা যায়, যার দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া হিসেবেই আত্মহত্যাস্পৃহা দানা বাঁধতে স্বতশ্চল হয় কবিদের মনে। বিংশ শতাব্দীর আধুনিকবাদের প্রধান পথিকৃৎ টি. এস. এলিঅটের কবিতায় ও প্রথম জীবনে এই নৈরাশ্য অন্যভাবে আত্মপ্রকাশিত হয়। বিষাদ, হতাশা, নির্বেদ তাঁকে জর্জরিত করেছিল মারাত্মকভাবে। ১৯১৫ সালে যাকে তিনি বিয়ে করেন সেই ভিভিয়েন হে হেউড ছিলেন মানসিক রোগী; ১৯৪৭ সালে উন্মাদাশ্রমে তাঁর মৃত্যু হয়। হয়তো পরবর্তী সময়ে ধর্মে আশ্রয়গ্রহণের মাধ্যমে এসব চিন্তাকে মোকাবিলা করেন তিনি। এলিঅটের কবিতায় ব্যক্তিমথিত নৈরাশ্য বহুধাভাবে প্রতিফলিত:

> হলুদ কুয়াশা যেটি জানালার কাচে কাচে পিঠ ঘষে যায়,
> হলুদ ধোঁয়াও যেটি জানালার কাচে কাচে মুখ ঘষে যায়,
> জিভ দিয়ে চেটেছিল সন্ধ্যার কোণগুলি, আর
> ঝুলে ছিল নর্দমার স্রোতের ওপর
> পিঠে নিয়েছিল তুলে চিমনি থেকে খসে-পড়া ঝুল
> চিলেকোঠা-ফসকানো যেন বা লাফিয়ে-পড়া ভূমে
> বাড়ির চারপাশে ঘুরল একবার, অবশেষে ঢলে পড়ল ঘুমে।[২০]

বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশের মধ্যে আগাগোড়াই বিদ্যমান ছিল এই নৈরাশ্যবোধ; তাঁর মৃত্যুকেও মৃদুভাবে বিবেচনা করা হয় সম্ভাব্য আত্মহত্যা হিসেবে।[২১] মৃত্যুচেতনা তাঁর ভেতর কাজ করেছিল আগাগোড়াই। অসংখ্য কবিতার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভেতর একটি কবিতাকে এখানে উদ্ধৃত করা যায় যেখানে কবি চিরস্থায়ী অন্ধকারের কথা বলেছেন। কবিতাটির নাম "মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল"

> মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল পৃথিবীর বুকের ভিতরে
> চারিদিকে রক্ত ঋণ গ্লানি ধ্বংসকীট নড়েচড়ে।
> তবুও শিশির সূর্য নক্ষত্র নিবিড় ঘাস নদী নারী আছে,
> হারিয়ে যেতেছে প্রায় আজ।
> মানুষের সাথে মানুষের প্রিয়তর পরিচয়
> নেই নেই আর;
> আলো আছে তবুও—আলোয় ভরে রয়েছে অন্ধকার।

জীবনানন্দ দাশ আলোয় ভরে থাকা অন্ধকারের কথা বলছেন, যেন তিনি বলছেন জীবনের ভেতর মৃত্যুর কথা, আশার ভেতর নিরাশার কথা। তাঁর একটি ছোটোগল্প "সঙ্গ-নিঃসঙ্গ"-তেও এই হতাশাবোধ ধরা পড়ে যা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনও:

> জীবনটাকে এইরকম নিস্তব্ধতা ও শূন্যতায়ই ভরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে আমার। আমার কামনা কী জান? বঁইচি, ময়নাকাঁটা, বাবলা, ফণিমনসা, বন-অপরাজিতার পাশ দিয়া এক-একটি শাদা ধুলামাখা ভারী স্নিগ্ধ আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ থাকে—তাহারই পাশে থাকে এক একটা প্রান্তরের অপরিসীম নিঃশ্বাসের নিস্তার—সবুজ ঘাস আছে সেখানে... সেইখানে খড়ের একখানা ঘর তুলিয়া পড়ি, লিখি, চুরুট ফুঁকি, দিন কাটাইয়া দেই।

মাল্যবান উপন্যাসেও পাওয়া যায় এরকম অন্তর্দাহময় শীতল উক্তি:

> আকাশে অনেক তারা, বাইরে অনেক শীত, ঘরের ভেতর প্রচুর নিঃশব্দতা, সময়ের কালো শেরওয়ানির গন্ধের মত অন্ধকার: বাইরে শিশির পড়ার শব্দ, না কি সময় বয়ে যাচ্ছে, কোথাও বালুঘড়ি নেই, সেই বালুঘড়ির ঝিরি-ঝিরি শিরি-শিরি ঝিরি-ঝিরি শব্দ: উৎপলার ঠান্ডা সমুদ্রশঙ্খের মত কান থেকে ঠিকরে—মাল্যবানের অন্তরাত্মায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আত্মবিচ্ছিন্নতাবোধ কাজ করেছিল তাঁর মধ্যে এবং তাঁর জীবনকেও এর থেকে পৃথক করে দেখার উপায় নেই। তাঁর মৃত্যুও রহস্যময়—দুর্ঘটনা ও আত্মহত্যার এক চমৎকার ধাঁধা। সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছেন "আমার মনে হয় জীবনানন্দ ঠিক ট্রাম-দুর্ঘটনায় মারা যাননি। যদিও এই কথাটাই সর্বত্র বলা হয়ে থাকে এবং আমরা দেখেছি, তথাপি আমার ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন।" ক্লিন্টন বি. সিলিও বলেছেন, যে-কোনো কারণেই হোক, হয়তো বিস্মরণে, জীবনানন্দ দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন ট্রাম রাস্তার ওপর।

স্বল্পজীবী কবিদের মধ্যে নৈরাশ্য, দুঃখবোধ আর ধ্বংসোন্মুখতা কাজ করে যা তাঁদের আত্মধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে যায়। রিক্ত-নিঃস্বতার এক দহনে তাঁরা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। আত্মদহন তাঁদের জীবনকে দিতে চায় এক বিপরীত তৃপ্তিবোধ। তুষার রায়ের (১৯৩৪-৭৭) "দেখে নেবেন" কবিতায় আমরা দেখতে পাই এসব আত্মহননের ক্যারিকেচার :

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিদায় বন্ধুগণ, গনগনে আঁচের মধ্যে
শুয়ে এই শিখার রুমাল নাড়া নিভে গেলে
ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন পাপ ছিল কি না

এখন আমার কোনো কষ্ট নেই, কেননা আমি
জেনে গিয়েছি দেহ মানে কিছু অনিবার্য পরম্পরা
দেহ কখনও প্রদীপ সলতে ঠাকুরঘর
তবু তোমরা বিশ্বাস করো নি
বার বার বুক চিরে দেখিয়েছি প্রেম, বার বার
পেশী অ্যানাটমী শিরাতন্ত্র দেখাতে মশাই
আমি গেঞ্জি খোলার মতো খুলেছি চামড়া
নিজেই শরীর থেকে টেনে
তারপর হার মেনে বিদায় বন্ধুগণ,
গনগনে আঁচের মধ্যে শুয়ে এই শিখার
রুমাল নাড়ছি
নিভে গেলে ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন
পাপ ছিল কি-না।

বাংলা ভাষার স্বল্পজীবী কবিদের অন্যতম অনন্য রায় (১৯৫৫-১৯৯০)। তাঁর কবিতায়ও বিপণ্নতা, ক্লান্তি, মৃত্যু প্রগাঢ়ভাবে ডানা-বিস্তার করে আছে।

১. কী ভারি, ভোঁতা, অলস ক্লান্তি —এই জীবন!
পৃথিবীর সমস্ত বেড়াল তাদের থাবায় মেখে নেয় নরম গোলাপি
নিঃশব্দ শিশির
আর তাদের তাড়া করে বিবর্ণ মৃত্যুর মতো মোমের খেঁকশিয়াল
অ্যালুমিনিয়ামের চাকতির মতো কঠিন হিংস্র চোখে;
মাথার ভেতর ফেটে পড়ছে বিস্মৃতির মতো ভারি এক পৃথিবী।[২২]

২. যেন মৃত্যু; ভয়ার্ত আদরণীয় মরচে পড়া নখ
বহুকৌণিক জ্যোৎস্নায় শিকারির গুলি ও হরিণ
একাকার;[২৩]

আমাদের আরেক স্বল্পায়ু কবি আবুল হাসান, বেঁচেছিলেন মাত্র ২৯ বছর, তাঁর মৃত্যুর সাথে মিল দেখি জন কিট্‌সের মৃত্যুর, তিনিও তাঁর কবিতায় বিষণ্ণতা ও দুঃখবোধের কথা বলেছেন। "ভিতর বাহির" কবিতায় তিনি বলছেন:

আমার শরীর খোঁড়ো, দুঃখময় আত্মার গাঁথুনী, দ্যাখো আমি ঠিকই
খণ্ডিত ইটের মতো খুলে যাবো সহজেই, কিছুই থাকবো না!
মায়া ও মমতা ছাড়া, মানুষের দুঃখবোধ, ব্যথাবোধ ছাড়া আমি
কিছুই থাকবো না!

অস্তিত্বের সংকটের কথা বলতে গিয়ে নিজে অমর আত্মার এক মোহময় ও ভঙ্গুর অবস্থানকে তিনি তুলে ধরতে চান:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কে বলে নিঃশেষিত?
নিঃশেষিত হতে হতে তবু সব নিঃশেষিত হয়নি এখনো!
মদের পাত্রের ঠোঁটে শেষ মদিরার চিহ্ন
কে কবে মুছেছে ঠোঁটে? কার সাধ্য, কতদূর পারে?

নিঃশেষিত হইনি ভিতরে।
থরে থরে মাটির পাত্র জুড়ে
আমি আছি শেষ মদ!
কেউ তাকে পারবে না চুমুকে সরাতে![২৪]

আত্মঅসুস্থতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

হা সুখী মানুষ, তোমরাই শুধু জানলে না।
অসুখ কত ভালো, কত চিরহরিৎ বৃক্ষের মতো শ্যামল
কত পরোপকারী, কত সুন্দর![২৫]

তাঁর এই কবিতা-পঙ্‌ক্তি মনে করিয়ে দেয় ভ্যান গঘের কথাকে: "অসুস্থতা শরীর পবিত্র করে, আমাদের ভালো থাকতে শেখায়।"[২৬] "বাইরে থেকে যন্ত্রণা পাই ঠিকই তবে জীবন কি অন্তরের দিকে সমৃদ্ধতর হওয়ার জন্যই নয়?"[২৭] অর্থাৎ ভাবনাই ছিল এই ভেবে সুখী যে জীবন অসুখী। এই লক্ষণ রোম্যান্টিক লক্ষণ যা মৃত্যুমোহানার কথা মনে করিয়ে দেয়, যেন এই মৃত্যুমোহানার জন্যই জীবন। এসব কবিদের নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব ও মৃত্যুমুখিতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রোম্যান্টিক কবিদের, যাঁদের কাছে মৃত্যুময়তা আর বিষাদগ্রস্ততাই স্বল্পস্থায়ী জীবনের মৌল বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি ছিল অন্যরকম: "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/তবুও শান্তি, তবু অনন্ত, তবু আনন্দ জাগে।" কিন্তু যৌবনে রবীন্দ্রনাথ বিষাদেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনিও হতাশার কথা বলেছেন, "নির্জনের প্রিয় বন্ধু" হিসেবে পড়া শুরু করেছিলেন *আমিয়েল-এর জার্নাল*। আঁরি ফ্রেদরিক আমিয়েল উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের এক নিঃসঙ্গ প্রতিভা।[২৮] তিনি ছিলেন চরম নৈরাশ্যবাদী। আমিয়েলের কাছে জীবন একটি অলীক ব্যাপার, প্রলোভন ও ধাপ্পামাত্র। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন, বুদ্ধ ও শোপেনহাওয়ারের নৈরাশ্যবাদে তিনি আক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ স্থায়ীভাবে হয়তো আক্রান্ত ছিলেন না, তবে নৈরাশ্য তাঁকেও তাড়িত করেছিল

যখন আমরা নিছক সুখভোগ করতে থাকি তখন
আমাদের মনের একার্ধ অকৃতার্থ থাকে, তখন একটা
কিছুর জন্য দুঃখভোগ এবং ত্যাগস্বীকার করতে
ইচ্ছা করে, নইলে আপনাকে সুখলাভের অযোগ্য
বলে মনে হয়—[২৯]

আমিয়েল ছিলেন দুঃখবাদী, আত্মজিজ্ঞাসাময়, গভীর ও বেদনাক্রান্ত। কিন্তু তেত্রিশ বছর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ কেন *আমিয়েলস জার্নাল* পড়ে মুগ্ধ হচ্ছিলেন? তিনি লিখেছিলেন :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে—আমি লো [কেনে]র ওখেন থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি—যখনি সময় পাই সেই বইটা উল্টে-পাল্টে দেখি। ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি—এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা আছে এবং এ বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এই বইটি আমার মনের মতো বই।[৩০]

কেন তেত্রিশ বছর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ আমিয়েলের সাথে এত অন্তরঙ্গ সামীপ্য অনুভব করলেন? এর উত্তর নিহিত আছে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক বহিরস্থিত রূপে। তেত্রিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ রোম্যান্টিক। পরম র‍্যোমান্টিক, আর পরম র‍্যোমান্টিক হিসেবে সে-সময়ে বিষাদে তিনি অবশ্যই আক্রান্ত ছিলেন, মৃত্যুতে ছিলেন আশ্লিষ্ট। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "...রোম্যান্টিক মনের স্বাভাবিক প্রবণতায় দু'জনেই প্রকৃতির রূপে দেখেছেন বিষাদ আর বৈরাগ্যের ছায়া।"[৩১] আমিয়েল বলেছেন, "আহ রাতের-প্রহর, নৈঃশব্দ্য আর নীরবতার প্রহর!—তোমরা দয়ালু আর বিষাদময়।"[৩২] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালোবাসি। এর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে, "আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে।... জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে।"[৩৩]

রোম্যান্টিক মানসের কারণেই মৃত্যু এবং হয়তো আত্মহত্যাও তাঁর তরুণ মনে উঁকি দিয়েছিল। বিষয়টি একেবারে অমূলক নয়, না-হলে কেন ৩৩ বছর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ *সোনার তরী* কাব্যের "প্রতীক্ষা" কবিতায় লিখবেন—"একে একে চলে যাবে আপন আলয়ে সবে/সখাতে সখীতে,/তৈলহীন দীপশিখা নিবিয়া আসিবে ক্রমে/ অর্ধরজনীতে?" তাছাড়া তিনি যে আমৃত্যু নৈঃসঙ্গ্যে আক্রান্ত ছিলেন তা তাঁর জবানিতেই ফুটে উঠেছে; দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফেরার পথে এক দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন: "জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।" আর একটি বিষয়, যৌবনেই তিনি দেখেছিলেন তাঁর প্রিয় একজনের আত্মহত্যা, তিনি হলেন প্রিয় বৌঠান, অনেকের মতে তাঁর প্রথম ও জীবনবিস্তারি প্রেমিকা কাদম্বরী দেবী, যার স্বেচ্ছামৃত্যুর কারণ হিসেবে তিনিই হয়তো পরোক্ষে কিছুটা হলেও দায়ী ছিলেন, আর প্রেমিকার আফিম খেয়ে আত্মহত্যা তাঁকেও কিছু মাত্রায় তাড়িত করাই ছিল স্বাভাবিক। আর তা না হলে কেন তিনি বলবেন দিন-রাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা তাঁকে তাড়না করছে, কেন তিনি ভাববেন তাঁর দ্বারা কিছুই হয়নি হবেও না, তাঁর জীবন আগাগোড়াই ব্যর্থ? এটা হয়তো ছিল এক পক্ষান্তরিত স্পৃহা রবীন্দ্রনাথ যাকে লালন করেছেন সেই দুর্ঘটনার পর থেকে। হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আজীবন তাঁর ভেতর কাজ করেছে প্রিয় বৌঠানের আত্মহত্যার এক পক্ষান্তরিত অপরাধবোধ, যাকে তিনি ক্ষতিপূরিত করতে চাইতেন নিজ জীবনে। প্রকৃতপক্ষে যে দুটি উপাদান, বিষণ্নতা ও অসম্বন্ধতা, আত্মহত্যার প্রধান নিয়ামক, তা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল নানাভাবে সক্রিয় যা মাঝে মাঝেই তাঁকে নিরন্তর উস্কে দিত আত্মহননের জন্য, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি চূড়ান্ত ফলাফলে, কারণ ছিল তাঁর সামগ্রিক জীবনবোধ। তিনি স্থিরভাবে বিশ্বাস করতেন, "দুঃস্বপ্নের ঘনজাল ...আমি ছিন্ন করব—এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।" কিন্তু এটাও ঠিক, আত্মহত্যায় তাড়িত হয়েছিলেন তিনি মুহুর্মুহুভাবে, নাহলে কেন তিনি নিজের ছেলেকে লিখবেন, "আমি deliberetely suicide করতেই বসেছিলুম"।[৩৪]

এমিল দ্যুরকহাইম অ্যানোমি উদ্ভূত আত্মহত্যার কথা বলেছেন তাঁর বইয়ে। তিনি বলেছেন, অর্থনৈতিক অ্যানোমিই একমাত্র অ্যানোমি নয় যার থেকে আত্মহত্যার জন্ম হয়।[৩৫] তিনি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন গৃহস্থিত অ্যানোমিকে যা মূলত স্ত্রী-স্বামীর সম্পর্কনির্ভর। দ্যুরকহাইম একে বলেছেন "দাম্পত্য অ্যানোমি" যার পরিণতিতে আত্মহত্যা দেখা দিতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কের দূরত্বের মাধ্যমে তা ঘটে থাকে। বিয়ের এক ধরনের আনুকূল্য আছে, তা যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যায় তবে স্ত্রী আত্মহত্যা করতে পারে এবং এর বিপরীতটাও ঘটতে পারে। পুরুষনির্ভর সমাজে এই অনুকূলতার ভারসাম্যহীনতা নারীর জীবনে মারাত্মক ঘটনা ঘটাতে পারে। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *অন্তঃশীলা* উপন্যাসে এ জাতীয় একটি আত্মহত্যার ক্যারিকেচার দেখা যায়।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় কেন্দ্রীয় চরিত্র খগেনের স্ত্রী সাবিত্রীর আত্মহত্যা: "সাবিত্রী দেবী, খগেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী, ক্ষণিক উন্মাদনার বশে আত্মহত্যা করেছেন।"[৩৬] উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে, "একজন তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি" যে পলায়ন করেছে "বাস্তব জগৎ ও ভাবের রাজ্য" থেকে। খগেনবাবুর সাথে তার স্ত্রীর মানসিক পার্থক্য ছিল ভয়াবহ; খগেনবাবু এজন্য দোষ দিতেন সাবিত্রীর স্বভাবকে: "সাবিত্রীর স্বভাবই ছিল তাই, সন্দেহ আর সন্দেহ" আর খগেন্দ্রের আত্মভাবনা, নিজের ভেতর আবদ্ধ হয়ে থাকাই সাবিত্রীর মৃত্যুর কারণ। উপন্যাসের অষ্টম অংশে সুজনের উদ্দেশে বিজনের সংলাপে খগেন-চরিত্রের এই দিক ধরা পড়ে:

> খগেনবাবুর মনে বুদ্ধিতে আমার কাজ নেই সুজনদা। কচকচানি প্যাঁচ কাটা আমার ধাতে বসে না। রস সব শুখিয়ে গেছে ভদ্রলোকের! যার স্ত্রী মরেছে মাত্র দুদিন আগে—মাপ কেরো তোমরা—সে কি করে তর্ক করে। বলবে তোমরা, চিন্তা যাঁরা করেন, তাঁদের স্বভাবই ঐ। ও রকম thoughtful লোকের সংস্পর্শে নদীও শুখিয়ে যায়, সাবিত্রী কোন ছার! তোমরা কিছু মনে করো না। তোমাদের হীরোকে আমি নিন্দা করছি বলে। কিন্তু ও কী রকম চিন্তা, যার তাপে সব মুষড়ে পড়ে, নিজের বসি, ভাবগুলো পর্যন্ত?[৩৭]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখা যাচ্ছে, সাবিত্রীর আত্মহত্যার পেছনে কাজ করেছে দাম্পত্য-অ্যানোমি যা সম্পর্কের সাঁকোটিকে ভেঙে দিয়েছিল; এবং এর ফলে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সাবিত্রী।

উপন্যাসে আত্মহত্যার কতকগুলো কুসংস্কারও উঠে এসেছে। আমরা দেখেছি আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টির ক্ষেত্রে সংস্কারের বিষয়: প্রাচীন গ্রিসে কখনও কখনও সম্মানচ্যুতি করে[৩৮] আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহ সংস্কার করা হতো। খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মধ্যেও দেখা গেছে সাংঘাতিক অনড় নিয়ম। হিন্দুরা অপঘাতে মৃত্যু বা অপমৃত্যুর ক্ষেত্রে বাদ দেয় কতিপয় ধর্মীয় সংস্কার—এ বিষয়ে উপন্যাসটিতে উল্লেখ আছে।

> খাটটা কাঁধে তোলবার সময় মুণ্ডুটা নড়বড় ক'রে উঠল। একজন বাহক বলে উঠলেন, "দোহাই মা জেগে উঠবেন না।" অগ্রবর্তী বাহকদের মধ্যে একজন ধমক দিলেন, "কি ইয়ারকি করছিস? সিগারেট নে—হরিবোল বলতে নেই জানিস ত।"...কিন্তু হরিবোল বলতে নেই—এ যেন মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে! যারা আত্মহত্যা করে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সেইজন্য বোধহয় ঈশ্বর-বিশ্বাসী শববাহীরা তাদের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করেন না।[৩৯]

এখানেই শেষ নয়, দেখা যায় দাহ সম্পন্ন হওয়ার পরও আত্মঘাতিনীর দায় শেষ হয় না। পুরোহিত শেষ কার্যে দাবি করে বেশি:

> পুরোহিত হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বল্লেন, "এইবার শেষ কাজটি করতে হবে, নাভি-কুণ্ডলটি বার করুন, আত্মঘাতিনীর কার্যে দক্ষিণা আমরা বেশি নিয়ে থাকি।"[৪০]

আত্মহত্যা একটি অপরিহার্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে ব্যক্তি-বিশেষের কাছে। জীবনানন্দ যখন "বোধ" বা "আট বছর আগের একদিন"-এর মতো কবিতা লেখেন, তখন তাতে জীবনের যে অসহায়তা ও নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হয়, তা কি আত্মহত্যার চেয়ে বেশি দূরে অবস্থান করে? আসলে মৃত্যু ও জীবন ও আত্মহত্যা একান্ত হতে পারে কখনও কখনও। এখন সময় এসেছে দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলানোর। আলভারেজ বলেছেন: "সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী, যারা আত্মহত্যাকে রোগ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে, তা মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা একে মারাত্মক প্রাণঘাতী পাপ হিসেবে দ্যাখে, তার চেয়েও আমাকে বেশি বিহ্বল করে।"[৪১] তিনি আরও বলেছেন: "এখন আমি মনে করি যে, মৃত্যু যখন চূড়ান্তভাবে আসবে, সম্ভবত তা আত্মহত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট হবে, এবং নিশ্চিতভাবেই হবে কম সুবিধাজনক।"[৪২] এখানে দেখি *আমিয়েল্‌স জার্নাল*-এর প্রতিধ্বনি। ১৮৬০ সালের ৫ মে তারিখের নোটে আমিয়েল বলছেন—বৃদ্ধ হওয়া, সক্ষমতার হ্রাস বা জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতাকে মেনে নেওয়া মৃত্যুর চেয়েও কঠিন। সাহিত্য ও আত্মহত্যার সম্পর্কটি অনেকটা পরিপার্শ্বহীন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনস্তত্ত্বগত। মৃত্যুকে জীবন ধারণ করে এবং তার ডিমে তা দেয়; ফলে তা বেরিয়ে আসে খোলস ভেঙে। আত্মহত্যা জীবনের হঠাৎ যবনিকাপাত ঘটায়, তবে স্বাভাবিক মৃত্যুর মতোই তা-ও কোনো অজানা জগতের ইশারায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে নীরব একাকিত্ব, নির্মম নৈরাশ্য, মর্মভেদী বেদনা আত্মহত্যাকারীর বিরল সম্বল, তা সাহিত্যেরও নিরবচ্ছিন্ন উপাদান। সুখ বিনোদননির্ভর, তা সৃষ্টিশীল নয়। কিন্তু বিষাদ ও নৈরাশ্য সৃষ্টিশীল।

মৃত্যুকে জন্ম দেয় জীবন, তাকে বহন করে সে, কিন্তু জীবনের ভেতর সুপ্তাবস্থায় থাকে মৃত্যু। মৃত্যু হলো জীবনের সমাপ্তি। তা আসে প্রাকৃতিক নিয়মে কাউকে জানান না দিয়ে। তবে কেউ কেউ নিজেই এর সমাপ্তি টানেন। মৃত্যু মৃত্যুই কিন্তু আত্মহত্যার মৃত্যু অন্যরকম, যেন ভিন্ন, ঠিক জীবনানন্দের কবিতাটির মতোন কলরব ছাড়াই অনুভূতিময়:

> পথের কিনারে দেখলাম একটা বেড়াল পড়ে আছে
> আস্তে আস্তে ছটফট করে মারা যাচ্ছে;
> কেন এই মৃত্যু?—বরং অল্পবয়সের এই প্রাণীটির?
> একে ঘিরে কোনো জনতা নেই,
> খানিকটা কলরবও নেই এর মৃত্যুকে আস্তে আস্তে ভালোবেসে তরিয়ে দেবার জন্য
> বেড়ালটা তার শরীরের সমস্ত সাদা কালো রং দিয়ে
> মুহূর্তের জন্য আমার মনের ভেতর চিন্তা হয়ে এল,
> তার নির্জন অদ্ভুত শরীরের সমস্ত সাদা কালো রং নিয়ে
> আমার কবিতার ভেতর এল,
> বললে, "এর চেয়ে অসাধারণ দাবি কোনোদিন করব না আমি আর।"[৪৩]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও বঙ্গীয় কয়েকজন অন্ধকার

যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন
হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্য
সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক
পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়।
কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়,
মুহূর্তে, মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বলো, সংহার দেবতা! বলো: কোথা
থেকে আমি আসছি, কোথা যাবো,
বলো—অস্তিত্বের অর্থ আছে কি না?

অনন্য রায়

সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কখন জাগে, আর কখনই বা তা নিরঙ্কুশ হয়? আমরা জেনেছি অ্যানোমিসংক্রান্ত কারণের কথা যা আত্মহত্যার ক্ষেত্রে একটি বিশাল প্রভাবশালী উপাদান। এই অ্যানোমি মূলত নৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাজনিত। জন-মানুষের ক্ষেত্রে এর এক বা একাধিক উপাদানের উপস্থিতিজনিত কারণে সংঘটিত হয় আত্মহত্যা। কিন্তু মৃত্যুবাসনা আবির্ভূত হতে পারে অন্তরঙ্গ আকুতি নিয়ে, আর এক্ষেত্রে নৈতিক দায়িত্বের সম্পাদন হিসেবে স্বেচ্ছামৃত্যু সংঘটিত হতে পারে আন্তরিকভাবে। জীবন মূল্যবান এবং অনুপম, তা বহন করতে পারে নানা সামাজিক বোঝা, অসংখ্য দায়িত্বের ভেতর দিয়ে গিয়েও তা ক্লান্ত হয় না, বরং নানামুখী ও প্রভূত সংঘর্ষে তা শক্তিমানও হয়ে উঠতে পারে কখনও কখনও; অসংখ্য ব্যর্থতা ও পরাজয়ও তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু নিজের কাছেই নিজের জীবন অসহনীয় ও অনৈতিক হয়ে উঠতে পারে, আর তখন তাকে বহন করার অর্থ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করা এবং নিজের ও অন্যের দুঃখকে দীর্ঘায়িত করা। বেঁচে থাকার প্রতিটি অনুভূতিময় মুহূর্তই অসহ্য আর যন্ত্রণাময় হয়ে উঠতে পারে কষ্ট আর অনারোগ্য রোগ-যন্ত্রণার কারণে, তখন এ অনুভূতিও স্থায়ী হয়ে দেখা দেবে, দিতে বাধ্য [illegible] হিপ্পোক্রাতেস শপথ[1] অর্থহীন, চিকিৎসকের

~ www.amarboi.com ~

প্রবোধ হাস্যকর। যে-চিন্তা, আত্মসম্মান, সুস্থতা, স্বাধীনতা, উপযোগিতা মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় মর্মে প্রতিটি মুহূর্তে অনুভূত হয়, তা উবে যেতে পারে, কারণ ব্যক্তির অস্তিত্ব তখন শুধু তার নিজের জন্যই নয়, আত্মীয়-স্বজন-চিকিৎসক এবং সমাজের জন্যও আত্মিক দৈন্য ও সাধ্যাতীত অর্থহীন ব্যয়কে বাড়িয়ে তুলতে পারে। আর এক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের কথার মতোই ব্যক্তির মনে হতে পারে: "বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে, মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন।"[২] এবং যখন "আজ এবং কাল" সকল সময়েই জীবন অর্থহীন ও অবহনীয় হয়ে ওঠে, তখন সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়াটাই নান্দনিক এবং যৌক্তিক, আর এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকারান্তরে হয়ে ওঠে আত্মহত্যার অধিকার।

কিন্তু এই স্বেচ্ছামৃত্যুর দায় যখন অন্য কারও ওপর বর্তাবে তখন সে তাকে কীভাবে পালন করবে? স্বেচ্ছামৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা হয়তো প্রতিভাত হবে নৈতিক ও প্রয়োজনীয় বলে কিন্তু যখন তার সংঘটনের সাথে সংযুক্তি ঘটবে অন্য ব্যক্তির, তখন পরিস্থিতি হয়ে উঠতে পারে জটিল, এবং মানবিক সম্পাদনের সাথে জড়িয়ে পড়বে অমানবিক সহযোগিতার অনৈতিক দিকটি। আত্মহত্যার উদ্‌যোগী ব্যক্তি অসহ্য ও অপরিত্রাণনীয় অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য যদি নিজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলে, তবু ইচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হলে তখন নৈতিকতা ও মানবিকতার এক দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। আরোগ্যের অতীত অবস্থায় ব্যক্তি আছে কি না—তার জন্য চিকিৎসকের মতামত অনস্বীকার্য কিন্তু এক্ষেত্রে মতামতও আপেক্ষিক হতে পারে, হতে পারে অস্পষ্ট ও অবিবেচনাপ্রসূত। চিকিৎসকের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্বই হলো শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বের পক্ষে কাজ করে যাওয়া, হিপ্পোক্রাতেস শপথ তা-ই বলে। আর যদি ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর্যায়ে না থাকে, তাহলে তার মৃত্যুর বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে: দেখা দেয় নানা আইনি জটিলতা এবং মানবিক-ও-নৈতিক বিপত্তি। টেরি শিয়াভোর বেঁচে থাকা[৩]-সংক্রান্ত জটিলতা এরই জ্বলন্ত উদাহরণ। ১৯৯০ সালে ফ্লোরিডার গৃহবধূ টেরি শিয়াভো হৃদ্‌রোগজনিত মস্তিষ্ক-রোগে আক্রান্ত হন। মস্তিষ্ক অকার্যকর হওয়ায় তাকে বাঁচিয়ে রাখতে নলের সাহায্যে খাবার দিয়ে রাখা হয়। এভাবে পনেরো বছর ধরে কৃত্রিমভাবে নলের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করে টেরি বেঁচেছিলেন। নল খুলে নিলে তিনি খুব তাড়াতাড়িই মৃত্যুবরণ করতেন। টেরির স্বামী মাইকেল শিয়াভো টেরিকে মৃত্যুর অধিকার দিতে ও তার খাদ্য সরবরাহকারী নল খুলে দেওয়ার প্রতিকার চেয়ে আদালতে আবেদন দায়ের করেন এ যুক্তিতে যে, যেহেতু চিকিৎসকেরা চূড়ান্তভাবে বলে দিয়েছেন টেরিকে সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়, সেহেতু তাকে যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তার খাদ্য সরবরাহকারী নল খুলে নেওয়া হোক, এবং তিনি দাবি করেন যে, টেরির ইচ্ছাও তা-ই। কিন্তু টেরির মা ও বাবা আশা করতে থাকেন, টেরিকে একদিন চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হবে এবং এজন্য তারা নলের সাহায্যে টেরিকে খাদ্য সরবরাহ চালিয়ে রাখার জন্য আদালতে আবেদন জানান। এই অবস্থায় ২০০০ সালে আদালত টেরির খাবারের নল খুলে দেওয়ার আদেশ দেন। কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২০০৩ সালে ফ্লোরিডার নিম্নকক্ষ, গভর্নর বেজ বুশের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে, টেরির জীবনরক্ষার জন্য "টেরির আইন" শীর্ষক একটি আইন পাস করে যার মাধ্যমে গভর্নর পুনঃ নল সংযোজনের জন্য নিরাময় কেন্দ্রের চিকিৎসকদের নির্দেশ দেন। এ নিয়ে নানা আইনি জটিলতা দেখা দিতে থাকে—বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। এক পর্যায়ে টেরির মুখে খাবার সরবরাহকারী নল পুনঃসংযোজনের জন্য কংগ্রেসে বিল পাস করা হয় যাতে প্রেসিডেন্ট বুশ স্বাক্ষর করেন। বিষয়টি থেকে একটি ব্যাপার স্পষ্ট যে, টেরির মৃত্যু ঘটানোর জন্য তার স্বামী ও পিতা-মাতার মতের অনৈক্য। টেরি নিজে মতামত দেওয়ার মতো শারীরিক সুস্থতায় ছিলেন না, তাই তার স্বেচ্ছামৃত্যুর বিষয়টি এখানে গোলমেলে হয়ে ওঠে। টেরি কখনও সুস্থ হবে না মর্মে চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও তাকে বাঁচিয়ে রাখার বিষয়টি গুরুত্ব পায়, যদিও শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়। নিজেই নিজের মৃত্যু ঘটালে এসব জটিলতার আবির্ভাবের সুযোগ থাকে না, কিন্তু যেখানে স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে সহযোগিতার, সেক্ষেত্রেই জটিলতার আবির্ভাব ঘটতে পারে।

সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষার কিছু নান্দনিক পূর্ববোধ দেখা দেয় অনেক সময়। এক খাপ-না-খাওয়া মানবের অভীপ্সার আকুতি, এক নিরাসক্ত মনোজাগতিক অবস্থা ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, যার থেকে মুক্তির জন্যই মূলত সংঘটিত হতে পারে আত্মহত্যা। ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছু থেকেই আর সাহায্য পায় না। যেমন জীবনানন্দের "জামরুলতলা" গল্পের নায়ক ভাবে:

> সবুজ পল্লবিত জারুলের ঐশ্বর্য, হেলিওট্রোপ রঙের ফুল, মেহেদি পাতার বনে স্বপ্নাতুর ঝিঁঝি, ছাতিমের ডালপালায় গাঙশালিখগুলোর জীবনোচ্ছ্বাস, কৃষ্ণচূড়ার অজস্র কুঁড়ি, হারানির প্রেম, চারদিককার সফল, প্রচুর, সজীব জীবনের কালীদহ কলরব কিছুই আমাকে সাহায্য করতে পারে না।[৪]

অতএব, বোঝা যাচ্ছে, জীবনের অনুকূলে বেঁচে থাকার প্রবর্তনাগুলো অদৃশ্য হতে থাকে, পৃথিবী ও তার দৃশ্যমান উপাদানরাশি ব্যক্তিকে আর সহযোগিতা করতে পারে না। যে-জীবনবাসনার প্রেরণা তাকে প্রলুব্ধ করেছিল নিজেকে ভালোবাসতে, তা আজ মৃত্যুবাসনায় পরিণত হয়। বোঝা হয়ে ওঠে জীবন ও তাকে ভালোবাসা, মৃত্যুকে ভালোবাসা কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে। এই মৃত্যুকে ভালোবাসার কথা বলেছেন জীবনানন্দ দাশ অসাধারণ রূপকে

> জেগে জেগে যা জেনেছ—
> জেনেছ তা—জেগে জেনেছ তা,
> নতুন জানিবে কিছু হয় তো বা ঘুমের চোখে সে!
> সব ভালোবাসা যার বোঝা হ'ল—দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে।[৫]

মৃত্যুকে ভালোবাসার এক অবলম্বিত রূপ ও অবিলম্বিত উপস্থিতি দেখা যায় শিল্পী-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে। অনেকে আচ্ছন্ন থাকেন সারা জীবন, তবে এককভাবে কারও কারও জীবনে তা দেখা গেলেও রোম্যান্টিক কবিদের মধ্যে এই বহিরস্থিত

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাবের লক্ষণাদি দুর্মরভাবে ও কখনও মহামারী আকারে দেখা দেয়। হুমায়ুন আজাদ তাঁর একটি অসাধারণ প্রবন্ধ "মধ্যাহ্নের অলস গায়ক: রোম্যান্টিক বহিরস্থিত রবীন্দ্রনাথ"-এ রোম্যান্টিক বহিরস্থিত আর অস্তিত্ববাদী বহিরস্থিতদের হনন-প্রবণতার মৌল প্রকৃতিকে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, রোম্যান্টিক বহিরস্থিতরা যেখানে আত্মহননমুখী, সেখানে অস্তিত্ববাদী বহিরস্থিতরা পরহননমুখী। তাঁর ভাষায়:

> ...রোম্যানটিক বহিরস্থিত সাধারণত জীবন ও সমাজের চাপে ক্রমশ এগিয়ে যায় আত্মহত্যা বা মৃত্যুর দিকে—খুন করে নিজেকে, আর অস্তিত্ববাদী বহিরস্থিত খুন করে অন্যকে।[৬]

সমাপ্তিবাসনার ক্ষেত্রে কিয়ের্কেগার্দ কথিত বেঁচে থাকার নান্দনিক নির্ভরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ জীবনের অনুকূলে সংগত উপাদানরাশির অভাববোধ থেকে ব্যক্তি আত্মসমাপ্তির সিদ্ধান্তে পৌঁছে। এ জাতীয় আকস্মিক দুর্ঘটনায় সমাজ চমকিত হয়, প্রশ্ন করে—কেন? আবুল হাসান তাঁর এক গল্পের সমাপ্তি-পঙ্‌ক্তিতে প্রশ্ন করেন :

> ভদ্রলোকের বাসনার মধ্যে কোনো বিষণ্নতা ছিল না। ছিল তার গলায় শুধু দুঃখের অধিকার। তবু ভদ্রলোক কেন আত্মহত্যা কোরলেন? কেন আত্মহত্যা কোরলেন?[৭]

আত্মহত্যাকারীর বাসনার মধ্যে বিষণ্নতা নেই, কারণ এ বাসনা মৃত্যুবাসনা, এর মধ্যে অনুপস্থিতির উজ্জ্বল ছবি চোখে পড়ে, কারণ মৃত্যুবাসনাও জীবনের এক অপর অভীপ্সার প্রতিফলন, কবি জয় গোস্বামীর কথায়, "মৃত্যুবাসনাও প্রেমেরই মতো, সমাজ মানে না।"[৮] এই মৃত্যু তার কাঙ্ক্ষিত এবং প্রয়োজনীয়, তার অপর সত্তার অভিলষিত কামনার ফল। এই মৃত্যু প্রেমই, প্রেমিকার মতো; আবুল হাসানের ভাষায় তা এক আশীর্বাদ

> সেই কথার অন্বেষাই এখন তার মরণের অনাবিল নদী তার বোধির সব কোলাহলময় জঞ্জাল ভাসিয়ে নিয়েছে—একটা কোলাহলহীন প্রয়োজনীয় মৃত্যু তাকে আশীর্বাদ দিয়ে প্রেমিকার অভাব ঘুচিয়ে দিয়েছে।[৯]

এই মৃত্যুবাসনা তাকে প্ররোচনা দেয়, সে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত। যে জীবনের উষ্ণভূমিতে দাঁড়িয়ে সে অনুভব করতে চেয়েছিল নিজেকে, তা অন্যরকম হয়ে ওঠে। কারণ তার জীবন হয়ে ওঠে মৃত্যুরই সম্পূরণ। বেঁচে থাকা যেন "মৃত্যুরই অনুভূতি!"

> বেঁচে থাকা মাঝে মাঝে গভীর মরণ। মাঝে মাঝে গভীর নিশীথ,
> মাঝে মাঝে গভীর দুপুর থেকে গ্রীষ্মকালও ছুটে আসে!
> যা তোমাকে ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।
> যা তোমার ক্রমশঃ মৃত্যুরই অনুভূতি![১০]

কিন্তু এই মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, অন্যরকম মৃত্যু। জীবনের অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক পরিণতিতে আসে না তা, বরং মনের তাৎক্ষণিক খেয়ালে সংঘটিত হয়। এই বাসনা শিল্পের বাসনার মতো, নিজের অস্তিত্বের মধ্যেই অনস্তিত্বের ভিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিক মৃত্যু মূলত এক দৈহিক মৃত্যু, মৃত্যু তো শরীরের উৎক্ষেপ। কিন্তু স্বেচ্ছামৃত্যু প্রথমত মনের মৃত্যু, স্বাভাবিক দৈহিক মৃত্যুর মতো এর থাকে না বহুমুখীনতা ও অনিশ্চয়তা। স্বাভাবিক মৃত্যু এক বহিরঙ্গ মৃত্যু আর স্বেচ্ছামৃত্যু হলো ব্যক্তির এক অন্তরঙ্গ মৃত্যু, তা সার্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন এক বিশেষ ব্যক্তির সময়ের প্রতিক্রিয়া। হয়তো সময়কে পার করতে পারলে ব্যক্তি ফিরে আসতে পারতেন সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায়। যৌথ-অবচেতনে মৃত্যু সম্পর্কে যে ধারণা থাকে, এক্ষেত্রে ব্যক্তি তা থেকে বেরিয়ে আসেন। প্রচলিত নৈতিকতা থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন। মৃত্যু এক অনিবার্য অস্তিত্ব হিসেবে দেখা দিলে আত্মহত্যাকারী এই বিশ্বাসে উপনীত হন যে, তা এক স্বাধীনতার উপলব্ধি, এক উদ্বেগের অবলুপ্তি। এই চিন্তা একান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং এর থেকে চরম নিষ্ক্রান্তের ইচ্ছা আবির্ভূত হয়। তারা ভাবে, ঘটনা ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনো বিষয় নয়, বরং ব্যক্তির সাথে তার সম্পর্ক অভ্যন্তরীণ। হতাশা সৃষ্টি হতে পারে জাগতিক বা বৈষয়িক বস্তু এবং ভাব থেকে যা অবশেষে পূর্ণসত্তায় সঞ্চারিত হয়, অবশেষে ব্যক্তি নিজের সাথে এক অসহনশীল ও বিরোধপূর্ণ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে দেখা দেয় এক ভিন্ন মৃত্যু যা তার জীবনের নান্দনিক হতাশাকে ব্যক্ত করে নিজে অবশিত হয়। কবির ভাষায় একে বলা যায়:

> যা কিছু জন্মায় সবই মৃত্যুর অধীন। তবু
> কত আর জন্ম ঋণ, কত আর ত্রাহি কণ্ঠে বলা যায়
> এই মৃত্যু, সেই মৃত্যু নয়। পথে পথে পাপের গুহায় ঢুকে
> আদিম টোটেম হিম গলিত লাভায় জমা অধঃপতনের রাহু
> যে মৃত্যুকে গ্রাস করে, এই মৃত্যু সেই মৃত্যু নয়।
> এটা তার বিপরীত ব্যাকুল দ্যোতনা?[১১]

রোম্যান্টিকদের মধ্যে মৃত্যুআচ্ছন্নতা বরাবরই অধিকার করে রাখে তাঁদের জীবনবোধকে, মৃত্যুবাসনা যেন মন ও শরীরাশ্রিত তাঁদের। বাংলা ভাষার মহৎ রোম্যান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনিও প্রথম যৌবনে ছিলেন মৃত্যুবাসনায় তাড়িত। "রবীন্দ্রনাথ কি কখনো আত্মহত্যার কথা ভেবেছেন? অবশ্যই ভেবেছেন; তাঁর প্রথম দিকের কাব্যগুলোতে এর নানা দাগ দেখতে পাই।"[১২]—বলেছেন হুমায়ুন আজাদ। এ ছাড়া প্রথম যৌবনেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এমন একজনের আত্মহত্যা যার সাথে এক রহস্যময় কিংবদন্তিতে তিনি চিরকালের জন্য আবদ্ধ হয়ে আছেন। সেই মানুষটি হলেন কাদম্বরী দেবী, যিনি রবীন্দ্রনাথের বিয়ের কিছুদিন পরেই আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

মৃত্যুভাবনায় ভাবিত হওয়ার কারণ ছিল তাঁর, রবীন্দ্রনাথের, কারণটি তাঁর রোম্যান্টিক বহিরস্থিত প্রকৃতি। হুমায়ুন আজাদ বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ চৌত্রিশ বছর পর্যন্ত ছিলেন স্পষ্টত বহিরস্থিত, তারপর হয়ে ওঠেন প্রচ্ছন্ন বহিরস্থিত—কোলাহলপূর্ণ সংসারকে নানাভাবে আয়ত্তে আনেন, নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু অন্তরে থেকে যান সে রোম্যানটিক কবি, বাস্তব যাঁর কাছে বিদেশ, আর স্বপ্ন-রহস্য-কল্পনা স্বদেশ।[১৩]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনা *ভগ্ন-হৃদয়*, *বনফুল*, *কবি-কাহিনী*তে এই রোম্যান্টিক বহিরস্থিতের আর্তি প্রকাশিত। শুধু কবিতায় নয়, গানেও এর সমান্তরাল উচ্চারণ ধ্বনিত :

আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে—
তাই আকাশ কুসুম করিনু চয়ন হতাশে।
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী, কুল নাহি পায় আশায় তরণী,
মানস প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে।[১৪]

রোম্যান্টিক বহিরস্থিতদের মধ্যে মৃত্যুর আকুতি বা সমাপ্তির তীব্র ও বুভুক্ষিত বাসনা ক্রিয়াশীল থাকে, তারা অজীবন থাকেন মৃত্যুতাড়িত ও মৃত্যুপীড়িত, কিন্তু আধুনিকদের মধ্যে কাজ করে নিজেকে প্রত্যাহৃত করার এক বিবমিষাজাত ইচ্ছা। রোম্যান্টিক বহিরস্থিতরা এক অর্থে জীবনকে পরিণত করেন মৃত্যুতে, তাদের জীবন যেন এক মন্থর মৃত্যু, কিন্তু আধুনিকেরা হঠাৎ করেই ঘটান জীবনের সমাপ্তি; তাদের মৃত্যু এক তাৎক্ষণিক ও দ্রুত প্রত্যাহারের ফল। রোম্যান্টিকেরা মৃত্যুকে বরণ করেন আর আধুনিকেরা ঝাঁপ দেন মৃত্যুতে। রোম্যান্টিকদের মৃত্যু বাসনাজাত আর আধুনিকদের মৃত্যু বিপরিণত ও বিপণ্নতাবশত।

হুমায়ুন আজাদ—বাংলা ভাষার এক আধুনিক কবি, যিনি মনে করতেন আত্মহত্যা "একটি আস্তিত্বিক পাপ"[১৫],—যৌবনে তাড়িত হয়েছিলেন অর্থহীনতায় এবং ভেবেছেন আত্মহত্যা নিয়ে। তাঁর প্রথম কাব্য *অলৌকিক ইস্টিমার*-এ রয়েছে এ-সংক্রান্ত দুটি কবিতা: "ছাদ আরোহীর কাসিদা" ও "আত্মহত্যার অস্ত্রাবলি।" ১৯৭৩ সালে যখন তাঁর প্রথম কাব্যটি বের হয়, তখন তাঁর বয়স ২৬ বছর, আর এই বয়সের কবি ভাবছেন আত্মহত্যা নিয়ে, একে সম্ভাব্য "সমাধান" হিসেবে সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন। কবিতাটিতে সামগ্রিক পূর্ণতা ও যাবতীয় ভালোবাসার আশ্লিষ্টতা থেকে মৃত্যুবাসনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে

আমরা সবাই ছাদে উঠি কখোন কখোন
সন্ধ্যায় মধ্যরাতে, লাফ দিই
পৃথিবীর উচ্চতম ছাদগুলো থেকে
যেমন সবাই আমরা কোনো কোনো দিন গভীরে আবেগে ছুঁই
ভালোবাসি তাজা বৈদ্যুতিক তার, পরম যত্নে খাই
ফাইল ফাইল স্লিপিং টেবলেট
বৃষ্টি ভরা ভোরে ছুটি রেললাইনের উদ্দেশ্যে
আজ রাতে আমি লাফ দেবো পৃথিবীর উচ্চতম ছাদগুলো থেকে

সবুজ সবুজ আমি ভালোবাসি তোমাকে সবুজে
সবুজ মাংস ঘাস রাত্রি ভোরের বাতাস
সবুজ সিংহ আসে ফুল হয়ে ফুলদানিতে যে-রাতে

ঝরবো লাল রক্ত গাঢ় মাটি নীল বৃষ্টিপাত
মনুমেন্ট মসজিদ রিকশাঅলার মাথায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমার মাথায় আমি অবাধ্য উড়বো চুল, গোলাপি রিবন আর
নীল কাঁটা ভেসে যাবে রাত্রির নদীতে

লাফ দিচ্ছি কেটে নিচ্ছি কিছুটা আকাশ
ছাদ কাঁপে জল্লাদের মতো, আমাকে সে ঠেলা দেবে
আমি তার লাল সার্থকতা;
কোনো লিফ্‌ট থামবে না মধ্যপথে, প্লেন বা ইস্টিমার পাবে না বিপদ সংকেত
আবহাওয়া অফিস দেবে শুভ আবহাওয়াসংবাদ
সব ট্রেন পৌঁছবে শহরে, সব নৌকো ভিড়বে ঘাটে যথাযথ সুনীল সময়ে
পৃথিবীর কোনো স্ট্রিটে আজ রাতে দুর্ঘটনা ঘটবে না
কলকাতা খুলনায় আজ ছুটবে না পুলিশ কোনো ঘটনা সন্ধানে
আজ রাতে সব মার্কেটে চলবে তীব্র কেনাবেচা
আজ দুপুরে সব ব্যাটসম্যান করবে সেঞ্চুরি
আজ সন্ধ্যায় সব প্রেমিক প্রেমিকাকে অলিঙ্গনে পাবে
আজ রাতে সব সঙ্গম তৃপ্ত হবে সব নারী গর্ভবতী হবে
আমি একা উঠবো ছাদে লাফ দেবো পৃথিবীর উচ্চতম ছাদগুলো থেকে

আমার বাঁ হাতে সমুদ্র আর ডান হাতে দশটি ধরণী।
দু-চোখে পর্বতমালা নদী বন স্ট্রিট শত রেলপথ
বুক ভ'রে ভেন্টিলেটর মোমবাতিজ্বলা ব্যালকনি
কোমরে সোনালি সাপ লাল মাছ পদ্মার ইলিশ
নিবিড় মৌমাছিপুঞ্জ গড়ে মৌচাক
তবু পৃথিবীর সবগুলো উচ্চতম ছাদে আমি উঠবো একাকী
একটি পরম লাফ দেয়ার ইচ্ছেয়[১৬]

যাবতীয় সার্থকতা, সকল অদৃশ্যপূর্ব সমারোহময় অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও কবি একাকী উঠে যান উচ্চ থেকে উচ্চতম অবস্থানে যেন সবকিছুকে ছাড়িয়ে যেতে চান তিনি মাটিকে আলিঙ্গন করতে। এও যেন এক "বিপন্ন বিস্ময়" যার জন্য সকল কিছু থাকা সত্ত্বেও কবি মুক্ত হতে চান এই জীবন থেকে যা তাঁকে "ক্লান্ত—ক্লান্ত করে।"[১৭] আর এই দুর্বিষহ ক্লান্তি থেকে মুক্তির জন্যই প্রয়োজন আত্মহত্যার, জীবনানন্দ যাকে বলেছেন অসামান্য বৈভবে :

লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।[১৮]

দেখা যায়, আধুনিক মানুষ এক দুর্বিষহ, অন্তহীন ক্লান্তি থেকে নিজেকে উদ্ধারের জন্যই খোঁজে মৃত্যু। রোম্যান্টিকদের মৃত্যু যেখানে নিপতিত ও অবধারিত, আধুনিকদের মৃত্যু সেখানে অন্বেষণমূলক ও আপতিক। হুমায়ুন আজাদ তাঁর অপর কবিতা "আত্মহত্যার অস্ত্রাবলি"তে (যাকে পূর্বোক্ত কবিতাটির সহোদরা-কবিতা বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যায়) আত্মহত্যা সংঘটনের নানা উপায়ের কথা বলেছেন, অবশেষে প্রেম ও প্রিয়তমাকেও আত্মহত্যার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন :

রয়েছে ধারালো ছোরা, স্লিপিং টেবলেট, কালো রিভলবার,
মধ্যরাতে ছাদ, ভোরবেলাকার রেলগাড়ি,
সারি সারি বৈদ্যুতিক তার।
স্লিপিং টেবলেট খেয়ে অনায়াসে মারা যেতে পারি,
অথবা আমূল বক্ষে বিদ্ধ করা যায় ঝকঝকে ধারালো তরবারি,
কপাল লক্ষ্য ক'রে স্নানাগারে টানা যায় সুপটু ট্রিগার,
ছুঁয়ে ফেলা যায় এক লাফে তাজা বৈদ্যুতিক তার,
ছাদ থেকে লাফ দেয়া যায়, ধরা যায় ভোরবেলাকার রেলগাড়ি,
অজস্র অস্ত্র আছে, যে-কোনো একটি দিয়ে আত্মহত্যা ক'রে যেতে পারি,
এবং রয়েছে, তুমি, সবচেয়ে বিষাক্ত অস্ত্র, প্রিয়তমা, মৃত্যুর দোসরী,
তোমাকে দেখলে, ছুঁলে, এমনকি তোমার নাম শুনলেই
আমার ভেতরে লক্ষ লক্ষ আমি আমার অজ্ঞাতেই আত্মহত্যা করি।[১৯]

তরুণ হুমায়ুন আজাদ আত্মহত্যা-চিন্তায় মজেছিলেন, মধ্যবয়সে তিনি আবার একে বাতিলও করে দিয়েছিলেন "আমি কয়েকবার আত্মহত্যাকে সমাধান হিসেবে বিবেচনা করেছি, এবং বাতিল করেছি।"[২০] জীবনের নিরর্থকতার প্ররোচনাকে এবং এর বিপণ্ন বিস্ময়জাত ক্লান্তিকে অনুভব করেও তিনি এর থেকে রক্ষার এক নান্দনিক ভিত্তিকে আবিষ্কার করেন যা তাঁকে জীবনমুখী রাখে :

মানুষের সঙ্গ ছাড়া আর সব ভালো লাগে; আমের শাখায়
কালো কাক, বারান্দায় ছোট চড়ুই, শালিকের ঝাঁক,
আফ্রিকার অদ্ভুত গন্ডার, নেকড়ে, হায়েনা, রাস্তার কোনায়
মলপরিতৃপ্ত নোংরা কুকুর, বহু দূরে ডাহুকের ডাক
সুখী করে, এই সব সুখ আছে ব'লে আজো বেঁচে আছি, এবং এখনো
বাঁচতে ইচ্ছে করে, তাই হয়তো আত্মহত্যায় যাবো না কখনো।[২১]

এই হলো নিজেকে অন্বিত রাখার উপায়—নানাভাবে সম্পর্কিত করে জগৎ ও জীবনের সাথে। প্রকৃত কবিসত্তার মধ্যে থাকে অতৃপ্তবোধ, হেগেল যাকে বলেছেন অসুখী চেতনা; কবি এই বিষণ্নতার স্তর থেকে নান্দনিক স্তরে উত্তরণের পথ খোঁজেন, অসংখ্য অতৃপ্তির মাঝেও পেয়ে যান কিছু পূর্ণতার স্বাদ, যা তাঁকে আত্মহত্যা থেকে বারিত হওয়ার ইন্ধন জোগায়। সমূহ আর্তি থেকেও এ জাতীয় বাঁচার এষণা কবি অনুভব করেন, আর তা-ই ব্যর্থতাকে শিরোধার্য করেও জীবনকে প্রাসঙ্গিক করে বলে বসেন:

শান্ত হও সুমঙ্গল, শোনো, দুঃখ না যায় যদি বা
ছাত থেকে লাফ দেবে? দু-একশো ঘুমের বড়ি খাবে?
এ কি একটা কথা হলো? এ কেমন তোমার হৃদয়?
ঢেউগুলি ওঠে আর মিলিয়ে যায়
আরো একটু চেষ্টা করি সুমঙ্গল, এসো বাঁচি, বেঁচে থাকা যাক।[২২]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সবক্ষেত্রে তা হয় না। আবার নিজেকে ক্রমাগত ব্যর্থ মনে করার সমূহ চিন্তার ফলাফল হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে আত্মহত্যা। এটা নির্ভর করে কবির অন্তর্গত অসংহতি ও বিপন্নতার ওপর।

বঙ্গভূমিতে জীবনের যেমন সম্ভার, তেমনি মৃত্যুর এন্তার উপস্থিতি পরিলক্ষিত। এখানে জীবন যেমন বিপন্ন তেমনি মৃত্যুও বিপ্লুত। মূল্যহীন জীবনের ততোধিক অমানবিক মৃত্যুই যেন নিয়তি-নির্দিষ্ট। মহার্ঘ মৃত্যুর সংরাগ এখানে অপরিলক্ষিত, মৃত্যু মানেই এখানে নিশ্চেষ্ট এক বিনাশের বিষয়। তবে এই গৌণ পারিপার্শ্বিকতায়ও প্রত্যাহৃত মৃত্যু পরিদৃষ্ট হয়, দেখা যায়, হরহামেশায়ই সংঘটিত হয় আত্মহত্যা যার বেশির ভাগই অ্যানোমি-উদ্ভূত সমস্যার বাহুল্যময় পরিণতি। সংবাদপত্রের পাতা ওল্টালেই চোখে পড়ে আত্মহত্যার ঘটনা, যার অধিকাংশই তাৎক্ষণিক সংঘটিত আত্মহত্যা। কিছু নমুনা

১. *সূর্যসেন হলের ছাদ থেকে লাফিয়ে ঢাবি ছাত্রের আত্মহত্যা*

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের এক ছাত্র গতকাল হলের ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তার নাম হুমায়ুন কবির। বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের মাস্টার্সের মেধাবী ছাত্র হুমায়ুন কবিরের বাড়ি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুরের শ্যামকুড় গ্রামে বলে জানা গেছে।
>
> ...তার সহপাঠীরা জানান, ছোট বোন পালিয়ে তার চাচাতো ভাইকে বিয়ে করার পর থেকে হুমায়ুন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি এর আগেও ঘুমের ওষুধ সেবন করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। কিছুদিন ধরে তিনি আর বাঁচবেন না বলে বন্ধুদের জানিয়েছিলেন।
>
> তিনি লাফিয়ে পড়ার আগে গলায় ছুরি চালিয়েও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন বলে ছাত্ররা জানান।... আত্মহত্যার আগে কবির মায়ের উদ্দেশে লেখা এক চিঠিতে তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় বলে লিখে যান।[২৩]

২. *পর পর তিন স্ত্রীর আত্মহত্যা!*

> নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলায় আহাম্মদ আলীর (৪৫) তিন স্ত্রীই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।[২৪]

৩. *প্রেমিকের সামনে আত্মহত্যা*

> প্রেমিকের যৌতুকের দাবি মেটাতে না পেরে বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় প্রেমিকের দোকানে এসে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে এক প্রেমিকা। চট্টগ্রামের[২৫]

প্রথমটির ক্ষেত্রে কাজ করেছিল দ্যুরকহাইম কথিত অতি নৈরাশ্য ও চরম বেদনাবস্থা যা আত্মহত্যাকারীকে প্রত্যাহৃত করেছিল সমাজ-আবদ্ধতা থেকে। এমিল দ্যুরকহাইম একে অন্যভাবে বলেছেন "মেলানকলি সুইসাইড"। জীবন এক্ষেত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেদনাদায়ক ও অবহনীয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা যায় সামাজিক ও পারিবারিক অ্যানোমি, যার ফলে সংঘটিত হচ্ছে পর পর তিনটি আত্মহত্যা। তৃতীয়টিকে বলা যায় "অর্থনৈতিক অ্যানোমি"র বহিঃপ্রকাশ-সংক্রান্ত আত্মহত্যা। মূলত অর্থনৈতিক অ্যানোমিজাত আত্মহত্যা সংঘটিত হয় বেশি অনুন্নত দেশে। এমিল দ্যুরকহাইম বলেছেন, আর্থিক সংকট আত্মহত্যা প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, ভিয়েনাতে ১৮৭৩ সালে যে আর্থিক দুরবস্থা দেখা দেয় যা ১৮৭৪ সালে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পৌঁছে, সেক্ষেত্রে আত্মহত্যার সংখ্যা সাথে-সাথেই বেড়ে যায়: ১৮৭২ সালে এর সংখ্যা যেখানে ছিল ১৪১ জন, সেখানে ১৮৭৩-এ বেড়ে তা হয় ১৫৩ জন এবং ১৮৭৪-এ ২১৬ যা ১৮৭২-এ সংঘটিত আত্মহত্যার ৫৩% বেশি এবং ১৮৭৩-এর ৪১% বেশি।[২৬]

বাংলাদেশে আত্মহত্যার ক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যাও কম নয়, যার পেছনে কারণ হিসেবে রয়েছে নারী-নির্যাতন ও দাম্পত্য-কলহ। ৬ জুন ২০০৫ *প্রথম আলোর* "আত্মহত্যার হার ও নারী"-বিষয়ক সম্পাদকীয়তে ফরিদপুরে ১০ দিনে ৯ জনের আত্মহত্যার অধিকাংশই নারী—এই বিষয়টিকে উদ্বেগজনক হিসেবে আলোকপাত করা হয়েছে। এসব আত্মহত্যার পেছনের কারণ হিসেবে নারী-নির্যাতন ও পারিবারিক কলহকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে হত্যাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। নারী-নির্যাতনের ক্ষেত্রে যৌতুক এক প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ১৯১৪ সালে কলকাতায় স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় নাম্নী এক নারী যৌতুকের কারণে গায়ে আগুন দিয়ে, প্রতিবাদস্বরূপ, আত্মহত্যা করেন। ঘটনাটি সে-সময়ে আলোড়ন তুলেছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনায় আলোড়িত হয়ে "হৈমন্তী" গল্প রচনা করেন। রানী চন্দকে তিনি একবার বলেছিলেন শিরা কেটে ফেলে মৃত্যুবরণ করার কথা।

বাংলাদেশে আত্মহত্যার ওপর নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের অভাব আছে। ১৯৪৭ সালে এক ব্রিটিশ সংবাদপত্রে আত্মহত্যার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যেখানে বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলা সবচেয়ে আত্মহত্যাপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

বাঙালি কবি-লেখক-শিল্পীদের মধ্যে আত্মহত্যা অতি সামান্য। সংঘটিত আত্মহত্যা অত্যন্ত কম এবং অনুসরিত আত্মহত্যা একেবারেই নেই। পাশ্চাত্যে দেখা যায়, মহৎদের আত্মহত্যা সমাজে সৃষ্টি করে অভিঘাত, অনেকেই অনুসরণ করে সেই পথকে। সিলভিয়া প্লাথ যে তারিখে আত্মহত্যা করেন সে সপ্তাহে গ্রেট ব্রিটেনে কমপক্ষে নিরানব্বইটি আত্মহত্যা সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়।[২৭] হয়তো বিষয়টি কাকতালীয় হতে পারে কিন্তু অনুসরিত বা প্ররোচিত আত্মহত্যার বিষয়টিকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাশ্চাত্যে সেলিব্রেটিদের আত্মহত্যা পথ সৃষ্টি করে, অনেকে তা অনুসরণ করে; অন্যদিকে আমাদের দেশে বিষয়টিকে দেখা হয় তমসাবৃত হিসেবে। শুধু আমাদের দেশ বললে ভুল বলা হবে, বরং অনেক দেশেই, বিশেষত ধর্মপ্রধান দেশগুলোতে আত্মহত্যাকে বিবেচনা করা হয় ঘৃণ্য কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিসেবে। তবে তাতে সমস্যা কমে না। যারা করার তারা ঠিকই আত্মহত্যা করে বসে। *বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার* এক হিসাবে দেখা গেছে, প্রতিদিন পৃথিবীতে কমপক্ষে ১০০০ জন মানুষ আত্মহত্যা করে।[২৮] অন্য হিসেবে এই পরিসংখ্যান আরও বেশি।

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুকে সন্দেহজনক হিসেবে দেখেন অনেকে; এটা দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা—এই প্রশ্নের উত্তর মেলা ভার। জীবন ও কবিতার মতোই তাঁর মৃত্যুও জন্ম দিয়েছে এক আশ্চর্য ধাঁধার। এক্ষেত্রেও সেই জটিল অনধিকারী সমস্যাটির সম্মুখীন হতে হয়—কিছু মৃত্যু শুধুই কি মৃত্যু, সত্যিই কি কোনো আত্মহত্যা নয়? জীবনানন্দ আজীবন ছিলেন মৃত্যুআচ্ছন্ন। রোম্যান্টিক ও আধুনিক, এই উভয়ত বিবেচনায় তাঁর মধ্যে মৃত্যুচেতনা উন্মেষিত। তিনি যখন বলেন

> যেনো কোনো ব্যথা নেই পৃথিবীতে—আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি?
> কেন মৃত্যু খোঁজো তুমি? চাপা ঠোঁটে বলে দূর কৌতুকী আকাশ।[২৯]

তখন আমরা দেখি আধুনিক বহিরস্থিত এক কবির মৃত্যুআচ্ছন্নতাকে, যা প্রশ্নদীর্ণ, সংশয়াকীর্ণ। আবার যখন তিনি বলেন

> মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে
> অন্তহীন অন্ধকারে আছে
> লীন সব অরণ্যের কাছে।[৩০]

তখন দেখি এক রোম্যান্টিক বহিরস্থিতকে, যিনি মৃত্যুবোধে বিবশ। আবার মৃত্যুবিষয়ক ধ্রুপদি উক্তিও তাঁর কবিতায় প্রতিধ্বনিত

> মৃত্যু আর জীবনের কালো আর শাদা
> হৃদয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাত্রী মানুষ
> এসেছে এ পৃথিবীর দেশে.[৩১]

তাঁর একটি অতি বিখ্যাত কবিতা "আট বছর আগের একদিন"-এ তিনি আত্মহত্যার কারণকে চিহ্নিত করেছেন, এক ভিন্নতর অর্থবহ কারণের কথা তিনি বলেছেন। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও, নারী-প্রেম-শিশু-গৃহ-অর্থ-কীর্তি থাকা সত্ত্বেও, কেন একজন আত্মহত্যা করে? করে, কারণ, "এক বিপণ্ন বিস্ময়"[৩২] তার রক্তের ভেতরে খেলা করে, ফলে সংলিপ্ত ক্লান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই সে আত্মহত্যা করে, কারণ, "লাশকাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নেই।"[৩৩] জীবনানন্দ এখানে দেখিয়েছেন দ্বিধাদীর্ণ জীবনের এক নীরন্ধ্র দিককে, যা বারে বারে পরাজিত হয় নিজের কাছে, প্রবহমান সময়ের কাছে। স্বেচ্ছামৃত্যুর এ এক অসাধারণ সাহিত্যিক সূত্র, জীবনানন্দ যা কবিতায় প্রকাশ করলেন। হায়, তিনি হয়তো জানতেন না, এই অদ্ভুত বিপণ্ন বিস্ময়ে তাড়িত হয়ে একসময় তিনিও হয়তো এভাবে ক্লান্তিহীন হবেন!

জীবনানন্দ প্রিয় কবি ছিলেন তাঁর, একটি গ্রন্থের নামও রেখেছিলেন জীবনানন্দীয় নিকষিত পঙ্‌ক্তিচূর্ণ দিয়ে—*লাশকাটা ঘর*, এবং তখন কে জানত, এমনই এক পরিণতির শিকার তিনি হবেন, একসময় দুর্মর মহাক্লান্তি থেকে মুক্তির জন্য লাশকাটা ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবেন তিনি, মর্গে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর লাশ জুড়িয়ে অবশেষে মহাকালের বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যাবে। তিনি কায়েস আহমেদ, ষাটের দশকে আবির্ভূত একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্ভাবনাময় গল্পকার, ১৪ জুন ১৯৯২, কোরবানির ইদের একদিন পর, বিকেলে চিলেকোঠার ফ্ল্যাটে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেছেন : "জীবনের বিনাশ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া ও এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন নিজেই। মরবার পর কোনোকিছু করা আর কিছুতেই সম্ভব নয়, নইলে নিজের দাফনের কাজটিও কায়েস মনে হয় নিজে-নিজেই করতেন।"[৩৪] কায়েস আহমেদের আত্মহত্যার পেছনে কী কারণ ছিল? আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেছেন: "দারিদ্র্য, পারিবারিক দুর্যোগ, বিচ্ছিন্নতা, বিরামহীন উদ্বেগ—সবই বহন করতে হয়েছে একা।"[৩৫] বোঝা যায়, তীব্র একাকিত্বের বেদনা তাঁর সঙ্গী ছিল, কিন্তু আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলেও ইলিয়াস জানাচ্ছেন: "আত্মবিশ্বাস ছিলো প্রবল, দৃঢ় ধারণা ছিলো যে প্রেম দিয়ে, যত্ন দিয়ে, সেবা দিয়ে স্ত্রীর মানসিক রোগ সারিয়ে তুলতে পারবেন। প্রায় দশটি বছর একনিষ্ঠভাবে স্ত্রীর সেবা করে গেছেন, যত্ন করলেন তাঁকে মায়ের মতো, বাপের মতো চোখে-চোখে রাখলেন। কত রকম চিকিৎসা করলেন। কারো কাছে কোনো সাহায্য চাননি, কাউকে জানতেও দিতে চাননি নিজের সমস্যার কথা।"[৩৬] দেখা যাচ্ছে, কায়েস আহমেদ আত্মবিশ্বাসী অবস্থা থেকে আত্মবিনাশী হয়েছেন। অসুস্থ স্ত্রীর আরোগ্যাতীত অবস্থাই হয়তো তাঁকে অবশেষে ধাবিত করেছে আত্মহত্যার দিকে। তাঁর আত্মহত্যার অভিপ্রায়ের সাথে মিল আছে সিলভিয়া প্লাথের আত্মহত্যার। সিলভিয়া প্লাথের আত্মহত্যা হলো একটি ভুল-সংঘটিত আত্মহত্যা। সিলভিয়া মরতে চাননি; তাঁর রেখে-যাওয়া লিপিতে ছিল: "প্লিজ কল ড. ", এবং ডাক্তারের টেলিফোন নম্বরও ছিল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল। সিলভিয়া বাঁচতে চেয়েছিলেন, না হলে কেন ডাক্তারের ফোন নম্বর রেখে যাবেন? তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত, আবেগি ও দায়িত্বশীল মা। যে-সময়টাতে তিনি দুর্ঘটনাটি ঘটান, সে সময়ে তিনি ছিলেন দ্ব্যর্থহীন এবং দুর্মরভাবে সৃষ্টিশীল প্রতিদিনই কবিতারা আসছে বাধাহীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে, এবং তিনি মেতে উঠেছেন নতুন উপন্যাস নিয়ে। তাহলে, "কেন, অতঃপর, তিনি আত্মহত্যা করলেন?" উত্তরে বলছেন আলভারেজ, "অংশত, আমি মনে করি, তা ছিল 'আ ক্রাই ফর হেল্প' হুইচ ফ্যাটলি মিসফায়ার্ড।"[৩৭] কায়েস আহমেদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় আত্মহত্যাটি এক আকস্মিক সংঘটিত ঘটনা। আকস্মিক কারণ তাঁর বাহ্যিক জীবন দেখে কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেন না যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। সিলভিয়া প্লাথের মতোই তিনিও সে-সময়ে ছিলেন সৃষ্টিশীল: "কায়েস আহমেদ সবসময়েই ছিলেন নতুন লেখক। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন নতুন লেখকের প্রেরণা ও কষ্ট এবং নতুন লেখকের উদ্বেগ ও অতৃপ্তি নিয়ে।"[৩৮]—বলেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। সুতরাং তাঁর আত্মহত্যা ছিল না জীবনানন্দের কবিতার সেই লোকটির মতো, ফাগুনের রাতের আঁধারে যার মৃত্যু হয়েছিল। কায়েস আহমেদের মৃত্যু বৈকালিক মৃত্যু। তাঁর মৃত্যু আকস্মিক, হয়তো অচিন্তিত, হয়তো বা জন্ম দেয় এক প্রশ্নচিহ্নের "এই শিল্পীর আত্মহত্যা কি কেবল আকস্মিকভাবে নিজেকে প্রত্যাহৃত করবার ফল?"[৩৯] এ প্রসঙ্গে মনে করা যায় কায়েস আহমেদের একটি গল্পের (লাশকাটা ঘর) চরিত্রকে, যে রাতের অন্ধকারে ঘরের বাইরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আসে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে, কিন্তু তার স্ত্রী পেছনে পেছনে এসে তাকে ফিরিয়ে নেয় এই বলে যে, এখন আর সহমরণের যুগ নেই, মরলে তাকে একাই মরতে হবে। চরিত্রটি হয়তো আর আত্মহত্যা করে না। কিন্তু চরিত্রস্রষ্টা কায়েস আহমেদ একাই করেছেন আত্মহত্যা, কেউ তাঁকে ফিরিয়ে নিতে আসেনি।এলে হয়তো ফেরানো যেত তাঁকে। কী অদ্ভুত জীবন মানুষের, যাকে রক্ষা করতে সে যারপরনাই সব কিছু করে, তাকেই মুহূর্তের জন্য ছুড়ে ফেলে দেয় মহাকালের নিকষ কৃষ্ণবিবরে। কায়েস আহমেদ খাপ খাওয়াতে চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর দুরারোগ্য অসুস্থতার সাথে, কিন্তু অবশেষে পারেননি। না-পেরে খাপ খাইয়েছেন মৃত্যুর সাথে, অসময়ে।

মৃত্যুকে হঠাৎ করেই অনেকে ভালোবেসে ফেলে, কিন্তু অনেকে আবার দীর্ঘদিন ধরে নিভৃতে একে ভালোবাসতে শুরু করে। কবি শামীম কবীর কেন মৃত্যুবাসনায় তাড়িত হয়েছিলেন? নব্বইয়ের দশকের এই প্রতিশ্রুতিশীল কবি কেন মাত্র ২৪ বছর বয়সেই (জন্ম: ১৯ এপ্রিল ১৯৭১, মৃত্যু: ২ অক্টোবর ১৯৯৫) গোধূলির অমোঘ টানে নিজের সাদা চাদর দিয়ে সিলিং ফ্যানে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে? এই প্রশ্ন বিস্ময় নিয়ে দেখা দেয় অজস্র নক্ষত্রের রাতে, কিন্তু এর উত্তর লুকিয়ে আছে তাঁর মৃত্যুমনস্তত্ত্বের গভীরে জন্ম-নেওয়া অভীপ্সার ওপর: শামীম কবীর কি মৃত্যু-অভীপ্সাকে লালন করছিলেন তাঁর জীবনে, কবিতায়, ডায়েরিতে? কেন এই আত্মহনন যার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি দীর্ঘসময়, যাপন করতে হয়নি দীর্ঘজীবন! এমনকি অপেক্ষা করতে হয়নি পঞ্চমীর চাঁদ ডোবা পর্যন্ত—যেতে হয়নি মৃত্যুবন্ধু বৃক্ষের কাছে দড়ি হাতে। দিন আর রাতের সন্ধিমুহূর্তকেই তিনি বিদায়মুহূর্ত করলেন, আলো-অন্ধকারের যুগল সন্নিপাতে ফাঁকা বাড়িকেই করলেন নিজ প্রস্থানের বারামখানা। তাঁর কবিতাতে তিনি বলতে চেয়েছেন এক দমিত সুন্দর-অসুস্থতার কথা, যা সাধারণত সঙ্গী হয়ে যায় চিরন্তন বিশুদ্ধ কবিদের:

> পথে আমরা প্রচুর ক্যানাবিস খেলাম। ফলে
> সবকিছু ভুলে গেছি। অবশ্য অন্যের কথা না
> জানলেও আমি সেই অসুখটাই চাচ্ছিলাম। কারণ
> The Sickness of mine is cosmic event.[৪০]

চব্বিশ বছর বয়সেই কামনা করছিলেন মৃত্যু, স্থায়ীভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন অপরিত্রাণনীয় বিষণ্ণতায়, ভাবতে বসেছিলেন জন্মক্ষণে অশুভ লক্ষণের বিষয়ে:

> আমার ভূমিষ্ঠকালে একটা দাঁড়কাক পাঁচবার ডেকে
> উঠেছে। এটা নাকি কারো জন্য সুখবর কারো জন্য
> দুঃখবর।[৪১]

জন্মকেই দণ্ডিত ভেবেছেন তিনি, তাই ভেবেছেন

> কী দণ্ড দেবে ঈশ্বর? অন্তহীন অন্ধ অনলবাস?
> না-কি পুষেছো শকুন কোনো জঘন্য আক্রোশে?
> যার তীক্ষ্ণ অনাহারী ঠোঁট খুবলে খুবলে ছিঁড়ে খাবে
> আজন্ম উপোসী এই রৌদ্রদগ্ধ আমার শরীর।[৪২]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পৌনঃপুনিক মৃত্যু দ্বারা তাড়িত তিনি, বলেছেন মৃত্যুকে ভালোবাসার কথা, ভাবছেন অবিরত এর স্বরূপ, ইশারা ও নূপুর-নিক্কণ, অনুভব করছেন মৃত্যুকে :

কী এক কথার লোভে বেঁচে থাকি
মৃত্যু দূরে নয়
ইচ্ছার পালক হয়ে মৃত্যু জেগে থাকে[৪৩]

মৃত্যুকে ভুল মনে হয় না তাঁর, তিনি লিখেন অনিমিখে :

না-না ভুল নয় মোটে, মূলত ডানার দোষ
ডানা ছিলো নিখাদ মোমের[৪৪]

ইঙ্গিত করেছেন শৈল্পিক মৃত্যুর, ইকারুসের নিয়তির বিষয়ে, যেখানে সূর্যালোকে গলে যায় ডানা, ফলে তাঁর মনে হয়—"রৌদ্রদগ্ধ আমার শরীর।" বলেছেন ইচ্ছার পালকের কথা যেখানে মৃত্যু জেগে থাকে। বস্তুত মৃত্যুকে আত্মচিন্তার বিষয় করেছিলেন তিনি, রূপান্তরিত করেছেন আত্মভাবনাকে মৃত্যুময়তায়। তাঁর সমস্ত কবিতাই এই প্রস্তুতির এক কালোয়াতি—কখনও শ্লেষ, কখনও জমক, কখনও বা ফ্যান্টাসির বাতাবরণে:

তবে আমি সানাইয়ের সুরে সুরে
মৃত্যুকে স্বাগত করি স্নানপথে
তুমি জানো—রাজহংস শিকারের উরুতলে
ডুবে মরা ভালো[৪৫]

মৃত্যুবোধ থেকে মৃত্যুঅভীপ্সা, তারপর সম্পাদন—এরূপ একটি বহমান পরিণামিতার গতিপ্রকৃতিকে আমরা বলতে পারি এক মৃত্যুবাসনার ক্যারিকেচার যা প্রকারান্তরে আত্মসমাপ্তির শেষ-তলানিটুকুকে চেটেপুটে খেতে চেয়েছিল। অনতিসময়ে এই ঘটন সহজ নয় ইতিহাসে। মৃত্যুঅভীপ্সার হাত ধরে এই দ্রুত মৃত্যু আমাদের মনে করিয়ে দেয় আরেকজনকে, নোফালিস, আসল নাম ফ্রিডরিশ লিওপোল্ড ফন হারডেনবার্গ (১৭৭২-১৮০১),—প্রথম প্রজন্মের জার্মান-রোম্যান্টিকদের অন্যতম প্রধান বিশুদ্ধ প্রতিভা, যিনি নীল ফুলকে রোম্যান্টিক আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত করেন, ১৮০০ সালে রচনা করেন রাত্রির স্তোত্র[৪৬], যাতে তিনি এক মরমি মৃত্যুঅভীপ্সাকে প্রতিফলিত করেন, এবং এর পরপরই ১৮০১ সালে ক্ষয়রোগে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আত্মহত্যা করেননি কিন্তু মৃত্যু দেখা দিয়েছিল তাঁর লেখায়, যেমন শামীম কবীরের অজস্র লেখায় দেখা দিয়েছিল মৃত্যুর এক আবেশমুগ্ধ আতশবাজির কোরিয়োগ্রফি। নোফালিস বলেছেন, "মৃত্যুতে প্রকাশিত পরমার্থিক জীবন"[৪৭], আর শামীম কবীর বলেছেন:

The Experiment is over
Now I'll have a walk some where
Yes I got my foot
And I start for go.[৪৮]

শামীম কবীর আত্মহত্যার বর্ণনা দিয়েছেন কবিতায়, বলছেন পারিপার্শ্বিকতার কথা, বলছেন, শেষ নোট লিখবার কথা, বলছেন আত্মহত্যার উপকরণের কথা:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ম্যান সাইজ আরশি/একটা, দ্বিতীয়ত একটা হিট রেডিয়েশন গান, পাওয়া/গ্যাছে দুটোই এবং এই আইস ব্লু দেয়ালের ঘের,/শাদা ছাদ, ফ্যান, ট্রেতে অমোঘ আপেল, প্যাড,/ইকোনো এবং তালাচাবি।"[৪৯] তাঁর একটাই লক্ষ্য—"ছয় ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত গ্রাহ্যতার সীমা" ছাড়িয়ে যাওয়া। শামীম কবীর চূড়ান্তভাবেই যেতে চেয়েছেন, ঠিক সিলভিয়া প্লাথের মতোই। হয়তো বললেও বলতে পারতেন "মৃত্যু এক শিল্প।"[৫০] কিন্তু তা বলেননি, বলেছেন, "আমি মৃত্যুর সাথে মশকরা করবোই।"[৫১]

এই মৃত্যুর সাথে মশকরা করতে করতেই কি তিনি অবশেষে তার করালগ্রাসে পড়েছেন? মৃত্যুকে বরণ করার জন্য কত কথকতাই না তিনি করেছেন। তাঁর ডায়েরির পাতাগুলো পড়লে মনে হয় তিনি নৈঃশব্দ্যের গভীরে মহাকালের মৃদু নিস্বনের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। ডায়েরিতে তিনি লিখেছেন :

ক. মৃত্যু ঘটনায় ও সংবাদে, শোক বা আবেগের উচ্ছ্বাস কতই না প্রবল, কিন্তু "মৃত্যু" কোনো কষ্টের ব্যাপার নয়, অর্থাৎ মৃত্যু সংবাদ কোনোই কষ্টময় নয়[৫২]

খ. তবে তার, যে কারোর, মৃত্যু মানে অন্য কারোর মঙ্গলের শুরু বা মঙ্গলই[৫৩]

তাঁর কবিতা ও লেখায় কিছু নিয়মিত মুহূর্তের বিস্মাপন চোখে পড়ে যা আত্মধ্বংসের মহিমাকে পাটাতন দিতে চেয়েছে। কবিতার ক্রমবিকাশ ঘটেছে এই রঙ্গতামাশার ভেতর দিয়ে, আর শামীম কবীর এভাবেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েছেন নিজেকে কুশায়াময় অনস্তিত্বের ঘুমবিন্দুতে নিয়ে যেতে। কবিতা-লেখার প্রক্রিয়ায় তিনি হয়ে পড়েছিলেন একা,[৫৪] শব্দের ফানুস ছিল এই একাকিত্বকে ঢেকে রাখার কৌশল। অর্থহীনতার বিবরে তিনি চলে গিয়েছিলেন। মৃত্যুকে বরণ করার আগে "শেষ নোট"-এ তিনি বলে যান:

> বেঁচে থাকার কতো মজা আছে।
> জীবনের কতো মজা।
> তবে তো মৃত্যুতে থাকে চূড়ান্ত মজা।
> নেশাকর অনন্তর মজা।
> আর এই জীবন তো মানুষের
> কীটের নয় পতঙ্গের নয় গিনিপিগের নয়।
> এ হয়তো মৃত্যু নয়।
> আরেকবার আরেক রকমের জন্ম সেইটি
> যাকে মৃত্যুই বলা হয়।
> সে হয়তো অন্যতম জীবন।[৫৫]

"যা মৃত্যু, যৌবন তা-ই"[৫৬]—শামীম কবীরের জীবন যেন এই কথাটিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর জীবন ছিল যেন এক অপেক্ষমাণ মৃত্যু, এক দ্রুত অপসারণযোগ্য জীবন। শামীম কবীরকে বলা যায় কবিতার শহিদ আর তাঁর মৃত্যু আমাদের মনে করিয়ে দেয় আর এক বিখ্যাত মৃত্যুর কথা, চ্যাটারটনের মৃত্যুর কথা। কিন্তু চ্যাটারটনকে পরবর্তী রোম্যান্টিকেরা এক নিয়তি-দণ্ডপ্রাপ্ত কবির প্রতীকে পরিণত করেছিলেন, শামীম কবীরের ক্ষেত্রে তা হয়নি এই বঙ্গভূমিতে। তাঁর লেখার "অটোম্যাটিজম"কে, তাঁর উৎসারিত অন্তর্নিবেশকে, আমরা রূপান্তর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করতে পারিনি কোনো শাপগ্রস্ত দেবতার পাখা-ঝাপটানোর মাতমের প্রতীক হিসেবে। বস্তুত আমরা তাঁকে ভুলতে বসেছি। মূলত শামীম কবীরেরা হলেন এক বুনো দেবতা, যাঁরা জীবনের সাথে এক অন্তরিন খেলায় মেতেছিলেন। ফরাসি কবি জাক ভাশে মনে করতেন, আলোকপ্রাপ্তির কোনো পর্যায়ে জীবনের নিরর্থকতার ভাবনা মনে হয় অনেকটা হাস্যোদ্রেককর।[৫৭] ভাশে বুঝিয়েছেন যে নিরর্থকতা এক অনিবার্য বিষয়। শামীম কবীরও তা-ই ঠিকঠিক মনে করতেন। জীবন যেন মৃত্যুর এক নিমিত্ত মাত্র, তবে কোনো ভুল নয়, এটা "মূলত ডানার দোষ।" এ এক যাত্রা, এক মহাজাগতিক ভ্রমণ:

জীবন্ত মেঘের থেকে শুরু হলো অনবদ্য রেল
পীড়িত পাপোষ আর গগণতা ছাওয়া মেঘাটোন[৫৮]

পরিণতি খোঁজার উশখুশ বা উৎকণ্ঠা তাঁর ভেতর কাজ করেনি, কারণ তিনি মূলত মৃত্যুআচ্ছন্নতায় ছিলেন পূর্বাপর ঘোরগ্রস্ত, কোনো অপ্রাপ্তির অনুতাপ ছিল না তাঁর, যেমন ছিল না প্রাপ্তির উপযোগ বা তৃপ্তি। এই হ্যাঁ-না-এর সুস্পষ্ট দূরত্বে তিনি তাঁর কবিসত্তাকে রেখেছিলেন, আর তাঁর জীবন এই কবিসত্তারই এক অনুবন্ধী প্রতিভাস ছিল। মৃত্যু নিয়ে ভাবনা নয়, বরঞ্চ মৃত্যুকে তিনি অর্জন করেছিলেন ভেতরে ভেতরে। জীবন ছিল তাঁর কাছে এক "আধিবিদ্যক মজা"। তাঁর কবিতা যেন পৌনঃপুনিক সতর্কতা, সংকেতের এক গুপ্তভাষ্য। মৃত্যুর কথা, চলে যাওয়ার কথাকে তিনি কবিতায় বলতে চেয়েছেন, ফলে যে নিগূঢ় আত্মার প্রতিধ্বনি তাঁর কবিতাতে শুনতে পাই, তা যে-কাব্যবাতাবরণ সৃষ্টি করেছে তা রুদ্ধ ও অব্যবস্থিত, এবং তা প্রকারান্তরে এক নিরর্থক ও ত্রস্ত সাহিত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি আক্রান্ত ছিলেন সামূহিক অর্থহীনতা দ্বারা। যদিও তাঁর কবিতায় প্রতিভাসিত হয় না এইসব উৎকণ্ঠার প্রত্নরূপ, তবু এসব নিয়েই যেন তা অবশেষে বিমূর্ত হয়ে গেছে। ডানার দোষই মৃত্যুর কারণ, যে মৃত্যু মানুষকে প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণে টেনে নিয়ে যায় আত্মবিবরে। এই হলো সেই নিষ্প্রাণ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন যা থেকে জীবনের আগমন হয়েছিল একদিন।

মার্টিন হাইডেগার বলেছেন, "বৃহৎ অর্থে, মৃত্যু হলো জীবনের প্রতিভাস।"[৫৯] তিনি আরও বলেছেন, "মৃত্যু হলো ডাজাইন-এর একান্ত নিজ সম্ভাবনা।"[৬০] এই সম্ভাবনা ও পরিণতির কথা মনে রেখে এক কবি তাঁর কবিতায় এক অস্তিত্বক্ষালনের, এক "চলে যাবার" কথা বলেছেন, প্রতিধ্বনি করেছেন মৃত্যুর তথা আত্মহননের, আর চূড়ান্তে নিয়তিনির্দিষ্ট করেছেন আত্মহননকে। মূলত সুনীল সাইফুল্লাহ্‌র (জন্ম ২ আষাঢ় ১৩৬৩, মৃত্যু ২২ মে ১৯৮১/১৩৮৮) কবিতা যেন এক স্বেচ্ছামৃত্যুর আগাম সংকেতধ্বনি, তিনি যেন সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুসাহিত্যের, পুনঃপুন পাঠিয়েছেন লাল সতর্কতার বাণী। যা তিনি ঘটাবেন, যা তিনি ঘটাতে চান, তার এক দ্যোতনাকে তিনি প্রতিফলিত করেছেন কবিতায়, আর অবশেষে পেছনে "অযোগ্য শরীর" রেখে প্রত্যাহার করেছেন নিজেকে—"স্বেচ্ছা-বিনাশে পাপমোচন করে।"[৬১] ইতি টেনেছেন ২৫ বছরের স্বল্পদীর্ঘ জীবনের। মৃত্যুর একবছর পর "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ" কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর একমাত্র কাব্য *দুঃখ ধরার ভরাস্রোতের* প্রথম পঙ্‌ক্তিটিই বলছে প্রস্থানের কথা:

চলে যাবার সীমারেখায় আজ বৃত্তায়িত সবকিছু
আর একটু ভালো করে দেখে নিই আকাশ, সূর্যাস্ত-সুর

...

এবার তো প্রস্তুত রথ, ওঠো জয়দ্রথ;
পেছনে রেখে যাই অযোগ্য শরীর, আর কিছু নয়
শিথিলতায় স্তব্ধ শ্বাসরোধী গ্রাম, এক জন্মকুকুরী কোলাহলে
নিমগ্ন থেকে তুলে আনি এই অমৃত-পাত্র, রক্ত ঢালো স্বেচ্ছাশরে
মুক্তি পাবে, বৃত্তায়িত জন্মবন্ধন পাপিষ্ঠ আকুতি
পিতৃপরিচয় মুছবো বলে শেষাবধি মুছি নিজেকে—
নিস্তব্ধ আবর্তনে নীলাক্ত শিশু, পরাধীন শপথ
এবার তো প্রস্তুত রথ ওঠো জয়দ্রথ;[৬২]

কাফকার মতো সমস্ত পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করার জন্য কোনো বন্ধুকে তিনি বলেননি, বরং আত্মহত্যার আগে একান্তে লিখিত কবিতাগুলো সংশোধন করে প্রস্তুত করেছিলেন পাণ্ডুলিপি।[৬৩] এর কারণ কী? মৃত্যুধারিত ও মৃত্যুবাহিত সুনীল সাইফুল্লাহ্ আত্মবিনাশের প্রস্তুতিতেও কেন কবিতা রেখে যেতে চাইলেন? এর উত্তর হয়তো এই যে, তাঁর কবিতাই ছিল তাঁর খণ্ডিত আত্মজীবনী, তাঁর মৃত্যুশাস্ত্রও বটে, যার পরতে পরতে ধরা আছে বিদায়ভাষ্য। তিনি বিদ্ধ হয়েছিলেন কোন ধরনের অ্যানোমিতে যাতে নিজ জন্মকেই মিথ্যে ভাবছিলেন তিনি?

এ জন্ম মিথ্যে, সত্যমুকুট ছাড়া একদিনও বাঁচবো না আর
পাপিষ্ঠ পুণ্যপটে রেখে যাই শেষ অহংকার।[৬৪]

মৃত্যুর প্রস্তুতির সমান্তরালে কাব্য-প্রকাশেরও প্রস্তুতি—এর পেছনে হয়তো কাজ করেছিল কবিজনোচিত অহংবোধ, এ এক কিংবদন্তি—অডেন ভ্যান গঘের ওপর লেখা তাঁর প্রবন্ধ "কাম ইভেন ইন ক্যাটাসট্রফি"তে যাকে শিল্পীর বীর হয়ে ওঠার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৬৫] সুনীল সাইফুল্লাহ্ও হয়তো কবিতাই রেখে যেতে চেয়েছেন যা প্রতিফলিত করবে তাঁর আত্মাকে ভবিষ্যতে। তাই তিনি লিখেছেন:

শরীর বাজি রেখে বলেছি আমি কতটুকু কবি
এবার ছুটি চাই ঈশ্বর।[৬৬]

কবিতাকে তিনি ল্যাজারাসের পুনরুত্থানের মতো আনতে চেয়েছেন, ভেবেছেন বিনাশের হাত ধরে আসবে সৃষ্টি ও সৌন্দর্য :

বিনাশ ছাড়া নবসৃষ্টি নেই, তার পদতললীন শুয়ে আছি প্রান্তরময়
শরীর ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমার মোহন মৃত্যু হলে যদি পাখিজন্ম পাই।[৬৭]

পাখিজন্ম চেয়েছিলেন তিনি, পাখির মতো মুক্ত ও আকাশলীনের সাধ জেগেছিল তাঁর মনে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনবরত এবং পৌনঃপুনিকভাবে তিনি আঁকতে চেয়েছেন আত্মহত্যার ক্যারিকেচার, প্রতিধ্বনি করেছেন আপন আত্মার সম্ভাব্য অনুপস্থিতির। ভেবেছেন আপন অনুপস্থিতিতে চলমান বিশ্বের পরম্পরা নিয়ে। তাঁর কাব্যের ৭-সংখ্যক কবিতাটিতে ফুটে ওঠে এ ধরনের সম্পর্কিত-দখলিস্বত্বের ছায়াসম্পাত :

ক. আমিহীন কিভাবে চলবে সংসার তার দায় নাও উন্মোচিত অন্ধকার[৬৮]

খ. শ্রেষ্ঠতম উন্মোচন হবে আজ—শেষাবধি এটুকু পুরস্কার
ফেলে যাবো তুচ্ছ বসবাসে ক্ষয়শীল মাটি ও আকাশ;[৬৯]

কিন্তু তিনি যে যাবার সুর বাজাচ্ছেন, যে উপসংহারের কথা বলছেন, তাতে কিছু অনিবার্য আলম্বনের কথা তিনি বলেন, কিছু আনুপূর্ব তিরোধানাবেশের কথা বলেন, বলেন উদ্‌ভ্রান্তির কিছু বোবাকথা। সম্পাদনের আগমুহূর্তের স্থির বহ্নিশিখা হয়তো শেষ-আলোতে দেখতে চাইছে মুকুরে আপন মুখ

১. আত্মহত্যার আগে শেষ কথা কী লিখে যাবো এই প্রশ্ন/করে শেষ রাত শেষ আকাশ মাধুরী;

এখানে একটু বসি যাবার আগে শেষ দেখি রঙে রঙে/কতটুকু কম্পমান স্বপ্নশরীর ছোঁবো না কণামাত্র নপুংশক মাটি ছোঁবো না পরাধীন সুষমা, নগ্ন হয়ে দেখাই রূপান্তরিত জন্মরূপ—/পরান্ন প্রবাসে এই অধিকার।[৭০]

২. আত্মহত্যার আগে আমার নিঃশ্বাসের আগুনে ক্ষয়িষ্ণু জ্যোৎস্নায় একদিন উৎসব হবে আলোছায়া আমলকি বনে, সমস্ত ক্রন্দনের উৎসভূমি ছুঁয়ে প্রবহমান নীরব নদীর ফুঁসে/উঠলে দুকূল/ যেখানেই থাকি ফিরে আসবো,[৭১]

বস্তুত সুনীল সাইফুল্লাহ্ বন্দি হয়েছিলেন কাম্যু-কথিত "অ্যাবসার্ড দেয়াল"-এর অন্তরালে। কাম্যু বলেছেন: যে-কোনো পথের বাঁকে নিরর্থকতার অনুভূতি যে-কোনো মানুষের মুখে আঘাত হানতে পারে। সুনীল সাইফুল্লাহ্ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন এর দ্বারা আর অবশেষে কাম্যুর ভাষায় বলতে চেয়েছেন: "অবশেষে আমি মৃত্যুতে আসি এবং এর প্রতি আমাদের মনোভাবে উপনীত হই।"[৭২] সাইফুল্লাহ্ মুক্ত হতে চেয়েছিলেন এই বন্দিত্ব থেকে, জীবন মনে হয়েছিল পরাধীন তাঁর কাছে, আর আত্মহত্যা এক অধিকার যার দ্বারা মানুষ মুক্ত হতে পারে : "এটুকুই স্বেচ্ছাচারী সাহস মানুষের, পরাধীন জন্মে স্বেচ্ছামৃত্যু/এই অধিকার।"[৭৩] এই এক উচ্চারণ যাকে ধরে ঘোষিত হয়েছে কত কবি ও দার্শনিকের অমর উক্তি।

প্রত্যাহৃত হতে চেয়েছিলেন তিনি, "ধ্বংসমাধুরী"তে মত্ত হতে চেয়েছিলেন, ফিরে যেতে চেয়েছিলেন আদিঅন্ধকারে। আর এই প্রত্যাবর্তনের জিগীষায় উচ্চারিত জীবনান্ত-সংগীতে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর নিজস্ব অবমোচনের সুর

ক হে চিত্রিতযোনী, তোমার গর্ভে আমাকে ফিরিয়ে নাও।
(*দুঃখ ধরার ভরাস্রোতে*, ২০ সংখ্যক কবিতা)

খ জন্মহীন পৃথিবী-পাথর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাকে ছেঁড়ো ছেঁড়ো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করো।
(*দুঃখ ধরার ভরাস্রোতে*, ২১ সংখ্যক কবিতা)

গ আত্মহননে সততঃ তৃষ্ণাতুর ঠোঁট শোনে ধীর পদশব্দ
উজানভাটায় তিরতির দয়ার্দ্র শরীর,
(*দুঃখ ধরার ভরাস্রোতে*, ৩৩ সংখ্যক কবিতা)

ঘ পুণ্য বলিদানে খিলখিল হেসে ওঠে স্তব্ধ মহাকাশ
সওদাগার নৌকো ভাসাও, মধুমালার দেশে যাবো।
(*দুঃখ ধরার ভরাস্রোতে*, ৩৮ সংখ্যক কবিতা)

ঙ শেষ রোদ্দুর গোলাপী প্লাবনে একবার ভাসাও পাপিষ্ঠ শরীরভার
আমারো সময় হলো যাবার।
(*দুঃখ ধরার ভরাস্রোতে*, ১৭ সংখ্যক কবিতা)

মৃত্যুমুখিতা চূড়ান্ত পরিণাম খুঁজেছিল তাঁর মধ্যে, কিন্তু ভাবনা ছিল সৃষ্টিশীল। ভেবে ভেবে তিনি যে জগৎ সৃষ্টি করেছেন তার ভেতর জায়মানিত হয়েছে এক অবিভাজ্য সত্তা যা প্রকারান্তরে এক অনড় অবস্থার দিকে চলে গেছে। সুনীল সাইফুল্লাহ্‌র এই পুনর্গঠিত সত্তার যে প্রতিফলন তাঁর কবিতায় আমরা পাই, তা বস্তুতপক্ষে এক অশান্ত স্বীকারোক্তি যা বারে বারে তাঁর প্রতিস্বের প্রত্যয়ের কথা বলছে, যেখানে কবিতা আসলে তাঁর নিজস্ব বিশ্বের ভাষায়তন। আর এই ভাষার শরীর কবির নির্দেশকের ভূমিকা রাখছে যথাযথভাবে। এই মৃত্যুউচ্চারণের মাঝ দিয়ে সুনীল সাইফুল্লাহ্‌ এক জীবনের কথা, তার সমূহ স্বাধীনতার কথা, তার সামগ্রিক লুপ্তির কথাকে বাঙ্ময় করতে চেয়েছেন। আশু সংঘটনের সতর্কতা-সংকেতও দিয়েছিলেন তিনি—১৯৭৯ সালে রচিত কবিতায় তিনি বলেছেন: "ঠিক তিন বছর পর আমি আত্মহত্যা করে যাবো।" এবং কথা তিনি যথাযথভাবেই পালন করেছেন ১৯৮১ সালের ২২ মে এক "পাখিজন্ম পাওয়ার" লক্ষ্যে অথবা "মাছেদের ক্রীতদাস" হয়ে জীবন কাটানোর জন্য চলে গেছেন তিনি। মিশে যেতে চেয়েছিলেন অধ্যুষিত অন্ধকারে, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল: "প্রতারক আলোর চেয়ে ঢের ভালো বিশ্বস্ত আঁধার।"

কেন আত্মহত্যা করেছিলেন সুনীল সাইফুল্লাহ্‌? মনে হয় এখন আর এর কোনো উত্তর হয় না। মৃত্যু সম্ভবত এক অর্থে কোনো কারণও রেখে যায় না। আর আত্মহত্যা নিজেই নিজের চারপাশে রহস্য ও কারণ সৃষ্টি করে। সম্ভবত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হয়নি, ফলাফল তাঁকে নিষ্পত্তির দিকে নিয়ে গেছে। কোনো এক অভ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গিকে জীবনের সাথে একাকার করে ফেলেছিলেন তিনি। তবে এ-সংক্রান্ত একটি চৌম্বক উত্তর তিনি দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থের ৩৯.ক.-সংখ্যক কবিতায় যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় শাশ্বত ও চিরন্তন বিষয়টিকে

সকাল হলে
একটি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো
আজন্ম-পরিচিত মানুষ ছেড়ে চলে যাবো
মৃত্যুদণ্ডিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুদণ্ডিতের মতো,
অথচ নির্দিষ্ট কোনো দুঃখ নেই
উল্লেখযোগ্য কোনো স্মৃতি নেই

এই দণ্ডিতের জীবনবোধ তাঁকে করে তুলেছিল দুর্নিরীক্ষ্য, যার ফলে প্রকৃত উদ্ভটতা ও অপব্যয়িতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য হয়েছেন দণ্ডার্হ। কিন্তু কেন তিনি নিজেকে ভেবেছিলেন দণ্ডিত? কী সেই কারণ যা তাঁকে অনপসরণযোগ্য এক সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিল?

কারণ নিশ্চয়ই ছিল, থাকতে হয়। আত্মহত্যা অজান্তেই জন্ম দেয় কিংবদন্তির ও কারণের। সাইফুল্লাহ্‌র আত্মহননও সে-সময়ে জন্ম দিয়েছিল কিছু কিংবদন্তির যার ভিত্তি ও সূত্র রচনা করেছিল তাঁর বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক এবং জনশ্রুতি। সুনীল সাইফুল্লাহ্ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন ঘুমের ওষুধ খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। সে-সময়ে তাঁর শিক্ষক কবি মোহাম্মদ রফিকের (তিনি তখন ইংরেজি বিভাগের সভাপতি ও সুনীল সাইফুল্লাহ্ তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন) সাথে আলাপসূত্রে জানা যায় কিছু তথ্য যা তাঁর মনোব্যাকুলিত চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জোতদার পিতার সন্তান সুনীল সাইফুল্লাহ্ অল্প বয়সেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু পাশাপাশি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন সহোদরার সাথে এক অজাচার সম্পর্কে যা স্থানীয় পর্যায়ে এক সময় জানাজানিও হয়ে যায়। এই সামাজিক-নিয়ম-বহির্ভূত সম্পর্কের অভিঘাতকে তিনি প্রতিরোধ করতে পারেননি, হয়তো তা-ই তাঁর ভেতর জন্ম দিয়েছিল পাপ ও অপরাধবোধের, যার থেকে নিষ্ক্রমণের উপায় হিসেবে তিনি বেছে নেন আত্মহত্যার পথ। এ জাতীয় ঘটনার উদাহরণ বিশ্বসাহিত্যে একেবারেই নেই তা নয়, টমাস মানের জীবনে এরূপ ঘটনা ছিল, সৎ বোনের সাথে তাঁর এই সম্পর্কের কথা জানা যায়। অ্যান সেক্সটনের জীবনেও তাঁর বড়ো মেয়ের সাথে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টার কথা জানা যায়; কিন্তু ব্যাপার হলো সুনীল সাইফুল্লাহ্ এর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, হয়ে পড়েছিলেন ত্রস্ত। তাঁর সিদ্ধান্তটি তিনি যেন দীর্ঘকাল ধরে ঠিক করে রেখেছিলেন, ফলে ১৯৭৬ সালে লিখিত (কাব্যের ৩৯.খ.-সংখ্যক কবিতা) ও ১৯৮১ সালে রচিত কবিতাতেও আত্মহত্যা অবধারিতভাবে হাজির। মৃত্যু তাঁকে অধিকার করেনি, তিনিই যেন মৃত্যুকে অধিকার করেছিলেন। সহোদরা বিষয়টি হয়তো আপতিক, কোনো প্রতিফলিত বিষয় ছিল না। হয়তো "পরাধীন জন্মে" "স্বেচ্ছামৃত্যু এই অধিকার", আর এই অধিকারেরই প্রয়োগক্ষেত্র ছিল তাঁর জীবন।

যাঁরা আত্মহত্যা করেছেন, যাঁরা ছিলেন লেখক-কবি-শিল্পী, তাঁদের এই আত্মলোপের মনস্তত্ত্বের ভেতর মূলত কী বিষাদবৃক্ষের বীজ উপ্ত ছিল যা মুহূর্তেই পরিণত হয়েছে বনস্পতিতে? নাকি এই কবি-হওয়ার বাসনার মধ্যেই আত্মজীবননাশের বাসনারও বীজ অঙ্কুরোদ্গমিত হয়েছিল? এর সঠিক উত্তর অজানা, তবে সম্ভাব্য উত্তর অনেক হতে পারে। সৃষ্টিশীলতার ব্যাপারটিকে অনেকে অতীন্দ্রিয় সমস্যা হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিহ্নিত করেছেন। সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের নিউরোসিস জড়িত থাকে তাঁর সৃষ্টির সাথে, ফলে ব্যক্তিগত শিল্পচর্চায় শিল্পীর মধ্যে দেখা দিতে পারে লুপ্ত হওয়ার চিন্তা, এবং এর থেকে অনেকে ব্যক্তিগত জীবনের আকাঙ্ক্ষার যবনিকাপাত ঘটান শুধু শিল্পসৃষ্টির বিলীয়মানতায়। যেহেতু তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা কোনো অভীপ্সারহিত, তাই তাঁরা বন্ধনহীন—জীবনের, পঞ্চভূতের। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে কপালকুণ্ডলার স্বেচ্ছামৃত্যুকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই কারণের কথা বলেছেন:

> তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া তাহা বলি। এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্তুলবৎ সংসারমধ্যে ঘুরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে। কদাচিৎ যদি আত্মকর্মদোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তবেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল; নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসার মধ্যে বদ্ধমূল; ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না। তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে? যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে, কে তাহার গতি রোধ করে? একবার বায়ু তাড়িত হইলে কে তাহার সঞ্চার নিবারণ করে? কপালকুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে কে তাহার স্থিতিস্থাপন করিবে?[৭৪]

বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার স্বেচ্ছামৃত্যুর কারণ ছিল তার বন্ধনহীনতার অনুভব। প্রকৃতপক্ষে কবিদের-শিল্পীদের বা অন্য ক্ষেত্রেও আত্মহত্যার কারণকে বলা যায় এক ধরনের বন্ধনহীনতা। এই বন্ধনহীনতা নিজের ও জগতের সাথে। ফলে প্রণোদনার আবির্ভাব ঘটে, মুহুর্মুহু উদ্দীপনায় ঘটে চূড়ান্ত অঘটনটি। তাঁরা প্রত্যক্ষ করতে থাকেন "অনৈসর্গিক পদার্থ।"[৭৫] কেউ একজন তখন পথ দেখায়। জীবনানন্দ দাশও একবার কথাবার্তার ঢঙে আত্মহত্যা নিয়ে বলেছিলেন ভিন্নতর কথা। তিনিও বলেছিলেন? আত্মপ্রেম আত্মবৈরিতায় পরিণত হওয়ার কথা। ভূমেন্দ্র গুহের সাথে কথাচ্ছলে একটি মেয়ের আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে পুলিশ যা বলবে, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট যা বলবে, তার থেকে কারণটা হয়তো অনেক বেশি আবছা। জীবনের মধ্যে একমাত্র একটাই শাশ্বত ও নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা, যা নিজে থেকে ঘটবে বা ব্যক্তি নিজে ঘটাবে। জীবনানন্দ বলেছিলেন—এটা ঘটানো হয়, কারণ জীবনকে ভালোবাসে বলে ধরাছোঁয়ার বাইরে কোনো চিড় ব্যক্তি সহ্য করতে পারে না, তখন নিজ ভালোবাসার জিনিসটাকেই ব্যক্তি ভেঙে ফেলে, শিশুরা যেমন প্রগাঢ় সৎ ভাবাবেগে ধ্বংস করে ফ্যালে, কেন তা না জেনেই করে। জীবনানন্দ আরও বলেছিলেন, আত্মহত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যু ঠিক জীবন-লালসার উল্টো পিঠ, মৃত্যু যথেষ্ট আগ্রাসীও হতে পারে।[৭৬]

সে যা-ই হোক, এর সাথে এসে যায় মৃত্যুকে অনুভব করার কথা:

> হাড়ের ভিতর দিয়ে যারা শীত বোধ করে
> মাঘ রাতে; তাহারা দুপুরে বসে শহরের গ্রিলে
> মৃত্যু অনুভব করে আরো গাঢ়-পীন।[৭৭]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর এভাবেই বন্ধনহীনতা, প্রণোদনা, অনুভব পেরিয়ে ভালোবাসা জন্মায়; জীবনের ভালোবাসা নয়, ভিন্ন বৌধায়নে মৃত্যুকে ভালোবাসা

মৃত্যুরেও তবে তারা হয়তো ফেলিবে বেসে ভালো!
সব স্বাদ জেনেছে যে সে-ও চায় এই নিশ্চয়তা!
সকল মাটির গন্ধ আর সব নক্ষত্রের আলো
যে পেয়েছে,—সকল মানুষ আর দেবতার কথা
যে জেনেছে,—আর এক ক্ষুধা তবু—এক বিহ্বলতা
তাহারো জানিতে হয়! এই মতো অন্ধকারে এসে! —
জেগে জেগে যা জেনেছে—জেনেছো তো—জেগে জেনেছো তা,—
নতুন জানিবে কিছু হয়তো বা ঘুমের চোখে সে!
সব ভালোবাসা যার বোঝা হলো,—দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে।[৭৮]

এভাবে চোখে ঘুম নিয়ে, অন্যতর, জগতোর্ধ্ব জানার বাসনা নিয়ে তাঁরা মৃত্যুকে ভালোবাসে, কারণ, নোফালিস-এর কবিতার ভাষায়; "মৃত্যুতেই শাশ্বতজীবন প্রকাশিত; তুমি মৃত্যু আর কেবল তোমার দ্বারাই আমরা হই সমগ্র।"[৭৯] জীবনানন্দ দাশ তাঁর "সপ্তক" কবিতায় বলেছেন "এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,—জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কি না।" কূটাভাসময় এই পঙ্‌ক্তির ব্যাপৃত অর্থভাষ্যে না গিয়েও বলা যায়, এর আছে অন্য এক অর্থ মৃত্যু আছে, কিন্তু মৃত নাই। মৃতরা মৃত্যুর মাধ্যমেই নিষ্ক্রান্ত হয় মাত্র। যাঁরা আত্মহত্যা করেছে, সেইসব কবি-লেখক-শিল্পী, তাঁরাও আর নেই কোথাও। জীবনের সফলতাকে তাঁরা শিরোধার্য করেনি, জীবনের রূপান্তরকেও রুদ্ধ করেছে। তাঁরা প্রতিপন্ন করেছে মৃত্যুকে, বিরত করেছে জীবনকে। মৃত ও জীবিতরা মূলত থাকে একই সময়ের বিছানায়, জীবিতরা সেখানে কোলাহলের জন্ম দেয়, আর মৃতরা নৈঃশব্দ্যের

মৃত্যু হলো অনির্বাচনীয়, অতি সম্মাননীয়
আর তুচ্ছ কথাবার্তাহীন।[৮০]

জীবন ও মৃত্যুর গভীরতাকে ভুলে থাকা নয়, বরং তার একান্ত অস্তিত্বকে অনুভব করার মধ্যে আছে সমগ্র অগ্রসরমাণতার অবলম্বন। হোর্হে লুইস বোর্হেস তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা "বুয়েনাস আইরেসে মৃত্যু"-এ বলেছেন, "জীবন হলো মৃত্যু যা চলে গেছে/মৃত্যুই হলো জীবন যা আসছে।" কিন্তু যে সময়ধারণায় তাঁরা রয়ে যায় বা ছিল বা থাকবে, তার সাথে আমরা যারা বেঁচে আছি তার পার্থক্য আছে কি? বস্তুত বর্তমান বলে কিছু নেই কারণ বর্তমান পলে পলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অতীতে আর যা রয়ে যায় তা থাকে ভবিষ্যতে। অতএব বর্তমান মূলত এক অসম্পূর্ণ ধারণা আর সেই অর্থে অস্তিত্বহীন, যেমন অতীত ও ভবিষ্যৎ। বর্তমান অস্তিত্বহীন কারণ তা অতীত ও ভবিষ্যতে অন্তর্ভূত আর অতীত ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্বহীন কারণ দুটিই অঘটমান—একটি ঘটে গেছে, অন্যটি ঘটেনি। মার্টিন হাইডেগারও বলেছেন, "আমরা বলি যে, প্রত্যেক বর্তমানই বর্তমান, প্রতিটি বর্তমানই অপসারিত হচ্ছে। বর্তমান হচ্ছে বর্তমান, যা আগমনের সাথে সাথেই নিষ্ক্রান্ত হয়।"[৮১]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলা যায়, তাঁরা, আত্মহতরা, বিরামচিহ্নের কাঙ্ক্ষী। নানা অ্যানোমি, নানা বন্ধনহীনতা, নানা নিরর্থকতা, নানা উদ্ভটতা, নানা দণ্ডার্হ নিয়েই এই জিগমিষা। কিন্তু এই জিগমিষার পেছনে হয়তো আছে অন্য এক বিরোধের সূত্র। সে বিরোধ হলো জীবন ও শিল্পের: জীবনের সসীমতার সাথে শিল্পের অসীমতার দ্বন্দ্ব। শিল্প জীবনের চেয়ে মহান—এই বিশুদ্ধ ধারণা তাঁদের এক অবিভাজ্য সত্তায় রূপান্তরিত করে যার থেকে নিষ্ক্রমণের কোনো পথ থাকে না। শিল্প মহৎ, কারণ, তা পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ, সুন্দর, সীমাহীন এবং বিমানবিক। অন্যদিকে জীবন দিনানুদৈনিক ও নিমিত্তমুখী, তাকে সহাবস্থান করতে হয় নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছের সাথে। ফলে যে সংঘর্ষ দেখা দেয় তাতে জীবন জয়ী হয় না। শিল্পের দাবির কাছে সে হয়ে পড়ে অসহায়। তখন অন্তর্গত প্রদাহ ব্যাপ্তি খোঁজে অলক্ষ্যে। আর এ পর্যায়ে শিল্প সৃষ্টিও তাঁর কাছে মনে হবে "এফিমেরাল ক্রিয়েশন" বা ক্ষণস্থায়ী সৃজন। এ অবস্থায় ব্যর্থতা পরিণাম খোঁজে। যদি সৃষ্টি ও জীবন হয় উপযোগনির্ভর তাহলে ঐকতান সম্ভব হয়ে ওঠে, অন্যথায়, ধ্বংস স্বাভাবিক নিয়মেই মৃত্যুমুখী হয়। কারণ সৃষ্টি তখন কোনো না কোনোভাবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। উপযোগবাদী সাহিত্যে ঐকতান থাকে সংগতিময়—সৃষ্টি ও স্রষ্টায়, কিন্তু চূড়ান্তবাদী সাহিত্যে দ্বন্দ্ব অবশেষে সংঘর্ষের রূপ নেয়।

এরপরও ব্যক্তিগত অসুস্থতা এবং কষ্ট সৃষ্টি করতে পারে আত্মহত্যা বা আত্মহত্যা-স্পৃহার। ইংরেজ কবি উইলিয়াম কাউপার-এর ক্ষেত্রে দেখা যায় এই অসুস্থতা, পাগলামো, আত্মহত্যাস্পৃহা, ধর্ম ও কবিতার মিশেল অবস্থা। তাঁর মায়ের দিকে দিয়ে তিনি ছিলেন জন ডান-এর বংশধর। তাঁর জীবনে দেখা যায় এক নিয়মিত মৃত্যুপ্রবণতার অভিঘাত। যখন তাঁর ছয় বছর বয়স তখন, ১৭৩৭ সালে, সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তাঁর প্রিয় মা মারা যান। এরপর এক বছরের মধ্যে তিনি এক বর্ডিং-হাউসে যান, যেখানে দুই বছর যাবৎ তিনি এক নির্মম পীড়নের শিকার হন এবং এর ফলে এক ধরনের স্নায়ুগত বিপর্যয়ে পতিত হন। নিপীড়নকারী সম্পর্কে তিনি পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন, এই বন্য অত্যাচারের ফলে তাঁর মনে অত্যাচারী-সম্পর্কে এমন এক ভয়াবহ ধারণার সৃষ্টি হয় যে তিনি তার হাঁটুর ওপরের দিকে তাকাতে সাহস করতেন না। ফলে এই বিপর্যয় তাঁর চোখের সমস্যাকেও ডেকে আনে। পরবর্তীকালে তিনি ওয়েস্টমিনস্টার স্কুলে যান কিন্তু চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত চোখের রোগে ভোগেন তিনি এবং সে বয়সেই গুটিবসন্তে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হন। তারপর তিনি ওয়েস্টমিনস্টার থেকে সলিসিটর অফিস হয়ে মিডল টেম্পল-এ যান এবং আইন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানেও তিনি অবশেষে হতাশাজনক অসুস্থতার কবলে পড়েন। মাসের পর মাস তিনি থাকেন কর্মহীন এবং কাজে অসমর্থ: সারা দিন-রাত্রি তিনি থাকেন উদ্বিগ্নাবস্থায়, উৎকণ্ঠা ও ভয়ে নিমজ্জিত আর হতাশায় পতিত। পুরো এক বছর এই অবস্থা থাকে তাঁর এবং তারপর একদিন সমুদ্রের ধারে এসে এই হতাশা চলে যায়। তিনি আবার লন্ডনে তাঁর সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে ফিরে যান। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তিনি আবার সমস্যায় পড়েন। কারণ পিতার ভবিষ্য-তহবিলের সামান্য অর্থ ছাড়া কিছুই তিনি পাননি, এর ফলে আইন পেশায় যাওয়ার বিষয়ে কিছুটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সচেতন হন তিনি। কিন্তু বিশ-বছর-বয়স্ক হওয়ার আগেই তিনি হয়ে ওঠেন লাজুক, অস্থির, অসফল—স্বাস্থ্য বিষয়ে ব্যস্তবাগীশ এবং ক্ল্যাসট্রোফোবিয়া বা ঘরকুনোগ্রস্ত আতঙ্কে পতিত এক মানুষ। এভাবে বত্রিশ বছর বয়সে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সবকিছুই শেষ হয়ে যায় এবং তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের সহায়তায় হাউস অব লর্ডস-এর করণিক হওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। কাজটি ছিল তাঁর আত্মীয়ের হাতেই, ফলে ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় তিনি তাঁর আত্মীয়ের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করতে থাকেন দুষ্টুমি করে যাতে তিনি তাঁর পদটি পেয়ে যান। কিন্তু কাকতালীয়ভাবে তাঁর কামনা ফলে যায়, আত্মীয়-কেরানি মারা যায় এবং কাউপার শূন্যপদের জন্য নিয়োগ পান। এছাড়া আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্যও তিনি প্রস্তাব পান কিন্তু এই পর্যায়ে আত্মীয়-করণিকের মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেকে দোষী করতে থাকেন। ফলে ভালো চাকরির প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য করেন, সামান্য বেতনের করণিকের চাকরিতেই থেকে যান। কিন্তু সে নিয়োগেরও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ থাকায় লর্ডস-এ এক পাবলিক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। কিন্তু তাঁর লাজুক ও অপরাধী মানসিকতার কারণে সে পরীক্ষা এক উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময়ে পর্যবসিত ও শেষ হয়। ফলে তিনি আবার পতিত হন স্নায়বিক দুর্দশায়। এর থেকে উদ্ধারের জন্য তিনি পাগলামোতে নিমজ্জিত হন, যার কারণে আত্মহত্যার কথা তিনি ভাবতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে, অনেক পরে, তিনি বর্ণনা করেছিলেন:

> সম্ভবত, আমি ভাবছিলাম ঈশ্বর নেই, অথবা যদি থেকেও থাকে তবু শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে, আর যদি তা-ই হয় তাহলে ঈশ্বর কোথাও আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করেননি। জীবন আমার নিজস্ব সম্পত্তি, আর তা আমার নিজস্ব নিষ্পন্নেরও বিষয়। আমি দেখেছি, স্বনামধন্যরা, নিজেদের ধ্বংস করেছেন; আর পৃথিবী এখনও তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে। কিন্তু মোটের ওপর, আমি বিশ্বাস করতে প্ররোচিত হই যে—যদিও এই কাজ অত্যন্ত বেআইনি, এবং যদি খ্রিস্টীয় সত্যকে ধরেও নিই—নরকে আমার কষ্ট অধিক সহনশীল হবে। আমার মনে পড়ে, যখন আমার বয়স এগারো, তখন আমার পিতা এক আত্মহত্যাকারীর বর্ণনা পড়তে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে আমার আবেগ জানতে চান: আমি তা করি এবং এর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করি। পিতা আমার কথা শোনেন এবং নীরব থাকেন। তবে তিনি না আমার মতামত মেনে নিলেন না বাতিল করলেন। সেখান থেকে আমি ধরে নিই যে পিতা আমার বিপক্ষে এবং লেখকের পক্ষে অবস্থান নেন; যদিও সবসময়, আমি বিশ্বাস করি যে, তার এই আচরণের সত্যিকার কারণ ছিল, তিনি চাইতেন, যদি পারেন তাহলে বিদেহী বন্ধুর অবস্থাটা সহানুভূতির সাথে চিন্তা করা, যে-কয়েক বছর আগে নিজেকে শেষ করেছে, এবং যার মৃত্যু তাকে গভীরভাবে আহত করেছে। কিন্তু বিষয়টির সমাধান কখনোই আমার মধ্যে ঘটেনি, আর এই পারিপার্শ্বিকতা এখনও আমাকে প্রচণ্ডভাবে বোঝার মতো চেপে ধরে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাউপার এ অবস্থার দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন, বলেছেন পুনঃপুন আত্মহত্যার উদ্‌যোগের কথা—আফিমের আরক পকেটে নিয়ে ঘোরাঘুরির কথা। তাঁর বর্ণনায় যা ফুটে উঠেছে তা অনেকটা আত্মহত্যা-সংক্রান্ত প্রথম দিকের ফ্রয়েডীয় চ্যুত-আগ্রাসন তত্ত্বের ছায়া। যার চাকরিটি তিনি চেয়েছিলেন তার মৃত্যু-কামনার বৈরী ইচ্ছাটি তাঁর নিজের দিকে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন অবশেষে, ফলে পাগলামি ও আত্মহত্যাকে তিনি পছন্দ করতে থাকেন। শিশু অবস্থাতেই তিনি দুর্দশা থেকে অসুস্থতায় পতিত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি বাস্তবতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাগলামো ও আত্মহত্যায় আশ্রয় নেন, এবং এরপর পাগলামো থেকে ধর্মে আশ্রয় নেন। কাউপারের ক্ষেত্রে এই স্পৃহা মূলত অর্থনৈতিক অ্যানোমি থেকে আবির্ভূত বলে পরিদৃষ্ট হয়।

এটা বলা দস্তুর যে রাজনৈতিক বিবিক্ততা ও আর্থিক দুর্দশা থেকেও সংঘটিত হয় আত্মহত্যা। মায়াকোভ্‌স্কিকে ধরা হয় রুশ বিপ্লবের বলি, কিন্তু এ ছাড়াও আর একজনের কথা বলা যায়, যিনি ছিলেন নারী, যিনি তাঁর প্রাত্যহিক বাস্তবতায় নিষ্পেষিত হয়েছিলেন, নিজ পুত্রকে বাঁচানোর তাগিদে কবিতাকে ছেড়ে আশঙ্কায় উৎপাটিত হচ্ছিলেন। তিনি হলেন মারিয়া (মারিনা)[৮৩] ৎস্‌ভেতায়েভা। তাঁর জন্ম ১৮৯২ সালে মস্কোতে। অল্প বয়সেই কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন তিনি। এই সূত্রেই সোর্জেই য়েফ্রনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বিয়ে হয়। পরবর্তী সময়ে দুর্যোগকবলিত হয়ে দেশান্তরিত হন, যান প্যারিসে। পরে দেশে ফিরে আসেন। ছেলেসহ দেশে ফিরে পড়েন রাষ্ট্রিক যাঁতাকলে। স্বামীকে গুপ্তচর সন্দেহে গুলি করে মারা হয়, তাঁর মেয়ে শ্রমশিবিরে আটক হয়। মারিয়া যান য়েলাবুগা শহরে এবং সেখানেই না খেয়ে, নিঃসহায় অবস্থায়, ১৯৪১ সালের ৩১ আগস্ট তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মারিয়া ৎস্‌ভেতায়েভার ক্ষেত্রে জীবন সমূহ দুর্ভাগ্যকে বয়ে নিয়ে এসেছিল। রাষ্ট্র থেকে উৎখাত, স্বামীর দুর্ভাগ্যের ট্র্যাজেডি, দেশান্তরিত অবস্থা, মস্কোতে দুর্ভিক্ষের সময় দুই সন্তানকে নিয়ে তাঁর একাকিত্বাবস্থা, স্বজনহীনতা, আর্থিক চরম দুরবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ উপাদান তাঁর আত্মহত্যার জন্য দায়ী ছিল।

জীবনবিমুখী মনস্তত্ত্বের ধারক হিসেবে এবং সাথে সাথে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিপুল অর্থের অপচয়, সমাজ ও পরিবার থেকে প্রায় নির্বাসিত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান কবি শার্ল বোদল্যের। পরিবারহীন অবস্থায় নিম্নশ্রেণির হোটেলে অবস্থানরত বোদল্যের সম্পাদক ও পাঠকের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে, ভাই অলফঁস ও জেনারেল ওপিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, ১৮৪৫ সালের ৩০ জুন ছুরি দিয়ে আত্মহত্যর চেষ্টা চালান। ব্যর্থ হওয়ার পর এক চিঠিতে তিনি লেখেন :

> আমি নিজেকে হত্যা করছি কারণ আমি অন্যের নিকট অপদার্থ আর
> নিজের কাছে মারাত্মক...কারণ আমি আশা করি ...তাঁর (জেন) কাছে
> আমার ভয়াবহ উদাহরণ তুলে ধরি কীভাবে জীবন ও মনের বিকলতা
> আমাকে অন্ধকার-হতাশা ও পূর্ণ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।[৮৪]

কাউপার, ৎস্‌ভেতায়েভা, বোদল্যের—এঁদের আত্মহত্যা বা আত্মহত্যাস্পৃহার পেছনে ছিল উদ্বেগ-আশঙ্কা-বিষাদ-অনিশ্চয়তা তথা এককথায় বলা যায় অ্যানোমি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনো "অ্যান্টি-লাইফ" উপাদান বা জীবনবিমুখী প্রবণতার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বঙ্গীয় তিনজনের—কায়েস আহমেদ, শামীম কবীর, সুনীল সাইফুল্লাহ্—মধ্যে এই অহং বা অ্যানোমির টানাপড়েন কী বা কতটুকু ছিল? কায়েস আহমেদের মধ্যে ছিল নানা ধরনের অ্যানোমির উপস্থিতি;—চাকরিগত অনিশ্চয়তা এবং স্ত্রীর মানসিক অসুস্থতায় তিনি ছিলেন নিয়ত দহ্যমান। ফলে অস্তিত্বের যে অসহনীয়তা দেখা দেয়, তার থেকেই তাঁর ভেতর জন্ম নেয় আত্মঘাতের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। আন্তঃব্যক্তিক সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত এই আত্মহননক্রিয়া। অন্য দুজন—শামীম কবীর ও সুনীল সাইফুল্লাহ্—ছিলেন একেবারেই তরুণ উদীয়মান কবি ও প্রতিভাবান ছাত্র, এবং সামগ্রিক অর্থেই তাঁরা ছিলেন সম্ভাবনাময়। তাঁদের পারিবারিক জীবনে অর্থনৈতিক অ্যানোমি বা অনিশ্চয়তার কোনো উপাদান পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাঁদের আত্মহত্যাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? যদি কোনো ক্ষেত্র না-ই পাওয়া যায় তাহলে কি বলব যে তাঁরা ছিলেন আজন্ম মৃত্যুতাড়িত বা মৃত্যুআচ্ছন্ন যার থেকে সুনির্দিষ্ট "ট্রমা" হিসেবে সংঘটিত হলো আত্মহত্যা? তবে তাঁদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় নানা ধরনের ভঙ্গুরতা। ফ্রয়েড বলেছেন, সব প্রাণীই যে-নিষ্প্রাণ অবস্থা থেকে জন্ম নেয়, সেই নিষ্প্রাণ অবস্থায় ফিরে যেতে উন্মুখ থাকে, যাকে তিনি বলেছেন মরণ-প্রবৃত্তি। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা *বিঅন্ড দ্য প্লেজার প্রিন্সিপল*-এ তিনি এই তত্ত্বের অবতারণা এবং বলেন: আমরা বলতে বাধ্য যে মৃত্যুই জীবনের লক্ষ্য, আর, পেছনে দৃষ্টিপাত করে বলা যায়, এই নিষ্প্রাণ বস্তুই জীবিত কারোর পশ্চাতে অস্তিত্বশীল।"[৮৫] এ যেন জীবনানন্দের "স্বপ্নের ধ্বনিরা" কবিতার পঙ্ক্তির মতো: "সব ছেড়ে একদিন আমিও স্থবির/ হ'য়ে যাবো।"

কিন্তু এই মৃত্যু-প্রবৃত্তির আগ্রাসন বলে যদি এঁদের আত্মহত্যাকে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে তা-ও অতি-সরলীকরণ দোষে দুষ্ট হবে। প্রতিটি মৃত্যুরই গূঢ় কার্যকারণ থাকে, হয়তো তা অব্যাখ্যাত থেকে যেতে পারে। কবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার কারণেও আত্মহত্যা দেখা দেয়। রবার্ট ফ্রস্টের ছেলে কবি হতে না পারার ব্যর্থতাবোধ থেকে আত্মহত্যা করেছিল। আবার কবি হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যেও আত্মহনন-ইচ্ছা জাগ্রত হতে পারে। জন্মের পর বহির্জগতের সাথে ব্যক্তির যে সম্পৃক্তি ও পরিচয়, তার ফলাফলের ক্ষেত্রে যখন অবিশ্বাস নেমে আসে, ব্যক্তি তখন আক্রান্ত হতে পারেন বিচ্ছিন্নতায়, ফলে যে দ্বন্দ্ব ও বিবিক্ততার সূচনা হয়, তার থেকে সৃষ্ট পরাগতি প্রচণ্ড ধাক্কায় জীবনের মাধ্যাকর্ষণশক্তিকে অতিক্রম করে যায়। যে আন্তঃব্যক্তিক ও আন্তঃবৈষয়িক সংযুক্তির ভেতর দিয়ে ব্যক্তি অগ্রসরমান, তার ছেদ তাকে করে তুলতে পারে আত্মঘাতী। কারণ এতে করে তার মধ্যে দেখা দেয় বাসনার দুঃস্বপ্ন যার থেকে পরিত্রাণের পথ সে খোঁজে। বস্তুত আত্মঘাতী মনোপ্রবণতা অনেকের মধ্যেই ক্রিয়াশীল থাকে কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, তা সবসময় সবার মধ্যে ফলাফল বা বাস্তবায়নের উপায় খোঁজে না; তা অনেকটা ক্ষণজীবীর মতো—দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়, আর এর কারণেই ব্যক্তি দ্রুত অভিযোজিত হয় চারপাশের সাথে। কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে এই মনোপ্রবণতা স্থায়ী রূপ নেয় এবং অবশেষে চূড়ান্ত আক্রমণশক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিসেবে আবির্ভূত হয়। এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন একাকার হয়ে যায়। ফলে অন্ধকারের মাধ্যাকর্ষণে সে নিজেকে সেখানে মিলিয়ে দেয়। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অস্তিত্ব—ঝড়ের মুখে দীপশিখার মতো; সে চায় নির্বাপণ। ব্যক্তির আত্মহত্যা তাই এক বিমূর্তায়ন, নিজেকে অপসারণের এক আত্মপরিকল্পনা, যা একান্ত, যা গোপন, যা অন্যের জন্য অপ্রবেশ্য। আত্মহত্যা রেখে যায় না তার কারণ; কিছু তথ্য, ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও অনুমিতির ওপর নির্ভর করে তার কারণকে নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীকালে খুঁজতে হয় তার কারণ যা নেপথ্যের সত্যিকার কারণের অপলাপ হয়ে উঠতে পারে। শামীম কবীর, সুনীল সাইফুল্লাহ্‌র আত্মহত্যা হয়তো অহংবাদী ধরনের। প্রকৃতপক্ষে এর উদ্ভবক্ষেত্র ছিল তাঁদের মন, মনের অসম্ভব ভঙ্গুরতা।

"মৃত্যু এক অনস্বীকার্য অভিজ্ঞতার ঘটনা"[৮৬]—বলেছেন মার্টিন হাইডেগার। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা অন্যের মৃত্যু থেকে হয়। প্রত্যেকেই অন্যের মৃত্যুবরণ প্রত্যক্ষ করে কিন্তু নিজ মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অপ্রাপ্তই থেকে যায়। আর অন্যের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করলেও তার কারণ বস্তুত অজ্ঞাতই থেকে যায়।

"জীবন অন্যের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, মৃত্যু নিজের ইচ্ছার ওপর"[৮৭]—বলেছেন মঁতেন। এটা স্বেচ্ছামৃত্যুকে এক দার্শনিক সমর্থন জোগায়। জীবন নির্ভরশীল বলেই যখন তা অবহনীয় হয়ে ওঠে তখন আত্মমৃত্যুর আবাহন দোষের হবে কেন? কারণ অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়াতে অবহনীয়তার দায়ও অন্যের ওপর যেতে পারে। যা কিছু চলে যেতে চায় তার গভীরে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে। যাওয়াই স্থায়ী। যযাতি যেমন ঘুরে-ফিরে চিরযৌবন ফেলে আত্মজরাতে প্রত্যাবর্তন করেছেন মৃত্যুর জন্য, তেমনি বাঁচার সমূহ তৎপরতার মধ্যেও সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষার আবির্ভাব ঘটে। আদিঅন্ধকারে প্রত্যাবর্তন এক নাড়ির টান, স্বভূমে প্রত্যাবর্তন। সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তাই সৌন্দর্যময়। ডব্লিও. বি. ইয়েটস তাঁর *ক্রসওয়েস* কাব্যের "দ্য সং অব দ্য হ্যাপি শেফার্ড" কবিতায় বলেন:

> আমাকে যেতেই হবে : এখানে আছে এক কবর-আধার
> ড্যাফোডিল আর লিলির ঢেউ যেখানে অনিবার।

জীবন যদি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে তাহলেও এই সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যেতে পারে, তীব্রতর হতে পারে। জীবন সুন্দর, তীব্র ও সংরাগী, তা ক্ষণস্থায়ী ও অর্থহীন বলেই। মানুষের ক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনা বা ঘটন না থাকলেও মানুষ একদিন-না-একদিন মরতে চাইতই।

টি. এস. এলিঅট তাঁর *পোড়ো জমি*র উৎসর্গপত্রে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা খুব আকর্ষণীয় ও দার্শনিকতাময়:

> একদিন আমি স্বচক্ষে নেপলস শহরে একটি
> খাঁচার মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় কুমে-র সিবিলকে
> দেখতে পেলাম এবং যখন বাচ্চারা তাকে
> জিজ্ঞাসা করল: সিবিল, তুমি কী চাও? সে
> উত্তর দিল: আমি মরতে চাই।[৮৮]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতএব মৃত্যু না এলে আমরা সবাই সিবিলের মতোই মরতে চাইতে পারি; মৃত্যুরও প্রয়োজন আমাদের, আর তা যাপনের মতোও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে কখনও কখনও। আমাদের সবার ভেতরেই কাজ করে রিলকে কথিত "ফলিং-সিকনেস।"[৮৯] কিন্তু আত্মহত্যাকারী অন্যের জন্য পরামর্শ দেন না আত্মহননের, যেমন দেননি মায়াকোভ্‌স্কি। শেষ রুশ রুলেতে পরাজিত হয়ে যে-আত্মহত্যালিপির আইকন তিনি রেখে যান, তার কিছুটা এরকম "আমি তা অন্যের জন্য সুপারিশ করছি না।"[৯০] আর আমাদের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুর আগে তাঁর পানাসক্তি থেকে মুক্ত হতে না পারার কারণ হিসেবে আত্মীয়স্বজনদের জানিয়েছিলেন তাঁর আত্মহত্যার ইচ্ছার কথা; তিনি বলেছিলেন, মদের গ্লাস সেই আত্মহত্যার ভিন্ন মন্থর এক উপায় মাত্র। বলেছিলেন তিনি "This is a process equally sure but less painful!"[৯১] হয়তো সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় বিভোর হয়েছিলেন তিনিও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁরা কয়েকজন

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, সিলভিয়া প্লাথ, জন বেরিম্যান, গেয়র্গ ট্রাকল, পাউল সেলান, হার্ট ক্রেন, ভ্লাদিমির মায়াকোভ্‌স্কি

বুঝতে পারছি, পাগল হয়ে যাচ্ছি আবারও

—*ভার্জিনিয়া উল্‌ফ*

কিছু মানুষ জীবনব্যাপী মৃত্যুর বিরোধাভাস তৈরি করে যান এবং এর মধ্যে বাস করতে থাকেন। এই যে ঠাসাঠাসির গুঁতোগুঁতির জীবন, তার নিভৃত ছায়ারৌদ্রের গভীরে একা অন্বেষণ করে যান স্তব্ধতার বেলুনগুলো। জীবনের সানুদেশে ফেলে রাখা তাঁবুগুলোকে শূন্যতা দিয়ে ভরিয়ে তোলেন আর তার গায়ে এঁকে দেন অদ্ভুত রহস্যময় চিহ্ন, যার ব্যাখ্যা মেলে আত্মবিলুপ্তির খোলা প্রান্তরে। তাঁরা এক অজানার কণ্ঠস্বর শুনতে পান নিরন্তর, যা স্নায়ুর গভীরতম নীরবতায় রেখে যায় হারিয়ে-যাওয়ার আর্তি। তাঁরা দগ্ধ, তাঁরা একা, তাঁরা মৃত্যুবাহিত। তাঁরা অন্ধকারকে পরিণত করেন আত্মার অহংকারে। তাঁরা অভাবনীয়। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ছিলেন এমন একজন।

১৯২২ সাল, আধুনিকবাদ আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ বছর: মার্সেল প্রুস্ত মারা গেলেন, এলিঅটের *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড* আর জয়েসের *ইউলিসিস* প্রকাশিত হলো। আর এই সালেই ভার্জিনিয়া উল্‌ফের সবচেয়ে নিরীক্ষাপ্রধান তৃতীয় উপন্যাস *জ্যাকবস রুম* বের হলো যেখানে তিনি বললেন, "আমি খুঁজে পেয়েছি বলার ভাষা, নিজের স্বরে কীভাবে শুরু করতে হয়।" তাঁর ও স্বামী লেনার্ডের হোগার্থ প্রেস থেকেই বের হয় *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড*-এর ব্রিটিশ সংস্করণ। তিনি এবং এলিঅট *ইউলিসিস* নিয়ে আলোচনা করেন আর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, *ইউলিসিস* ঊনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের মৃত্যু রচনা করেছে এবং সমসাময়িক ইংরেজি উপন্যাসশৈলীর অকার্যকারিতা তুলে ধরেছে।

সত্যিকার অর্থে একজন আধুনিক লেখক হয়ে ওঠা ছিল তাঁর জন্য কঠিন সাধনা। তিনি ছিলেন না জনপ্রিয় লেখক। তিনি অনুভব করতেন, কোনো সংরাগ বা ভিন্ন ক্ষমতা নয়, বরং ''অস্বাভাবিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য''ই তাঁর লেখকসত্তার অনুপম বৈশিষ্ট্য। তাঁর লেখা নিজ জীবন, অনুভূতি ও সময়ের নিবিড় রূপায়ণ। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে তিনি লেখেন ছোটোগল্প "মিসেস ড্যালোয়ে ইন ব্রডস্টিট" যা ১৯২৩ সালে আমেরিকার ম্যাগাজিন *দ্য ডায়াল*-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু গল্পটি পরবর্তী সময়ে তাঁকে অধিকার ও আলোড়িত করতে থাকে অনুক্ষণ। তিনি একে উপন্যাসে রূপান্তরণে সচেষ্ট হন। *মিসেস ড্যালোয়ে* উপন্যাসের বর্তমান রূপ তার আদি পরিকল্পনার মতো

~ www.amarboi.com ~

নয়। প্রাথমিক অবস্থায়, ছয় অথবা সাত অধ্যায়ে, লন্ডনের সামাজিক জীবন, প্রধানমন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র—এসব নিয়ে তামাশা আর বিষণ্নতার উপন্যাস ফাঁদাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য—নোটবুকে এরকমই তিনি লিখেছেলেন। কিন্তু পরে এই ধারণার পরিবর্তন হয়; মৃত্যু হয়ে ওঠে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৯২২ সাল জুড়ে উপন্যাসটি লেখার ব্যাপারে তিনি ভীষণভাবে আলোড়িত হতে থাকেন; কীভাবে রচনা করবেন তা, এ বিষয়ে *দিনলিপি*তে মন্তব্য লেখেন: ''যে-কোনোভাবেই হোক না কেন, তা হবে সাবধানী রচনা।'' এবং জয়েসের *ইউলিসিস*-এর প্রভাবে চৈতন্যপ্রবাহরীতির প্রতিফলন ঘটে তাতে, এবং জয়েসের *ইউলিসিস*-এর মতোই একদিনে ঘটে সম্পূর্ণ ঘটনা? যেদিন ক্ল্যারিসা ড্যালোয়ে এক অনুষ্ঠান করেন। জয়েসের উদ্ভাবিত ইপিফ্যানিরও প্রয়োগ ঘটে তাতে। বাহ্যিক আর অন্তর্সময়ের যোগসূত্র ধরা পড়ে; মূলত এই উপন্যাস লেখকের তীব্র আত্ম-আবিষ্কার-সৃষ্টির এক অনন্য অনুসন্ধান। লেখকের ভাবারোহের উত্থান-পতনের সুর এতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন: ''চল্লিশে এসে আমি আমার মস্তিষ্কের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বুঝতে শুরু করেছি।''

১৯১৫ থেকে ১৯৪১, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, তিনি নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। পরবর্তী সময়ে এই ডায়েরি হয়ে ওঠে এক সাহিত্যিক কীর্তি, যাতে প্রতিফলিত হয়েছে লেখকের সামাজিক ও অন্যবিধ নিবিড় অবলোকনের এক অন্তর্ভেদী আলেখ্য। তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি, নিজস্ব অধ্যয়ন, সাহিত্যিক স্পৃহা এবং নিজস্ব রচনাকৌশল—সবকিছুই ডায়েরিতে তিনি অন্তরঙ্গ করে তুলেছেন। ১৯৫৩ সালে, স্বামী লেনার্ডের উদ্যোগে, তাঁর মৃত্যুর পর এই বৃহদায়তন ডায়েরির অংশভাগ *আ রাইটার্স ডায়েরি* নামে প্রকাশিত হয়। অনেক পরে তাঁর চিঠিপত্রসহ এই ডায়েরি সুসম্পাদিত হয়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়েই উল্‌ফের বিকাশ ও সমাপ্তি। সাহিত্যিক সত্য আর লেখকের সমস্যা নিয়ে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে তাড়িত, এবং পরিশীলিতও। মানবীয় সংবেদনশীলতার যে অনিঃশেষ সমৃদ্ধি? এর দ্বারা তিনি ছিলেন বিমোহিত। সংবেদন ও গভীরতার গোপন অন্বয়ের তিনি ছিলেন এক নান্দনিক ভাষ্যকার, যার মাধ্যমে জীবনের গোপন-গভীর বাস্তবের শিল্পকে তিনি প্রকাশ করে গেছেন।

উল্‌ফের প্রধান কাজগুলো? *মিসেস ড্যালোয়ে* (১৯২৫), *টু দ্য লাইটহাউস* (১৯২৭), *অর্লেনডো* (১৯২৮), *আ রুম অব ওয়ান্‌স ওন* (১৯২৯) এবং *দ্য ওয়েভস* (১৯৩১)? বিশের দশকে ইংল্যান্ডের লেখার আধুনিকায়নে প্রচণ্ড অভিঘাতই শুধু সৃষ্টি করেনি, বরং বিভিন্নভাবে পালন করেছিল প্রধান ভূমিকা? মানবের ইন্দ্রিয়-বিপর্যাসে, ঈশ্বরহীন জীবনের অস্তিত্বের বহ্নিবাষ্পে। এক লুক্কায়িত বাস্তবতার উন্মোচনে তারা হয়েছিল একক ক্রিয়াশীল। তবে এসব কিছুর অনেক আগে থেকেই তাঁর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল, পিতা লেসলি স্টিফেনের হাত ধরেই? যিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রিভিয়্যুকার? ১৯০৫ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত *টাইমস লিটারার্যারি সাপ্লিমেন্ট*-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সমালোচক হয়ে ওঠেন তিনি। পিতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশাল পাঠাগার, নিজের প্রবল জ্ঞানান্বেষণের আগ্রহ তাঁকে করে তুলেছিল এই শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছরের এক প্রবল সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব, এবং তিনি হয়ে পড়েন সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠনের অন্যতম মুখপাত্র। বন্ধুবান্ধব এবং ক্যামব্রিজে সমসাময়িকদের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনটির নাম ছিল ''ব্লুমসবেরি গ্রুপ'', তিনি ছিলেন এর কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি বসবাস করতেন গর্ডন স্কোয়ারে, ব্লুমসবেরিতে; এর থেকেই এই গোষ্ঠীর এ নামকরণ। ব্লুমসবেরির আন্দোলন ছিল প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; ১৯২০ সালের পর যা নিজেই হয়ে ওঠে সাহিত্যিক ও শৈল্পিক জীবনের প্রকাশনা, সাহিত্য পত্রিকা, সমালোচনা ও সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির প্রতিষ্ঠান। উল্‌ফ ছিলেন তার সাহিত্যিক বিবেক। ১৯১০ সালে, গ্রাফটন গ্যালারিতে, রজার ফ্রাই যখন পোস্ট-ইম্প্রেশানিস্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করেন, তখন তা হয়ে যায় এক ব্লুমসবেরি ঘটনা। ক্লাইভ বেলের ভাষায়? যিনি বিয়ে করেছিলেন ভার্জিনিয়ার বোন ভেনেসাকে? ব্লুমসবেরির মানস হলো, ''সত্য আর সৌন্দর্যের স্বাদ, বৌদ্ধিক সততা, রুচিতা, রসবোধ, কৌতূহল; স্থূলতা, নিদয়তা আর অতিগুরুত্ববিমুখী... ।''

আধুনিক ইংরেজি উপন্যাসের নবতর ছাঁচ ও প্রতিরূপ নির্মাণে নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা, আধুনিক উপন্যাসে, যার প্রকাশকাল ১৯১৯-এ, যে বছর তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *রাত আর দিন* প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সেখানে তিনি বলেন, "একজন লেখক যদি দাস না হয়ে হন মুক্ত মানুষ, যদি তিনি যা প্রয়োজন তা না লিখে নিজস্ব পছন্দের লেখা লেখেন, যদি তিনি প্রথাকে অবলম্বন না করে নিজস্ব উপলব্ধির ওপর নির্ভর করেন, যেখানে হয়তো নেই কোনো প্লট, না আছে কমেডি বা ট্র্যাজেডি, গৃহীত শৈলীর মধ্যে নেই কোনো প্রেমগত আগ্রহ বা বিপর্যয়, এবং সম্ভবত ব্রডস্ট্রিট দর্জিদের মতো একটি বোতামও সেলাই করা থাকে না। জীবন কোনো সুসমঞ্জস সজ্জিত ঘোড়ার গাড়ির বাতির আনুক্রমনিকতা নয়, বরং তা হলো এক উজ্জ্বল বর্ণবলয়, এক অর্ধস্বচ্ছ মোড়ক যা আমাদের চারদিকে চেতনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুড়ে আছে। এই ভিন্ন, এই অজানা এবং অসীম সত্তাকে জ্ঞাপন করা, বিচ্ছিন্ন ও বাহ্যিকতার লঘু সংশ্লেষের সম্ভাব্যতায় তা যত চ্যুতি বা জটিলতাই প্রদর্শন করুক না কেন? তা ব্যক্ত করা কি ঔপন্যাসিকের কাজ নয়?"

আধুনিক উপন্যাস হলো এমন এক সম্পাদন যা জীবনের সংবেদনের পরিবর্তন সাধন করে। এটা শুধু সামাজিক সচেতনতা বা মানবীয় সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন করে না, বরং নান্দনিক অভিজ্ঞতার দ্বারাই তা জীবনের অনুভূতিগুলোর পরিবর্তন আনয়ন করে। জীবনের এই "অর্ধস্বচ্ছ মোড়ক" যা ঘিরে আছে আর সৃষ্টি করছে চৈতন্যব্যাপ্তি? তাকেই উল্‌ফ তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরতে চেয়েছেন। উপন্যাসে সমালোচনামূলক চিন্তার বৈশিষ্ট্যায়নে তিনি বিচলিত ছিলেন। ডায়েরিতে তিনি এ ব্যাপারে লিখেছেন: "সমালোচনা এবং সৃষ্টিশীলতা? এই দুই ধরনের চিন্তা-সংঘর্ষে আমার মস্তিষ্ক কী রকম যে অবসন্ন।" এই অন্তর্গত সংঘাত *মিসেস ড্যালোয়ের* মনস্তাপে ছায়া ফেলেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯২৪ সালে তিনি *মিসেস ড্যালোয়ে* লিখে শেষ করেন এবং এ বছরই তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি সর্বোচ্চ উচ্চাসনে পৌঁছায়। বছরের লেখালেখি থেকে প্রাপ্তব্য তিনশ পাউন্ড তিনি বাড়ির বাথরুম এবং গরম জলের ব্যবস্থা করার কাজে ব্যয় করার আশা করেন, যদিও লেখকবৃত্তি থেকে আশানুকূল প্রাপ্তিযোগ তাঁর তেমন হয়নি। এ বছরকেই, ১৯২৪-কে, তিনি সবচেয়ে ঘটনাবহুল বলে বর্ণনা করেন। ১৯২৫-এর মার্চ মাসে *মিসেস ড্যালোয়ে* প্রকাশিত হওয়ার পর বোদ্ধামহলে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয় এবং তা এক "ম্যাগনাম ওপাস"-এ পরিণত হয়। কিন্তু এ ছিল নিশ্চিতভাবেই আকস্মিক, দুর্বোধ্য এবং ভঙ্গুর; আমরা যাকে এখন আধুনিক উপন্যাসের উত্তরাধিকার বলে মনে করি তার বিবেচনায় তা ছিল এরকমই। উল্‌ফ মনে করতেন আধুনিক উপন্যাস প্রথাগত পদ্ধতির কোনো প্লট, কমেডি বা ট্র্যাজেডি নয়, বা আধুনিক ঔপন্যাসিক এভাবে কোনো কিছু সৃষ্টিও করেন না; আধুনিক উপন্যাস আসলে চরিত্রের উপন্যাস, সময়-ভাবনার উপন্যাস? এজন্যই *মিসেস ড্যালোয়ে* ১৯২৩ সালের কিছু উজ্জ্বল আলোকিত মুহূর্তকে ধরে আছে, যেদিন ক্ল্যারিসা ড্যালোয়ে তার পার্টির আয়োজন করেন। *ইউলিসিস*-এ জয়েস যে উন্মীলনের ধারণা আবিষ্কার করেছেন এখানেও তা মুহূর্মুহুভাবে উপস্থিত। *ইউলিসিস* এবং জন ডোস প্যাসোস-এর *ম্যানহাটন ট্রান্সফার*-এর মতো এই উপন্যাস হলো সময়ের শোধন বা সময়ের স্তব্ধতা বা দাঁড়িয়ে যাওয়া। প্রুস্ত বা জয়েসের উপন্যাসের মতো এ হলো তাঁর নিজের সৃষ্টির কার্যকাল; একটি নগরের ঘন এবং ঘিঞ্জি অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তা সময়কে শোধন করে। চরিত্রের কালিক অনিবার্য উল্লম্ফনকেও তা অস্বীকার করে। ধ্রুপদি রীতির প্লট ও চরিত্রের ঘনঘটা আর অনিবার্য উত্থান এখানে অস্বীকৃত হয়ে যায় ভাষা এবং ফর্মের নতুনত্বে। বাস্তববাদী বিষয় থেকে ভিন্নভাবে তা পরিণত হতে থাকে ভাষা আর ফর্মের অভিনব রীতিতে।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফের ওপর জেমস জয়েসের প্রভাব তুমুল ও ব্যাপক, আর এর কারণেই তা স্মরণীয় এবং সার্থক। *ইউলিসিস* বের হয় ১৯২২ সালে, *মিসেস ড্যালোয়ে* ১৯২৫ সালে। দুটিরই ঘটনাকাল একদিন? *ড্যালোয়ে*তে, যেদিন ক্লারিসা তার পার্টির আয়োজন করে আর *ইউলিসিস*-এ লেপোল্ড ব্লুম নামক এক আলুথালু ইহুদি-বিজ্ঞাপন-ক্যানভাসার দশ বছরের এ পৌরাণিক ভ্রমণময়তাকে গোচরে আনে একদিনের (১৬ জুন ১৯০৪ ব্লুমস ডে বলে খ্যাত) আঠারো ঘণ্টায়। কিন্তু এদের অন্তর্গত সময় বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে হাজির হয় বাহ্যিক সময়ের হাত ধরে। চৈতন্যপ্রবাহরীতিরও ব্যবহার বিস্ময়পূর্ণ, অন্তর্গত মনোক্তি স্বতন্ত্র ও রূপকাশ্রিত। আর জয়েসের বিখ্যাত ''ইপিফ্যানি''র প্রয়োগও উল্‌ফে লক্ষণীয়। ইপিফ্যানি বা উদ্ভাসন এক অতীন্দ্রিয় প্রকাশ, সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্বের এক উন্মীলন, জয়েস যাকে ধর্ম থেকে নিয়ে শিল্পে প্রয়োগ করেন, যাকে তিনি বলেছেন এক তাৎক্ষণিক আধ্যাত্মিক উন্মীলন, যা বাচনের স্থূলতা বা ভঙ্গি বা মনের এক অভিনব স্মরণীয় দশা। *আ পোর্ট্রেট অব দি আর্টিস্ট এজ আ ইয়ং ম্যান*-এ জয়েস প্রথম এর প্রয়োগ দেখান।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে এর আত্যন্তিক ও অনন্য প্রকাশ চোখে পড়ে যখন স্টিফেন ডিডেলাস সাগরের আর্দ্র বেলাভূমিতে এক বালিকাকে হাঁটতে দেখে আর ভাবে, তাকে (বালিকা) মনে হচ্ছে এমন একজন যার জাদুময়তা এক আশ্চর্য সুন্দর পাখির ভালো লাগায় পরিণত হয়। অথবা মনে হয়? তার (বালিকা) প্রতিচ্ছায়া যেন তার আত্মার গভীরে হেঁটে যায় চিরতরে, আর কোনো শব্দই তার আনন্দের পবিত্র নীরবতাকে ভাঙতে পারে না। এই বিখ্যাত ইপিফ্যানিকে উল্‌ফও ব্যবহার করেন নীরব অভ্যুদয়ে। উল্‌ফ যদিও বলেছেন যে তাঁর কাজ "অপ্রযত্নায়িত", তবু *ইউলিসিস*-এর প্রভাব ছাড়া *মিসেস ড্যালোয়ে*র বর্তমান সার্থকতা অকল্পনীয়।

১৯২৪-এর শুরুর দিকে উল্‌ফ ব্লুমসবেরি জেলায় ৫২ টেডিস্টক স্কোয়ারে দশ বছরের জন্য একটি বাড়ি নেন। এখানেই তিনি বড়ো হয়েছিলেন এবং ১৯১২ সালে লেনার্ড উল্‌ফের সাথে বিয়ে হওয়ার আগ পর্যন্ত বসবাস করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর তাঁরা ক্লিফোডস ইন-এ রিচমন্ডে হোগার্থ হাউসে চলে আসেন এবং হোগার্থ প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রেস থেকেই এলিঅটের *দ্য সেক্রিড উড* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৫ সালে। এছাড়া তাঁর রচনা সংকলন *দ্য কমন রিডার* বেরিয়েছিল। কিন্তু এই বাড়িটি তাঁরা বেচে দেন এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাছাকাছি চলে আসেন। কিন্তু আরও একটি জায়গাও তাঁর সাথে জড়িত। প্রতি বছর গ্রীষ্মাবকাশে তিনি সাসেক্সে লুইসের নিকটবর্তী রডমিলে মঙ্ক হাউসে আসতেন যা তাঁরা সাতশ পাউন্ডে কিনেছিলেন ১৯৩৬ সালে, এবং এই সাসেক্সেও, তাঁদের অনেক বন্ধুবান্ধব বসবাস করতেন; কিন্তু এটা ছিল বস্তুত ব্লুমসবেরি জীবনের এক পরিবর্তিত সম্প্রসারণ। এখানের অবস্থান উল্‌ফের ভাবাবহের পরিবর্তন সাধন করেছিল। গ্রীষ্মে তিনি ব্যাপক লেখালেখির পরিকল্পনা করলেন, তাঁর ভাষায় সময়টা ছিল, "এক সঞ্জীবিত গ্রীষ্ম...জনসাধারণের মাঝেই বেশির ভাগ বসবাস।" এখানে অবস্থানকালেই ক্যামব্রিজে হেরেটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতা নিয়ে বই *মিস্টার বেনেট অ্যান্ড মিসেস ব্রাউন* বের হয়েছিল।

অপ্রকৃতিস্থতা ছিল উল্‌ফের আজন্মলালিত, নিয়তিনির্দিষ্টও সম্ভবত। ১৯১৩ সালে প্রথম দৃষ্টিগ্রাহ্য আত্মহনন প্রচেষ্টার ঘটনা ঘটে এবং এর অভিরূপের আঙ্গিক উন্মোচিত হয়। বিয়ের মাত্র এক বছর পর তিনি মারাত্মক মানসিক অবনতির সম্মুখীন হন: তাঁর স্বামী যখন বাইরে ডাক্তারের সাথে আলাপ করছিলেন তখন উল্‌ফ একশ রতি ভেরোনাল গিলে ফেলেন। এ সময়ে তিনি মারাত্মক মাথা-ধরা আর নিদ্রাহীনতায় ভুগছিলেন। স্বামী লেনার্ডের লুকিয়ে রাখা ওষুধ খুঁজে পেয়ে তিনি তা খেয়ে ফেলেন বেশি পরিমাণে। সে যাত্রায় দ্রুত চিকিৎসাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারায়, পাকস্থলী পাম্প করে ফেলায়, তিনি বেঁচে যান। মুমূর্ষাবস্থায় সারারাত এবং পরের দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন তিনি। এ ঘটনার পরও তিনি কয়েকবার আত্মহত্যার অসফল চেষ্টা চালান। কিন্তু স্ত্রীর এত সব মানসিক জাড্য, অবিশ্বস্ততা, দাম্পত্য-অসংগতি সত্ত্বেও স্বামী লেনার্ড ভার্জিনিয়ার অসুখে-বিসুখে নিবিড়ভাবে তাঁর দেখাশোনা করতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হোগার্থ প্রেস মূলত ভার্জিনিয়ার জন্যই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এর অর্থ নয় এই যে, লেনার্ড ছিলেন সমস্যামুক্ত। পুরুষ হিসেবে এবং ভার্জিনিয়ার যৌনশিথিলতা ও যৌনশঙ্কার কারণে তিনি ছিলেন এর সক্রিয় ভুক্তভোগী।

শৈশবাবস্থায় যৌন নিপীড়নই ছিল উল্‌ফের স্নায়ুরোগের অন্যতম কারণ। তাঁর উনিশ বছর বয়সি ভাইয়ের মতো দেখতে জর্জ ডাকওয়ার্থ, তাঁর যখন মাত্র ছয় বছর বয়স, তাঁকে প্রায়শ নিগৃহীত করত এবং উল্‌ফ পরবর্তী সময়ে বলেওছেন যে, সে (ডাকওয়ার্থ) তাঁর গোপনাঙ্গ ঘাটতে বিশেষ আগ্রহী ছিল। তাঁর পুরুষবিরোধী মনোভাব তখন থেকেই দানা বাঁধতে থাকে এবং তা এমন অবস্থায় রূপান্তরিত হয় যে, শুধু এ কারণেই তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর এই পুরুষবিদ্বেষের আরও কারণ ছিল: তিনি মনে করতেন, সকল প্রকার হিংস্রতা আর অমানবিক উন্মত্ততা মিশে আছে পুরুষ-মানসিকতায়। তাছাড়া স্বামী লেনার্ডের ছিল পশ্চিমা ইহুদিদের মতো স্বভাবজাত অর্থপ্রীতি। বই আর সমালোচনা থেকে প্রাপ্ত সব অর্থ ভার্জিনিয়া উল্‌ফ স্বামীকে দিয়ে দিতেন এবং যখন তাঁর টাকার প্রয়োজন হতো তখন প্রায়শ স্বামীর কাছে চেয়ে তিনি ব্যর্থ হতেন। এছাড়া তাঁর মনস্তত্ত্বে অপরাধবোধের জন্ম হচ্ছিল: তিনি মনে করতেন স্বামীর শারীরিক চাহিদা মেটাতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়েছেন, যদিও স্বামীর সাথে ছিল তাঁর সুন্দর অন্তরঙ্গ বোঝাপড়া।

মধ্যবয়সে তিনি জড়িয়ে পড়েন সমকামিতায়: অনুসারী-লেখক ভিটা স্যাকভিলে-ওয়েস্ট ছিলেন তাঁর সমকামিতার সঙ্গী, যার শরীরকে তিনি দেখেছেন পূর্ণ এবং প্রশস্তভাবে; তাঁর বাড়ি লংবার্নে, শীতল ও স্বাভাবিক অনুত্তেজিত ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুর সাথে শারীরিকতায় মেতে উঠতে থাকেন। পরে, স্মৃতিচারণে, স্যাকভিলে-ওয়েস্ট বলেন: ''আমার ঘরে সোফায় যেন এক বিস্ফোরণ যখন তুমি আমার সাথে অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করলে, আমাকে চিরতরে অধিকার করে নিলে।'' তিনি আরও মনে করতেন, ভালো সাধ্বী স্ত্রী তিনি হতে পারেননি, এ মনস্তাপ আর অপরাধবোধ তাঁর সমস্ত মনোজগৎ অধিকার করে রেখেছিল। বাবার ঘরে ছেলেদের ধূমপানের অনুমতি ছিল, মেয়েদের ছিল না, কারণ বাবার ঘর কোনো শস্তা বার নয়? এ জাতীয় তুচ্ছ অথচ অস্বস্তিকর ঘটনাও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

পরবর্তী জীবনে দেখা যায়, চুরুট টানার এক অনুরাগময় অভ্যাস তাঁর ভেতর জন্ম নিয়েছিল। হয়তো তা অবদমনের এক পরিণত রূপ। কিন্তু ১৯১৩ সালেরও আগে, ১৯০৪-এ, তাঁর বাবা বিখ্যাত প্রাবন্ধিক স্যার ল্যাসলি স্টিফেনের মৃত্যুতে, তাঁর মানসিক ভারসাম্য নড়ে ওঠে? তখন এক বন্ধুর বাড়ির উঁচু জানালা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়েন তিনি। সৌভাগ্যবশত উচ্চতা কম থাকায় সে যাত্রায় বেঁচে যান। বিছানায় শোয়া অবস্থায় তিনি শুনতে পান অন্তর্গত কণ্ঠস্বর, যা এর আগে কয়েকবার, মানসিক দুর্ঘটনার সময় তিনি শুনেছিলেন: ''পাখিরা গ্রিক ভাষায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিচিরমিচির গান করছে।" পরে তিনি বুঝেছিলেন, এই স্বর আর কিছুই নয়, বরং তাঁর বিভাজিত মনের এক অস্বাভাবিক বিচলিত উদ্গিরণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল উল্‌ফের জন্য এক দুঃস্বপ্ন। তিনি ছিলেন বিদ্বেষহীন মানসিকতার অহিংস ধারায় বিশ্বাসী: তাঁর স্বামী স্থানীয় প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দেওয়ায় তিনি তার সমালোচনাও করেন নির্দয়ভাবে। কিন্তু তারপরও শত্রুদের বিষয়ে তাঁর কোনো মায়া কাজ করত না। ফ্যাসিবাদ বস্তুতই তাঁকে তুমুলভাবে আতঙ্কিত করেছিল। অক্ষ ও মিত্র শক্তির প্রকাশ্য শত্রুতা শুরু হলে তিনি দেশপ্রেমের অংশ হিসেবে সাহিত্য-সমালোচনা ও সাংবাদিকতায় নিজেকে নিয়োজিত করতে মনস্থ করেন, কিছু উপার্জন করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। উল্‌ফ এবং লেনার্ড সে সময় তাঁদের গ্রামের বাড়ি মঙ্ক হাউসে চলে গেলেন। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ সেখানে রজার ফ্রাইয়ের ওপর তাঁর জীবনীর কাজ এবং উপন্যাস *পয়েন্টস হল* শেষ করার কাজ শুরু করেন। যুদ্ধ খুব খারাপ অবস্থার সৃষ্টি করল; জার্মানি বেলজিয়াম আক্রমণ করল? হল্যান্ড ও ফ্রান্স আক্রান্ত; প্যারিসের পতন হলো; ব্রিটিশ যুদ্ধবাহিনী ডানকার্কে নাস্তানাবুদ হলো। যুদ্ধে ব্রিটেন অধিকৃত হলে তারা যৌথভাবে একসাথে আত্মহত্যা করবেন বলে দুজনে মনস্থিরও করেছিলেন। আত্মহত্যার সম্ভাব্য স্বরূপও নির্ধারিত হলো: গাড়ির ভেতর কার্বন-মনো-অক্সাইড গ্যাস টেনে বা অতিরিক্ত মরফিন নিয়ে। এই খারাপ ও প্রতিকূল সময়ের মধ্যেই উল্‌ফ রজার ফ্রাইয়ের ওপর তাঁর কাজটি সমাপ্ত করলেন। লেনার্ড এই কাজের সমালোচনা করেন, যদিও ফ্রাইয়ের সমসাময়িকেরা এর প্রশংসা করেন এই বলে যে, উল্‌ফ এই কাজের মাধ্যমে ফ্রাইকে পুনরায় জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু ব্রিটেনে যুদ্ধ শুরু হলো এবং তাঁর "শান্তির সামান্য মুহূর্ত"ও পরিণত হলো "হাইতোলা শূন্যতা"য়। বিমান আক্রমণে উল্‌ফ ও তাঁর বোন ভ্যানেসা বেলের লন্ডনের বাসা ধ্বংস হলো। এমনকি রডমিলও অক্ষশক্তির বিমান আক্রমণ থেকে রেহাই পেল না। এই বিমান আক্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন:

> তারা খুব নিকটে এসে পড়ে। গাছের গাছের নীচে শুয়ে পড়ি। শব্দ, যেন কেউ ঠিক আমাদের মাথার ওপরে দেখছিল। আমরা ওপরের দিকে মুখ রেখে মাথার নীচে হাত দিয়ে সোজা মাটিতে শুয়ে পড়ি। মুখ বন্ধ করো না, বলল বেল। তাদের কাছে মনে হবে কোনো নিশ্চল বস্তু। বোমা আমার লজের শার্সি কাঁপিয়ে দিল। এটা কি পড়ে যাবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম। যদি তাই হয় তাহলে আমরা একত্রে গুঁড়ো হয়ে যাব। আমি চিন্তা করলাম, আমি চিন্তা করি, নিরর্থকতা-নৈরাত্ম্য বিষয়ে। আমার মানসিক অবস্থা নীরস।

১৯৪০-এর আগস্ট থেকে পরবর্তী বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁর অবস্থা ছিল শান্তিপূর্ণ। এই সময়ে মাথা-ধরা বা অন্য কোনো উপসর্গ দেখা দেয়নি। ভিটাকে এ সময় তিনি এক তীব্র ভাবাবেগময় ধন্যবাদপত্রও দেন। গ্রামের অলস আর মন্থর জীবন যেন এক উপন্যাসের দাওয়াই দিচ্ছিল। বিছানায় বসে ভালো খাবার খেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ পড়াশোনা, তারপর স্নান সেরে পোশাক পরে পুরুষ-ভৃত্য লউ-ইর সাথে আলাপ সেরে দিনের প্রাত্যহিক কাজ তাকে বুঝিয়ে দেওয়া, অতঃপর গার্ডেন লজে গিয়ে একটা-দুটা সিগারেট টানার পর অসমাপ্ত উপন্যাস *পয়েন্টস হল* লেখা শুরু করা, মধ্যদিন পর্যন্ত কাজ করে যাওয়া? এই ছিল তাঁর তখনকার দৈনন্দিনতার ঘেরাটোপ। এ সময় *অ্যানোন* নামে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস লেখাও তিনি শুরু করেছিলেন।

দুপুর পর্যন্ত লেখালেখির পর মধ্যাহ্নভোজ সেরে তিনি কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াতেন, পত্রিকায় চোখ বোলাতেন, তারপর গাছ থেকে আপেল পাড়তেন অথবা কখনও ব্রেড বানাতেন। বিকেলে চা খেয়ে মুখপাত্রদের সাথে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে ফেলতেন, তারপর নিজ হাতে করা রান্নায় ডিনার খেতেন। অতঃপর গ্রামোফোনে গান শুনতেন অথবা সূচিশিল্পের কাজ করতেন অথবা বই পড়তেন যতক্ষণ না তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তিনি যখন লিখতেন প্রায়শ মাঝপথে থেমে গিয়ে লজ থেকে দেখা ল্যান্ডস্কেপ বিষয়ে মনে মনে ভাবতেন। নভেম্বরে একবার বিমান আক্রমণের সময় আউজ নদীর জল দুই তীর ছাপিয়ে তাঁর বাগান পর্যন্ত উঠে এসেছিল। ফলে কর্দমাক্ত তৃণভূমি পাখিদের আকর্ষণ করল? নদী যেন তাঁর দিকে এক হাত প্রসারিত করে দিল। এই নদীকে তিনি মনে গেঁথে রাখলেন তাঁর পরবর্তী শেষ আলিঙ্গনের জন্য। এই নদীই তাঁর পবিত্র জর্ডান নদী যার জলে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর মৃত্যুর স্নান শেষ করে নিয়েছিলেন, অথবা মৃত্যুর ডুবসাঁতারের জন্য নিজেকে নিয়েছিলেন ঠিক করে।

উল্‌ফ নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন "উভচরী" হিসেবে? যেখানে তাঁর মতো একজন লেখকের সৃজনশীলতা, নিষ্ঠা ও শ্রম, এবং অন্যদিকে তাঁর নিঃস্বতা, স্নায়বিক অবসন্নতার এক সমাপতন; লেখার টেবিলে এক অখণ্ড মনোযোগ অন্যদিকে সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকা। একদিকে আত্মবিলুপ্তি অন্যদিকে আত্মমহিমা? এই উভয়ত নিজ ধর্মে নিজেকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। সম্ভবত জীবনে নয়, মৃত্যুতেই তিনি তাঁর অভিলষিত অনিঃশেষ সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছিলেন। *অরল্যান্ডো: আ বায়োগ্রাফি*তে তিনি বলেছেন? লেখা, শৈল্পিক সৃষ্টি, সম্ভবত বুনোহাঁসের পশ্চাদ্ধাবন ছাড়া বেশি কিছু নয়।

১৯৪১-এর মধ্য-জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁর অবস্থা ছিল মোটামুটি সন্তোষজনক। তিনি তখন ছিলেন ধীর স্থির সুস্থ স্বস্থ, কিন্তু পরবর্তী দুই মাসে অবস্থা খারাপ হতে লাগল, মার্চ নাগাদ তা হলো সংকটজনক। কিন্তু উল্‌ফ ভাবতেন তিনি ঠিক আছেন। ২৭ মার্চ স্বামী লেনার্ড ডাক্তার দেখাবার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করলেন। উল্‌ফের বন্ধু ডা. অক্টাভিয়া উইলবারফোর্স এলেন, তাঁকে দেখলেন ও তাঁর সাথে কথা বললেন। আলোচনাকালে উল্‌ফ স্বীকার করলেন, তাঁর মনে হচ্ছে অসুস্থতা আবার দেখা দিয়েছে এবং তিনি আর লিখতে পারবেন না। ডা. উইলবারফোর্স তাঁকে মনে সাহস সঞ্চয় করার জন্য বললেন আর মনে করিয়ে দিলেন যে, অতীতেও এ ধরনের অবস্থা থেকে তিনি আরোগ্যলাভ করেছিলেন। ডাক্তার লেনার্ডকে বললেন, ভার্জিনিয়ার জন্য একজন সার্বক্ষণিক নার্স এবং যে-কোনোভাবেই হোক তাঁর ওপর নজরদারি রাখার জন্য। আলাপচারিতাকালে ভার্জিনিয়ার অবস্থা মোটামুটি ভালোই মনে হচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৮ মার্চ ১৯৪১, তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়লেন। শেষবারের মতো দুটি চিঠি? একটি স্বামী লেনার্ডকে, অন্যটি তাঁর মধ্যবয়সের সমকামী সঙ্গী ও অনুসারী-লেখক ভিটা স্যাকভিলে-ওয়েস্টকে? সমাপ্ত করে তিনি তাঁর রোডম্যানের বাড়ি ত্যাগ করে দ্রুত বাইরে চলে গেলেন। সূর্যের প্রখরতা সত্ত্বেও দিনটি ছিল প্রাণবন্ত, ছিল শীতল আমেজময় সকাল। হাতের ছড়িসহ তিনি আউজ নদীর ধারে চলে এলেন। তীরে এসে কোটের পকেটে রাখলেন অনেকগুলো পাথরখণ্ড। কেন তিনি পকেটে পাথর ভরলেন? তিনি কি ভেবেছিলেন শেষাবধি জলে না ডুবে ভেসে উঠতে পারেন আর পাথর যেন তাঁকে বাঁচার সুযোগ না দিয়ে জলের নীচে নিয়ে যায়! কিন্তু বাঁচার ইচ্ছাশক্তির বিপরীতে পাথরগুলো যদিও ছিল হালকা, কিন্তু রোগগ্রস্ত ভঙ্গুর মানসিকতার বিষমমাত্রার এই নারীর মৃত্যু যেন ছিল নিয়তি, যেন এক ভবিতব্য যা শুধু ঘটার অপেক্ষায় ছিল। উল্‌ফ অজ্ঞানকারী গ্যাস টেনে নেওয়ার মতোই নাক ও মুখ দিয়ে টেনে নিলেন জল? আউজ নদীর নীল স্বচ্ছ জল। স্নান সমাপনান্তে দিলেন ডুবসাঁতার, জলের একান্ত গভীরে, নেপথ্যে নয় সরাসরি রয়ে গিয়েছিলেন ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত জলের গর্ভে। মৃত্যু শান্ত নিস্তরঙ্গ: ফুসফুস শীতল জলে পূর্ণ হতেই তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে গেলেন, অর্জন করলেন "সেই এক অভিজ্ঞতা", যার বিষয়ে তিনি স্যাকভিল-ওয়েস্টকে বলেছিলেন, ''যাকে আমি কখনও বর্ণনা করব না।''

মৃত্যুবাহিত ছিলেন তিনি আজীবন, আক্রান্ত ছিলেন মুহুর্মুহু ভঙ্গুরতায় যা তাঁকে অপস্মৃতির কিনারায় নিয়ে গিয়েছিল। বস্তুত যা থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনার কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি। একে বলা যায় রিলকে কথিত "ফলিং-সিকনেস" বা জীবনানন্দ কথিত "বিপণ্ন বিস্ময়" যা তাঁকে ধাবিত করেছিল আত্মঅনুপস্থিতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে। লিখেছিলেন ব্যাপক-প্রতুল ডায়েরি, এটাও একটি দিক যে, মনোজগতের পরিবর্তনগুলোকে তিনি অনুভব করতেন নিবিড় সংবেদনের সাথে। নিজেকে যাবতীয় যাপনের জন্য অপ্রয়োজনীয় ও অসম্পূর্ণ ভাবতেন উল্‌ফ। ভাবতেন তাকে রক্ষা করার কোনো মানেই আর হয় না। যে উদাসীনতা বিনাশের মানচিত্রের জন্ম দেয়, যে আর্তনাদ মুখোশের অন্তরাল থেকে হানা দেয় দৃশ্য-পরম্পরায়, সেই নিপাট ব্যর্থতা বহন করার অর্থও এক হাস্যকর অর্থহীনতা যা থেকে মুক্তি নেওয়াই স্বতঃসিদ্ধ বিবেকের অন্তিম আহ্বান। স্বামী লেনার্ডকে উদ্দেশ করে রেখে যাওয়া শেষ নোটেও তিনি এরই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলেছেন যেখানে ফুটে উঠেছে তাঁর মৃত্যুর বিরোধাভাস, যাকে তিনি তাঁর "উভচরী" ব্যক্তিত্বের বেষ্টনীতে সমৃদ্ধ করেছেন আজীবন।

যে আগন্তুক হাওয়া এসে জীবনের উর্বর পলিতে নিরর্থকতার বীজ ফেলে দিয়ে যায়, তা উপ্ত হয়, অঙ্কুরোদ্‌গমিত হয় ব্যক্তির নানা পরাজয়, অসুস্থতা ও আততির রসস্পর্শে। ব্যক্তি তখন নিরর্থকতাকেই মুক্তিমোক্ষ ভেবে বসেন। উল্‌ফের ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক স্থির অনাস্থা প্রকাশ করে গেছেন নিজের জীবনের প্রতি, অনবরত। শেষ নোটে স্বামী লেনার্ডকে তিনি লিখছেন:

> আমি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছি, আবারও আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।
> মনে হচ্ছে, আমরা আর সেই ভয়ংকর সময়ে যেতে পারি না, এবং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> আমি সেই সময়কে পুনরুদ্ধারও করতে পারব না। সেই স্বর শুনতে পাচ্ছি আমি, নিজেকে একাগ্রও করতে পারছি না। অতএব যা করা উচিত আমি তা-ই করতে যাচ্ছি। তুমি আমাকে পরম সুখ দিয়েছো। অন্য একজন যা হতে পারত, তুমি সব অর্থেই তা হয়েছো। আমি মনে করি না এই ভয়ংকর রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর দুজন মানুষ আর সুখী হতে পারে। আমি আর পারছি না যুদ্ধ করতে এর সাথে। জানি, আমি তোমার জীবন নষ্ট করে দিচ্ছি? আমাকে ছাড়াও তুমি চলতে পারতে। আর তুমি তা জানবে। দেখো আমি ঠিকভাবে তা লিখতেও পারছি না; পড়তেও পারছি না। যা আমি বলতে চাই তা হলো? সব সুখের জন্যে আমি তোমার কাছে ঋণী। তুমি আমার প্রতি ছিলে পরিপূর্ণ ধৈর্যশীল আর অসম্ভবরকম আন্তরিক। আমি এ-ই বলতে চাই যা সবাই জানে। যদি কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারত তবে সে? তুমি। তোমার নিশ্চিত মঙ্গলকামনা ছাড়া আর সব কিছুই আমি হারিয়েছি। আমি আর তোমার জীবন নষ্ট করতে পারি না। আমি এও মনে করি না, আমাদের দুজনের মতো অন্য কেউ এমন সুখী হতে পারত।

এখানেও হাহাকারিত সেই লুপ্তাকাঙ্ক্ষা? যা জন্মের পর থেকেই বাসা বেঁধেছিল তাঁর স্নায়ুর গভীর অন্ধকারে।

মৃত্যু এক শিল্প

–সিলভিয়া প্লাথ

১৯৪৮ সালে, যখন সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ, একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন:

> জিজ্ঞেস করো তুমি আমাকে কেন আমি
> লেখায় ব্যয় করছি আমার জীবন?
> আমি কি তাতে পাই বিনোদন?
> নাকি তা মূল্যবান কিছু?
> সর্বোপরি, কবিতা লিখে কি টাকাকড়ি কিছু মেলে?
> তা না হলে, কী আর কারণ আছে?...
> আমি লিখি শুধু এ কারণে যে
> আমার ভেতরে রয়েছে প্রস্বর
> যা কখনও হয় না নিশ্চুপ।

মূলত সারাটি জীবন তিনি অন্বেষণ করেছেন সেই স্বরকে, যার পরিসমাপ্তি হয়েছে তাঁর আত্মহত্যায়। সিলভিয়া প্লাথ (১৯৩২–১৯৬৩), পিতা অটো এমিল প্লাথ, মাতা অরেলিয়া শোবার প্লাথ, স্বামী বিখ্যাত কবি টেড হিউজ, নিজেকে ভাবতেন "লেডি ল্যাজারাস", একাধিকবার সচেষ্ট ছিলেন আত্মহত্যায়। "লেডি ল্যাজারাস" কবিতায় তিনি বলেছেন, প্রতি দশ বছরে কমপক্ষে একবার আত্মহত্যায় তিনি আগ্রহী হয়ে

~ www.amarboi.com ~

উঠতেন, এবং দেখা যায়, তাঁর প্রথম ব্যর্থ আত্মহত্যার চেষ্টার ঠিক দশ বছর পর ১৯৬৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি আত্মহত্যায় সফল হন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে "প্রান্ত" কবিতায় তিনি লেখেন, মৃত্যু একজন নারীকে পূর্ণতা দেয়; তাঁর প্রত্যেকটি স্তন এক মৃতশিশু। আত্মহত্যার আগে দুই শিশুসন্তান নিয়ে তিনি ছিলেন ভাবিত, ছেলে নিকোলাসের জন্মের পর ডেভনের দিনগুলো হয়ে উঠেছিল ভয়ংকর। স্বামী টেড হিউজকে নিয়ে তিনি ছিলেন অসন্তুষ্ট। কানাডীয় কবি ডেভিড উইভিলের পত্নী আসিয়া উইভিলের সাথে টেড হিউজের সম্পর্ক হওয়ায় সিলভিয়া প্লাথ মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হন। এ সময়ের লেখা কবিতাগুলোতে উঠে এসেছিল দাম্পত্য সমস্যা, যাকে প্লাথ মনে করতেন এক ফাঁদ, যেখানে নারী ভুক্তভোগী।

যে দাম্পত্যজীবন শুরু হয়েছিল আনন্দ আর প্রত্যাশায়, তা পরিণত হলো বিষাদ আর বঞ্চনায়। তিনি তাড়িত হয়ে পড়লেন মৃত্যুর ছায়ায়। জুনের প্রথম দিকে প্লাথ যখন টেড হিউজের একটি গোপন ফোনকল শুনলেন, তিনি পুড়িয়ে ফেললেন তাঁর নতুন অসম্পূর্ণ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, যাতে তিনি তাঁদের রোম্যান্টিক প্রেমকে উদ্‌যাপন করতে চাচ্ছিলেন। আয়ারল্যান্ডে স্বল্পকালীন ভ্রমণের পর তাঁরা আলাদা হয়ে গেলেন। আগস্ট মাসের শেষের দিকে সিলভিয়া মরিস স্টেশন ওয়াগন অফ রোডে গেলেন এবং সেখানে এক বিমানঘাঁটিতে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান। তিনি অক্ষত থাকেন, গাড়িরও কোনো ক্ষতি হলো না। "লেডি ল্যাজারাস" কবিতায় এ দুর্ঘটনাকে তাঁর দ্বিতীয় আত্মহত্যার চেষ্টা ও রক্ষা পাওয়া বলে বর্ণনা করেন। অক্টোবরে লেখেন অনেক কবিতা যাতে ছিল তাঁর "মৌমাছিগুচ্ছ" যেখানে নারীত্বের উদ্‌যাপন ধ্বনিত। রানি মৌমাছি তার তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করে, এবং জয়ী হয়। শীত এলে পুং-মৌমাছিরা নারী মৌমাছির তাড়ায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় মরে যাওয়ার জন্য। অপদার্থ, খোঁড়া, পুরুষ মৌমাছিদের মৃত্যুই কাম্য। "লেডি ল্যাজারাস"ও শেষ হয়েছে নারীবাদের সাহসী বাহাদুরিতে। প্লাথ যাচ্ছিলেন তাঁর দাম্পত্য সংকটের ভেতর দিয়ে। ফিনিক্স পাখির মতোই নিজের দেহভস্ম থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন তিনি। অগ্নিরঙা চুল নিয়ে জাগছেন তিনি, উল্লসিত বাতাসের মতোই এখন তিনি উপভোগ করতে পারবেন পুরুষদের। অক্টোবরের ১২ তারিখে তিনি লিখলেন "ড্যাডি", এটিও অনেকার্থ দ্যোতনামণ্ডিত এক কবিতা: এক বালিকা বলছে কথা তার মৃত বাবা সম্পর্কে, যাকে মেয়েটি দেবতা ভাবত। মরে গিয়ে বাবা আসলে মেয়েটিকে প্রতারণাই করল। বাবার বিষয়ে মেয়েটির ভয় ও ভালোবাসা এমনই মারাত্মক যে, বাবার ছায়ায় বেড়ে উঠে এবং বেঁচে থেকে সে তার বাবার সব স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। বালিকাকেই খুন করতে হয়েছে বাবাকে। বোঝা যায়, বাবা ছিলেন একজন নাৎসি আর মেয়ে অর্ধেক-ইহুদি। সারা জীবন ধরেই প্লাথ তাঁর জার্মান বংশগত উত্তরাধিকারকে ভয়ংকরভাবে সন্দেহ করেছেন। প্লাথ ভালোবাসতেন তাঁর বাবাকে, এবং ভেবে আতঙ্কিত হতেন যে জার্মানিতে থাকলে তিনি হয়তো হতেন একজন নাৎসি। এটাও অকল্পনীয় নয় যে তাঁর মা, যিনি ছিলেন অস্ট্রীয়, হলেও হয়ে থাকতে পারেন ইহুদি রক্তের উত্তরাধিকারী, তাই পিতার আক্রমণের শিকার হতে পারতেন। বর্ণনা দিতে গিয়ে প্লাথ বলছেন, "এই দুটি

~ www.amarboi.com ~

টানাপোড়েন একে অপরকে সম্পর্কিত ও অসাড় করে দেয়।" প্লাথ লেখেন যে সব নারীই ভালোবাসে ফ্যাসিস্টদের, গেঁয়োদের, যারা কষ্ট দিয়ে সুখ পায়।

কিন্তু ১৯৫৩ সালে যে আত্মহত্যার চেষ্টা তিনি করেন, তার পেছনে ছিল তাঁর নার্ভাস ব্রেকডাউন, যার কারণ ছিল *ম্যাডমইসেলে* পত্রিকার অতিথি সম্পাদক হিসেবে কাজ করার সময় পত্রিকার কর্মচারীদের তাঁর কাজের সমালোচনা। এতে তাঁর লেখার ওপর বিশ্বাস কমে গিয়েছিল। নিউ ইয়র্ক ছাড়ার কিছুদিন আগে জাতিসংঘের এক পেরুভীয় প্রতিনিধির সাথে দেখা করতে গেলে তার দ্বারা ধর্ষণের পরিস্থিতির শিকার হন তিনি। পুরুষের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায়ও তিনি আক্রান্ত ছিলেন। সমগ্র কলেজ জীবনেই তাঁর ভেতর ছিল দ্বৈতব্যক্তিত্বের সমস্যা। মনে করতেন সারা জীবন রয়ে যাবেন কুমারী কিন্তু পুরুষসঙ্গীরও প্রয়োজন বোধ করতেন তিনি। ওয়েলেসলিতের প্রতিবেশী ডিক নর্টনের সাথে ছিল তাঁর দীর্ঘকালীন সম্পর্ক, ডাক্তারি পড়ার সময় ডিক আক্রান্ত হয়েছিলেন যক্ষ্মায়। কিন্তু সিলভিয়া যখন শুনলেন এক পরিবেশিকার সাথে ডিকের প্রেম চলছে, তখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পুরুষদের তিনি মনোযোগ দিয়ে যাচাই করতেন কিন্তু কখনোই কারও সাথে তাঁর যৌনসম্পর্ক হয়নি। কিন্তু ১৯৫৬ সালের ১৬ জুন ব্লুমসডে-তে যখন টেড হিউজের সাথে তাঁর পরিচয় থেকে পরে বিয়ে হয়ে গেল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে এতদিনে নিজের সমান একজনকে পেলেন তিনি।

যখন ঘটে আত্মহত্যাটি, সে-সময় ছিল শতাব্দীর সবচেয়ে মারাত্মক শীতকাল, বলা হয় যে গত দেড়শ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। একা একা ডেভনে শীতকাল পাড়ি দেওয়া তাঁর কাছে অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল; তিনি লন্ডনে ফিরে যাবার মনস্থ করেন। ভাড়ার জন্য যখন খোঁজ করছিলেন ফ্ল্যাট, তখন দেখলেন কবি ইয়েটসের বাড়িটি যেখানে লেখা রয়েছে "এখানে ইয়েটস বাস করতেন"। এই বাড়িটির পাশ দিয়ে অনেকবার তিনি গেছেন, মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এখানে বসবাসের। একটু আশ্চর্য হয়ে দেখলেন জানালায় বিজ্ঞাপন রয়েছে যে বাড়িটি ভাড়া দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গেলেন এজেন্টের কাছে এবং পাঁচ বছরের বন্ধকের চুক্তি করে এলেন। বড়োদিনের কয়েক দিন আগে তিনি উঠলেন এখানে।

তুষারঝড়, বিদ্যুৎবিভ্রাট, তাঁর ফ্লু, বাচ্চাদের সর্দি ও ঠান্ডা। লাইনের ওপর আটকে গিয়েছিল রেলগাড়ি, রাস্তায় জমে গিয়েছিল ট্রাকগুলো। জলের পাইপলাইন জল জমে বরফ হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পাওয়ার স্টেশনগুলো হয়ে পড়েছিল অতি ভারে ন্যুব্জ। মনে হচ্ছিল, এ এক অন্তহীন তুষারকাল। সিলভিয়া প্লাথ হয়ে পড়লেন অসহায় ও হতাশ, সাইনাসের ব্যথায়ও ছিলেন কাতর। ডিসেম্বর মাসে *অবজারভার*-এ প্রকাশ পায় তাঁর দীর্ঘ-অগ্রন্থিত কবিতা "ইভেন্ট"; মধ্য-জানুয়ারিকে প্রকাশিত হয় কবিতা "শীতবৃক্ষ"। আল আলভারেজের কথা থেকে জানা যায়, সে-সময়ে সিলভিয়া একটি নামকরা সাপ্তাহিকীতে কিছু ভিন্ন ধরনের কবিতা পাঠান যা অপছন্দের কারণে সম্পাদক তাঁকে ফেরত পাঠান। তবে তিনি আলভারেজকে জানান যে সিলভিয়ার হয়তো সাহায্যের প্রয়োজন। সিলভিয়ার চিকিৎসকও একই ধারণা পোষণ করেছিলেন। তিনি

~ www.amarboi.com ~

তাঁকে ঘুমের ওষুধ দেন এবং সাইকোথেরাপিস্টের পরামর্শ গ্রহণের জন্য বলেন। দ্বিধার পর থেরাপিস্টের অ্যাপোয়েন্টমেন্ট চেয়ে তিনি চিঠি লেখেন কিন্তু হয়তো তাঁর চিঠি দেরিতে পৌঁছানোতে বা থেরাপিস্টের চিঠি ভুল ঠিকানায় যাওয়ায় এ আয়োজন কাজে এল না। থেরাপিস্টের জবাব এল তাঁর মৃত্যুর এক-দুই দিন পর। আলভারেজ বলছেন, এত কিছুর পরও সে-সময়ে সিলভিয়া মরতে চাননি। বরং দশ বছর আগে তিনি যে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছিলেন তা ছিল আরও ভয়াবহ। সে-সময়ে সেলারে নিজেকে আটকে রেখে তিনি পঞ্চাশটি ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেলেন, কিন্তু রক্ষা পেয়ে যান। তাঁর জীবনীশক্তি ছিল মৃত্যুচেষ্টার চেয়ে ঢের বেশি। এর বর্ণনা পাওয়া যায় উপন্যাস *দ্য বেল জার*-এ, একে মিথ্যা মনে করার কারণ নেই।

একটি এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি থেকে একজন মেয়েকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল তাঁর লেখার সময় শিশু ও ঘরগেরস্থালির কাজে সহায়তা করার জন্য। সেই অস্ট্রেলীয় মেয়েটির আসার কথা ছিল ১১ ফেব্রুয়ারি, সোমবার সকাল নটায়। এদিকে বার বার সাইনাসের আক্রমণে ব্যথায় তিনি পর্যুদস্ত। নতুনভাবে পরিবর্তিত তাঁর ফ্ল্যাটের জলের পাইপ জমে কঠিন হয়ে গেছে; কোনো ফোন আসছে না, বা আসছে না কোনো খবর এমনকি থেরাপিস্টের কাছ থেকেও; আবহাওয়া ক্রমশই হয়ে যাচ্ছে বীভৎস। অসুস্থতা, একাকিত্ব, হতাশা আর শৈত্য, তার সাথে দুই বাচ্চার বাঁচার চাহিদা যুক্ত হয়ে তাঁকে করে তুলেছিল অস্থির, হতাশ আর বিষণ্ন। সুতরাং সপ্তাহান্তে বন্ধের দিন তিনি বাচ্চাদের নিয়ে লন্ডনের অন্য অংশে বন্ধুদের সাথে থাকার জন্য গেলেন। পরিকল্পনা ছিল সোমবার খুব সকালে রওনা দিয়ে ফিরে এসে অস্ট্রেলীয় মেয়েটিকে স্বাগত জানাবেন। কিন্তু রোববারেই তিনি ফিরে এলেন। বন্ধুরা আপত্তি করেছিল, কিন্তু তিনি তাঁর সহজাত দৃঢ়তায় সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। ফলে তারা যেতে দিলেন তাঁকে। রাত প্রায় এগারোটায় তিনি তাঁর ফ্ল্যাটের নীচে বসবাস করা বয়স্ক চিত্রকরের দরজায় টোকা দিলেন এবং তাঁকে কিছু ডাকটিকিট ধার দেবার জন্য বললেন। দরজায় দাঁড়িয়ে অযথাই কথা বলা চালিয়ে তিনি সময়ক্ষেপণ করছিলেন যতক্ষণ না চিত্রকর তাঁকে বললেন যে আজ সকাল নটারও আগে তিনি ভালোভাবেই ঘুম থেকে উঠেছেন। তারপর তিনি বিদায় জানিয়ে ওপরতলায় উঠে গেলেন।

রাতটি কীভাবে কাটান তিনি? নিশ্চিতই নিদ্রাহীন। কিন্তু সিদ্ধান্তে কি আসতে পেরেছিলেন? শেষ কয়েকটা দিনে তিনি লিখেছিলেন তাঁর অন্যতম সেরা কবিতা "এজ", যাতে বলা হয়েছে তাঁর সম্পাদনের কথা:

নারীটি হয়ে উঠেছে নিখুঁত
তার মৃতদেহ
পরে আছে বহুগুণান্বিতের হাসি

আনুমানিক ছয়টার দিকে বাচ্চাদের ঘরে যান তিনি, তাদের পাশে রাখেন রুটি, মাখন আর দুই মগ দুধ, যাতে অস্ট্রেলীয় মেয়েটি আসার আগে তারা ঘুম থেকে উঠে গেলে ক্ষুধা লাগলে খেতে পারে। তারপর রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে তোয়ালে দিয়ে নীচটা ভালো করে বন্ধ করে দেন, দরজা আর জানলার ফাঁকও তোয়ালে দিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভালো করে বন্ধ করে দেন, চুলা খুলে দেন, তারপর মাথা তাতে দিয়ে তা চালু করে দেন। তারপর!

ঠিক সময়েই অস্ট্রেলীয় মেয়েটি এল, ঠিক নটায়। বেল বাজাল দীর্ঘ সময় ধরে, দরজায় ধাক্কা দিল। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো উত্তর এল না। সে তখন নেমে এসে টেলিফোন দোকান খুঁজতে লাগল যাতে এজেন্সিতে ফোন করে ঠিকানা ঠিক আছে কি না তা নিশ্চিত হতে পারে। ঘরের ডোরবেলের কাছে সিলভিয়ার নাম লেখা ছিল না। সব ঠিক থাকলে প্রতিবেশী তো ছুটে আসত দরজা ধাক্কার শব্দে, কিন্তু প্রতিবেশী ছিল বধির, ঘুমাচ্ছিল সে তার শ্রবণযন্ত্র খুলে রেখে; যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ যে, তার শোবার ঘর ছিল সিলভিয়ার রান্নাঘরের ঠিক নীচেই। গ্যাস চুঁইয়ে পড়ছিল। মেয়েটা ফিরে এসে আবারও চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হলো। পুনরায় সে টেলিফোন করল এজেন্সিতে কী করবে সে ব্যাপারে, তারা তাকে ফিরে যেতে বলল। তখন এগারোটা বাজে। ঠিক ওই সময়েই কিছু জমাট হয়ে যাওয়া ঘরে কাজ করার জন্য কয়েকজন মিস্ত্রি এল। তারা তাকে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিল। সে যখন সিলভিয়ার দরজায় ধাক্কা দিল তখন তীব্র গ্যাসের গন্ধ পেল সে। মিস্ত্রিরা জোর করে দরজা ভেঙে দেখল রান্নাঘরে সিলভিয়ার এলোমেলো ছড়িয়ে থাকা শরীর। তখনও সিলভিয়ার শরীর ছিল উষ্ণ। পাশে রাখা চিরকুট যাতে লেখা, "প্লিজ কল ডক্টর? আর ডাক্তারের টেলিফোন নম্বরও দেওয়া ছিল। কিন্তু ততক্ষণে তিনি চলে গেছেন অজানায়, অদৃশ্যে।

আত্মহত্যা কি অনিবার্য ছিল তাঁর জন্য! ঘটনা ঘটে গেলে তা-ই বলতে হয়। কিন্তু দশ বছর আগে যখন সিলভিয়া প্লাথ পঞ্চাশটি ঘুমের বড়ি খেয়ে বসেন আর পার পেয়ে যান, তার তুলনায় ১৯৬৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সময়টি ছিল তাঁর জন্য অধিকতার স্বস্থ। দুটি সন্তান, তুমুল সৃষ্টিশীলতা? কবিতা আসছে অবিরাম, লিখছেন উপন্যাস, ভোর চারটায় শুরু করতেন লেখা, উপন্যাস *দ্য বেল জার* ছদ্মনামে প্রকাশ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, জীবনের শেষ মাসে কাজ করছিলেন তাঁর নতুন উপন্যাস *ডাবল এক্সপোজার* নিয়ে, যেখানে একজন শক্তিশালী ও ধাপ্পাবাজ পুরুষের পাল্লায় এক তরুণীর পতনের কাহিনি বর্ণিত হচ্ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর এ পাণ্ডুলিপিটির দেখা মেলেনি। টেড হিউজের ভাষ্যমতে ১৯৭০ সালে হারিয়ে গিয়েছিল তা। কেন তবে আত্মহত্যাটি ঘটল? গুরুত্বপূর্ণ লেখার উল্লাস, সন্তানদের জন্য গভীর প্রেম, তাঁর প্রিয় মনোচিকিৎসক ড. বি.-র সুপরামর্শঋদ্ধ চিঠি, টেডের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা, তাঁর পরিবারের অন্তহীন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি? কিছুই আটকাতে পারল না তাঁকে! ১৯৫৩ সালে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বেঁচে যাওয়াটা ছিল আশ্চর্যের আর ১৯৬৩ সালে আত্মহত্যা করাটাও ছিল আশ্চর্যের।

সারা জীবন অসংখ্য চিঠি লিখেছেন, বিশেষত মাকে, যা তাঁর মায়ের সম্পাদনায় *লেটারস হোম* নামে গ্রন্থিত। ১৯৬৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লেখা চিঠিতেও (সম্ভবত এটাই মাকে লেখা শেষ চিঠি) তিনি জানাচ্ছেন লন্ডন নিয়ে তাঁর আবেগের কথা, বলছেন কখনও আর ফিরে যাবেন না আমেরিকায়। লন্ডনের চমৎকার ডাক্তার, ভালো প্রতিবেশী, পার্ক, থিয়েটার আর বিবিসির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত তিনি। বলছেন লন্ডনের

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডাক্তারদের সেবার কথা, টেড সপ্তাহে একবার বাচ্চাদের দেখে যায় যা তাঁকে দায়িত্বশীল করছে, তার কথা, সন্তানদের কারণে পরবর্তী কয়েক বছর সকালে লেখার কথা। ৭ নভেম্বর, ১৯৬২ মাকে লেখা চিঠির শেষাংশে তিনি বলছেন: "টেডের থেকে আলাদা হয়ে বেঁচে থাকাটা দারুণ? আমি আর তাঁর ছায়ায় নেই, আর নিজের মধ্যে থাকা এবং নিজের চাওয়া সম্পর্কে জানা স্বর্গীয়।... ব্যাঙ্কে অর্থ থাকার বিবেচনায় হয়তো আমি গরিব কিন্তু অন্যভাবে আমি অনেক ধনী, আমি মোটেই এসবকে ঈর্ষা করি না। বাচ্চারা আর লেখাই আমার জীবন।"

কিন্তু তারপরও ঘটল, কেন ঘটল এর উত্তর কখনও আর জানা যাবে না। কারণ তা জানাও যায় না, যদিও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু লেখক আল আলভারেজ বলেছেন যে, তা ছিল এক সাহায্যের ক্রন্দন যা মারাত্মকভাবে হয়েছিল লক্ষ্যচ্যুত।

অনেক পরে সিলভিয়ার স্মরণে প্রকাশিত টেড হিউজের কাব্য *বার্থডে লেটারস*-এর "লাইফ আফটার ডেথ" কবিতার সমাপ্তিতে টেড হিউজ লিখেছেন:

> যেন আমার শরীর ডুবে গেল লোকগল্পে
> যেখানে বনের ভেতর নেকড়ে গায় গান
> দুই শিশুর জন্য, যারা ঘুমের গভীরে
> হয়েছিল অনাথ
> তাদের মায়ের মৃতদেহের পাশে।

বন্ধুরা, জীবন বড়োই ক্লান্তিকর

—জন বেরিম্যান

পুরো মনস্তত্ত্ব জুড়েই ছিল নিষ্প্রদীপ আঁধারের লুক্কায়িত বাস্তবতা কিন্তু নিস্তারের পথ তাঁর জানা ছিল না। স্নায়ুর গভীরে ছড়ানো ছিল শাণিত চকচকে ছুরি যার আঘাতে কাটত সংবেদনশীল তন্ত্রীগুলো। বিকারগ্রস্ত আর অন্তর্বাহী বিলাপে পূর্ণ ছিল তাঁর সত্তা যা তাঁকে গভীর-গভীরতর শূন্যগর্ভতায় নিয়ে গিয়েছিল এবং আত্মার ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খলমুক্তির এক মুক্তবেগ সঞ্চার করেছিল। পেছনের প্রেক্ষাপটীয় অন্ধকার তাঁকে তাড়া করেছিল এবং এই কাউন্টারপয়েন্টিং বারে বারেই উন্মাদনায় আক্রান্ত করেছিল তাঁকে, যার ফলাফল হিসাবে সময়ের ধারালো পেরেকে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন তিনি। বর্তমানকে মনে করতেন অতীত আর অতীতকে অন্ধকার। সংশয় ও শূন্যতার এই ভেতরের অন্ধকার সারা জীবন তাঁকে বিদারিত করছিল আর তিনি হয়েছেন ভারসাম্যহীন। জন বেরিম্যান, আর এক বিখ্যাত স্বীকারোক্তিক কবি, আজীবন তাড়িত ও আচ্ছন্ন ছিলেন তাঁর পিতার মৃত্যুতে;? তাঁর পিতা জন অ্যালাইন স্মিথ, ১৯২৬ সালের ২৬ জুন আত্মহত্যা করেছিলেন। সে-সময়ে এগারো বছরের বালক পিতার যে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেন, তার থেকে, সেই বিচ্ছেদ ও হারানোর বেদনা থেকে, তিনি আর রেহাই পাননি। তিনি ভুলে থাকতে চেয়েছেন পিতাকে, পরিবর্তন করেছেন নিজ নামের পদবি? মা মার্থার দ্বিতীয় স্বামী জন এংগাস বেরিম্যান-এর পদবি নিয়ে জন অ্যালাইন স্মিথ জুনিয়র থেকে হয়েছেন জন অ্যালাইন বেরিম্যান, কিন্তু আত্মহত্যাকারী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পিতা বারে বারে যেন তাঁকে অবচেতনে প্ররোচিত করছিল, ফলে তিনি এক হ্যামলেট-গূঢ়েষায় ভুগছিলেন সারাজীবন। পিতার আত্মহত্যাকালীন মা মার্থা জন এংগাস বেরিম্যানের সাথে ভালোবাসায় মত্ত ছিলেন? এই সূত্রপাতে সারাজীবন তিনি, জন বেরিম্যান, অনিশ্চয়তা আর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে তাড়িত হয়েছেন। এবং প্রিন্স অব ডেনমার্ক-এর মতোই ধীরে ধীরে নিজের জীবনে এক মৃত্যু-ইচ্ছার উদ্বোধন ঘটান যা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বর্ধিষ্ণু। এরই পরিণতিতে আটান্নো বছর বয়সে, ১৯৭০ সালে, মিনিয়াপোলিসের ওয়াশিংটন অ্যাভিনিউ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। মদ্যপানাসক্ততা থেকে রেহাই না পেয়ে এর দুঃখ থেকে স্ত্রী ও সন্তানদের মুক্তি দেওয়ার জন্যও তিনি আত্মহত্যা করেন। পাশাপাশি এ উদ্দেশ্যও ছিল যে, যে পিতা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল, এবার তাঁর সাথে তিনি মিলিত হবেন। পিতার মৃত্যু তাঁর নিকট এতই মর্মপীড়াদায়ক ও অসহ্য ছিল যে তিনি শুধু তাঁর পিতার স্মৃতিকে অবদমিতই করতেন না, বরং তাঁর সংগ্রহগুলোকেও ভুলে থাকতে চাইতেন। পরবর্তী জীবনে বেরিম্যান বলতেন, পিতার মৃত্যুর কারণে তাঁর সমগ্র শৈশবই চুরি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পিতা আত্মহত্যা করেছিলেন, ২৬ জুন, সকালে; তাঁর মা মার্থা স্মিথ স্বামীর মৃতদেহ আবিষ্কার করেন। মৃতদেহের পাশে পড়ে ছিল ·৩২ ক্যালিবারের পিস্তল, যা থেকে তাঁর বুকে ঢুকেছিল একটি বুলেট।

পিতার মৃত্যুর পরের মাসগুলোতেই বালক বেরিম্যানের জীবন ওলটপালট হয়ে যায়। তাঁর কাকা জ্যাক, তাঁর মা, তিনি এবং তাঁর ছোটো ভাই রবার্ট জেফারসন, ফ্লোরিডার টামপা থেকে কুইন্স-এর জ্যাকসন হাইটে চলে আসেন। বালক বেরিম্যান তাঁর পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত ক্যাথোলিক বিশ্বাস পরিত্যাগ করে এপিসকোপালীয় চার্চে যোগদান করেন। ১৯২৮ সালের সমাপ্তি সময়ে বেরিম্যানকে কনেকটিকাটের সাউথ-কেন্ট-এ একটি এপিসকোপালীয় বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে, প্রাথমিক অবস্থায়, অন্য স্কুলছাত্রদের সাথে সহাবস্থানে, বেরিম্যানের মারাত্মক সমস্যা হয়। ব্রণে আক্রান্ত এবং কম দৃষ্টিশক্তির কিশোর বেরিম্যান তাঁর সহপাঠীদের দ্বারা উপর্যুপরিভাবেই নিপীড়িত হতেন।

সাউথ-কেন্টে আসার কিছুদিন পর, বেরিম্যান হয়ে পড়েন বিষণ্ন, স্মৃতিতাড়িত ও গৃহকাতর। সে-সময়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন, তাঁর মা মারা গিয়েছেন এবং তিনি মাকে দেখার জন্য স্কুল থেকে আসতে পারছেন না। বাস্তবে এ ঘটনার এক ছায়াপাত চোখে পড়ে। তাঁর মা এক রূপান্তরের ভেতর দিয়ে যান; আঙ্কল জ্যাকের অনুরোধে তিনি তার নামের "মার্থা" অংশ পরিত্যাগ করেন। বেরিম্যানের জীবনেও কোনো কিছুই, এমনকি তাঁর মায়ের দেওয়া নামটিও অপরিবর্তিত থাকেনি। অনেক বছর পর, তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যার খ্রিস্টান নাম রাখেন মার্থা,? এটা হয়তো তাঁর আত্মসমর্থন ও সংশোধনের একটি ছুতো ছিল। কিন্তু সবকিছু হারালেও কিছু ফিরে এসেছিল তাঁর। জীবনে, ও মৃত্যুতে। মৃত্যুর পর রোমান ক্যাথোলিক রীতিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছিল তাঁর। সেন্ট ফ্রান্সেস ক্যাব্রিনি চার্চে, মিনিয়াপলিসে, তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বেরিম্যান যখন সাউথ-কেন্টে আসেন তখন তাঁর বয়স তেরো বছর। তাঁর মনে হয়েছিল অতীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবন চলে গেছে? হারানো বলের মতোই তা ভেসে ভেসে দূর-সমুদ্রে চলে গেছে, হয়ে গেছে অদৃশ্য, হয়েছে তার সলিল-সমাধি। ১৯৪১ সালে লেখা "দ্য বল পোয়েম" কবিতায় এই ব্যাপারটির উন্মেষ ঘটান বেরিম্যান:

এখন বালক যে তার বল হারিয়েছে,
কী; কী তার করার আছে? আমি দেখি তা
উল্লসিতভাবে লাফিয়ে চলে যায় দূরে, রাস্তায় পড়ে থাকে
আর তারপর ঘটে সুখদ সমাপ্তি? এখন তা
পড়ে থাকে জলে! বলার আর সুযোগ নেই
ওই যে রয়েছে অন্য বল:
এক চূড়ান্ত কাঁপানো দুঃখ বালককে অনড়
করে, এখন সে স্থির দণ্ডায়মান, কম্পমান,
সব যৌবনের দিন নিয়ে পোতাশ্রয়ের দিকে
তাকানো? যেখানে রয়েছে পড়ে বল তার।

এখন অনেক সমালোচকই মনে করেন, এই কবিতাটি বেরিম্যানের প্রথম দিকের একটি সার্থক সৃষ্টি। বেরিম্যান নিজেও মনে করতেন, কবিতাটি তাঁর এক সবল ও নতুন ধরনের কবিতা, যা তাঁকে এক নতুন প্রমিত পরিচয় দেয়। বেরিম্যান-জীবনীকার পল মারিয়ানি কবিতাটি সম্পর্কে লেখেন, কবিতাটি উপস্থাপন করে "এক দ্বিগুণ অভিদর্শন: শিশুর প্রথম হারানোর উপলব্ধি? একটি বল সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে? আর বয়স্কের প্রেক্ষাপট থেকে এক অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক উপলব্ধি? সামনের দিকে তাকানো এবং একই সাথে পেছনের দিকে তাকানো? যে-জীবন অপরিহার্যভাবেই এ সমস্ত ক্ষতির জন্য প্রস্তুত...।" কবিতাটি আত্মজৈবনিক এক স্মরণ: পিতা জন অ্যালাইন স্মিথ বুকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন, কিন্তু মৃত্যুর আগের সপ্তাহগুলোতে তিনি উপসাগরে সাঁতার কাটতেন, অনবরত সাঁতার কাটতেন তিনি। বেলাভূমিতে বসে থাকা তাঁর ছেলে দেখতেন, তাঁর পিতা সাঁতার কাটতে কাটতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন; উদ্বেগ নিয়ে পিতার জন্য অপেক্ষা করতেন ছেলে।

ছোটোবেলা থেকেই মৃগীরোগে প্রায়শই আক্রান্ত হতেন বেরিম্যান, যাকে তিনি বলতেন ''হিস্টারিয়াগ্রস্ততা",? যা তাঁর মাকে নিয়ন্ত্রণের এক মনস্তাত্ত্বিক উপায় ছিল। সারা জীবনই তিনি মা বা তার স্মৃতি দ্বারা সন্তাড়িত ছিলেন এবং এই তাড়নায় অনেক সময় হয়ে উঠতেন অস্বাভাবিক, ভেঙে ফেলতেন শরীরের হাড়, যেতেন হাসপাতালে। আত্মহত্যার প্রবণতাও তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল কম বয়সে; সাউথ-কেন্ট-এ ছাত্রাবস্থায় তিনি একবার আত্মহত্যায় উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। এক শীতের দিনে, টেনিস প্রশিক্ষণের জন্য তিনি যখন দৌড়োচ্ছিলেন, তখন তিনজন ওপরের ক্লাসের ছাত্র তাঁকে উৎপাত করতে শুরু করল, এবং একজন তাঁর দিকে স্নোবল নিক্ষেপ করে বসে, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় দুইবার, ফলে ছেলেটি তাঁর ওপর চড়ে বসে, তাঁকে বরফের ওপর ফেলে দেয় এবং দারুণভাবে উত্ত্যক্ত করে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিম্যান হঠাৎ কলেজের পাশ দিয়ে যাওয়া রেললাইনের ওপর দৌড়ে যান এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অগ্রসরমান রেলগাড়ির নীচে পড়তে উদ্যত হন। অবস্থা বেগতিক দেখে ছেলে তিনজন তাঁকে জোর করে রেল লাইন থেকে টেনে সরিয়ে ফেলে। সেদিন নৈশভোজে তিনজনের মধ্যে দুইজন ছেলে তাঁর কাছে এসে এই ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে এবং এ ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হবে না মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়। সে-সময় থেকেই অপরের করুণা বা দয়া পাওয়ার ব্যাপারটাতে তিনি হয়ে ওঠেন সিদ্ধহস্ত যা পরবর্তী জীবনে আরও ঘটেছে তাঁর জীবনে।

সারা জীবন তাড়িত ছিলেন পিতার আত্মহত্যায়। ১৯৩৮ সালে তিনি ঘোষণা দেন, তাঁর কাব্যিক উদ্দেশ্য হলো মৃত পিতার "নাম ও স্মৃতিকে তালি দেওয়া", কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তিনি তাঁর পিতা জন অ্যালাইন স্মিথের বিষয়ে বিদ্বেষ ছড়াতে থাকেন। পিতা যেন তাঁর নিকট হয়ে ওঠে ভ্যাম্পায়ার বা ভূত, ঠিক সিলভিয়া প্লাথের মতোই। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর উদ্দিষ্ট *ড্রিম সংগস*-এর জন্য যথার্থ বিষয় ঠিক করতে গিয়ে তিনি তাঁর পিতার আত্মহত্যা নিয়ে লেখেন একটি খসড়া কবিতা, যেখানে তিনি পিতার মৃত্যুবাসনাকে স্বার্থপর কাজ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, পিতা যে উত্তরাধিকার তার দুই পুত্রের জন্য রেখে যাচ্ছেন, তা তিনি ভুলে গেছেন আর তার অনিবার্য অভিঘাত ছেলেদের ওপর পড়েছিল মারাত্মকভাবে। বেরিম্যান মোট ৩৮৫টি স্বপ্নগান সিরিজের কবিতা লিখেছিলেন যার প্রত্যেকটি কবিতা ছয়-পঙ্ক্তির তিনটি স্তবকে বিন্যস্ত, যার ১, ২, ৪ এবং ৫ নম্বর পঙ্ক্তি পেনটামিটারে আর ৩ ও ৬ নম্বর পঙ্ক্তি ট্রাইমিটারে রচিত। এই বিন্যাসের কঠোরতা সত্ত্বেও কবিতাগুলো ছিল ঝরঝরে ও সাবলীল, এবং কবিতাগুলোর শৈলী ও অন্তর্গঠন বুলিবিষয়ক ও সাম্প্রতিক। এই কবিতাগুলো দুটি খণ্ডে বেরিয়েছিল: ১৯৬৪ সালে *সেভেনটি সেভেন ড্রিম সংগস: ৭৭টি স্বপ্নগান* এবং ১৯৬৮ সালে *হিজ টয়, হিজ ড্রিম, হিজ রেস্ট: তার খেলনা, স্বপন, তার অবসর* নামে। প্রথম খণ্ডটির জন্য তিনি পুলিৎজার আর দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য তিনি কবিতায় ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড পুরস্কারে ভূষিত হন।

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বলেন: "যা কিছু বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরুক না কেন, কবিতাগুলোর জন্য একটি কাল্পনিক চরিত্রের (না কবি, না আমি) জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে যার নাম হেনরি: প্রাক্‌মধ্যবয়সি এক সাদা-আমেরিকান কখনও বা কৃষ্ণমুখাবয়বে, যে এক অপরিবর্তনীয় ক্ষতির শিকার এবং যে কখনও কখনও নিজের সম্বন্ধে কথা বলে উত্তমপুরুষে, কখনও বা নামপুরুষে, এমনকি কখনও কখনও মধ্যমপুরুষে; তার এক বন্ধু আছে, যার কোনো নাম নেই, যে তাকে ডাকে মি. বোন্‌স বা ঈষৎ ভিন্নভাবে।" রচিত কবিতাগুলো উচ্চমাত্রার স্বীকারোক্তিক, যদিও বেরিম্যান *ড্রিম সংগস*-এর কবিতাগুলোকে মহাকাব্যিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "এর প্লট হলো হেনরির ব্যক্তিত্ব, যেমন সে জগতে চলাচল করে" ? একচল্লিশ থেকে একান্নো বছরের মধ্যে। কবিতাগুলোতে হেনরির ব্যক্তিক ভীতি, তার মদাসক্ততা, তার আত্মঘাতী উন্মুখতা, তার বৈবাহিক সমস্যা, আর তার যৌন অভিযান লিখিত হয়েছে। র‍্যান্ডাল জ্যারেল, থিয়োডোর রোথ্‌কে, সিলভিয়া প্লাথ, এবং

~ www.amarboi.com ~

ডেলমোর শোয়ার্জ, এবং অন্যদের প্রতি কবির শ্রদ্ধার নিদর্শন রয়েছে তৃতীয় খণ্ড? *হিজ টয়, হিজ ড্রিম, হিজ রেস্ট*-এ। অপরিবর্তনীয় ক্ষতির যে কথা বেরিম্যান বলেছেন, তা হলো তাঁর পিতার মৃত্যু। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে বেরিম্যান লেখেন কবিতা "ড্রিম সংগস"। রচনাকালে তিনি মদাসক্ততায় নিজেকে নিমজ্জিত করে দেন। এরূপ অবস্থাতেই তিনি লিখতে শুরু করেন "ড্রিম সংগস ৪২"। এখানে তাঁর অপর সত্তা তাঁর পিতার প্রেতের সাথে মুখোমুখিতায় লিপ্ত হয়, যেন কাঁধে এক বাঁদর, এক ভূত ভর করেছে তাঁর ওপর যাকে তিনি ঝাড়াতে পারছেন না। এ সময়ে তিনি তাঁর পিতার কবর দেখতে যান এবং এ-বিষয়েও তাঁর রাগ ও উষ্মা কবিতায় প্রতিফলিত হয়—ড্রিম সংগস ৩৮৪-সংখ্যক কবিতায় তিনি লেখেন: "আমি এই ভয়ংকর ব্যাংকারের কবরের ওপর থুথু ছিটাই/যে ফ্লোরিডায় এক সকালে তার হৃদয় বিদীর্ণ করেছে গুলিতে।"

অন্য কবিতায় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ধ্বনিত, যে ঈশ্বর সমস্ত ভোগান্তির জন্য দায়ী, যুদ্ধ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং রোগ যেমন ক্যান্সার, যাতে তাঁর বন্ধু ও কবি ভেইন ক্যাম্পবেল ১৯৪০ সালে মারা যান। ক্যাম্পবলের মৃত্যুর দুই বছর পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে, আর, বেরিম্যান মদে নিমজ্জিত করতে থাকেন তাঁর দুঃখরাশিকে। তিনি ঘোষণা দেন: স্কচ, বরফ আর জল হলো ''নতুন ত্রিত্ব'' বা ''দ্য নিউ ট্রিনিটি''। কিন্তু এই ঈশ্বর-বিরোধিতারও পরিবর্তন ঘটে। ক্রমাগত মদাসক্ততার কারণে ১৯৭০ সালে তিনি সেন্ট মেরি হাসপাতালের নিবিড় মদাসক্ততা নিরাময় কেন্দ্রে ভরতি হন এবং সে-অবস্থাতেই তিনি লেখেন *ইলেভেন অ্যাড্রেসেস টু দ্য লর্ড: প্রভুর উদ্দেশে এগারোটি বক্তৃতা* শিরোনামের এক সিরিজ-কবিতা, যাতে তাঁর এই ঈশ্বরমুখী অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়।

বেরিম্যান আত্মপ্রাজ্ঞ ও আত্মানুসন্ধানী ছিলেন। তিনি জানতেন, বন্ধু ডিলান টমাসের মতোই মদাসক্তিতে নিজেকে তিনি ক্রমাগত হত্যা করছেন। তাঁর এই মনস্তাত্ত্বিক আত্মহনন শুরু হয়েছিল অনেক আগ থেকেই, আর এই পর্যায়ে ভাবান্তর থেকেই এক প্রেমময় ঈশ্বরের চিন্তায় তিনি আকৃষ্ট হন এবং একই সাথে ধারাবাহিক মৃত্যুবাসনায় তাড়িত হতে থাকেন। প্রতিনিয়তই, প্রায় দিনানুদৈনিকভাবেই, জীবন-সমাপ্তির চিন্তায় তিনি বিভোর থাকতেন। তাঁর প্রথম দিকের অন্যতম প্রিয় কবি হার্ট ক্রেনের মতো সমুদ্রে ডুবে বা কোনো সেতু থেকে পড়ে মরার কথা তিনি ভাবতেন। তাঁর এই নিয়ত মৃত্যুবাসনার মূলে কাজ করেছিল এক স্তরীভূত হতাশাবোধ: প্রেমিকা বা বন্ধুর প্রত্যাখ্যান, মদাসক্তি নিবারণে ব্যর্থতা, লেখালেখিতে ক্রমাগত অসন্তুষ্টি, আর্থিক সমস্যা, ক্লাসরুমে লেখাপড়ার নিম্নমান-সংক্রান্ত উদ্বেগ, পৃথিবীর নানা ঘটনা, পারমাণবিক পরীক্ষা ইত্যাদি। জীবন তাঁর নিকট এতই ক্লান্তিকর ও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল যে, তিনি ভাবতেন, মৃত্যুই এর একমাত্র যৌক্তিক সমাধান।

যুবক হিসেবেও, একাধিকবার বিভিন্ন ঘটনায়, বেরিম্যান নিজেকে হত্যা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মে, তিনি ও তাঁর প্রথম স্ত্রী আইলিন, হ্যারিংটনে রিচার্ড ও হিলেন ব্ল্যাকমুরের গ্রীষ্মাবকাশ-কুটিরে বেড়াতে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডেলমোর শোয়ার্জ বেরিম্যানকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ব্ল্যাকমুর ও তাঁর স্ত্রী শুধু ঝগড়া করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং তাঁদের সংঘর্ষ এক বদমেজাজি সমাপ্তিতে গড়িয়ে যায়। বেরিম্যান সেখানে অবস্থানকালে এই কথার সত্যতা অনুভব করেন। কুটিরের পাতলা দেয়ালের এপাশ থেকে বেরিম্যান ও আইলিন শুনতে পেতেন, তাঁদের আমন্ত্রক সারা রাত্রি পরস্পর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। তাঁর মনে পড়ে গেল ফ্লোরিডার টাম্পাতে নিজ পিতা-মাতার ঝগড়ার দৃশ্য। একরাতে এরূপ ঝগড়া শুনে বেরিম্যান অসুস্থ হয়ে পড়েন, তিনি সারারাত ঘুমাতে পারলেন না। রাতের পর তিনি হয়ে পড়লেন বিষাদগ্রস্ত, ইচ্ছা করলেন হেঁটে সমুদ্রে নেমে গিয়ে জীবন সমাপ্ত করার। কিন্তু সে-যাত্রায় নিজের ইচ্ছাকে দমন করলেন, কিন্তু পরের দিন, তিনি ও আইলিন ব্ল্যাকমুর দম্পতিকে বিদায় জানিয়ে চলে এলেন। এর ছাব্বিশ বছর পর, ১৯৭২-এ? ওয়াশিংটন অ্যাভেনিউ ব্রিজ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যার খুব বেশি আগে নয়? ''হেনরি-স আন্ডারস্ট্যান্ডিং'' নামীয় রচিত কবিতায় ১৯৪৬ সালের রাতের এ অভিজ্ঞতাকে তিনি তুলে ধরেন। এরপর ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে তিনি ও আইলিন কেপকোড-এ ছুটি কাটাতে গিয়ে একরাতে এক ককটেল পার্টিতে তাঁর এক বন্ধুর সাথে যুক্তিতর্ক করে পোশাকসহ সমুদ্রে গিয়ে নামেন। বন্ধুরা খোঁজাখুঁজি করে আধ ঘণ্টা পর তাঁকে সৈকতে সম্পূর্ণ ভেজা ও অর্ধচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে।

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কবিতায়, বেরিম্যান মুহুর্মুহুভাবে নিজেকে হননের আকুতির কথা বলেছেন। এ-সংক্রান্ত কবিতাগুলোর মধ্যে, ১৯৭০ সালে রচিত "অব স্যুইসাইড" কবিতাটি সম্ভবত সবচেয়ে বেশি তীব্র ও অন্তর্ঘাতময়। এতে প্রতিফলিত হয়েছে মৃত্যুর প্রতি তাঁর চিরন্তন আকর্ষণ ও আত্মঘাতী তাড়নার উন্মুখতা:

আত্মহত্যা আর পিতার চিন্তা, অধিকার করে রেখেছে আমাকে।
পান করেছি অতিমাত্রায়। স্ত্রী ভয় দেখায় বিচ্ছেদের।
অধিকন্তু সে আমাকে "শুশ্রূষা" করে না। সে ভাবে "অযোগ্য"।
মেশামেশি করি না আমরা আর একত্রে।

মাকে স্মরণ করতে পারি। প্রাচ্যে এক ঘণ্টা দেরি।
ওয়াশিংটন ডিসিতে আমি
কিন্তু কী কাজে আসবে সে আমার?
আর এ সমস্ত তোষামোদ আর ভর্ৎসনা?

শিলাময় এক-প্রকার প্রেম আর বন্ধুতা
এ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী পাগলামোর প্রয়োজন প্রতীয়মান।
এপিকটেটাস কোনোভাবে আমার প্রিয় দার্শনিক।
সুখী মানুষেরা আগে-ভাগেই মরে গেছে।
এখনো মনস্থ করি এই গ্রীষ্মে মেক্সিকো ভ্রমণের।
ওলমেক ইমেজ! চিকেন ইটজা!
ডি.এইচ. লরেন্সের এ বিষয়ে আছে এক বুনো স্বপ্ন

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ম্যালকম লওরির বই প্রকাশের পর প্রিন্সটনে
আমি শিখিয়েছি নীতিবাক্য।
সম্পূর্ণভাবে ছাড়ছি না এখনও। বিকেলে শেখাতে পারি
তৃতীয় সুসমাচার। এখনও করিনি মনস্থির।
কখনও কখনও মনে হয় অন্যদের রয়েছে সহজ কাজ
আর করতে পারে আরও খারাপ কিছু।
খুব ভালো, আমাদের প্রয়োজন শ্রম ও স্বপ্নের। গোগোল
ছিলেন পুরুষত্বহীন, পিট্সবার্গে একজন আমাকে তা বলেছে।
আমি বলি: কোন বয়সে? তারা বলতে পারল না তা।
এটা এক মারাত্মক ঘৃণার্হ কাজ।

রেমব্রান্ট ছিলেন অতিশয় ভদ্র। এখানেই আপত্তি আমাদের। ভদ্র।
আতঙ্ক তাঁকে আক্রান্ত করত। আমাদেরও করে।
আত্মহত্যা বিষয়ে ভাবছি মুহুর্মুহু।
বাহ্যিকভাবে সে কিছু করেনি। আমি লুককে শিক্ষা দেব।

এই আত্মহনন-ভাবনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টাই তিনি করেছেন। অবসাদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আকণ্ঠ মদ্যপান করেছেন, লেখালেখিতে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন? কবিতা লিখে তাঁর ওপর ভর-করা-ভূত ঝাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্যস্ত থাকলেই আত্মহননভাবনা থেকে তিনি মুক্ত থাকেন। নিজ ছেলেমেয়েদের সাথে খেলাধুলায় রত থাকতেন। ঈশ্বরকে চিন্তা করতেন। কিট্সের পত্রাবলি, নতুন নিয়ম বাইবেল ও শেক্সপিয়রের নাটক তাঁকে সান্ত্বনা দিত। একবার তিনি বলেছেন, হেনরি জেমসের ছোটোগল্পগুলো তাঁকে অনেক সময়ে আত্মহননচিন্তা থেকে রক্ষা করত, এবং এজন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, বছরে জেমসের একটিমাত্র ছোটোগল্প পড়বেন যাতে গল্প পড়া শেষ না হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও শেষরক্ষা হয়নি।

বেরিম্যান জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওকলাহোমার ম্যাক আলেস্টার-এ, ২৫ অক্টোবর, ১৯১৪ সালে। ১৯৭২-এ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি লেখেন? কাব্য: *দ্য ডিসপোজেজ্ড* (১৯৪৮), *হোমেজ ট্যু মিসট্রেস ব্রডস্টিট* (১৯৫৬, সংশোধিত-১৯৬৮), ৭৭ *ড্রিমসংগস* (১৯৬৪), *শর্ট পোয়েমস* (১৯৬৭), *হিজ ট্রয়, হিজ ড্রিম, হিজ রেস্ট* (১৯৬৮), এবং *ডিল্যুশন্স, এট সেটেরা* (১৯৭২); গদ্য: জীবনী: *স্টিফেন ক্রেন* (১৯৫০), এবং উপন্যাস: *রিকোভারি* (১৯৭৩)। ১৯৫৪ সালে জিওফ্রে মোর *দ্য পেঙ্গুইন বুক অব মডার্ন ভার্স*-এ বেরিম্যানের কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, সমালোচকেরা তাঁর কাজকে সেরিব্রাল উৎসারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। জিওফ্রে মোর বলেন, "এটা সত্য, আর সেখানে রয়েছে এক ঠাসা বৌদ্ধিক আদিমতা। তাঁর কাজ অতি দুর্দান্ত, প্রাণবন্ত...কবিতাগুলো এক মারাত্মক আত্মা দ্বারা সম্ভবত লিখিত।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেরিম্যান ক্যামব্রিজ ও কলম্বিয়াতে লেখাপড়া করেন, পরবর্তীকালে লেখক ও *পার্টিসান রিভিয়্যু*র সমালোচক হিসেবে স্বীকৃতি পান। পড়িয়েছেন হারভার্ড, ওয়েনে স্টেট, প্রিন্সটন এবং মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা লিখে পেয়েছেন অনেক পুরস্কার যার মধ্যে পুলিৎজার (১৯৬৫), বোলিংগেন (১৯৬৮), এবং ন্যাশানাল বুক অ্যাওয়ার্ড (১৯৬৯) অন্যতম। সাফল্যের জন্য তাঁকে অনেক বড়ো ত্যাগ করতে হয়েছে। কবিতার সমালোচনা ও মূল্যায়নে তিনি ছিলেন অতি সংবেদনশীল। ১৯৭০ অব্দে *দ্য প্যারিস রিভিয়্যু*কে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর এই অতিসংবেদনশীলতার কথা বলতে গিয়ে তরুণ লেখকদের উদ্দেশে বলেন, "প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ের প্রতি চরম নিরপেক্ষ থাকতে হবে, কারণ প্রশংসা তোমাকে শ্লাঘার দিকে আর নিন্দা আত্মবেদনার দিকে ঠেলে দেবে, আর এই দু-ই লেখকের জন্য ক্ষতিকর।"

বেরিম্যান নিজেকে স্বীকারোক্তিক কবি মনে করতেন না, বরং প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক উৎসনির্ভর লেখক মনে করতেন। তিনি বলেছেন, "ধরি, আমি অগাস্তিনের ওপর বক্তৃতা করছি। আমার লাতিন-জ্ঞান খুবই খারাপ কিন্তু আমি লোয়েব সংস্করণের লাতিনগ্রন্থের ওপর কিছু সময় ব্যয় করব। তারপর আমি পাঠাগারে যাব এবং সেন্ট অগাস্তিনের ওপর সাম্প্রতিক ও পুরোনো কাজগুলোকে খতিয়ে দেখব। এখন এসবই তোমার কবিতার জন্য সুসজ্জিতকরণের অংশ হবে, এমনকি গীতিকবিতার জন্যও।" তিনি আরও বলেছেন: "চূড়ান্তভাবে, আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের পরিপার্শ্বে কবিতাকে উন্মুক্ত রাখি।" তাঁর কবিতা কনফেশনাল, কারণ তা ব্যক্তি ও জৈবনিক উপাত্ত এবং উদ্ধৃতিতে ভরপুর এবং তা নিউরোসিস ও স্কিট্সোফ্রেনিয়াগত মনস্তাত্ত্বিক উৎসারে সমৃদ্ধ। কিন্তু *দ্য ড্রিম সংগস*-এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে, বেরিম্যান সহজ মুখোশ বা পারসোনাকে আবিষ্কার করেছেন। তিনি হেনরি, মি. বোন্স ও আমি সমন্বয়ে এক অপবিত্র বা নারকীয় ত্রিত্বের জন্ম দিয়েছেন যা এক যৌগিক পারসোনা এবং প্রকারান্তরে যা ট্র্যাজিক, কমিক ও সেন্টিমেন্টাল। তিনি বলেছেন: "আমার ছিল এক ব্যক্তিত্ব ও পরিকল্পনা, এবং সব ধরনের দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক আসক্তি...কিন্তু একই সাথে আমি ছিলাম যাকে তোমরা বল ওপেন-এন্ডেড।"

প্রায় দীর্ঘ এক বছর বেরিম্যান মদ স্পর্শ করেননি, কিন্তু এবার, ৫ জানুয়ারি, ১৯৭২ তিনি এক বোতল হুইস্কি কিনলেন। এ সময়ে তিনি সবে সমাপ্ত করেছেন কাব্য *বিভ্রম, ইত্যাদি*, যা তাঁর মৃত্যুর পরপরই প্রকাশিত হবে, এবং লিখেছেন উপন্যাস *পুনরুদ্ধার*, যাতে মদের সাথে তার অহর্নিশ যুদ্ধ ও মুখোমুখিতার বিষয়টি প্রতিফলিত। এ সময়ে শেক্সপিয়রের সমালোচনামূলক জীবনী লেখার জন্য পেয়েওছিলেন একটি অনুদান: ন্যাশনাল এন্ডৌমেন্ট ফর দ্য হিউমেনিটিস গ্র্যান্ট, যা ছিল বিশ বছর ধরে চলা এক প্রকল্প। উপরন্তু, তিনি ভাবছিলেন শিশুদের জন্য জিশুর জীবনী লেখার। ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সবই যেন চলছিল ঠিকঠাক। এ সময়ে কিছু নতুন কবিতার খসড়া করতে গিয়ে তিনি তীব্র অসন্তুষ্টি ও অতৃপ্তিতে ভুগতে থাকেন। এছাড়া এ সময়ে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ক্লাসগুলো নিয়ে তিনি সমস্যায় পড়েন: তিনি

~ www.amarboi.com ~

অনুভব করছিলেন, ছাত্ররা অমনোযোগী, নিষ্প্রভ এবং অসহযোগী। শিক্ষকতার জীবন তাঁর মনে হলো একঘেয়ে, গতানুগতিক ও কাজ-চালিয়ে যাওয়ার মতো কিছু একটা। পুনরায় মৃত্যুভাবনা ও মৃত্যুবাসনায় আক্রান্ত হন তিনি। ডিসেম্বরের ১৩ তারিখে, বেরিম্যান, কোনো মোটেলে গিয়ে বন্দুক দিয়ে গুলি করে বা তাঁর স্পেনীয় ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করার বিষয়ে ভাবতে লাগলেন। এ সত্ত্বেও দোতলায় উঠে শোবার ঘরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি প্রার্থনা করতেন এবং জিশুর জীবনী লেখার বিষয়ে পুনঃপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এ সময়ে তিনি নিজেকে শক্তিমান ও মার্জিত হিসেবে মনে করতে লাগলেন।

এর পরের সপ্তাহগুলোতেই তিনি লেখালেখিতে অক্ষম হয়ে পড়লেন—এক ঊষরতায় আক্রান্ত হলেন। ভাবলেন এবং ভেবে ভীত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর নতুন ঈশ্বর-বিশ্বাস এক বিভ্রম। শীতকালীন সম্ভাব্য ক্লাসগুলো তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করতে লাগল। যদিও তাঁর ছিল দীর্ঘ শিক্ষকতার পেশা, পড়িয়েছেন ওয়েনে স্টেট, হারভার্ড, প্রিন্সটন এবং সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু বেরিম্যান ১৯৫৪ সালে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে নিগৃহীত ও অপদস্থ হয়েছিলেন, তা ভুলতে পারেননি কখনও। সেখানেও সর্বনাশের কারণ ছিল মদ্যপান। সেবার সেখানে প্রচুর মদ্যপানের পর শেষরাতে, মাতাল বেরিম্যান টলমল পায়ে তাঁর ঘরে ফিরছিলেন। বাড়ির মালিক তাঁর এই অবস্থা দেখে তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দিলেন না। বেরিম্যান চিৎকার আর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে একটানে প্যান্ট খুলে পোর্চের সামনে পায়খানা করে দিলেন। বাড়িওয়ালার স্ত্রী তখন পুলিশকে ফোন করলেন, পুলিশ এসে বেরিম্যানকে গ্রেফতার করল, এবং সে রাত তাঁকে জেলে কাটাতে হলো। পরের দিন স্থানীয় পত্রিকায় ঘটনা প্রকাশিত হলে স্ক্যান্ডালের কারণে বেরিম্যানকে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়।

জানুয়ারির পাঁচ তারিখে বেরিম্যান বোতলের অর্ধেক হুইস্কি পান করলেন এবং ওয়াশিংটন অ্যাভেনিউ ব্রিজ থেকে লাফ দিয়ে জীবন সমাপ্তির জন্য মনস্থ করলেন। তিনি আরেকটি আইওয়া-ঘটনা ঘটুক তা চাচ্ছিলেন না, এবং তা তিনি সহ্যও করতে পারতেন না। পাঁচ তারিখ অপরাহ্নে রান্নাঘরের টেবিলে একটি লিপি রেখে—যাতে লেখা ছিল "আমি একটা উপদ্রব"—তিনি ঘর থেকে বের হয়ে যান। সম্ভবত তিনি ব্রিজের ওপর গিয়েছিলেন, কিন্তু লাফ দিলেন না, বরং ঘরে প্রত্যাগমন করলেন আর লিখলেন শেষ কবিতা:

স্পেনিশ ব্লেড ধারালো, ব্রিজের
উঁচু রেলিঙে চড়ে বসার পর
আমার গলা কাটতে ঝুঁকে পড়ে, ডানহাতে ধরা ছুরি
আঘাত করি নিজেকে পড়ে না-যাওয়া পর্যন্ত
অবহিত, রুখতে পারি না করোটি
পতনোন্মুখ থেকে, কিন্তু ভয়হীন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যতক্ষণ না স্ত্রী আমায় ঘরের বাহির করে
যতক্ষণ না পুলিশ আমাকে ক্যাম্পাস অতিক্রম করে
ব্রিজে উঠতে আজ্ঞা দেয়।
আর পর্যবেক্ষণের জন্য আমাকে হাততালি দেয়, দর-কষায় আমার চাকরির—
আমি আছি এখন খুপরিতে, চাকরির দর কষাকষিতে—
সাধু, আমি তার অভাব বোধ করি;

কিন্তু এখানে কালকের ক্লাস নেওয়ার ভয়ংকরতা
ছাত্ররা কোর্স পড়া ছেড়ে দেয়,
প্রশাসন শুনানি নেয় আর আমাকে হয় চিকিৎসাগত ছুটি
বা পদত্যাগ, যে-কোনো একটি
করতে বলে— কিটিকেট, তারা করে না আমাকে চাকরিচ্যুত—

দু-দিন পর, জানুয়ারির ৭ তারিখ খুব ভোরে, মারাত্মক ঠান্ডা দিনে, বেরিম্যান তাঁর স্ত্রীকে অফিসঘর পরিষ্কার করতে ক্যাম্পাসে যাচ্ছে বলে বেরিয়ে পড়েন ঘর থেকে। যাওয়ার সময় তিনি বলেন, "তুমি আমাকে নিয়ে আর উদ্বিগ্ন হয়ো না।" সকাল সাড়ে নটার দিকে তিনি ব্রিজে পৌঁছান। তবে সঙ্গে আনেননি তাঁর স্পেনিশ ছুরি যার কথা শেষ কবিতায় তিনি বলেছেন; হয়তো তাঁর নিকট তা মনে হয়েছে বাহুল্য। যেভাবে মরতে চান তার জন্য আর কী প্রয়োজন তাঁর! উত্তর-পার্শ্বে বুক-সমান উঁচু রেলিঙে চড়ে বসেন তিনি। বিপরীত দিকে গ্লাসে-ঢাকা হাঁটাপথ থেকে ছাত্ররা অবাক আর অবিশ্বাস্যভাবে দেখল যে, বেরিম্যান তাদের ইশারা করলেন, তারপর ঢালু হয়ে ভর নিয়ে ঝাঁপ দিলেন। তিনি প্রায় একশ ফুট নীচে বাঁধের ওপর পড়েছিলেন। তাঁর শরীর প্রথমে লাফিয়ে উঠে তারপর গড়িয়ে যায়। পুলিশ তাঁর পকেট বইয়ে রক্ষিত একটি অলিখিত চেক থেকে কবিকে সনাক্ত করে। তাঁর ভেঙে-যাওয়া হর্ন-রিম্‌ড-চশমার অগ্রভাগেও তাঁর নাম লেখা ছিল।

যদিও তিনি স্বীকার করেননি, তবু, জন বেরিম্যানকে বিবেচনা করা হয় স্বীকারোক্তিক কবি হিসেবে। কারণ নিউরোসিস ও স্কিট্‌সোফ্রেনিয়াশ্লিষ্ট মনোবস্থা থেকে তাঁর কবিতা উত্থিত যা অতিমাত্রায় ব্যক্তিক ও জৈবনিক প্রাসঙ্গিকতায় ভাস্বর। যখন তিনি তাঁর দীর্ঘ কবিতা "শ্রীমতি ব্রডস্ট্রিট-এর প্রতি শ্রদ্ধা" ১৯৫৬ সালে লিখে জাতীয়ভাবে খ্যাতি অর্জন করেন—কবিতাটিতে মার্কিন উপনিবেশের প্রথম মহিলা কবি অ্যান ব্রডস্ট্রিটের প্রেতাত্মার সাথে কবির কথোপকথনের বিষয় ধারিত—তখন থেকেই তাঁর কবিতায় স্বীকারোক্তিক উপাদান পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কবিতায় প্রায়শই উপলব্ধি আর অভিজ্ঞতার অন্বেষণ চোখে পড়ে যাকে বলা যায় এমন কিছু, যা "সুসঙ্গত, সরাসরি ও বৌদ্ধিক।"

স্বীকারোক্তিক কবিরা ব্যক্তিত্বের জীবন ও মনস্তত্ত্বের অন্বেষণ হিসেবে আধুনিক সাহিত্যিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে থাকেন যাতে প্রতিফলিত হয় ব্যাজস্তুতি,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোলাজ, শব্দপ্রক্ষেপ এবং প্রশস্ত উল্লিখন। বেরিম্যান তাঁর *ড্রিম সংগস*-এ এসবের পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন, যেমন লাওয়েল করেছেন তাঁর *লাইফ স্টাডিস* (১৯৫৯) আর রোথ্‌কে করেছেন তাঁর *ওয়াড্‌স ফর দ্য ওয়াইন্ড* (১৯৫৮)-এ। আধুনিকবাদী কবিতা থেকে স্বীকারোক্তিক কবিতা এখানেই পৃথক হয়ে যায়—নৈর্ব্যক্তিকতাকে বাদ দিয়ে স্বীকারোক্তিক কবিতা গভীর আত্ম-পরীক্ষণ এবং খোলামেলা ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

জীবন তাঁর নিকট ছিল আলোড়িত, সংশয়বিদ্ধ এবং ক্লান্তিকর। এই একঘেয়ে বিপর্যস্ত ক্লান্তির কথা তিনি বলেছেন তাঁর কবিতায়— *৭৭টি স্বপ্নগান*-এর ১৪-সংখ্যক কবিতায় :

বন্ধুরা, জীবন বড়োই ক্লান্তিকর। আমরা বলতে পারি না তা-ও।
বস্তুত, আকাশ চমকায়, বিশাল সমুদ্রও আকাঙ্ক্ষায় হয় যে আকুল,
আমরাও আকুল ও উজ্জ্বল,
অধিকন্তু যা বালক হিসেবে বলেছে আমাকে
(পৌনঃপুনিকভাবে) ''কখনও যদি স্বীকার করো যে
তুমি ক্লান্ত একঘেয়েমিতে, তার অর্থ
তোমার নেই অন্তর্গত ঐশ্বর্য।'' আমি এখন জেনে যাই
আমার তো নেই কোনো অন্তর্গত ঐশ্বর্য, কারণ আমিও ভীষণ ক্লান্ত।
মানুষ আমাকে ক্লান্ত করে,
সাহিত্য, বিশেষত মহৎ সাহিত্য, আমাকে ক্লান্ত করে
হেনরিও ক্লান্ত করে আমাকে তার প্রতিশ্রুতি ও বোধে
যা অ্যাকিলিসের মতোই খারাপ,

সে ভালোবাসে মানুষ আর শৌর্যপূর্ণ শিল্প, যা
আমাকে করে ক্লান্ত। আর প্রশান্ত পাহাড়, আর জাল,
যেন এক ক্লান্তি ও বিষণ্নতা, আর যে-কোনোভাবেই এক কুকুর
তাকে নিয়ে গেছে আর তার ল্যাজ সুবিবেচিতভাবে দূরে
পর্বতে বা সমুদ্রে বা আকাশে, পেছনে
ফেলে যায়: আমাকে, ইতস্তত, আন্দোলিত।

প্রশান্ত এক নৌকা ডুবে যায় ধীরে নক্ষত্রের নীচে, রাত্রির নিস্তব্ধ চিত্রকল্পে

—গেয়র্গ ট্রাকল

যখন জানালা ধরে ঝরে পড়ে বরফেরা,
উচ্চতম নাদে বাজে শুভ সন্ধ্যার ঘণ্টাধ্বনি,
অনেকের জন্যই তৈরি হয়ে যায় টেবিল,
সকলেই তুষ্ট হয় ঘরের সমাদরে
তাদের অনেকেই ভ্রমণের পথে
অন্ধকার পথ ধরে এসে যায় তোরণে এখন,
আশীর্বাদধন্য বৃক্ষরা প্রকাশিত স্বর্ণময়
পৃথিবীর শীতল নির্যাসে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিব্রাজক শান্তভাবে ভেতরে দাঁড়াও এসে;
চৌকাঠের নীচে ব্যথারা তো শিলীভূত।
এইখানে বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা
রুটি আর মদ টেবিলে যে সুসজ্জিত।
[এক শীতের সন্ধ্যা]

পাখিদের উড্ডয়ন পরিপূর্ণ সংগতিময়। হরিৎ অরণ্য এই সন্ধ্যার অবকাশে তাদের করেছে একত্র শান্ত বসবাসে; মৃগদের স্ফটিকশুভ্র চারণভূমির মাঝে। ঝরনার জলের মৃদু ধ্বনি তৃপ্ত করে কোনো এক অন্ধকার, ভিজে ছায়াদের আর বসন্তের ফুলগুলো বাতাসের গভীরে কী অদ্ভুত স্বরে রণিত। যেন ইত্যবসরে মানুষেরা বুঝে নেয়, গোধূলি তাদের কপালের চারপাশে জমা হয় নিজ অনুভবে।

[মৃত ব্যক্তির গান]

এই কবি, গেয়র্গ ট্রাকলকে, আরেক বিখ্যাত জার্মান কবি রিলকে বলেছিলেন বিস্ময়কর অস্তিত্বের একজন কবি বলে। তাঁর চিঠিপত্রেও মনে হয়, রিলকের মতোই কাব্যবৃত্তি তাঁকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল যিনি ছিলেন তাঁর অন্যতম বোধক পাঠক, এবং যাকে তিনি প্রভাবিত করেছিলেন। রিলকেকে ছাড়া তিনি তাঁর অস্তিত্বকে সহ্যই করতে পারতেন না। যদিও রিলকে কখনোই ড্রাগ বা উত্তেজক দ্রব্য স্পর্শ করতেন না, মাদক থেকে ছিলেন নিরঙ্কুশ মুক্ত। কিন্তু তিনি ছিলেন এর বিপরীত; তাঁর মৃত্যুও এরই আঙ্গিক ও ফলাফল, কোকেনের অতিমাত্রা সেবনে, হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবেই, হয়তো বা স্বেচ্ছাকৃত, কারণ যে বিভ্রমকে তিনি বিবর্ধিত করেছিলেন দিন দিন তাঁর ভেতরে, এবং তাঁর মনে হয়েছিল এভাবে তিনি একদিন এক পলাতক হিসেবে নির্বাসিত হবেন এমন জায়গায়, যেখানে কোনো বুদ্ধিবাদী পৌঁছাতে পারেনি, এবং ওটাই হবে তাঁর ইলিসিয়াম—চিরশান্তির জীবনধাম। ট্রাকল, শতাব্দীর এক প্রভাবসঞ্চারী কবি, যিনি নন শুধু একজন পরাদৃষ্টিময় কবি, বরং একজন বিচ্ছিন্ন শিল্পীসত্তাও, যার কাছে কবিতা ছিল প্রকৃত উপশমকারী থেরাপি, আর তার প্রতি-থেরাপি ছিল মাদক, যা তিনি সচরাচর নিতেন নিজেকে রক্ষা অথবা ধ্বংস করার উপায় ও অন্ত হিসেবে। তাঁর জীবন এক কম্পিত এক্সপ্রেশনিস্ট নায়কের? ডব্লিউ. এইচ. সোকেল যাকে আখ্যায়িত করেছেন এমন একজনের মতো, "উচ্চতাই যার জীবনের ধ্বংসের কারণ আর ...নিক্ষেপ করেছে তাঁকে বাইরের অন্ধকারে। তাঁর প্রকৃতি অদ্ভুত, তাঁর শব্দরা প্রতিধ্বনিহীন।" গেয়র্গ ট্রাকল কোনো কিছুতে ব্যস্ত ছিলেন না, শুধু ঈশ্বর তাঁর মনের ভেতর বলে উঠেছেন, "এক শান্ত অগ্নিশিখা; আহ মানব!" এ-ই ঈশ্বরের স্বগতোক্তি, হয়তো বা মনস্তাপের মানবিক এক শব্দনীহারিকা।

১৯১০-২৫ সময়ের, এক্সপ্রেশনিজম আন্দোলন, আধুনিকবাদের সবচেয়ে প্রথম স্পষ্ট বিভাব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে শব্দটি সাহিত্যিক মহলে চালু ছিল না, যদিও পিকাসোর এক ফরাসি চিত্রপ্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ১৯১১ সালে জার্মান-শিল্প-সমালোচকেরা এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই বিতর্কিত সমালোচক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হারম্যান বাহর এর প্রয়োগ ঘটান। বাহরের মতে, এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হলো অন্তর্গত মর্মযন্ত্রণার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যে আধুনিকবাদ আন্দোলনের এক বিরাট অংশ এই এক্সপ্রেশনিজম। এই এক্সপ্রেশনিজমের বার্তা ট্রাকলের কবিতায় ছিল অন্তঃসারে, কিন্তু তা জায়মানিত হয়নি প্রকাশ্যে। যাঁরা তাঁকে মনে করতেন বিষণ্ন বা মর্বিড, তাদের হয়তো জানা দরকার, তাঁর এই বিষণ্নতা আনন্দের এক ধরনের চেতনা। তিনি নিশ্চয়ই এমন এক জাতের দ্বৈতসত্তার ধারক যার মাঝে সুন্দর ও কুৎসিত অন্তহীন উৎসারে অগ্রগামিত। তাঁর কবিতায় রঙের উল্লেখ আছে নিরঙ্কুশ, যা ইতিপূর্বেকার কারও লেখায় দেখা যায়নি। দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার এক বিতর্কিত প্রবন্ধে বলেছেন, তাঁর রঙের বিষয়টি বিরুদ্ধমুখী বৈশিষ্ট্যের উন্মেষক। তাঁর কবিতায় বারে বারে, ঘুরেফিরে আসে "সবুজ", যা লোরকার কবিতাতেও দেখা যায়, এই সবুজ যেন বসন্তের মতো—আদি, অকৃত্রিম ও ক্ষয়িষ্ণু। ট্রাকলের কবিতার জগৎ তাঁর অন্তর্গত প্রতিভূ, এক স্বপ্নছবির মতো যা বহির্জগতের উদ্দাম চিত্রকল্পের সমাবেশে ঋদ্ধ। তাঁর কবিতা তাই অধঃপতিত, করালগ্রাসী, মায়াময়, দুর্বোধ, জীবনসঞ্চারী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ, আর একই সাথে স্বপ্নময় এবং পরমার্থিক। তাঁর কবিতার বিভ্রম এবং হেঁয়ালিময়তা এবং এর ঘনিষ্ঠ চিত্রকল্প, তার অলংকারহীন সাদাসিদে ভাষা খুলে দেয় বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের দুয়ার যা কখনও কখনও প্রতিবিরোধী ও প্রতিবর্তময়। রিলকে যেমন একে বলেছেন কোনোটাই সুনির্দিষ্ট নয় তা, "যেন এক নিবিষ্ট দর্শক দেখেছেন কবির অতিদর্শন ও অন্তর্লোককে, কোনো এক শার্সি দিয়ে, আর যেন বা তা বাইরে থেকে রুদ্ধ।" রিলকে মনে করতেন, ট্রাকলের সার্থকতা তাঁর কাব্যিক চিত্রকল্পের মুক্তিতে। বস্তুতই রিলকে ট্রাকলের কবিতা বিষয়ে তুলে ধরেছেন এক বিপর্যাস, যাকে বলেছেন: falling is the pretext for the most continuous ascension"। রিলকে ট্রাকলের কবিতাকে চূড়ান্ত বিবেচনায় সদর্থক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং আরও বলেছেন, অনুভূতি ও বিষয়বস্তুর ব্যাপার নয়, তাঁর কবিতা এই ধারণা ও কুসংস্কারকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। রিলকে তাই ট্রাকলের কবিতাকে বলেছেন: "মহার্ঘ অস্তিত্বের বস্তুসত্তা"। দার্শনিক লুডভিগ হ্বিটগেনস্টাইনও বলেছেন যে ট্রাকলের কবিতা কোনো সুর্নিদিষ্ট চেতনার অবিকল উৎসার নয়। এই ব্যাখ্যাকে ধরে নিয়ে তিনি বলেছেন, কবিতাগুলো থাকে তাঁর ঊর্ধ্বে এবং তিনি কবিতাগুলোকে ভালোবাসেন, যদিও তারা থাকে তাঁর বোধগম্যতার বাইরে। ট্রাকলের কবিতাকে তিনি তাই বলেছেন, "একজন প্রকৃত প্রতিভাধর ব্যক্তির প্রস্বর।" তাঁর সকল কবিতাই যেন এক সমসূত্রীয় বাক্‌প্রতিমার আবাস। অন্যভাবে বললে, সব কবিতা মিলেই যেন রচিত হয়েছে একটি কবিতা, যে-কোনো একটির স্খলনে সমগ্র মালাটিই ছিঁড়ে যায়। যেন একটির থেকে জন্ম নিয়েছে আরেকটি সহোদর কবিতা, যারা পরস্পর পরিপূরক এবং একটি তাড়িয়ে ফেরে অন্যটিকে বাতিল করার জন্য; একক, পূর্ণ দ্যোতনায় আবির্ভাবের লক্ষ্যে। আর পাঠক যখন এক কবিতা থেকে অন্য কবিতায় অগ্রসর হবেন, তখন তিনি শুনতে পাবেন তার চলমান প্রতিধ্বনি? একই শব্দ, একই স্বতশ্চলতা, একই আত্মময় বাক্‌প্রতিমার পৌনঃপুনিকতার আবাহন। কিন্তু তারা রূপান্তরিত হচ্ছে, পরিপ্লুত হচ্ছে স্ব-স্ব আবহের নিরিখে। এ যেন হ্বাগনারের অপেরার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাইটমটিফ বা ভাবরাগিনী, যা অসংখ্যভাবে পরিবর্তনমুখী। হাইডেগারের মতে, প্রত্যেকটি কবিতাই যেন এক অখণ্ড কবিতার অংশ, সত্তার অলিখিত এক গীতিকা যা একই সাথে আনন্দ আর শোকের বহমান পরিণাম। যারা তাঁর সুরে বন্দি হয়ে যায়, তারা আর অগভীর-উপল-খাড়াইয়ে দাঁড় টানার ঝুঁকি নেয় না। তারা নিজেদের হারিয়ে ট্রাকলকেই অনুসরণ করতে থাকে আর চলে যায় দূর থেকে দূরে, গহিনে।

ট্রাকল জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের সার্থক ফসল, যদিও তাঁর মধ্যে ছিল এক ভিশনারি বা অর্ফিক কবির মেজাজ ও বোধ। জীবৎকালে প্রকাশিত হয়েছিল সবেধন একটিমাত্র কাব্য, যা মূলত সাহিত্য পত্রিকা *ডের ব্রেনার*-এ তাঁর কবিতা প্রকাশের পর কবি ও নাট্যকার ফ্রানৎস হ্বেরফেলের প্রচেষ্টায় ও নির্বাচনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ফ্রানৎস হ্বেরফেল নিজেও ছিলেন অভিব্যক্তিবাদের সক্রিয় সদস্য, কিন্তু তখন পর্যন্ত বার্লিনভিত্তিক অভিব্যক্তিবাদীদের সাথে ট্রাকলের তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না, এবং তিনি এই আন্দোলনের ইশতেহার বা কবিদের কবিতা পড়েছেন কি না তা-ও স্পষ্ট নয়। কিন্তু তাঁর কবিতা ছিল গুরুত্বপূর্ণ—গটফ্রিড বেন (১৮৮৬-১৯৫৬), আর্নেস্ট স্টেডনার (১৮৮৩-১৯১৪) তথা প্রথম প্রজন্মের অভিব্যক্তিবাদীদের কবিতার মতোই তা ছিল রহস্যময়, ঐন্দ্রজালিক, অপার্থিব, শোকাবহ, ঐকান্তিক এবং গোপনতাময়। ট্রাকল নিজেও তাঁর কবিতাকে বলতেন, "অপূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত" বা "অনির্দোষ অপরাধ" যা অনেক সময় মনে হতো অস্পষ্ট প্রার্থনার মতো, এবং একবার তিনি, তাঁর তিনটি ছোটো কবিতাকে বলেছিলেন "চার্চের প্রার্থনাসংগীত"। যদিও এই বার্লিনভিত্তিক কবিরা তাঁদের কবিতায় সরাসরি কখনও আগ্রাসী ভূমিকায় অন্তর্গত মনস্তাপ, যাতনা ও ক্ষোভকে প্রকাশ করতেন, কিন্তু ট্রাকলের ক্ষেত্রে তা ছিল গোপনসঞ্চারী চিত্রকল্পের আড়ালে নিমজ্জিত ঝিনুকের মতো, যার গভীরে লুকিয়ে থাকত মনস্তাপের মুক্তারাশি।

ট্রাকলের ওপর যাঁদের প্রভাব ছিল সীমাহীনভাবে গভীর তাঁরা হলেন—নিট্‌শে, দস্তইয়েফ্‌স্কি এবং কিয়েৰ্কেগার্দ। ব্যক্তিগত পরিত্রাণ-অন্বেষণ, অনির্দোষ অপরাধ এবং প্রায়শ্চিত্তের গুরুভার থেকে নিজেকে মুক্ত করার যে আজীবন অন্বেষণ তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল, তার প্রধান দার্শনিক উৎসব্যক্তিত্ব ছিলেন ডেনমার্কের অস্তিত্ববাদী লেখক কিয়ের্কেগার্দ ও রুশ ঔপন্যাসিক দস্তইয়েফ্‌স্কি। জীবনের শেষদিকে, তিনি যখন যাবতীয় লেখা ও পড়া ত্যাগ করেছিলেন, তখনও দস্তইয়েফ্‌স্কির লেখা না পড়ে থাকতে পারতেন না। দস্তইয়েফ্‌স্কির চেতনা নিশ্চয়ই তাঁকে টেনেছিল: ভোগান্তি যে মানব অস্তিত্বের এক মৌল উপস্থিতি, দস্তইয়েফ্‌স্কির এই বোধ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দস্তইয়েফ্‌স্কির বৌদ্ধিক রোম্যান্টিকবাদের বিরোধিতার উপাদান তাঁর মধ্যে উপস্থিত ছিল এবং তাঁর (দস্তইয়েফ্‌স্কির) নোটবুকের কিছু কথাও নিশ্চয়ই ট্রাকলেরই কথা: "সুখের জন্য মানুষের জন্ম হয়নি। মানুষ সুখ অর্জন করে ভোগান্তির মাধ্যমে।" *ভূতলবাসীর ডায়েরির* সেই কথা, "আমি এক অসুস্থ লোক ...আমি এক অসূয়াসম্পন্ন লোক। আমি এক অনাকর্ষণীয় মানুষ। আমি বিশ্বাস করি যে আমার যকৃৎ বিনষ্ট"? যেন তাঁরই মর্মের কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জার্মান প্রকাশবাদী হিসেবে চিহ্নিত হলেও তাঁর ওপর প্রভাব ছিল ফ্রান্সের প্রতীকবাদী কবিদের? বোদল্যের, ভেরলেন, র‍্যাঁবোর; যাঁদের কবিতা যুবক হিসেবে একজন অ্যালসেশীয় গভর্নেসের কাছে ফরাসি ভাষা শিক্ষার পরপরই তিনি আবিষ্কার করেন। প্রতীকবাদীদের মতোই তিনি বস্তুপ্রপঞ্চকে ভাবে এবং ভাবকে চিত্রকল্পে রূপান্তরিত করার বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন। আর শব্দকে ব্যবহার করতেন চিত্রশিল্পীদের ধরনে, বিষণ্নতা আর কুৎসিত থেকে সৌন্দর্যকে ছেঁকে তুলতেন হৃদয়ের সঞ্চরণে। বাক্‌প্রতিমার পাশাপাশি অলীক ও অবাস্তবতার এক স্বপ্নময় জগতকে নির্মাণ করতেন যেখানে চিত্রকল্পগুলো বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্যে ফুটে উঠত কোনো রকম নিশ্চলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে। একটি চিত্রকল্পকে অনুসরণ এবং অনুধাবন করে পরবর্তী চিত্রকল্পটি, এবং এভাবেই প্রাগ্রসর হয় তাদের সমাবেশ। শব্দের সম্ভারেও তিনি আহ্বান জানান ইন্দ্রিয়সংবেদনঃ কাপবোর্ডে আপেলের গন্ধ, ঘাসেদের ফিসফিসানি, পাতাদের মর্মরতা, পাহাড়ের ওপর গোলাপি-লাল মেঘেরা, সূর্যরশ্মির উজ্জ্বল খনি, গাছের নীচে যূথচারী হরিণেরা, উপল-বিছানায় সমুদ্রের মগ্নদৌড়, বনে শ্যামাপাখির গান, নক্ষত্রভরা আকাশে আলোকময় চাঁদের জেগে ওঠা, মৃত যোদ্ধাকে রাতের কোলাকুলি, শান্ত ঘর আর বনানীর পুরাণগাথা, দাঁড়কাকের গভীর ডানা ঝাপটানো? এইসব চিত্রকল্প এবং শব্দময়তার অবয়বে তাঁর কবিতা সৃষ্টি করে অব্যবহিত দৃশ্যগ্রাহ্য ও ধ্বনিগত তরঙ্গ, যা পরাবাস্তব ও হতচকিতময়। কিন্তু প্রতীকবাদীরা ছাড়াও নিজ দেশের কয়েকজন কবিও তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন। অস্ট্রিয়ান রোম্যান্টিক গীতিকবি নিকোলাস লিনাওয়ের দুঃখ ও সংক্ষোভের কবিতাগুলো তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় সক্রিয় ছাপ রেখেছিল। কবিতা লেখার প্রথম পর্যায়ে ট্রাকল তাঁর পূর্বসূরি ও নিজ দেশীয় এই কবিকে নিজের শিক্ষক হিসেবে ঘোষণা দেন এবং তাঁর কাছে নিজের ঋণের কথাও সাড়ম্বরে স্বীকার করে নেন। লিনাওয়ের প্রতি তাঁর টান ও সহমর্মিতার আরেক কারণ, দুজনের জীবনের মিল। ট্রাকল সমব্যথী ও সগোত্রীয় অনুভব করতেন সেই সব কবিদের প্রতি, যারা আজীবন প্রেম ও ঘৃণার ভেতর জীবন কাটান এবং অবশেষে পাগল হয়ে যান। লিনাও-ও তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু-পত্নীর প্রেমে পড়েন যাকে তিনি বিয়ে করার আশা করতে পারেননি এবং ফলস্বরূপ তিনি পাগল হয়ে যান। ট্রাকলও তাঁর পিয়ানোবাদক ছোটো বোনের প্রতি এক অবৈধ প্রণয়ে ভোগেন এবং সেই বোন মার্গারিটকে, যে ছিল তাঁরই মতো দেখতে মেজাজে ও শৈল্পিক প্রেরণায়, কবিতায় মুহুর্মুহুভাবে রূপায়িত করতে থাকেন। এই অসংগত প্রেমই তাঁকে অসুস্থ ও অপরাধী করে তোলে, এবং তিনি হয়ে পড়েন স্কিট্‌সোফ্রেনিয়াগ্রস্ত। লিনাওয়ের বিষণ্ন ল্যান্ডস্কেপের বর্ণনা, আদি অরণ্যের বর্ণনা, তাঁর গভীর ভাবের রূপক ও চিত্রকল্প, সবই তিনি পছন্দ করতেন এবং তাঁর কাছ থেকেই ট্রাকল জাদুময় অভিক্ষেপের নৈপুণ্য আয়ত্ত করেন। কিন্তু লিনাওয়ের মতো প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ অবিকল তুলে আনার চেয়ে তিনি তাঁর এলাকা জালসবুর্গের পর্বত ও চারণভূমি প্রতীকায়িত করতে সচেষ্ট থাকেন এবং এক্ষেত্রে এক রহস্যময় স্পর্শের অনুভব ঘটান। এছাড়া স্টিফেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জর্জ, হফমানস্টাল ও মরিক, এই তিন জার্মান কবির কবিতাও তাঁর ওপর প্রভাব ফেলেছিল। তবে আর এক মহৎ জার্মান কবি হ্যোল্ডারলিনের এলিজি ও স্তোত্রবিষয়ক কবিতাগুলোও তাঁর ওপর গভীর প্রভাব সঞ্চারিত করেছিল, এবং তিনি, ট্রাকল, শুধু হ্যোল্ডারলিনের পঙ্‌ক্তির বহমান ছন্দোস্পন্দ শুধু নয়, বরং অন্বয় ও বাক্‌প্রতিমাকেও গ্রহণ করেছিলেন নিজ নবীকৃত ভাষার শরীরে, আপন ঢঙ এবং মৌলিক উদ্দেশ্যচারিতায়। হ্যোল্ডারলিন যেন তাঁর হাতে দ্বিতীয় রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে, যেন কোনো এক অপরসায়নবিদ সাধারণ মিশ্র ধাতুকে পরিণত করছেন স্বর্ণ আর রৌপ্যে। তিনি তাঁর পূর্বসূরিকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ ও সাঙ্গীকৃত করে তার জন্মান্তর ঘটাচ্ছেন, যেন হ্যোল্ডারলিনের ভাষা ও কবিতার সত্তা নতুনভাবে, ভিন্নতর আঙ্গিকে, সময়ান্তরে দ্বিতীয়বারের মতো সমীকৃত হচ্ছে। কিন্তু যা-ই আসছে, পূর্বসূরিদের কাছে তাঁর যা-কিছু ঋণিতা, সবকিছুই নতুনভাবে নিজের মতো প্রণিধানতায় তিনি জন্ম দিচ্ছেন, যা হয়ে ওঠে তাঁর অস্তিত্বচর্চার অমোঘ হাতিয়ার। তাঁর কবিতাকে তাই মনে হবে ক্যালাইডোস্কোপে ভেসে ওঠা স্পন্দিত চিত্রকল্প, হয়তো পরাবিজ্ঞানও।

সেবাস্টিয়ান ইন ড্রিম কাব্যের শিরোনাম কবিতাটি আসলে এক আত্মজৈবনিক উৎসারে পল্লবিত। কবিতাটিকে বলা যায় তাঁর আত্মজীবনীর এক কাব্যিক উল্লিখন। পতনের ভাবই এখানে বিধৃত হয়েছে। কবিতাটির শুরুতে শিশুটির জন্ম হয়; স্বপ্নের অথবা আচ্ছন্নতায় শিশুটির স্মৃতি জোর দেয় তার ঝঞ্ঝাসঙ্কুল দৃশ্যপটে। গুন্টার গ্রাসের *টিন ড্রাম*-এর নায়ক অস্কার ম্যাটৎজারেথের মতোই—যে কিনা সব মনে করতে পারে, এমনকি মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে শান্তি আর নীরবতায়, তা-ও সে মনে করতে পারে—তার থাকে এক এমন ধরনের অশরীরী ক্ষমতা। অস্কার কখনোই জন্মগ্রহণ করতে চায়নি, সেবাস্টিয়ানও তা-ই।

১৮৮৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রিয়ার জালসবুর্গ শহরে গেয়র্গ ট্রাকল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ও পিতা ছিলেন মারিয়া হালিক ট্রাকল ও টোরিয়াস, এবং তাদের ছয় সন্তানের মধ্যে গেয়র্গ ছিলেন চতুর্থ। তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন স্লাভিক বংশোদ্ভূত—পিতার পূর্বপুরুষেরা এসেছিল হাঙ্গেরি থেকে আর মাতার দিক এসেছিল বোহেমিয়া থেকে। মারিয়া ছিলেন টোরিয়াসের দ্বিতীয় স্ত্রী। স্বামীর থেকে প্রায় পনেরো বছরের ছোটো বিপত্নীক টোরিয়াসের সঙ্গে ছিল তার প্রণয় এবং ফলস্বরূপ গর্ভসঞ্চারের পর মারিয়া তার প্রথম স্বামীকে তালাক দিয়ে টোরিয়াসকে বিয়ে করেন। ট্রাকলের পিতা টোরিয়াসের ছিল হার্ডওয়ারের ব্যবসায় এবং লোহার জিনিসপত্র বিক্রির মাধ্যমে তার অবস্থা খুব ভালো হয়ে উঠেছিল। তাঁর মাতার ছিল অ্যান্টিকের শখ এবং সারা ঘরেই ছিল এসবের আশ্চর্যজনক সংগ্রহ। সুন্দর ও আড়ম্বরপূর্ণ বাসগৃহ ছাড়াও শহরের অপর প্রান্তে ছিল তাঁর পিতার এক সুন্দর বাগান। এসবেরই উল্লেখ আছে ট্রাকলের কবিতায়, বিশেষত *সেবাস্টিয়ান ইন ড্রিম*-এ। তাঁর পিতা ছিলেন সাত্যিকার অর্থেই বুর্জোয়া, কিন্তু মাতার মধ্যে ছিল সুন্দর মানসিকতার উষ্ণতা। তিনি ছিলেন শোভন এবং হার্দিক। তারপরও তিনি, মারিয়া ট্রাকল, তীব্র জটিল মানসিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবসাদে ভুগতেন এবং অনেক ট্রাকল-বিশেষজ্ঞই মত দিয়েছিলেন যে ট্রাকলের জন্মের সময় তিনি আফিমের নেশায় আসক্ত ছিলেন যা ট্রাকলের *সেবাস্টিয়ান ইন ড্রিম* কবিতায় ইঙ্গিতপ্রাপ্ত, যদিও অনেকে আবার এই ধারণা উড়িয়েও দেন। মাতা-পিতা উভয়েই ছিলেন সন্তানের প্রতি অননুরক্ত, কিছুটা উদাসীন; নিজেদের ব্যবসায় ও অ্যান্টিক সংগ্রহে তাদের সময় চলে যেত।

ছোটোবেলায় গেয়র্গ ছিলেন শান্ত ও অনুগত ধরনের; পিতা-মাতার অবহেলা সত্ত্বেও তাঁদের তিনি পছন্দ করতেন। কিন্তু কিছু কিছু অদ্ভুত ও রহস্যময় ঘটনা তাঁর ছোটোবেলার জীবনে ঘটে; ছয়-সাত বছর বয়সে তিনি একবার পুকুরে নেমে পড়েন, বরফ শীতল জলের নীচে তাঁর সমস্ত শরীর ডুবে যায়, তাঁর মাথার টুপিটি সৌভাগ্যক্রমে পুকুরের পাড়ে থাকে যা দেখে চৌকিদার তাঁকে সে যাত্রা তুলে এনে রক্ষা করে। এর কয়েক বছর পর মত্ত ঘোড়ার সামনে তিনি নিজেকে ছুড়ে দেন আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে। পরে, *সেবাস্টিয়ান ইন ড্রিম* কবিতায় তিনি বিষয়টির উল্লেখ করেন। আরেকবার তিনি চলন্ত রেলগাড়ির দিকে লাফ দিতে সচেষ্ট হন। শৈশবের এসব প্রবণতাকে কীভাবে মিলিয়ে দেখা যায় তাঁর জীবনে যেখানে তিনি সাতাশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন? সে সময়ে যে চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করেন, পরবর্তীকালে তিনি এ ঘটনাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন, "তিনি বিশ্বাস করতেন না যে তাঁর পিতা তাঁর আপন মানুষ, তবু কল্পনা করতেন যে তিনি এক কার্ডিনালের বংশধর আর ভবিষ্যতে তিনিও হবেন এক বিখ্যাত ব্যক্তি।" ডাক্তার আরও বলেন যে, এই বালক প্রায়শই শুনতেন এক ভুতুড়ে ঘণ্টার আওয়াজ: যার মানে তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে গণ্ডগোল ছিল এবং অনবরতই দেখতেন এমন বস্তু যার ছিল না বাহ্যিক অস্তিত্ব। ট্রাকলও তাঁর বন্ধুদের কাছে পরবর্তী সময়ে বলেছেন যে বিশ বছরের আগ পর্যন্ত জল ছাড়া তিনি তাঁর চারপাশের বস্তুজগতের আর সব বিষয়কে প্রভেদ করতে পারতেন না; তাঁর দেখা সকল মুখ তাঁর কাছে অস্পষ্ট ও মেঘময় বলে মনে হতো: তিনি এসব মুখের একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করতে পারতেন না।

এসব উৎকেন্দ্রিকতা এবং মানসিক রোগের লক্ষণাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও দশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি স্কুলে যান এবং মানবিক শাখায় গ্রিক ও লাতিন বিষয় নিয়ে লেখাপড়াও করেন। কিন্তু কৈশোর-অন্তে ও প্রাক-যৌবন সময়ে তিনি হয়ে ওঠেন অসামাজিক, সমাজবিরুদ্ধ এবং হিংস্র। কখনও ভালো কখনও মন্দ, কখনও শান্ত নিরীহ, কখনও ভয়ংকর। স্কুলের নিয়মকানুন পরিপন্থি ট্রাকল তখন থেকেই হয়ে পড়েন ড্রাগ-আসক্ত, আফিম ও সিগারেটখোর, আর মদ্যপ। এ-সময় থেকেই তিনি হয়ে পড়েন বোন মার্গারিটের প্রতি প্রণয়াসক্ত। বোনের পিয়ানোবাদনে তিনিও অংশগ্রহণ করতেন। সে-সময়ে তিনি জালসবুর্গের "অ্যাপোলো" সাহিত্যিক ক্লাবে ভরতি হন এবং তাঁর প্রথম গদ্যকবিতা লেখা শুরু করেন। স্কুলে ফেল করাতে, স্কুল থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয়, কারণ তিনি দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দিতেও ছিলেন অনাগ্রহী। কিছুদিন তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে পড়েন; কিন্তু তারপর জালসবুর্গের সাদা দেবদূত নামীয় ওষুধের দোকানে তিন বছর মেয়াদি শিক্ষানবিশ বিক্রেতা হিসেবে তাঁর জীবন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুরু হয় যার শেষ হওয়ার কথা ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বছরের ফার্মাকোলজির কোর্স সমাপনের মাধ্যমে। হয়তো এই ভবিষ্যৎ পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবচেতনে তাঁর ভেতর কাজ করেছিল মাদকের জগতে তাঁর ডুবে থাকাকে অধিকতর মসৃণ ও উপভোগ্য করার দুর্মর অভিলাষ। এই সময়ে ট্রাকল দৈনিক কাগজে পুস্তক সমালোচনা এবং গদ্য প্রকাশ করতে থাকেন; স্থানীয় নাট্যকার ও নিট্শে-শিষ্য গুস্তাফ স্ট্রেইচারের অনুপ্রেরণায় তিনি দুটি এক অঙ্কের নাটক রচনা করেন যা ১৯০৬ সালে জালসবুর্গ মিউনিসিপ্যাল থিয়েটারে মঞ্চায়িতও হয়। কিন্তু তেমন সাড়া জাগাতে না পারায় ট্রাকল পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেলেন। ১৯০৮ সালে তিনি ভিয়েনায় তাঁর কোর্স শুরু করেন। সেখানে তিনি অপচয় ও আমোদে নিজেকে নিমজ্জিত করতে থাকেন। তাঁর সাথে তেমন কেউ মেলামেশা করত না। এক সময় তিনি এক বেশ্যাকে ভাড়া করেও নিয়ে আসেন যেন সে তাঁর একান্ত শ্রোতা হয়। বস্তুত সব মিলিয়ে এক বিবিক্ত জীবনের সুর ডানা মেলে দিতে থাকে। তাঁর মানসিক অবসাদ আর একাকিত্ব আরও গভীর রূপ ধারণ করে যখন, ১৯০৯ সালে, বোন মার্গারিটা আর তাঁর বন্ধু এরহার্ট বুশব্যাক ভিয়েনায় আসে সংগীত আর আইন শিক্ষার জন্য। এ সময়ে পিতার মৃত্যুতে ট্রাকল আর্থিক অনটনে ভুগছিলেন। তবুও তিনি তাঁর লেখাপড়া শেষ করেন এবং অস্ট্রিয়ান মেডিক্যাল কোরে এক বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রথমে ইনসব্রুকে তাঁর কর্মস্থল হয় কিন্তু পরে ভিয়েনায় তিনি চলে আসেন। এই চাকরি তাঁকে অবরুদ্ধতা দিয়েছিল যা ছিল তাঁর জীবনের জন্য দরকারি। কিন্তু তিনি রিজার্ভে চলে যান এবং চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের পর ভিয়েনা থেকে জালসবুর্গ চলে আসেন, বিভিন্ন ফার্মেসিতে কাজ করেন। কখনও এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারতেন না। তিনি কাজ করতেন কম, রোজগার ছিল কম, ফলে ট্রাকল পুনরায় ইনসব্রুকে চলে এসে সামরিক হাসপাতালের ফার্মেসিতে কাজ নেন।

ইনসব্রুকে পরিচয় ঘটে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর সাথে, বিশেষত, *ডের ব্রেনার*-এর প্রভাবশালী সম্পাদক লুডভিগ ফন ফিকারের সাথে। ক্রমান্বয়ে তাঁদের সম্পর্ক বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং তাঁর কবিতা ফিকারের সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে নিয়মিত। এ সময় তিনি আবারও মিলিটারি সার্ভিস ছেড়ে দেন এবং ভিয়েনায় করণিকের চাকরি নেন। তিন দিন পর তা ছেড়ে ইনসব্রুকে চলে আসেন এবং ফিকারের বদান্যতায় পুরাপুরি কবিতা লেখায় নিমগ্ন হন। ফ্রানৎস ওয়ারফেল *ডের ব্রেনার* (পরিশুদ্ধকারী বা টর্চ)-এ প্রকাশিত ট্রাকলের কবিতা পড়ে তাড়িত হন এবং তাঁর কবিতাগ্রন্থ প্রকাশে উদ্‌যোগী হন। এই পর্যায়েই ট্রাকল মূল্যায়িত হন তাঁর কাজের জন্য এবং তিনি তাঁর সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময়ে প্রবেশ করেন। এই সময় তিনি হ্যোল্ডারলিন পড়তে শুরু করেন। কিন্তু সাফল্য সত্ত্বেও তাঁর জীবনযাপন হয়ে পড়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও মারাত্মক। ডিসেম্বর, ১৯১৩-এ তিনি প্রায় মরতেই বসেন অতিরিক্ত ভেরোনাল সেবনে। আরেক ঘটনায় অতিরিক্ত মদ্যপানে নিঃসার হয়ে সারারাত তিনি বাইরে তুষারের ওপর পড়ে থাকেন, যা তাঁর কবিতা "উইন্টারনাচ"-এ অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু তিনি রক্ষা পেয়ে যান। অতিরিক্ত

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অ্যালকোহল পানের কারণে তিনি অলৌকিকভাবে শৈত্য থেকে বেঁচে যান এবং পরদিন সকালে উঠে হেঁটে ঘরে ফিরে আসেন।

কাব্য *গ্যাডিশট* (কবিতাবলি) ১৯১৩-এর জুলাই মাসে বের হয়। জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত একমাত্র কবিতার বই তাঁর। মৃত্যুর পর, ১৯১৫ সালে, বের হয় অপর কাব্য *সেবাস্টিয়ান ইন ড্রিম*। ১৯১৩-এ ট্রাকল বের হন দেশভ্রমণে। ফিকারের কতিপয় সঙ্গী ও পৃষ্ঠপোষক সহযোগে তিনি ঘোরেন ভেনিস এবং অস্ট্রিয়ার অনেক স্থান। ১৯১৪ সালের মার্চে বিষাদ আর আতঙ্কে কাটে তাঁর সময়। তাঁর বোন মার্গারিট এক গর্ভপাতজনিত কারণে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ ঘটনা ট্রাকলের কিছুটা আপাত স্থিত অবস্থাকে একেবারে এলোমেলো করে দেয়। বার্লিনে বসবাসকালে একঘেয়ে এবং উদ্ধত মার্গারিট মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তাঁর দ্বিগুণ বয়সি এক লোককে বিয়ে করে, যা ছিল এক অসুখী দাম্পত্য জীবন। ট্রাকলের সাহচর্যে মার্গারিট সেরে ওঠে। মার্গারিটের মাধ্যমেই, বার্লিনে অবস্থানকালে, ট্রাকলের সাথে পরিচয় হয়েছিল কবি এলস লাসকার-সুলারের। নিজ বোন ছাড়া কতিপয় নারীদের অন্যতম এই কবি যার সাথে ট্রাকল সম্পর্কে গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন এবং যাকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর এক বিখ্যাত কবিতা "প্রতিশ্চ"। ১৯১৪ সালে ফিকার দার্শনিক হ্বিটগেনস্টাইনের কাছ থেকে অভাবী জার্মান ও অস্ট্রিয়ান লেখকদের মাঝে বিতরণের জন্য এক লক্ষ অস্ট্রীয় ক্রাউন পান। এই টাকার প্রধান ভাগই যায় রিলকে আর ট্রাকলের হাতে। তাঁরা প্রত্যেকেই পান বিশ হাজার ক্রাউন। এই টাকা গ্রহণে ট্রাকল ছিলেন অত্যন্ত বিচলিত; শঙ্কিত ফিকারের সাথে ব্যাংকে গিয়ে লেনদেন শেষ না করেই পালিয়ে চলে আসেন তিনি।

১৯১৪ সাল। সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। মেডিক্যাল কোরের ল্যাফটেন্যান্ট হিসেবে তাঁকে কাজে ডাকা হলো। তিনি অস্ট্রিয়া অধিকৃত পোল্যান্ডের গ্যালিসিয়ার উদ্দেশে ইনসব্রুক ত্যাগ করলেন। গ্রোডেকের ভয়াবহ ও ভয়ংকর যুদ্ধের পর গোলাবাড়িতে শায়িত নব্বই জন আহতকে দেখার দায়িত্ব তাঁর ওপর পড়ল। আহতদের সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদানের দক্ষতা, অথবা তাদের কষ্ট উপশম করার মতো নারকোটিকস তাঁর হাতে ছিল না। ফলে কষ্ট আর তীব্র আর্তনাদে একজন আহত ব্যক্তি নিজের মাথায় গুলি করে বসল। ট্রাকল তার পাশে গিয়ে দেখলেন, গোলাঘরের দেয়ালে তার মাথার মগজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লেগে আছে। ট্রাকল ওই ঘর থেকে দৌড়ে চলে গেলেন বাইরে কিন্তু দেখলেন আর এক ভয়ংকর বীভৎস দৃশ্য: পলাতক সৈন্যদের নিস্পন্দ নিথর দেহ গাছের স্থির দেহ থেকে দুলছে। এর কিছুদিন পর এক নৈশভোজকালে ট্রাকল ঘোষণা দেন তিনি আর এ জীবন সহ্য করবেন না, এবং এই ঘোষণার পর তিনি আত্মহত্যার হুমকি এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করতে লাগলেন। সতীর্থ সৈন্যদের বারণে তখন তা সম্ভব হলো না। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁকে পাঠানো হলো ক্রাকাওর সামরিক হাসপাতালে। সেখানে তাঁকে স্কিট্‌সোফ্রেনিয়াগ্রস্ত রোগী বলে ঘোষণা করা হলো এবং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁকে অন্য আর একজন বিকারগ্রস্তের সাথে একই সেলে রাখা হলো। স্কিট্সোফ্রেনিয়াগ্রস্ত ট্রাকল বলে উঠলেন: ...কেউ আমাকে বলো, আমি নই উন্মাদ। এক পাথুরে অন্ধকার আমার দেয়াল ভেঙে আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। বন্ধু, কী নিদারুণ অসুখী আর ছোটো হয়ে পড়লাম আমি।" তিনি লিখলেন তাঁর জীবনের শেষ কবিতাদ্বয়: "বিলাপ" ও "গ্রোডেক" যাতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মনস্তাপ এবং বিষাদ। তিনি যেন পালাতে চাইছেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, মুক্ত হতে চাইছেন সামরিক হাসপাতালের অবরুদ্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে, যেতে চাইছেন শান্তি আর শান্তময় অরণ্যের মাঝখানে যেখানে মৃতরা আছে জীবন নিয়ে। একটি কবিতার ভাষান্তর নিম্নরূপ:

ঘুম আর মৃত্যু, অন্ধকার বিষণ্ন ইগলেরা
রাত্রিভর চারদিকে আবর্তিত হয়;
শাশ্বতের বরফ-শীতল ঢেউ
মানবের সোনালি প্রতিমার অস্তিত্বরাশি
গিলে নেবে। তার ধূসর শরীর
ভয়ংকর চড়া দিয়ে নেমে এসে ছড়িয়ে যায়।
আর অন্ধকার স্বর
সমুদ্রের ওপর বিলাপ করে।
ঝঞ্ঝাহত হে বেদনার বোন আমার,
দেখো এক প্রশান্ত নৌকা ডুবে যায়
ধীরে নক্ষত্রের নীচে
রাত্রির নিস্তব্ধ চিত্রকল্পে।

ফিকার ট্রাকলকে দেখে গিয়েছিলেন সামরিক হাসপাতালে; এবং তার পরপরই হ্বিটগেনস্টাইনকে পত্র দিয়ে অনুরোধ করেন ফিকার, ট্রাকলকে দেখে যাওয়ার জন্য। হ্বিটগেনস্টাইন এসেছিলেন তাঁকে দেখতে, কিন্তু একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল তাঁর; ট্রাকল চলে গিয়েছিলেন তিন দিন আগেই। ৩ নভেম্বর ১৯১৪, ফিকারের সাথে দেখা হবার কিছু পরেই অতিরিক্ত কোকেন সেবনে গেয়র্গ ট্রাকল মারা যান। এর দুই বছর পর মার্গারিটও এক পার্টিতে, নিজেকে গুলি করে হত্যা করেন।

১৯২৫ সালে পোল্যান্ডের ক্রাকাও থেকে ট্রাকলের মৃতদেহ কবর থেকে তুলে এনে আবার কবর দেওয়া হয় তাঁর আজীবন সুহৃদ, বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক লুডভিগ ফন ফিকারের বাড়ির নিকটবর্তী ইনসব্রুকের এক কবরখানায়।

কোনো এক সন্ধ্যায় যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম আমরা
বিষণ্ন পথ দিয়ে, আমাদের পাণ্ডুর ছায়ারা
তখন দাঁড়িয়েছিল পাশে এসে।
তৃষ্ণার্ত আমরা পান করেছিলাম পুকুরের সফেদ জল
আমাদের অভিমানী শৈশবের স্বাদ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর এখন যখন কোনো বিষণ্ন সংগীত
আমার আত্মাকে খামচে ধরে প্রায়শই, তখন
তুমি হে সাদা মানবী, দেখা দাও তোমার
নবীন প্রেমিকের দৃশ্যময় বাগান থেকে।

জলের সুচ বিচ্ছিন্ন ছায়াগুলোকে সেলাই করে

—পাউল সেলান

গিয়ম আপোলিনেরের বিখ্যাত কবিতা "দ্য পোন্ট মিরাবো"র সূচনা পঙ্ক্তিগুলো এ রকম:

মিরাবো সেতুর নীচে বয়ে যায় স্যেন
আর আমাদের ভালোবাসারাশি
নিশ্চিতই স্মরণমনস্ক আমি তার
আনন্দধারা সবসময় বেদনাকে করে অনুসরণ
এসো রাত এসো সুরেলা প্রহর
চলে যাওয়া দিনগুলোকেই স্মরণ করি আমি।

আপোলিনের তুলে ধরেছেন হতাশা, ক্ষণস্থায়িত্ব আর বেদনাময় বোধকে। জীবন তো দুঃখময়, আত্মার ভাঁজে বিস্মরণ আর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার নিবন্ধন। আপোলিনেরের মৃত্যুর বায়ান্ন বছর পর এই মিরোবো স্মরণীয় হয়ে ওঠে এক অধিরূঢ় বাস্তবতার গমকে;—এক কবির অন্তরঙ্গ আশ্লিষ্টতায় পুনর্বার বেদনাঘন স্যেনের জল বয়ে যায় মিরাবোর নীচ দিয়ে; পাউল আন্টসাল বা পাউল সেলান, ১৯৭০ সালের এপ্রিলে মিরাবো সেতুর থেকে স্যেন নদীতে ঝাঁপিয়ে অন্তরঙ্গ মৃত্যুকে বরণ করেন। পাউল সেলান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান ভাষায় সবচেয়ে শক্তিমান কবি, তাঁর মৃত্যুদিন সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়নি, তবে সম্ভবত তা ছিল ছুটির দিন। মে মাসের কোনো এক তারিখে নদীর সাত মাইল ভাটিতে এক জেলে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করে। উনপঞ্চাশ বছর বয়স্ক এই কবি, যিনি ছিলেন একজন দক্ষ সাঁতারুও, তাঁর সলিল সমাধির প্রাথমিক আঙ্গিকটি এইরকম। তাঁর স্ত্রী গ্রাফিক শিল্পী গিসলি লাস্ট্রান্জ ভেবেছিলেন সেলান হয়তো গ্রামে গিয়েছেন, তবু তাঁর অবস্থান বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন বন্ধুকে। সেলানের লেখার টেবিলে খোলা ছিল মহৎ জার্মান কবি হ্যোল্ডারলিনের জীবনী, যেখানে এক জায়গায়, সেলান একটি লাইন রেখাঙ্কিত করেন এরূপ একটি পঙ্ক্তির নীচে: "কখনও কখনও এই মনীষী চলে যান গভীরে, আর ডুবে যান হৃদয়ের মর্মভেদী কূপের ভেতর"। তাঁর ফ্ল্যাটটিও, ৬ এভিনিউ এমিল জোলা, ছিল মিরাবোর জেটির ওধারে। সেলানও ১৯৬২ সালে লেখা এক নামহীন কবিতায় আপোলিনেরের মতোই লেখেন:

পাথরসেতু থেকে—
যেখান থেকে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে
জীবনের গভীরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আঘাতের পালকে উড়ে—
মিরাবো থেকে।

১৯৬৪ সালেও তিনি লিখেছিলেন: "জলের সুচ বিচ্ছিন্ন ছায়াগুলোকে সেলাই করে।" অতএব জলের দেবতার সাথে তাঁর অদৃশ্য পাশাখেলার শুরু হয়েছিল অনেক আগ থেকেই, মৃত্যু শুধু কাজ করেছে নিয়ামকের।

কবিরা কি মৃত্যুমুখী বক্তিত্ব? অথবা তারা কি নিজেরাই ঠিক করে নেন তাদের জীবন? র‍্যাঁবো বলেছেন, শিল্পী হলেন মহৎ অসুস্থ, মহৎ অপরাধী, মহৎ বহিষ্কৃত ব্যক্তি। কবিকে হতে হবে দূরতর পৃথিবীর লোক, পরিচিত জগৎ থকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত:

নিজেকে তুমি মুক্ত করো
মানবের প্রবল প্রচেষ্টা থেকে
আর পৃথিবীর সকল পশরা থেকে
তোমাকে হতেই হবে যারপরনাই বিমুক্ত...

মৃত্যু হলো ঈশ্বরের আশীর্বাদ, তার জন্য অপেক্ষায় থাকো? এ জাতীয় নিয়তি-সম্পত্যয় কবিরা মানেন না, বর হেরাক্লেতাসের সেই বিখ্যাত উক্তি? জন্মের পর থেকেই মৃত্যুর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, এর সাথেই তাদের মনোপলব্ধি। কবি শুধু তার আঙ্গিক আর সময়কে নিয়ন্ত্রণ করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "মনের-মতোকে" সে ঠিকঠাক রাখতে চায়। পাউল সেলানও তাঁর মৃত্যুর আঙ্গিককে দৃঢ় করেছেন জলের গম্বুজে? তার নিখিল অক্ষরবৃত্তের আবেষ্টনে।

দুই.

সেলানের জন্ম ১৯২০-এ, রোমানিয়ার বুকোভিনা অঞ্চলের সারনোভিজ-এ, এক জার্মানভাষী ইহুদি পরিবারে। বুকোভিনা, যাকে কবি পরবর্তীকালে বলতেন, "এমন এক জায়গা যেখানে মানুষ এবং পুস্তক বাস করত" যা ছিল একসময় অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অংশ, কবির জন্মের ঠিক আগেই তা রোমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সারনোভিজ জিমনেসিয়ামে পড়াশোনা শুরুর পর, ১৯৩৮-এর শুরুতে, সেলান অর্ধেক বছর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন ফ্রান্সের তুরস্-এ। তারপর তা বাদ দিয়ে সেলান সারনোভিজে চলে আসেন এবং স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রোমান ভাষা ও সাহিত্যের ওপর লেখাপড়া করেন। ১৯৪০-এ বুকোভিনা সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক অধিকৃত হয়। পরবর্তী বছরে, জার্মান ও রোমানীয় সৈন্যদের দ্বারা সারনোভিজ শহর দখল হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে যান। জার্মান ও রোমানীয় সৈন্যরা স্থানীয় সকল ইহুদিকে একত্র করে জার্মান নিয়ন্ত্রিত গেটোতে রাখতে থাকে। পাউল সেলানের বাবা-মায়ের জায়গা হয় নাৎসি এক্সটারমিনেশন ক্যাম্পে, আর সেলানের হয় রোমানীয় লেবার ক্যাম্পে। ১৯৪৪-এ রুশ সৈন্যরা শহরটি পুনর্দখল করে। ১৯৪৩-এর শেষ নাগাদ সেলান তাঁর নিজ শহর সারনোভিজে ফেরেন এবং পড়াশোনা পুনরায় শুরু করেন। ১৯৪৫-এ সেলান বুকোভিনা ছেড়ে বসবাসের জন্য বুখারেস্টে চলে যান এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেখানে একজন অনুবাদক ও প্রুফ-রিডার হিসেবে একটি প্রকাশনা সংস্থায় কাজ নেন আর জীবন চালাতে থাকেন। ১৯৪৭-এ তিনি বুখারেস্ট ছেড়ে ভিয়েনায় চলে আসেন; এর পরবর্তী বছরেই ভিয়েনা ছেড়ে প্যারিসে চলে আসেন। প্যারিসে তিনি জার্মান ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৯৫০ সালে বিশেষ ডিগ্রি License en letters পান। ওই বছরেই তিনি লাস্ট্রানজকে বিয়ে করেন এবং ফরাসি নাগরিকত্ব পান।

প্রায় আটশ কবিতা লেখেন সেলান। ১৯৩৮-৭০—এই দীর্ঘ ৩২ বছরে যা বিভিন্ন সাময়িকীকে প্রকাশ হতে থাকে আর তিনি অন্ধকার ঘরের ভেতরে প্রদীপের আলোর মতো ব্যাপ্তি পেতে থাকেন। নিজ প্রকৃত নামে তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ, ১৯৪৮ সালে, প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ *পপি ও স্মৃতি*, যা তাঁকে এনে দিয়েছিল খ্যাতি এবং জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায় যা সাড়া জাগিয়েছিল, ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়; তাঁর বিখ্যাত কবিতা "মৃত্যুসংগীত" এই দুই কাব্যেই স্থান পায়। কবিতাটির সুর ও ভাব হলো সেই স্মরণীয় মহাতঙ্ক যা কাঁপিয়ে দিয়েছিল সভ্যতার ভিত, সেই নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প আর হিটলারের চূড়ান্ত ইহুদি নিধন-যজ্ঞ। ১৯৪৪ সালে সারনোভিজ থেকে লেখা শুরু হয় কবিতাটির আর বুখারেস্টে ১৯৪৫ সালে শেষ হয় তা। সামগানের মতো ধ্বনিত এবং মর্মরিত হয়ে উঠেছে কবিতাটি—ক্যাম্প অধিনায়কের আদেশে গ্যাস চেম্বারের অধিবাসীরা তাদের নিজেদের কবর খুঁড়ছে। কবর খোঁড়ার সাথে সাথে তালে তালে এক ইহুদি অর্কেস্টা সংগীত গায়:

সে চিৎকার করে বলে খোঁড়ো গভীর করে মাটি তোমরা সকলে, আর
অন্যরা এখন গাও আর খেলা করো
সে তার মুঠোতে নেয় কোমর-বেল্টের লোহা, দোলায়, তার দু-চোখ
গভীর নীল, খোঁড়ো নিজ নিজ কোদাল দিয়ে, হারামজাদারা, আর
অন্যরা নৃত্যের তালে তালে খেলা করো
প্রভাতের কালো দুধ—আমরা রাতের বেলায় তোমাকে পান করি
মধ্যাহ্নে আর সূর্যাস্তে পান করি
পান করি আর করি
বাড়িতে বাস করে একজন তোমার সোনালি চুল মার্গারিটা
তোমার ছাই-রং চুল গুলামিথ সে খেলা করে সরীসৃপ নিয়ে
সে ডাকে অন্তরঙ্গময়—খেলো মৃত্যু নিয়ে, মৃত্যু হলো
জার্মানির ফুয়েরার
সে গভীরভাবে ডাকে এখন তোমাদের তন্ত্রীগুলোতে টোকা দাও যেন
ধোঁয়ার মতো তোমরা বাতাসে মিলিয়ে যাও
তারপর পেয়ে যাবে একটি কবর মেয়েদের দেশে যেখানে
এত গাদাগাদি করে তোমাদের শুতে হবে না
সকাল বেলার কালো দুধ আমরা পান করি রাতে
আমরা তোমাকে পান করি মধ্যাহ্নে মৃত্যু এক জার্মানির প্রভু
সূর্যাস্তে তোমাকে পান করি পান করি মধ্যাহ্নের মৃত্যু এক
ফুয়েরার জার্মানির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিন.

পাউল সেলান আধুনিক সময়ের এক দুর্বোধ কবি। গূঢ় কবিতার উৎসারভূমি তিনি, যেখানে পাঠকের প্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। নতুন আর প্রাচীন শব্দের গাঁথুনিতে তিনি গড়তে চেয়েছেন তাঁর একান্ত ঊর্ধ্বভুবন যেখানে ঘোরানো সিঁড়ি ভেঙে আকাশগঙ্গার অন্বেষণ পাঠককে অভিলক্ষণের প্রান্তদ্বারে যেতে দেয় না। হিব্রু বাগ্‌ধারাও তাঁর কবিতায় অনুপ্রবিষ্ট। সমালোচক জো. এ. মিডলটন বলেছেন, "তাঁর বাগ্‌ধারা পরিহার প্রবণতায় আলঙ্কারিক... অন্বয় আর চিত্রকল্প পাঠককে কমই ছাড় দেয়।" পূর্বসূরি জার্মান কবি কার্ল ক্রোলোর মতোই তিনি ফরাসি পরাবাস্তববাদীদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর ওপর গেয়র্গ ট্রাকল এবং ইভান গলেরও প্রভাব ছিল। আর প্রভাব ছিল নিজ ইহুদি ঐতিহ্যের। যে প্রাচীন ইহুদি-শাস্ত্র ও লোককাহিনি চিত্রকর মার্ক শাগাল ও লেখক কাফকার গভীরে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল, সেলানেও তা ছিল সঞ্চারী অভিমুখিতায় ক্রিয়াশীল। তাঁর আন্তরিকতা ছিল একান্তভাবে সৎ, কিন্তু তাঁর বিষয়বস্তুর দুরন্ত প্রকাশে বাধা হয়ে দেখা দিত তদানীন্তন মামুলি কাব্যভাষার সীমাবদ্ধতা, যার দ্বারা ইহুদি হত্যাযজ্ঞের মতো বিষয়কে প্রকাশ করা যেত না। এই হত্যাযজ্ঞ, এর বিষয়বস্তু ও ভাবই তাঁর কবিতায়, তাঁর সমগ্র সম্প্রদায়ের বেদনায় বাঙ্ময় হয়েছিল, যে সম্প্রদায় হত্যাযজ্ঞে নিশ্চিহ্ন ও সম্মার্জিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু রয়ে গিয়েছিল একটি জিনিস, তাঁর কথায়, যা মুছে যায়নি: ভাষা। জার্মানেরা তাঁর সবটুকুই নিয়ে নিয়েছিল, তাঁকে করেছিল স্থানচ্যুত। কিন্তু একটি জিনিসই তাঁর অধিকারে ছিল: তাঁর ভাষা; তাঁর নিজের ভাষায়, "সকল হারানোর মাঝখানে একটি জিনিসই হারায়নি, রয়ে গেছে আশ্রয়ের...।" তিনি অনুভব করতেন জার্মানেরা তাদের ভাষাকে অপবিত্র ও নষ্ট করে ফেলেছে। নাৎসিরা শব্দকেও করেছে তাদের অস্ত্র—ইউরোপীয় ইহুদিরা যাতে আক্রান্ত হতো। সেলান এই নষ্ট, ছেঁড়া ভাষাকে জোড়া দিতে চেয়েছেন। তিনি বিশুদ্ধ করতে চেয়েছেন তাঁর ভাষাকে, নতুন এক শব্দের ঠিকানায় নিয়ে গিয়ে। তিনি ছিলেন এক ভঙ্গুর ব্যক্তিত্ব, তাঁর ছিল জার্মান আর ইহুদি পরিচয়। তিনি লিখেছেন এক নবজাত জার্মান ভাষায় যার ছিল অতীতের অপবিত্রতাকে দূর করার দুর্মর শক্তি। তিনি লিখেছেন, "কেবল মাতৃভাষাতেই কেউ প্রকাশ করতে পারে তার নিজস্ব সত্য। বিদেশি ভাষায় কবিরা তো মিথ্যাই বলে।" কিন্তু পরে হয়েছিলেন ফরাসিও। পরাবাস্তবতা আর ইহুদি অতীন্দ্রিয়বাদ তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল কিন্তু তাঁর প্রধান অভীপ্সাই ছিল কবিতার ভাষার পুনর্নবীকরণ যার কারণে কবিতা হয়ে ওঠে দাঢ্য, কূটাভাসময়, বাক্‌প্রতিমায় বিস্ময়পূর্ণ, ভঙ্গুর পঙ্‌ক্তিসর্বস্ব, ভুতুড়ে, যৌগিক। পূর্বসূরি ইভান গলের সাথে তাঁর মিল আছে এক্ষেত্রে। সেলান ফরাসিতেও লিখেছেন। গল বলতেন, তিনি, "ভাগ্যে ইহুদি, দৈবাৎ ফরাসি, কাগজপত্রে জার্মান।" যেহেতু গলের প্রথম ও শেষ কবিতা জার্মান ভাষায় লেখা, সেহেতু নিশ্চিতই তাঁকে বলা যায় জার্মান ইহুদি-কবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেলান আরও বেশি জার্মান-ইহুদি। ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন প্রচুর—র‍্যাঁবো, ভালেরি, মিশো, রেনে শার প্রমুখের কবিতা। এমিলি ডিকিনসন, মারিয়ান মুর-ও অনুবাদ করেছেন। "ফ্রান্সের স্মৃতি" কবিতায় তিনি লেখেন:

আমরা সমবেতভাবে পুনরায় স্মরণ করি; প্যারিসের আকাশ, সেই
বিশাল শরতের ক্রোকাশ ফুল...
ফুলকন্যার দোকানে আমরা গিয়েছি হৃদয়ের কেনাকাটায়;
তারা ছিল নীল আর জলের মধ্যে তারা উন্মোচিত হলো।
আমাদের কক্ষের ভেতর বৃষ্টিপাত শুরু হলো,
আমাদের প্রতিবেশীরা এল, মঁশিয়ে লা সংগ, এক ছোটোখাটো চিকন লোক।
আমরা তাস খেললাম, আমি হারালাম আমার চোখের রংধনু:
তুমি আমাকে ধার দিলে তোমার দিঘল কুন্তল, আমি তা-ও হারালাম।
সে আমাদের ফেলে দিল নীচে।
সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, বৃষ্টিও তাকে অনুসরণ করল
আমরা ছিলাম মৃত আর নিশ্বাস নিতে অক্ষম।

কবিতাটিতে আছে মৃত্যুর অনুষঙ্গ, পরাবাস্তব রসে যা সিক্ত। সেলানের কবিতার অনেক ব্যাখ্যায় তাঁকে এই পরাবাস্তব সংশ্লিষ্টতায় আবিষ্কার করা হয়েছে। অনেকে আবার তাঁকে মরমি ইহুদি কবি হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু শেষ দিকের তাঁর কবিতাকে অনেকেই বলেছেন কৃত্রিম। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত *স্পিস-গ্রিন* কবিতাগ্রন্থে প্রতীয়মান হয় এই ব্যর্থতা। তিনি নিজেও পঞ্চাশ ও ষাট দশকের ফরাসি সাহিত্যের বন্ধ্যা ছদ্মসৃজনশীল উপাদানের সাথে তাঁর সামীপ্যকে চিহ্নিত করেছেন। শেষ দশ বছর কবিতায় নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তিনি দারুণভাবে ব্যর্থ হন এবং চুপ থাকাতেই যেন স্বস্তি পেতেন। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন সেলান তাঁর কবিতায় খুঁজে পেতে চাইতেন একটি "ঘর": "ভাষার ল্যান্ডস্কেপ"-কে। গেয়র্গ স্টাইনার বলেছেন, সেলানের কবিতা আসলে "ভাষার বিরুদ্ধে সাহিত্যিক দ্রোহ"। কিন্তু তিনিও সেলানের শেষ দিকের কবিতাগুলোকে অপ্রয়োজনীয় হিসেবে মন্তব্য করেছেন। এ সত্ত্বেও সেলান সমৃদ্ধ, ঋদ্ধমান তাঁর নবীকৃত ভাষার জাদুময় ভূমিতে:

১. এই হলো সময়ের চোখ:
সাত রঙের অক্ষিগোলকের নীচ দিয়ে
তির্যকভাবে তাকিয়ে আছে।
তার চোখের পাপড়ির আগুনে ধোয়া পরিষ্কার,
আর অশ্রু উষ্ণ প্রস্রবণ।
অন্ধ নক্ষত্ররা তার পানে ছুটে যায়
আর চোখের পাতায় গলে যায় উষ্ণময়তায়।
তা ছেড়ে যায় কবোষ্ণ পৃথিবী
আর মৃতদের জুড়ে
বিকশিত পত্র-পুষ্পিতায়।

[সময়ের চোখ]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২. তোমার করপুট সময় আর মুহূর্তে পূর্ণ, তুমি আসো আমার
কাছে—
আর আমি বলি: তোমার চুল বাদামি নয়।
অতএব তুমি হালকাভাবে একে তুললে দুঃখের পাল্লায়: আর তা
ওজনে আমার চেয়েও ভারী হলো...
[তোমার হাত পূর্ণ সময়ে]

চার.

"জার্মান লেখকেরা সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই পুরাণীকরণ করেন"—পাউল ওয়েস্টের এই স্বতঃসিদ্ধ মন্তব্যের সারবত্তা পাই সেলানের মধ্যে। অন্তর্গত মানসলোকে বাস্তবতা আর ব্যক্তিত্বের মিথস্ক্রিয়ায় তিনি গড়ে তোলেন এক পৌরাণিক কাব্যভূমি যা অনিবেদিত, বিবিক্ত এবং প্রতিবন্ধ। অবশ্য তিনি মনে করতেন কবিতার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ, তা নিশ্চয়ই সকলের কাছে পৌঁছাবার মতো নয়, বা নয় সহজসাধ্য। তবে কেউ কেউ পেয়ে যায় তার অনির্বচনীয় স্বাদ আর তখনই কবিদের উদ্দেশ্য পায় সার্থকতা।

তাঁর প্রিয় কবিদের মধ্যে আছেন আবহমান জার্মান ঐতিহ্যের গ্যোয়েটে, হ্যোল্ডারলিন, রিলকে। হ্যোল্ডারলিনের মতোই কবিতা যে মানুষের "উৎসভাষা" তার বিন্যাস খোঁজাতে তিনি ছিলেন অন্তহীন, নিরলস আর আকাঙ্ক্ষিত। প্রিয় কবির মতোই তিনি নিজেকে সমুদ্রের দোলা-লাগা নৌকার মতো দোলাতে চেয়েছেন স্যেন নদীর শীতল জলে, আর নিয়েছেন স্বাধীনতা "যেখানে সে যেতে চায় সেই দিকে যাত্রার।" আর রিলকের "প্রাচীন বেদনা"-কে বহন করে তাঁরই অন্বিষ্ট অথচ অপ্রাপ্ত "ব্যক্তিগত" মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন সেলান।

ইতিহাসবিদ এরিথ কাহলার নিজ মৃত্যুশয্যায় সেলানের মৃত্যুসংবাদ পান। খবরটা শুনে তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন ইয়োসেফ ফ্রানৎস: কাহলার, "নিজের সম্পর্কে কিছু বললেন না, কিন্তু, নিজের হাতদুটিকে প্রার্থনা করার মতো গুটিয়ে আনলেন চোখের সামনে এবং এক অন্তর্গত সন্তাপ ও মূর্ছনায় তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল, আর চোখ জলে ভরে গেল এক ভয়ংকর মনস্তাত্ত্বিক ভারে, এই ভার হলো এক মহৎ জার্মান কবি আর মধ্য ইউরোপের এই ইহুদি যুবকের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের ছায়ায় বেড়ে ওঠার বিষয়, যা পাউল সেলানকে মৃত্যুতে ঠেলে দিয়েছিল।''

পাউল সেলান ছিলেন স্বভাব ফরাসি, ফরাসি কবিতা পছন্দ করতেন তিনি। জ্যুল সুপারভ্যেল, একজন ''স্বাভাবিক'' কবি, তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন:

ডুবন্ত মানুষটি খুঁজে ফিরে সেই গান
যাতে তার যৌবন হয়েছিল মূর্ত,
বৃথাই শোনে খোলের ভেতরে, আর
সমুদ্রের অন্ধকারি বিছানায় ডুবিয়ে দেয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিতার অন্তর্গত ইঙ্গিতটি কি সেলানের কিংবদন্তিতুল্য নিয়তির কথাই মনে করিয়ে দেয় না? হয়তো মৃত্যুই পারে "বিশ্লিষ্ট ছায়াগুলোকে এক করে দিতে"।

পাঁচ.

অকৃত্রিম বন্ধু লাইসিডাসের সমুদ্রে ডুবে অকালমৃত্যুর পর মিল্টন লেখেন শোকগাথা "লাইসিডাস" যাতে তিনি বলেন লাইসিডাসের জন্য শোক না করতে; লাইসিডাস সমুদ্রগর্ভে সলিলসমাধি লাভ করলেও সূর্য যেমন প্রতিদিন সমুদ্রগর্ভে সমাহিত হয় আবার ভোরের আকাশে মাথা তুলে ওঠে, তেমনি লাইসিডাসও আবার ওপরে উঠে আপন মহিমায় আনন্দ ও প্রেমের সম্মিলনে অমৃতধারায় ঋদ্ধ করে তুলবে তার তরুণ যৌবনকে। সলিলসমাধিস্থ পাউল সেলানও তাঁর অপরসত্তার সঞ্চারে জেগে উঠছেন অবিরত, এবং নিশ্চিতভাবে আমাদের, এক অন্যতর তাৎপর্যে ভাস্বর করেছেন? এই আশা ও প্রত্যয়ের ফুলরাশি ঝরিয়ে দিয়েই তাঁর আত্মহত্যাকে আমরা উদ্ভাসিত করতে পারি :

ছোটো রাতঃ তোমার গভীরে
যখন আমাকে নিয়ে নাও, নিয়ে নাও
ওপরের সেইখানে,
তিন বেদনা ইঞ্চি ওপরেঃ
এইসব বালির কাফনের পোশাক
সাহায্য করে না এইসব
জিহ্বার
এইসব স্থির হাসি?
[ছোটো রাত্রি]

পাহাড়ের নীল কেন্দ্রে ধরে রাখি এক মহৎ শৈশব

—হার্ট ক্রেন

বিস্মরণ যেন এক সংগীতের মতো
তাল, লয় আর বিস্তার হতে মুক্ত।
বিস্মরণ এমন এক পাখি যার ডানাগুলো সমন্বিত
প্রসারিত আর গতিহীন—
এমন এক পাখি বাতাসকে গড়িয়ে দেয় ক্লান্তিহীন।

বিস্মরণ রাত্রিতে বৃষ্টিপাত
অথবা অরণ্যের গভীরে এক পুরোনো বাড়ি— বা নয় এক শিশু।
বিস্মরণ সাদা—এক ঝড়ে পতিত বৃক্ষের মতো সাদা
আর তা সম্ভবত সিবিলকে দিব্যপ্রেরণার ধাঁধায় হতচকিত করে

আমি স্মরণ করতে পারছি অনেক অনেক বিস্মরণ।

[বিস্মরণ]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত জীবন ও কবিতার ক্লান্তিহীনতার গভীরে লুকিয়ে থাকে এমন এক অনিঃশেষ বিস্মরণ যা সত্তার মগ্নবিজ্ঞপ্তিকে উজ্জ্বল করে বিভাবসৌন্দর্যে, যখন জীবনের আবহ তার আদিবোধকে করে রেখাঙ্কিত।

দুই.

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর "মনে পড়লো" কবিতায় লিখেছেন: লেবেল-ক্রসিং—দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন/অনাবশ্যক পড়ছো কি হার্ট ক্রেন? হার্ট ক্রেন আমেরিকান কবি—আত্মহননকারী। প্রত্যেক কবিই হনন করে চলেন নিজেকে, শারীরিক স্থূলতার অর্থে নয় বরং ভেতরে গভীরে—নিজের ভেতর নিজেকে। কিন্তু এই হনন মানসিক, আর শারীরিক হনন? আত্মহত্যার দার্শনিক ব্যাখ্যা কী? অথবা কী তার নৈতিক ও জীবগত অভীপ্সা? কবিরা কি আত্মহত্যার মৌল ভবিতব্য নিয়েই পৃথিবীতে আসেন! মিল্টন তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, মৃত্যুর কোনো বিভীষিকাকে স্বীকার করে না কবিরা; তাদের কাছে মৃত্যু মৃত্যুই নয়, তা যেন এক মহাজীবনে উত্তরণ। মৃত্যু মানে জৈব অস্তিত্বের গরিমা, উচ্চস্তরে আরোহণ।

হার্ট ক্রেন আজন্ম মাতাল আর ছিলেন আত্মহত্যায় প্রায়শই উদ্‌যোগী? ভার্জিনিয়া উল্‌ফের মতো মনে করতেন, মৃত্যু হলো জীবনের চূড়ান্ত মহিমা। "ব্রোকেন টাওয়ার" লেখার এক মাস পর স্টিমার "ওরিজাবা"র রেলিং থেকে লাফিয়ে পড়েন, তিনি হাবানার ২৭৫ মাইল উত্তরে, সাগরে তাঁর সলিলসমাধি হয়। জলের মৃত্যু তিনি কল্পনা করতেন; তাঁর প্রথম জীবনীকার ফিলিপ হর্টন বলেছেন, সম্ভবত, অন্য কোনো লেখকই, ক্রেনের মতো, সমুদ্রের রহস্য ও ভয়ংকরতাকে, কল্পনা আর বাগ্মিতার বুনুনে ফুটিয়ে তোলেননি। ডুবে যেতে তাঁর বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না। এ মৃত্যু অতি সৌম্য যাতে মুহূর্তেই রূপান্তর ঘটে। অভিজ্ঞতার এই তাৎক্ষণিক রহস্যোদ্‌ঘাটন মহান।

তিন.

হেরল্ড হার্ট ক্রেন ওহিওর গ্যারেটসলিলেতে (পেনসিলভানিয়ার সীমান্তে অবস্থিত একটি ছোটো শহর) ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ক্লেরেন্স ও গ্রেস হার্ট ক্রেনের একমাত্র সন্তান। ক্রেনের শৈশবকালে তাঁর পরিবার দু-বার বাসস্থান বদল করেছিল: প্রথম ওহিওর ওয়ারেনে তাঁর পিতা একটি ম্যাপল-সিরাপের কারখানা স্থাপন করেছিলেন, পরে, ক্লিভল্যান্ডে এসে ক্যান্ডি প্রস্তুতকারী হিসেবে তিনি তার পেশা শুরু করেন। পরে তিনি ক্রেন কোম্পানির মালিক হন। ১৯০৯ সালে যখন হার্ট ক্রেনের বয়স দশ বছর তখন তাঁর পিতা-মাতার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তাঁর মাতা গ্রেস ক্রেন মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হন। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর পিতা-মাতা আবার একত্রে বসবাস করতে শুরু করেন। তাদের মনোমালিন্যের সময় বালক হার্ট ক্রেন তার মাতামহের নিকট পালিত হচ্ছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যদিও তাঁর পিতা-মাতা আবার একত্রে বসবাস করতে শুরু করেন এবং আরও নয় বছর একত্রে থাকেন, তবু তাদের সম্পর্ক সবসময়ই ছিল নড়বড়ে ও ভঙ্গুর, এর ফলে ১৯১৭ সালে পাকাপাকিভাবে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে হার্ট ক্রেন তাঁর "কোয়াকার হিল" কবিতায় এই বিচ্ছেদের বর্ণনা দেন এবং লেখেন যে, এই "বিচ্ছিন্ন অভিভাবকত্বের অভিশপ্ত ভার" তাঁর জীবনকে কোণঠাসা করে দিয়েছিল মনে-প্রাণে। হার্ট ক্রেনের কবিতা লেখা তার পিতা পছন্দ করতেন না। চাইতেন তিনি যেন পৈতৃক ব্যবসায় মনোযোগ দেন, মনে করতেন কবিতা লেখা মেয়েলি কাজ, দুর্বলের অবলম্বন। কিন্তু তাঁর মা তাঁকে অনুপ্রেরণা জোগাতেন তাঁর শৈল্পিক জাগরণে। হার্ট ক্রেন তাই পছন্দ করতেন তাঁর মাকে আর যারপরনাই পিতাকে ঘৃণা করতে শুরু করেন।

ক্রেনের জীবন চড়াই-উতরাইয়ের জীবন। বিবমিষা আর আত্মধ্বংসের এক যজ্ঞের তিনি ঋত্বিক। তাঁর শেষ কবিতা "দ্য ব্রোকেন টাওয়ার"-এ সন্দেহ আর বিশ্বাসের এই দোলাচল প্রতিফলিত; কবিতাটি তিনি কবি ও সমালোচক ম্যালকম কাউলের সম্পর্কচ্ছিন্ন পত্নী পেগি বায়াডের প্রেমে পড়ার পর লেখেন:

আর সুতরাং তা ভাঙা জগতের ভেতরে ঢুকে যায়
ভালোবাসার অপার সঙ্গকে খুঁজে পাওয়ার জন্য তার স্বর
বাতাসের এক মুহূর্তময়তা (আমি জানি না হেথায় নিক্ষেপিত)
কিন্তু প্রতিটি বেপরোয়া পছন্দকে ধরার জন্য নয় দীর্ঘায়িত।

আমি ঢেলে দিই আমার শব্দরাশি: কিন্তু তা সমুদ্ভব

১৯৩২-এর ২৭ জানুয়ারি, ইনসোমনিয়ায় আক্রান্ত কবি, সকালে উঠে ম্যাক্সিকোর ট্রাকসকোয় গ্রামের মাঝ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখা পেলেন এক পুরোনো বন্ধুর, যে তাঁকে নিয়ে গেল চার্চে, যেখানে সকালের গির্জার ঘণ্টা খ্রিস্টের পুনরুত্থানের ঘোষণা দিচ্ছে। এভাবেই ক্রেন অনুভব করলেন এক আনন্দ ও উল্লাসময় পরামুহূর্তের। সূর্য উঠেছে, পাহাড়ের ওপর গির্জার ঘণ্টা বেজে চলছে আর বাতাস হয়ে যাচ্ছে সঞ্চরণশীল, বিস্তৃত। কবির পুনর্জন্ম হলো, তিনি ফিরে পেলেন জীবন। ঘরে ফিরে গিয়েই লিখতে লাগলেন কবিতা। যে-বন্ধু লেসলি সিম্পসনকে তিনি কিছুক্ষণ আগে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন, এখন তাকে নিয়েই তিনি গেলেন প্লাজায়। সিম্পসন পরে স্বীকার করেছিলেন যে তারা দুজন চার্চের ছায়ায় বসে পড়েন আর ক্রেন ঢেলে দিচ্ছেলেন শব্দ, আর তা তৈরি করছিল মহার্ঘ শব্দের ক্যাসকেড। ক্রেন লিখছিলেন তাড়াতাড়ি, কারণ যদি এ মুহূর্তের সৃষ্টি হারিয়ে যায়! কবিতাটিতে চার্চের ঘণ্টাধ্বনির সাথে কবির সৃষ্টিকে আর কবিকে খ্রিস্টের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ত্রাণকর্তার মতোই কবি প্রবেশ করেন "ভাঙা জগতে/ভালোবাসার অলৌকিক সাহচর্য আবিষ্কারে..."। কবিও ভোগান্তির মধ্য দিয়ে যান আর অন্ধকারময় মুহূর্তগুলো তাঁর মনে সৃষ্টি করে অনিশ্চিতি যেন অভিযাত্রা পূর্ণ হবে না। যেন, মনে হয়, কাব্যদেবী তাঁকে ত্যাগ করেছেন। তাই তিনি বলেন? আমার শব্দগুলোকে আমি ঢালি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অধিকাংশ সমালোচকই তাঁর শেষ কবিতাটিকে শ্রেষ্ঠতম বলে মনে করেন। কবিতাটিকে ক্রেন বলেছেন একটি নিষ্কর্ম সম্পাদন যাতে তাঁর সৃষ্টিশীল শক্তি হয়েছিল ব্যয়িত। প্রায় দুই বছর ধরেও ক্রেন কবিতাটি শেষ করতে পারেননি।

হোয়াইট বিল্ডিংস কাব্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর ভাষা? তাঁর সময়ের ভাষাকে। ক্রেন আমাদের বলতে চেয়েছেন রোম্যান্টিক প্রেম-প্রকৃতি, প্রশান্তি, যৌনতা, সমকামিতার যন্ত্রণা এবং কবিতা ও কবি সম্পর্কে। বিংশ শতাব্দীর কোনো কবিই তাঁর মতো এমন ভঙ্গিমাত্মক সঞ্চরণশীল কবিতা লেখেননি। "দ্য ব্রোকেন টাওয়ার" কবিতাটি? যাকে তিনি মনে করতেন এক ব্যর্থ কবিতা? সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ভঙ্গিসর্বস্ব কবিতা। তাঁর ওপর ফরাসি প্রতীকবাদের ছায়াসম্পাতও লক্ষণীয় ছিল। বিষয়কে ভাবের মাধ্যমে বাক্‌প্রতিমায় রূপান্তরণের ভাবনাসূত্র তাঁকেও বিলোড়িত করেছিল। ভাবরূপই অন্বিষ্ট যার হাত ধরে কবিতা হয়ে ওঠে অভিব্যঞ্জনাময়, যাতে উদ্ভাসিত হয় অন্তরালের জগৎ।

জীবিতকালে তাঁর প্রকাশিত কাব্য—*দ্য হোয়াইট বিল্ডিংস* (১৯২৬), ছোটো কবিতার সংকলন আর আমেরিকান মহাকাব্য *দ্য ব্রিজ* (১৯৩০)। *সংগৃহীত কবিতা* নামে তাঁর শেষ দিককার ছোটো ছোটো কবিতাগুলো নিয়ে সংকলন বের হয় ১৯৩৩-এ, আর চিঠিপত্র প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। তাঁর রচিত মহাকাব্য *দ্য ব্রিজ*কে কোনো সচেতন সমালোচকই সফল হিসেবে চিহ্নিত করেননি। মূলত ক্রেন অটো কান নামীয় এক ব্যবসায়ী ও পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করেই এই মহাকাব্যটি লেখেন। তিনি কানকে বলেছিলেন, আমেরিকান ইতিহাস ও অতীতকে বর্তমানের মাধ্যমে তুলে ধরবে এই কবিতা তার সঞ্জীবনী উপাদানের মাধ্যমে। কিন্তু বাস্তবে তা ব্যর্থ হয়। অটো কানের কাছ থেকে প্রাপ্ত দু-হাজার ডলার ক্রেন উড়িয়ে দেন পানোন্মত্ততা আর লাম্পট্যে। *দ্য ব্রিজ*-এর অন্তঃসার হলো মূলত তার সস্তা ভাবালুতা। ১৯২৩ সালে, ঠিক "ফস্টাস ও হেলেনের বিয়ের উদ্দেশে" কবিতাটি সমাপ্ত করার পরপরই তিনি *দ্য ব্রিজ* লিখতে শুরু করেন এবং পরবর্তী সাত বছর ধরে চলে তার সংশোধন এবং সংবর্ধন। এই দুটি কবিতা খুবই সন্নিহিত ধরনের কবিতা। প্রথম কবিতা "ফর দ্য ম্যারেজ অব ফস্টাস অ্যান্ড হেলেন"-এ গাড়িতে চড়ে বেড়াবার সময় কবি-ভ্রামণিকের এক পরমার্থিক অভিজ্ঞতা জন্মে। ক্রেনের ভাষায়, কবিতাটিতে, প্রাত্যহিকতা থেকে সর্বজনীন সৌন্দর্য সঞ্চারের কল্পনার উত্তরণকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। কবি যতই এগিয়ে যান তাঁর গন্তব্যের দিকে, ততই নিরীক্ষণ করেন যানজট, হই-হল্লা, নিয়নবাতির লাল-নীল চিহ্নের ফুলঝুরি। কবি কল্পনায় অতীত-ভবিষ্যৎ দেখতে থাকেন নিজ উপলব্ধিতে। আসে এক মরমি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। এই অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হলো এক যোগসূত্রের? অতীত বর্তমানের, আমাদের বর্তমান সময় আর অতীত সময়ের মাঝে এক ফিউশন। কবিতাটি একটি রূপক কবিতা: গাড়ি হলো স্থান ও কালের সংযোগসূত্র; বিয়ে হলো মরমি যোগাযোগ স্থাপন; হেলেন হলো সৌন্দর্য-সংবেদনার প্রতীক; ফস্টাস হলো কবি? সব সময়ের [illegible] কবিসত্তার প্রতীক। এভাবেই, কবি নিজেই কবিতাটির অন্তর্ভাষ্য দিয়েছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

*দ্য ব্রিজ*ও এক অতীন্দ্রিয় দর্শনের কবিতা। এই কবিতা সম্পর্কে, হার্ট ক্রেন, তাঁর পৃষ্ঠপোষক অটো এইচ কানকে একটি চিঠিতে জানান, কবিতাটি এমন এক জৈবনিক প্যানোরোমা যা বর্তমানের জৈব অস্তিত্বের মাঝে অতীতের বহমান এবং জীবন্ত অস্তিত্বের বিষয়টি তুলে ধরেছে। অন্যত্র তিনি কবিতাটিকে আমেরিকান এক পৌরাণিক সংশ্লেষণরূপে বর্ণনা করেছেন যেখানে ইতিহাস, ঐতিহ্য, দৃশ্যাবলি জারিত হয়ে এক অনন্য বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ক্রেন মনে করতেন *দ্য ব্রিজ* হলো এলিঅটের *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড*-এর সমতুল্য কাজ। ক্রেন *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড*কে মূল্যায়ন করেছেন সংহতভাবে, কিন্তু তাঁর বিবেচনায় আধুনিকতার বিশ্লেষণে *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড* পুরোপুরি নৈরাশ্যবাদকেই উপস্থাপন করেছে। *দ্য ব্রিজ* লেখার সূচনাসময়ে টেটকে লেখা চিঠিতে ক্রেন এলিঅটকে নিয়ে তাঁর মনের আবিষ্টতার কথা এবং তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা সবিস্তারে বলেছেন: "চার বছর ধরে তাঁর অভিমুখিতায় আমি আছি—কিন্তু তাঁর ভাণ্ডারের কোনো সামান্য দুর্বলতাও আমি বের করতে পারি না, আমি নিজেকে দেরিতে হলেও কিছুটা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছি যে আমি একটি নিরাপদ স্পর্শক আবিষ্কার করতে পেরেছি আঘাত করার—যা তাঁর ভেতর দিয়ে একটি ভিন্ন লক্ষ্যে পৌছাতে সম্ভবত আমার অবস্থানকে ব্যাখ্যা করেবে। দেখো, তাঁকে অনুকরণ করা এক ভয়ানক লোভ যার থেকে সময়ে সময়ে আমি প্রায়ই সরে এসেছি। ...তাঁর নিজের এলাকায় এলিঅট আমাদের জন্য এক পরম কানাগলিকেই উপস্থাপন করেন, যদিও তা প্রচণ্ড বিষম, তবু তিনি আমাদের এগিয়ে দেবেন বৌদ্ধিক উদ্বর্তনে, অন্যদের অবস্থান এবং নতুন চারণভূমির সন্ধান দিতে। তাঁকে পরিপূর্ণ আত্মস্থ করে আমরা নিজের ওপর নির্ভর করতে পারি আরও ভালোভাবে... ।"

ক্রেন *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড*কে একটি "মৃত্যুর পূর্ণতা" বলেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে এখন আর এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছুই করা সম্ভব নয়, হয়তো কোনো এক ধরনের পুনরুত্থান ছাড়া। এলিঅটের এই কবিতা "ভঙ্গুর অংশ"কে ধারণ করেছে। লুই আন্টারম্যায়ার একে বলতে চেয়েছেন, "সাঙ্গীকরণ আর তালগোল-পাকানো ভাষার কচকচানি; শেক্সপিয়র, ভার্জিল, মিল্টন, রিচার্ড হ্বাগনারের অপেরা আর বাইবেল উপনিষদসহ ধর্মীয় উপাদানের ব্যাপক উল্লিখন"। এলিঅট দেখেছেন আধুনিক কবি এক ম্যাগপাই পাখি ছাড়া আর কিছু নয়, যে শুধু কিচিরমিচিরই করতে পারে। হার্ট ক্রেন ভেঙে-পড়া লন্ডন সেতুর বিপরীতে এক সংহত সেতুর আশা করেছেন যা সময় ও শূন্যতাকে মুখোমুখি করবে। লেখার পূর্বপ্রস্তুতিতে এ রকমই ছিল তাঁর মানসিক ইচ্ছা। তিনি রচনা করতে চেয়েছেন ধ্রুপদি ঐতিহ্যের এক মহাকাব্যিক কবিতা। আমেরিকার ভার্জিল হিসেবে জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনই ছিল কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য। কিন্তু রচনাকালে তিনি হারিয়ে ফেলেন আগ্রহ, ফলে মহাকাব্য রচনা সম্পূর্ণ হয় না। ১৯৩০ সালে কবিতাটি চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হবার পর অ্যালেন টেট এবং উইন্টার্স এর সমালোচনায় মেতে ওঠেন। প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির কী বিশাল ব্যবধান! *দ্য ব্রিজ* অবশেষে হলো মহাকাব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অথবা অন্যভাবে নিরেট গীতিকবিতার এক জোড়াতালি হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। সমালোচক ডেম্বো পরবর্তীকালে একে বলেছেন মহাকাব্যিক বাতাবরণে এক রোম্যান্টিক গীতিকবিতা। ক্রেনও বুঝলেন, যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেভাবে কাজ হয়নি। ১৯২৬ সালের জুন মাসে ওয়ালডোকে লেখা চিঠিতে তিনি এ বিষয়ে বলেন, "পুরো ভাব ও প্রকল্প বৌদ্ধিকভাবে বিচার করে প্রতীয়মান হয়েছিল একেবারে অবাস্তব।" এছাড়া এর ব্যর্থতার আরেকটি কারণ ছিল হয়তো, *দ্য ব্রিজ* লেখা শুরু করার সময় তাঁর জার্মান দার্শনিক অসওয়ার্ল্ড স্পেংলারের ওপর পড়াশোনা শুরু করা, যার কারণে তিনি মনে করেছিলেন, এলিঅটই সম্ভবত ঠিক। এসব সত্ত্বেও, এত কিছু মানসিক দোলাচলতা ও অনিশ্চিতি থাকার পরও, তিনি কবিতাটি শেষ করতে চাইলেন তাঁর প্রাথমিক অভীপ্সা অনুযায়ী—আশাবাদ আর উল্লাসের ব্যাকুলতায়। তারপরও বলা যায়, কবিতাটি ক্যালাইডোস্কোপিক: সুন্দর, মর্ত্যমান, বিচিত্র প্রপঞ্চের ক্রমাগত রূপ আর অরূপের ব্যাপ্তি দূরবর্তী মাধুরিমায় স্ফূর্ত। কিন্তু এসব কিছু মহৎ ও উদ্‌বেলিত অংশই যেন বেসুরো অথবা কবিতাটির সমগ্রতার সাথে পূর্ণ সংস্রবী নয়। সমালোচকদের নিকট *দ্য ব্রিজ*কে তাই মনে হয়েছে অপ্রণিহিত, বিষমছান্দিক—যেখানে উৎকৃষ্ট ও অনুৎকৃষ্টের সন্নিহিত অবস্থান দৃষ্টিগ্রাহ্য।

চার.

ক্রেন কখনোই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি। জীবনের নাতিদীর্ঘ সময়জুড়ে নানান তুচ্ছ কাজ করেছেন এবং নিজের জন্য কখনোই কোনো স্থায়ী ঠিকানা গড়তে পারেননি। ম্যানহাটান ছেড়েছেন অনেকবার; বাস করেছেন ক্লিভল্যান্ড, অ্যাকরোন, ওয়াশিংটন ডিসিতে; আবার নিউ ইয়র্কে ফিরে এসেছেন। কখনও বছরজুড়ে কাজ করেছেন বিজ্ঞাপনী সংস্থার কপিরাইটারের, কখনও বইয়ের দোকানের কেরানির, কখনও ফেরিওয়ালার, চা দোকানের ম্যানেজারের, শেষাবধি ট্র্যাভেলিং স্টক দালালের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে। কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময়ই কর্মহীন ছিলেন। টাকার অভাব হলেই ওহিওতে ফিরে এসে পিতার সাথে কাজ করতেন। ১৯১৯-এ, তিনি অ্যাকরোনে এসে ক্যান্ডিশপের করণিকের কাজ করেন। ১৯২০ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি ক্লিভল্যান্ডে বসবাস করেন এবং পিতার অন্য বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করেন। এখানেই আর্নেস্ট নেলসন এবং চিত্রকর উইলিয়াম সোমার্সের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ক্রমশই তিনি হয়ে পড়েন এলোমেলো, উন্মাতাল, বিপর্যস্ত। দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি সুরাসক্ত অবস্থায় থাকতেন। ১৯২৮ সালে ক্রেন ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯২৯-এর প্রথমার্ধ হ্যারি ক্রসবির সাহচর্যে ছিলেন। ক্রেনের মতোই হ্যারি ক্রসবিও ছিলেন অধঃপতিত, নীতিভ্রষ্ট এবং মৃত্যু-আচ্ছন্নতার আরেক প্রতিভূ। দুজনেই আকণ্ঠ মদ্যপানে ভেসে যেতে লাগলেন। প্যারিসের ব্ল্যাকমান প্রেস থেকে প্রকাশের সম্প্রত্যয় দিয়ে ক্রসবি তাঁর অসমাপ্ত *দ্য ব্রিজ* সমাপ্ত করার জন্য নিরন্তর তাড়া ও উৎসাহ দিতে লাগলেন ক্রেনকে। পরবর্তী বছরেই প্যারিস ও নিউ ইয়র্ক থেকে তা বের হয়েছিল। ১৯৩১-এ, ক্রেন, তাঁর পিতার সাথে ওহিওতে তিন মাস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাটান। মার্চ মাসে তিনি গোজেনহেইম ফেলোশিপ পান এবং এর অর্থ দ্বারা ট্যাকসকোতে যান স্প্যানিশ কবিতার ওপর কাজ করতে। ট্যাকসকোতে অনেক শিল্পীর সাথে বসবাস করেন, যাদের মধ্যে অন্যতম উদ্ভিন্নমান ছোটোগল্প লেখক ক্যাথারিন অ্যান পোর্টার, যার প্রথম বই *ফ্লাওয়ারিং জুডাস* সবে বেরিয়েছিল। কিন্তু ক্রেন লেখায় অগ্রসর হতে পারছিলেন না; উন্মুক্ত ও প্রকাশ্য মদ্যপান আর রেড ইন্ডিয়ান বালকদের সাথে সমকামিতার কারণে তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। মেক্সিকোয় এই ধরনের যৌনতায় তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। তাঁর নিকট মনে হয়েছিল এ অভিজ্ঞতা স্বতঃস্ফূর্ত, মুক্ত ও আনন্দময়। রেড ইন্ডিয়ান বালকদের বহুগামী যৌনতাও তাঁকে আশ্চর্য করেছিল।

কিন্তু প্যাগি কাউলি ট্রাকসকোতে আসার পর, সারা জীবনে প্রথম বারের মতো, তিনি তার প্রেমে পড়েন। সম্ভবত ইন্ডিয়ান তরুণদের উভগামী যৌনতায় আকর্ষিত হয়েই, ক্রেন নারীপ্রেমে পড়েন যার অনুভূতি ছিল তাঁর কাছে "উপশমময়, প্রকৃত এবং বিশুদ্ধ"। তাঁরা একসাথে থাকার চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্পর্ক হয়ে উঠল ঝঞ্ঝাময়। উভয়েই ছিলেন প্রচণ্ড মদ্যপায়ী এবং প্রায়শই তুচ্ছ ও বিরক্তিকর বিষয়ে তারা মেতে উঠতেন। ক্রেন সবচেয়ে বেশি উন্মুক্ত হয়ে পড়তেন, ভেঙে ফেলতে চাইতেন হাতের কাছে যা পেতেন, যেন ধ্বংসের দেবতার নীল ক্রোধঝড়ে পড়তেন অস্বাভাবিকতায়। সে সময়ে ট্যাকসকোতে বসবাসরত কবি উইটার বায়নার তাঁদের দুজনের সংসার প্রত্যক্ষ করেন; তাঁর কথায়: "তাঁদের ঘরসংসার যে কাউকে পাগল করে দিত। যখন তাঁরা পরস্পর হিংসাত্মকভাবে ঝগড়া করতেন না, তখনও তাঁরা কাজের লোকদের সাথে হইহল্লা করতেন ...তাঁদের সারাক্ষণ কলহের পরিসমাপ্তি ঘটত হার্টের নিজের হোটেলে চলে যাওয়ার মাধ্যমে।" এরকম হইচইয়ের মধ্যে কিছু করা ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব। দুজনের ঝগড়া ক্রেনকে তাঁর পিতা-মাতার সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিত। তবু নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবার পর তাঁরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মেক্সিকোয় শেষ কয় মাস তিনি হয়ে উঠলেন ভাবোন্মাদ, নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাঁর রইল না। গোজেনহেইম ফেলোশিপের ব্যর্থতাও এর অন্যতম কারণ। কারণ মন্টেজমার ওপর মহাকাব্য লেখাও হলো না। কাউলির সাথে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কারণে তিনি ইন্ডিয়ান বালকদের প্রতি সমকামিতায় আরও ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু এই সমকামিতা তাঁকে আবার অপরাধী করে তুলল নিজের কাছে। এই অপরাধবোধই তাঁকে ঠেলে দিল মদ্যপান ও সমকামিতায় পুনর্বার। আত্মহত্যা করতে চাইলেন কয়েকবার, মিসেস কাউলির দুই বন্ধুর উপস্থিতিতে আয়োডিন পান করতে উদ্যত হলেন। আর একবার খেয়ে ফেললেন মারকুরোক্রোমের ছোটো এক বোতল। পাম্প করে পেট পরিষ্কার করে, সে-বার তাঁকে রক্ষা করা হলো। দন্ত চিকিৎসকের চেয়ারে বসে হার্ট ক্রেন ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফ উভয়েই লাভ করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা। লাভ করেছিলেন অতীন্দ্রিয় মায়াদর্শন। এই অভিজ্ঞতা ক্রেনের পরবর্তী সব কবিতাকে প্রভাবিত করেছিল যা ছিল মূলত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উল্লসিত এবং অলৌকিক মাহাত্ম্যপূর্ণ। বাস্তবতার কোনো রকম সন্নিকর্ষ নেই, বরং সুনিশ্চিত কতিপয় মুহূর্তময় বিশুদ্ধ উল্লাস এবং তার যথোচিত অতীন্দ্রিয় প্রকাশের কারণে মনোপ্রসারণ—এই ছিল দন্ত চিকিৎসকের অফিসে সুনিয়ন্ত্রিত গ্যাস গ্রহণের আপাত সংবেদনময় ফল। তাঁর রচনা "সাধারণ লক্ষ্য ও তত্ত্ব"-এ ক্রেন নতুন কাব্যকলাকে আখ্যায়িত করেন অনপেক্ষবাদ বলে, আর এই অনপেক্ষবাদী ও প্রভাববাদী কবির তিনি পার্থক্য দেখান। তাঁর বন্ধু গোরহাম মানসনকে লেখা এক চিঠিতে, হার্ট ক্রেন, ডেন্টিস্টের অফিসে কী অভিজ্ঞতা ঘটেছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন "আচ্ছন্ন আর স্মৃতিবিলুপ্তির ঘোরে আমার মন সচেতনতার সপ্তম স্বর্গে উন্নীত হয়, সাত আকাশের মাঝে অস্মিতাময় নৃত্য শুরু হয়—আর উদ্দেশ্যময় স্বরের মতো কোনোকিছু আমাকে বলতে থাকে, "তুমি আছো উচ্চতম চেতনে। এটা ভাগ্যবানদের ভাগ্যেই ঘটে। এটাকেই বলা হয় প্রতিভা। এক ধরনের সুখ, উল্লসিত যেন আমি কেবল জানতে পেরেছি দুইবার এই প্রেরণা, যা আমার কাছে এসেছিল। আমি অনুভব করলাম দুটি বিশ্ব। আর তখনই...ও গোরহাম, আমি এক শাশ্বতের মুহূর্তকে জেনে ফেললাম।" এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা তাঁর "প্যাসেজ" কবিতায় প্রতিধ্বনিত, যেখানে উৎক্রমণ আর পতনের সমাপতন কবিতাটির প্রথম চার স্তবকে পরিকীর্ণ:

> যেখানে চিরহরিৎ বৃক্ষ আকাশকে করে বিভাজিত
> সেইখানে আমি শুনি সাগরের গান।
> পাহাড়ের নীল কেন্দ্রে
> ধরে রাখি মহৎ শৈশব।

ক্রেনের প্রিয় কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে ছিলেন ফরাসি প্রতীকবাদীরা। প্রধানত, বোদল্যের ও র‍্যাঁবোকে তিনি তাঁর পূর্বসূরি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। র‍্যাঁবোর প্রভাব ছিল প্রচণ্ড, "মাতাল তরণী"র অন্তর্গত যাত্রাই ছিল তাঁর পাথেয়। বাস্তব থেকে উড্ডয়নের এটাই ছিল তাঁর প্রস্থানভূমি। রূপক, প্রতীকের ব্যবহারে র‍্যাঁবোই ছিলেন ক্রেনের পরম কাঙ্ক্ষিত। শব্দের সাংগীতিক তাৎপর্য, ইঙ্গিতময়তা আর অন্বয়ের বিপর্যস্ত প্রয়োগের মাধ্যমে মায়াবী আবহ সৃষ্টিতে তিনি র‍্যাঁবোকেই শিরোধার্য করেছিলেন। মনে করতেন, চূড়ান্তে কবিতাকে স্থাপন করতে হয় তার কাঙ্ক্ষিত কক্ষপথে যার মাধ্যমেই সে পরিভ্রমণরত হবে মনের গহনলোকে। উচ্চতর সত্যের প্রতিধ্বনিকে খোঁজাই কবিতার উদ্দেশ্য। তাঁর ভাষায়: "এর (কবিতার) আহ্বান কখনোই পরিশোভন বা মনোরঞ্জনমুখী নয়, বরং এক চেতনাবস্থার দিকে, ব্লেইক কথিত সরলতা বা পরম সৌন্দর্যের দিকে। এ শর্তেই নতুন আঙ্গিক বা আধ্যাত্মিক আলোকনকে কবিতায় আবিষ্কার করা যায় যা অভিজ্ঞতা-উৎসারিত প্রয়োজনীয় এক ধরনের নৈতিকতায় সমুজ্জ্বল, কখনোই তা পূর্বতন নীতি বা পূর্বধারণাসম্ভূত হবে না।"

ক্রেন মনে করতেন কবিতা অবশ্যই তার [illegible] থেকেও বেশি মাত্রায় যোগাযোগ স্থাপন করে। একটি ভালো কবিতার পুরো চেতনা তার রূপকের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যৌক্তিকতার ওপর নির্ভরশীল এবং বস্তুত ক্রেন তাঁর কবিতায়, ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রতিধ্বনি ও শাশ্বতের ইশারা-উল্লাসকেই ধরতে চেয়েছেন এবং প্রকাশ যেন হয় আন্তরিক, দার্ঢ্য ও ধ্বনিমুখর তা-ও ছিল তাঁর কাব্যিক সম্প্রত্যয়। তাঁর জীবনীকারের ভাষায়, ক্রেনের কবিতা, "অভিজ্ঞতার শুধু বর্ণনা নয় যা পাঠককে পড়তে হবে বরং এক অব্যাহত অব্যবহৃত অভিজ্ঞতা যাতে পাঠকও সন্নিহিত..."। কবিতায় ক্রেনের অনুরোধ ও অনুমত কীভাবে আদৃত হয়েছিল অন্যদের মধ্যে? তাঁর কবিতার মূল্যায়ন ছিল একাধারে অনুগামী ও বিপরীতগামী। ইউজিন ও'নীল, ডিলান টমাস, লুইস সিম্পসন তাঁর কবিতায় উদ্বেলিত-উল্লসিত হয়েছিলেন। ইউজিন ও নীল ক্রেনের সমুদ্রবিষয়ক কবিতার বিমুগ্ধ পাঠক ছিলেন। ডিলান টমাস ও সিম্পসনও তাঁর কবিতার অকৃত্রিম অনুরাগী ছিলেন। "হার্ট ক্রেনের জন্য শব্দরাশি" নামক স্তবকমালায় ডিলান ক্রেনকে তুলনা করেন প্রাচীন রোমান গীতিকবি কাতুল্লুসের সঙ্গে। তিনি আরও বলেন, হার্ট ক্রেন "আমাদের সময়ের শেলি"। সময়ান্তরেও তাঁর এই মূল্যায়নের পরিবর্তন হয়নি। এর কয়েক বছর পর *প্যারিস রিভিয়ু*র এক সাক্ষাৎকারে তিনি ক্রেনকে দ্বিধাহীনভাবে তাঁর প্রজন্মের সবচেয়ে মহৎ লেখক বলে অভিহিত করেন এবং ক্রেনের কবিতার "বিশাল শক্তি" ও "অভিজ্ঞতার পূর্ণতার" বৈশিষ্ট্যকেও সদর্থক বলে চিহ্নিত করেন।

ক্রেনের বিরুদ্ধ সমালোচকদের মধ্যে ছিলেন আর. পি. ব্ল্যাকমোর, ইওডর উইনটার্স আর ক্রেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি অ্যালেন টেট। এদের সবাই ক্রেনের প্রতিষ্ঠা আর সামর্থ্যকে স্বীকার করতেন, কিন্তু ব্লেকমোর তাঁকে শব্দের কারিগর এবং অসমঞ্জস চিন্তক হিসেবে বাতিলও করেন। তাঁর মতে, ক্রেন একজন বাক্‌সর্বস্ব আত্মরতিমগ্ন দুর্বোধ কবি, যিনি শিল্পের জন্য শিল্পচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। উইনটার্সের মূল্যায়ন ছিল: ক্রেন এক আত্মসর্বস্ব হিস্টিরিয়াগ্রস্ত যুক্তিহীন ব্যক্তিত্ব, একজন ফাউস্টীয় ইন্দ্রিয়বাদী, যিনি মদ ও শব্দের নিগড়ে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন যার ফলে নবতর এবং মহৎ সংবেদে পৌঁছাতে পারেননি কখনও। যদিও উইনটার্সের মূল্যায়ন অনেকটা শুদ্ধবাদী ও নৈতিকতাগ্রস্ত, তবু তাতে ক্রেনের চরিত্রের এক বিশেষ দিকের মনস্তত্ত্ব উন্মোচিত হয়। উইনটার্স দোষারোপ করেন যে এমার্সন ও হুইটম্যানের বুদ্ধি ও মননবাদী ধারাকে ক্রেন বলেছেন "খারাপের উৎস" এবং "প্রেরণা পরিপন্থি"; ক্রেনের নিকট স্বয়ংক্রিয় মানুষ, আবেগ প্রেরণার অকৃত্রিম সৃষ্টিই ছিল আদর্শ। যুক্তিবাদী, বৌদ্ধিক পর্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে তিনি পছন্দ করতেন না। এতৎসত্ত্বেও, উইনটার্স ক্রেনকে মরমি সংবেদের কবি হিসেবে মূল্যায়িত করেছেন এবং তাঁকে "ভুল ধর্মের সন্ত" বলে আখ্যায়িত করেছেন। অ্যালেন টেটের মূল্যায়ন উইনটার্সের মূল্যায়নের মতো ভনিতাপূর্ণ ছিল না। তাঁর মূল্যায়ন ছিল সাবধানী ও সতর্কীকরণ ধরনের। তিনি মনে করতেন ক্রেনের প্রথম দিকের কবিতাই ছিল উৎকৃষ্ট। এ-সব কবিতার মধ্যে টেট "ভস্মাধারের জন্য প্রশংসা (প্রেজ ফর অ্যান আর্ন)"-কেই শ্রেষ্ঠতম বলে চিহ্নিত করেছেন। এই কবিতাটি, একটি হতাশার কবিতা যা তাঁর অধিকাংশ কবিতার পুনরুত্থান এবং মরমি রূপান্তর-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধারণাকে খণ্ডন করে। এই কবিতাটি সম্পর্কে অ্যালেন টেট তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন, সম্ভবত ক্রেন "তাঁর বিষয়ের এ রকম কর্তৃত্বপূর্ণ সম্পাদন আর দ্বিতীয়টি করতে পারেননি, কারণ আমার ধারণা, পরবর্তী সময়ে তিনি কখনোই জানতেন না কী ছিল তাঁর বিষয়...।"

পাঁচ.

এখন মাতাল হবার সময়!
সময়ের অসহায় দাস হওয়ার চেয়ে বরং হও মাতাল,
একটুও না থেকে অবিরল!
মদ, কবিতা অথবা উৎকর্ষ
যেটাই হোক তোমার পছন্দের।

বোদল্যের বলেছিলেন এই কথা। সেরিব্রাল উৎসারে এ রকমই ছিল তাঁর ওঙ্কারধ্বনি। হার্ট ক্রেন ছিলেন সুরাপায়ী—ছিলেন এক্ষেত্রে সীমাতিক্রমণকারী এবং ক্রমসম্প্রসারণশীল। ভাব, আঙ্গিক এবং বোধন এসব বিবেচনাতেই তিনি মদ্যপানকে যথার্থ করেছিলেন। বরং মদ্যপানই ছিল তাঁর অপর অস্মিতা। মদ আর সমকামিতাই ছিল তাঁর একমাত্র দুর্মর জীবন সংরাগ। "দ্য ওয়াইন ম্যানেজারি" কবিতায় ক্রেন লিখেছেন, মদ "দৃষ্টিকে বিমুক্ত করে"। মদ্যপান এক অপার উচ্ছ্বাস আর বিমোক্ষণ ঘটায়, প্রতিদিনের একঘেয়েমি থেকে রক্ষা করে। আকণ্ঠ পান করে তিনি ভুলে যেতে চান যৌবনের বেদনাগুলোকে, বিস্মরণে পাঠাতে চান তাঁর পিতা-মাতার উৎকণ্ঠাময় বিষাদ আর যৌন দ্বন্দ্বকে। কখনও নেশাঘুম থেকে জেগে মনে হয় মৃত্যু তাঁর শরীরে ঢুকছে। তিনি আবিষ্কার করেন সিস্টোল আর ডায়াস্টোলের মাঝখানে ক্ষণিকের নিদ্রাকে, আর নিজ মৃত্যুর আভাসকে। হঠাৎই বেড়ে যায় হৃদ্‌কম্পন, যেন চাকার স্পোকের ঘূর্ণন। একইভাবে সমকামিতাকে আবিষ্কার করেন পিতার রিরংসা আর মাতার দুর্দশা থেকে রক্ষার উপশম হিসেবে। ওহিওতে প্রথমবারের অভিজ্ঞতার আগে তা ছিল তাঁর কাছে এক অপ্রস্তুতকর বিষয়, কিন্তু প্রথম অভিজ্ঞতাই হয়েছিল যেন বিস্ময়কর। মদ আর যৌনতা ছিল যেন অপার্থিব অভিজ্ঞতার ফটকদ্বার।

হার্ট ক্রেনের আত্মহত্যা মনে করিয়ে দেয় চীনের বিখ্যাত গীতি কবি লি-পোর কথা। কিংবদন্তি অনুযায়ী লি-পো তাঁর মৃত্যুর রাতে আকণ্ঠ মদ্যপান করে চাঁদের উদ্দেশ্যে কবিতা পড়তে থাকেন। ইয়েলো নদীতে প্রতিফলিত চাঁদকে ধরতে গেলেন জলে, আর ডুবে গেলেন। একটি ডলফিন তাঁর মৃতদেহকে পিঠে বহন করে নিয়ে গেল অমর্ত্যলোকে। হার্ট ক্রেনের মৃত্যুর সাথে আর একজনের আত্মহত্যার মিল পাওয়া যায় তাঁর আঙ্গিক ও প্রকরণে? তিনি হলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান ভাষার বিখ্যাত কবি পাউল সেলান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছয়.

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে ক্রেন ও কাউলি সমুদ্রপথে মেক্সিকো থেকে যাত্রা করলেন। সমুদ্র-ভ্রমণও হয়ে উঠল পারস্পরিক ঝগড়া আর সংঘর্ষে তিক্ত। সে সময় জাহাজের এক কর্মীকে উত্ত্যক্ত করার জন্য তাঁকে মার দেওয়া হলো। ২৭ এপ্রিল কাউলির কথায় ক্রেন গভীরভাবে মর্মাহত হন। জাহাজের রেলিং থেকে ঝাঁপ দিয়ে সাগরে পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন কিন্তু একজন স্টুয়ার্ড তাঁকে বিরত করে ধরে এনে কেবিনে আটকে রাখে। এর পরের কয়েক ঘন্টা তিনি আকণ্ঠ মদ্যপান করলেন আর হয়ে উঠলেন আসব দেবতা বাক্কাস। মধ্যাহ্নে, কেবিন থেকে বের হয়ে, পাজামা ও ওভারকোট পরে কাউলির ক্যাবিনে যান। কিন্তু কাউলি তাঁকে নিজ কক্ষে ফিরে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজের উপযুক্ত পোশাক পরে আসতে বললেন। ক্রেন তখন তাকে বললেন, "আমি তা করতে যাচ্ছি প্রিয়তমা, আমি খুবই দুঃখিত।" কাউলি আবার তাঁকে অনুরোধ করলেন রুমে গিয়ে সঠিক পোশাক পরে আসতে। হার্ট ক্রেন তখন বললেন, "ঠিক আছে প্রিয়তমা, বিদায়।" কাউলিকে চুমো দিয়ে ক্রেন রেলিঙে উঠে বসেন আর সমুদ্রে গলিয়ে দেন নিজেকে। মুহূর্তের মধ্যেই সমুদ্রের গভীরে হারিয়ে যান এই আধুনিক বাক্কাস তাঁর সুরা, নৃত্য আর উন্মত্ততাকে পেছনে রেখে। জীবনরক্ষী আর জীবনতরীরা ছিল সচল, কিন্তু দুই ঘণ্টার অক্লান্ত প্রচেষ্টার পরও খালি হাতে ফিরতে হলো তাদের। তারা ফিরে আসল।

তেত্রিশতম জন্মদিনটি, তিনি, আধুনিক সময়ের বাক্কাস, উদ্‌যাপন করেছেন সমুদ্র দেবতা প্রোতিয়োসের সঙ্গে। হ্যোল্ডারলিনের ভাষায়, নিশ্চয়ই, তাঁর, "বাক্কাসের মতো আছে জয় করবার অধিকার।"

আমি দাঁড়াব, মৃত্যুহীন শিখায় মোড়ানো—সত্যিকার প্রেমে

—ভ্লাদিমির মায়াকোভ্‌স্কি

তাঁকে বিংশ শতাব্দীর একজন বিতর্কিত ও কূটাভাসময় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রুশ কবিতায় তিনি বলতে গেলে আত্মবিনাশী এক মহীরুহ। সেই ভ্লাদিমির মায়াকোভ্‌স্কি তাঁর লেখালেখির শুরুর দিকে শহিদত্ব ও আত্মহত্যার ধারণায় ছিলেন আবিষ্ট। প্রথম দিকের অধিকাংশ কবিতার বিষয়ও ছিল আত্মভোগান্তি। কিন্তু কাটিয়ে উঠেছিলেন এই সম্মোহন বা হাতছানি। ধ্বংসাত্মক প্রবণতা ও নৈরাজ্যবাদ থেকে তিনি উপনীত হয়েছিলেন সাম্যবাদে। আলিঙ্গন করলেন বলশেভিক বিপ্লবকে। রুশ কবিতার ভিন্ন রীতির উদ্ভাবক এই কবি তাঁর নিজস্ব শৈলী ও আত্মগত বিষয় থেকে বেরিয়ে এসে হয়ে পড়লেন লেনিনের বিপ্লবের অন্ধ সমর্থক, হলেন কমিউনিস্ট তার্কিক। কিন্তু মৃত্যুর দু-বছর আগে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। ১৯৩০ সালে তিনি লিখলেন দুটি শ্লেষাত্মক নাটক, *ছারপোকা* আর *স্নানঘর*, যেখানে সোভিয়েত পদ্ধতির ব্যর্থতাকে ব্যাজস্তুতির আকারে প্রকাশ করলেন তিনি। একটি সর্বগ্রাসী ও একচ্ছত্রবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির বাঁচার দুর্দশাকে আঁকলেন তিনি, আর স্তালিনের আমলের সোভিয়েত-আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি ও গোলকধাঁধাময় অদক্ষতাকে করলেন উন্মোচন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বরিস পাস্তেরনাক মায়াকোভ্স্কির প্রথম দিকের কবিতাকে বলেছেন, "একেবারে পাকা ওস্তাদি কায়দায় লেখা কবিতা; গর্বিত ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এবং একই সাথে মুমূর্ষতায় অন্তহীনভাবে নিয়তিতাড়িত, প্রায়শই সাহায্যের জন্য আর্তিরত।" তাঁর কবিতার বিষয় ছিলেন তিনি নিজেই। ১৯১৫ সালে লেখা কবিতা "দ্য ব্যাকবোন ফ্লুট"-এ তিনি তাঁর জীবনকে দেখেন এক ধরনের উঁচু তারের প্রদর্শনী হিসেবে, যেখানে প্রয়োজন হয়ে পড়ে দর্শকের, যারা তাঁর মরণের নৃত্য দেখবেন। যুবক মায়াকোভ্স্কির ভেতর কাজ করেছিল গভীর বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছিন্ন, বিরূপ এই পৃথিবীতে তাঁর ভেতরের মৃত ও অসুখী অবস্থাকে তিনি অনিবার্য করে নেন তখন। মনে করতেন, "চেহারাহীন জনতা" ও "ষাঁড়সদৃশ জনতা"-র থেকে কোনো সহানুভূতি পাবার নেই তাঁর। এই ঘৃণা ও মনোভাবের প্রকাশ দেখি তাঁর "যেভাবে হলাম কুকুর" কবিতায়। মানুষের সাথে একাত্ম না হয়ে তিনি হয়ে যেতে চাইলেন একটি কুকুর, অন্য শিকারি কুকুরদের সাথে থাকতে চাইলেন, গড়তে চাইলেন তাদের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ। কারণ কুকুর হিংস্র, বন্য, পাশব হতে পারে কিন্তু ধাপ্পাবাজ নয় কখনোই। মানুষের মতো নয়, বরং তাদের আচরণ, উদ্দেশ্য এবং উৎসাহ সব সময় পরিষ্কার। তাঁর প্রথম দিকের একটি কবিতা "আ ওয়ার্ম ওয়ার্ড টু সার্টেন ভাইসেস"-এ আমরা দেখি, তিনি দুর্নীতি ও অসাধুতাকে হয়ত শ্লেষের ছলে প্রশংসা করছেন এবং অন্যের ভাগ মেরে খাওয়া লোকদের মাহাত্ম্যকে উদ্‌যাপন করছেন। যেহেতু তাঁর প্রথম দিকের স্বীকারোক্তিক কবিতাগুলো ছিল অতিমাত্রায় আবেগময়, সেজন্যই তিনি স্বীকার করেন যে অবসাদ আর অস্বস্তি ছিল তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা। যেহেতু তিনি ভুগছিলেন "আঁনুই" বা নির্বেদ থেকে, তাই একঘেয়েমিকে অতিক্রমণের জন্য তিনি সবকিছুই করতে পারতেন। ফলে যখন তাঁর বেদনা, ক্ষোভ আর ঘৃণা তীব্রতার উচ্চতায় পৌঁছাত তখনই তাঁর আবেগ ও অনুভূতিকে তিনি বিগড়ে দিতে পারতেন বলে বিশ্বাস করতেন। মর্ষকামিতা তাঁর ভেতরে ছিল প্রখর, যার কারণে কবিতায় কাল্পনিক যন্ত্রণাকে তিনি পরিসর করে দিতেন। প্রায় সবসময়ই হর্ষ আর উত্তেজনাকে অন্বেষণ করতে গিয়ে জীবন-বিতৃষ্ণ মায়াকোভ্স্কি পারস্পরিক ধ্বংসাত্মক প্রেমের অপসরণ ঘটাতেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত প্রেমটি ছিল সম্ভবত লিলি ব্রিকের সাথে। লিলি ব্রিক ছিলেন মস্কোর বিখ্যাত এক আইনজীবীর মেয়ে আর সম্পাদক ও সমালোচক অসিপ ব্রিকের স্ত্রী। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে তাঁদের দেখা হয় ব্রিকদের বৈঠকখানায়। ব্রিক-দম্পতির বৈঠকখানাটি কবি-লেখকদের পদচারণায় সবসময়ই থাকত মুখর, আর লিলি উপস্থিত আঁভা-গার্দদের মধ্য থেকে অচিরেই পেয়ে যেতেন তার গুণগ্রাহীদের, যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন মায়াকোভ্স্কি। কিন্তু বিপ্লবের আগ পর্যন্ত এ দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা হয়ে উঠতে পারেননি। সহৃদয় অসিপ ব্রিক মায়াকোভ্স্কিকে অনুমতি দিলেন তাদের অ্যাপার্টমেন্টে এসে বসবাস করতে। মায়াকোভ্স্কি শুরু করলেন সেখানে বসবাস, এমনকি ১৯২৩ সালে লিলির নতুন প্রেমিক জোটার কারণে যখন তাদের প্রেমের অবসান হলো, তারপরও তিনি সেখানে বসবাস চালিয়ে গেলেন। সম্পর্ক কেটে যাওয়ার পর, বাইরে ভ্রমণের সময়টাতে মায়াকোভ্স্কি লিলিকে চিঠি লিখতেন তার পুনরাগ্রহ সৃষ্টির অনুরোধ জানিয়ে, যদিও অন্য নারীর প্রতি ততদিনে তিনি আসক্ত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়েছিলেন। চিঠিতে তিনি লিলিকে সম্ভাষণ করতেন কিটেন বলে আর নিজেকে স্বাক্ষর করতেন পপি নামে। ১৯৫৮ সালে ব্রিক চূড়ান্তভাবে অনুমতি দেন মায়াকোভ্স্কির চিঠিগুলোর প্রকাশে। একজন চপলমতি ও শক্তহৃদয়ের ব্যক্তি হিসেবে লিলি ব্রিক মায়াকোভ্স্কির এইসব কাকুতিমিনতিতে ছিলেন একেবারেই না-পাত্তা দেওয়ার অবস্থানে। মায়াকোভ্স্কি তাঁর মৃত্যুর এক মাস আগেও লিলিকে পাঠিয়েছিলেন অনুনয়-বিনয় করা কয়েকটি টেলিগ্রাম। শেষটির বিপরীতে লিলি ফিরতি টেলিগ্রামে লিখলেন: "আমি তোমার গুরুত্বহীন টেলিগ্রামগুলো পেয়েছি...কিন্তু মোটেও বুঝতে পারছি না কাকে তুমি তা লিখেছো—আমাকে নয় নিশ্চয়ই... দয়া করে টেলিগ্রাম লেখার নতুন ভাষা রপ্ত করো।"

প্রেমের বহু আগে, বস্তুত ১৯১৫ সালে দুজনের দেখা হওয়ার ঠিক পর থেকেই, মায়াকোভ্স্কি লিলিকে কবিতা উৎসর্গ করা শুরু করেন। খুব স্বাভাবিক অনুভূতি থেকে তিনি তাকে কবিতার প্রেরণাদাত্রী দেবী করেননি, বরং তা ছিল তার প্রতি সুস্পষ্টভাবে অবজ্ঞাসূচক ও অবমানকর আরজি। লিলির সাথে দেখা হওয়ার কয়েক মাস পরে লেখা পূর্বাভাসসূচক "দ্য ব্যাকবোন ফ্লুট" কবিতায় মায়াকোভ্স্কি নিজেকে লিলি ব্রিকের প্রেমিক হিসেবে চিহ্নিত করলেন—ঘোষণা করলেন এমন এক প্রেমিক যাকে তাঁর প্রেমিকা ছেড়ে গেছে অন্য এক প্রেমিকের লোভে। নিজেকে ভাবলেন সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত একজন। লিলির পরিত্যাগ সত্ত্বেও তাঁর প্রেম বেঁচে রইল তবু। এ বলে তিনি আহ্লাদিত হতেন যে লিলির নাম তিনি এঁকে রাখবেন তাঁর পায়ের বেড়িতে, আর, "কঠোর পরিশ্রমের অন্ধকারে"। শপথ নিলেন পায়ের শিকলে বার বার চুম্বনের। "দ্য ব্যাকবোন ফ্লুট" এবং লিলিকে উদ্দেশ করা তাঁর প্রথম দিকের এমন আরও কিছু নারীবিদ্বেষী কবিতা, লিলির অনুমতি নিয়ে, তিনি সারা রাশিয়ায় পাঠ করে বেড়ান। নিজের এই বর্তমান অবস্থায় আত্মহত্যা করা দস্তুর কি না এই প্রশ্ন পুনঃপুন তুলে মায়াকোভ্স্কি সবাইকে ঘাবড়ে দিতে থাকেন। "দ্য ব্যাকবোন ফ্লুট" কবিতায় দেখা যায়, তিনি পিস্তলের ব্যবহার নিয়ে ভাবতে থাকেন। "মানুষ" কবিতায় তিনি লেখেন: "হৃৎপিণ্ড আকুলিবিকুলি করছে বুলেটের জন্য, আবার গলা উন্মুক্ত ক্ষুরের জন্য..."। যদিও তিনি তাতিয়ে উঠেছিলেন জীবন সমাপ্তির জন্য কিন্তু এ সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে অবশেষে প্রতিরোধ করেন। এর পরিবর্তে উপভোগ করতে থাকেন তাঁর কষ্টকে। তাঁর ভালোবাসা, তিনি সজোরে বললেন, অতিমানবিক এবং ঈশ্বর আর মহাবিশ্ব উভয়কেই স্থায়ী করবে:

যখন আমরা হব বিলুপ্ত,
ঝেঁটিয়ে দূর করা হবে আমাদের,
সে
যে কি না শেষ সূর্যের
ভালোবা[illegible]
শেষ সপ্তা[illegible]
নক্ষত্রের পা[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুড়ে হবে ছাই,
তারপর,
আমার ব্যথারা হবে তীক্ষ্ণ,
পাশে,
নীচে,
ওপরে—
আমি দাঁড়াব,
মৃত্যুহীন শিখায় মোড়ানো—
সত্যিকার প্রেমে।

একজন কেতাদুরস্ত মানুষ, সফল কবি ও নাট্যকার হওয়ার কারণে মায়াকোভ্স্কির নারীভক্তের কোনো অভাব ছিল না। জীবনে অনেককে পেয়েছেন প্রেমিকা হিসেবে, কিন্তু তিনি তাদেরই বেশি পছন্দ করতেন যারা ছিল লিলি ব্রিকের মতো দেখতে, অন্যভাবে বললে, যারা করতে পারত তাঁর ক্ষতি। তিনি নিজেও ছিলেন দস্তইয়েফ্স্কির *অপরাধ ও শাস্তি*র পঞ্চাশ বছর বয়স্ক অনৈতিক ও ইন্দ্রিয়াসক্ত জোতদার আরকাদি ইভানোভিচ স্‌ভিদ্রিগাইলভ-এর মতো, যার প্রতিটি কাজ ছিল লিবিডো তাড়িত।

১৯১৭ সালের আগে লেখা তাঁর বিখ্যাত কবিতা "দ্য ক্লাউড ইন ট্রাউজার্স"-এ মারিয়া নামের দুজন নারীর সাথে তাঁর সংঘাতময় জীবনের কথা বলা হয়েছে। মায়াকোভ্স্কি সেখানে নিজেকে শূলবিদ্ধ, জনতার দ্বারা পদস্পৃষ্ট, আগুনে তাড়িত আর ঝড়ে আক্রান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেন। ১৯২৬-এ রচিত *হাউ ডু ইউ ডু?* নামক এক ছায়াছবির চিত্রনাট্যে নারীর মৃত্যুতে মায়াকোভ্স্কি তাঁর প্রতিক্রিয়াকে অঙ্কিত করেন। ছবির নায়কের নাম মায়াকোভ্স্কি। দৃশ্যটি লেখক কর্তৃক অভিনীত। চিত্রনাট্যের শুরুতেই দেখা যায় কবি পত্রিকাতে প্রকাশিত তার প্রেমিকার আত্মহত্যার খবর পড়ছেন। আর্মচেয়ারে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে কবি পড়ছেন এই খবর। বালিকাটি হঠাৎ করে পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে জেগে ওঠে। সে একটি রিভলবার তার দেহের দিকে তাক করে। মায়াকোভ্স্কি এক লাফে তার কাছে গিয়ে ট্রিগার না টানার জন্য অনুনয় করেন, কিন্তু সে যে-কোনোভাবেই হোক গুলি করে বসে। গুলিতে পত্রিকার পাতা ছিন্ন হয়ে যায়। কাগজের ভেতর দিয়ে বুলেট এমনভাবে বেরিয়ে যায় যেন কোনো সার্কাসের কুকুর চাকা গলিয়ে বেরিয়ে গেল। মায়াকোভ্স্কি বিরক্তির সাথে পত্রিকাটিকে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলেন, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আবার চেয়ারে বসে পড়েন। তাঁর মুখ অবশেষে শান্ত হয়। তিনি বালিকাটির আত্মহত্যার ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যান, তার মৃত্যুকে নাটকীয়, বৃথা ও অহম্‌বাদী কৃতকর্ম বলে বাতিল করে দেন।

কবি হিসেবে প্রলেতারীয় বিপ্লবের মহত্ত্বকে গ্রহণের পর আত্মহত্যা বিষয়ে তাঁর দানাবাঁধা ধারণা ঋণাত্মকই হয়ে গিয়েছিল, বিশেষত প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আত্মহত্যা করার ক্ষেত্রে। *হাউ ডু ইউ ডু?* লেখার কয়েক মাস আগে ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সের্গেই এসেনিন আত্মহত্যা করলে তিনি খুব খারাপভাবে এসেনিনকে আক্রমণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে বসেন। এসেনিনের কবিতাকে প্রথম থেকেই তিনি খারাপ চোখে দেখতে থাকেন। ফাঁস দেওয়ার আগে এসেনিন শিরা কেটে রক্ত দিয়ে অস্পষ্টভাবে যে কবিতা বা আত্মহত্যালিপি লেখেন, তার শেষ সমাপ্তিপঙ্ক্তি ছিল পরিষ্কারভাবে এরকম, "এ জীবনে মরে যাওয়া কোনো নতুন বিষয় নয়/আর, সত্যিসত্যি বললে, বেঁচে থাকাও নয় অধিক কোনো নতুন বিষয়।" মায়াকোভ্স্কি তাঁর "সের্গেই এসেনিনের প্রতি" কবিতায় এসেনিনের এ কথাকে খণ্ডন করলেন। পরে এ ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, এ কবিতা লেখার পেছনে কারণ ছিল, "ইচ্ছাকৃতভাবে এসেনিনের শেষ পঙ্ক্তির উত্তেজনাকে অসাড় করে দেওয়া যাতে এসেনিনের জীবনসমাপ্তি অগ্রহণযোগ্য হয়; যাতে সহজ মৃত্যুর সৌন্দর্যের জায়গায় নতুন সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, যাতে শ্রমিকশ্রেণি কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি পায়... যেভাবে জীবন ও আনন্দকে গৌরবান্বিত করা যায়, যা এক কঠিন পথ—আর সে পথ হলো সাম্যবাদের।" নিজের লেখা কবিতাটিতে মায়াকোভ্স্কি এসেনিনের পঙ্ক্তিকে পুনর্লেখ করেন এভাবে: "এ জীবনে মরে যাওয়া সহজ/ কিন্তু জীবনকে নির্মাণ করা খুব কঠিন।" কিন্তু মহা আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ ঘটনার পাঁচ বছর পর এসেনিনের মতোই মায়াকোভ্স্কি নিজে তা ঘটান। এসেনিনের মতোই তিনি নিজেও রুশ সর্বগ্রাসী পদ্ধতিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, আর মৃত্যুর মাত্র কিছু দিন আগে এক অসম্ভাব্য প্রেমের ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়েন। এসেনিন-বিষয়ক তাঁর সকল আলোচনাতেই এসেনিনকে তিনি কিছুটা নিজ গুণসম্পন্ন সত্তা হিসেবে স্বীকার করেছেন। মায়াকোভ্স্কি নিজেও সবসময় ছিলেন মৃত্যুর সহজ সৌন্দর্যে মুগ্ধ মানুষ। শেষের দিকের তাঁর মন্তব্য যত গোঁড়াই হোক না কেন, তাঁর বুকের ভেতরে ছিল দুই সত্তার সংঘর্ষ: লজ্জাহীন আত্ম-প্রবর্ধক আর যৌনতা ও মৃত্যুতে আবিষ্ট মনমরা এক আত্মপ্রেমী। এক সাহিত্যিক উদ্ভাবক যে তাঁর অন্তর্গত জগতে মগ্ন, আত্মপ্রকাশে উচ্ছ্বসিত আর অপরত্বময় আজগুবি সাম্যবাদী ভাবাদর্শ, যার ভেতর রূপকল্পিত হয়েছিল এক হিতকর ও সমতাভিত্তিক পৃথিবীর স্বপ্ন। মায়াকোভ্স্কির সংগ্রাম ছিল ব্যক্তিগত হতাশা ও বিচ্ছিন্নতাকে জয় করে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধে উপনীত হওয়া, এক উচ্চতর সামগ্রিক শুভত্বের অন্বেষণ। সারা জীবনই তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়ার অলৌকিকত্বকে উপস্থাপন করেছেন। ক্ষোভ ও প্রেমের উৎকণ্ঠা নিয়ে উদ্‌ঘাটনমূলক কবিতা "ক্লাউডস ইন ট্রাউজার্স"-এ তিনি রুশ বিপ্লবের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। প্রেম পাননি, ফলে সমগ্র পৃথিবীকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন প্রেম, শিল্প, ধর্ম—সব ধ্বংস হোক। এমন এক সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি যখন সমাজের পাটাতন ধসে যাবে, দুর্গপ্রাকার টলতে টলতে পড়ে যাবে। এবং পুরো ব্যাপারটাকে তিনি বাইবেলীয় উত্থানের মতো, খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের মতো দেখেছেন। তিনি পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে বিপ্লব ঘটবে ১৯১৬ সালেই। ভুল করেছিলেন তিনি এক বছরের:

সময়ের পর্বত অতিক্রম করে,
যা কেউ দেখেনি তা-ই আমি অনুভব করি,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যখন মানুষের চোখ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়,
সেখানে, ক্ষুধার্ত যাযাবরদের মস্তিষ্কে,
আসে ১৯১৬ সাল
বিপ্লবের কণ্টক মুকুটে।

বলশেভিক বিপ্লবকে তিনি মনে করতেন তাঁর নিজের ও সমগ্র জগতের জন্য এক নতুন আরম্ভ। "মানুষ" কবিতায় তিনি লেখেন: "তোমাদের হাজার বছরের পুরোনো বিষয়ের আজ পতন হবে।/ আজ পৃথিবীর বুনিয়াদ ঝালিয়ে নেওয়া হবে।/ আজ,/ আঙ্‌রাখার শেষ বোতামটি থেকে শুরু করে সবার জীবন নতুনভাবে হবে রূপায়িত...।" মায়াকোভ্‌স্কি মনে করতেন, বিপ্লবের জন্য দরকার হতে পারে বড়ো ত্যাগের, এমনকি রক্তদানেরও। এজন্যই বলশেভিকদের বর্বরতা ও আতঙ্ক সত্ত্বেও তিনি সাম্যবাদী সরকারের প্রথম বছরের গণ্ডগোল ও হত্যাকাণ্ডকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তবে জারের পতনের পর লেনিনের নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্রের উত্থানে এক মানসিক ভারসাম্যহীনতার মুখোমুখি হন তিনি যা তাঁর জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। ১৯২০ সালের দিকে যদিও অনেকগুলো প্রচারধর্মী কবিতা তিনি লেখেন এবং প্রেমের কবিতাকে আক্রমণ করে বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু এটাই সত্য যে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি প্রেমের কবিতা লিখে যান। বিশের দশকের প্রথম দিকে বেশ কিছু স্মরণীয় কবিতা তিনি লেখেন লিলিকে উদ্দেশ করে, যাদের মধ্যে অন্যতম "আমি ভালোবাসি" (১৯২২) এবং "এ বিষয়ে" (১৯২৩)। ১৯২৮ সালে তিনি লেখেন কবিতা "কমরেড কসত্রোভকে প্যারিস থেকে লেখা প্রেমের প্রকৃতি-বিষয়ক চিঠি"। এ শেষ কাজটিতে মায়াকোভ্‌স্কি ঘোষণা দেন, বিষয় হিসেবে প্রেম সাম্যবাদ বা শ্রেণি-সংগ্রাম অপেক্ষা বেশি না হলেও সমানভাবে কার্যকর। কবিতাটি লেখার সময় তিনি প্যারিসে ভ্রমণরত ছিলেন, সেখানে ঠিক সে সময়ে তাতিয়ানা ইকোভ্লিয়ার প্রেমে মুগ্ধ তিনি, যা ছিল তাঁর জীবনের শেষ মহৎ প্রেম। ফরাসি সংস্কৃতির ওপর একটি প্রবন্ধ চাইলে তিনি প্রবন্ধের পরিবর্তে এ কবিতাটি সম্পাদককে পাঠিয়ে দেন।

মৃত্যুর তিন সপ্তাহ আগে "অবক্ষয়ী" সাহিত্যের বিরুদ্ধে তিনি শেষবারের মতো মুখ খোলেন। তাঁর বইয়ের এক প্রদর্শনীতে তিনি বলেন, "জীবন গঠনকারী রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসেবে নিজেকে না ভেবে কেন আমি পিটারের জন্য মেরির ভালোবাসা নিয়ে লিখতে মত্ত থাকব। এ প্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো... এই দেখাতে যে কবি এমন কেউ নন যিনি লোমবিশিষ্ট ভেড়ার মতো শুধু কামগীতির ভাব নিয়ে ভ্যা ভ্যা করে ডেকে যাবে, বরং এমন একজন, যিনি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি-সংগ্রামের সময়, প্রোলেতারীয় অস্ত্রভাণ্ডারে নিজ লেখনীকে সমর্পণ করবেন।"

বিপ্লবোত্তরকালে মায়াকোভ্‌স্কি নিজেকে চিহ্নিত করেন একজন লোক-দ্যাখানো ও পেতলের মুখবিশিষ্ট পালের গোদা বলে। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক মূল্য এবং উপযোগিতা না থাকলে শিল্প মূল্যহীন। আজীবন ছিলেন থিয়েটারে আগ্রহী, কিন্তু ১৯২০ সালে, তিনি সাংঘাতিকভাবে আগ্রহী হয়ে উঠলেন সিনেমায়, লিখলেন ডজন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খানেকের মতো চিত্রনাট্য। রাশিয়ান টেলিগ্রাফ এজেন্সিতে কাজ করবার সময় কার্টুন আর পোস্টারও আঁকলেন অনেক। এগুলো রাশিয়ার প্রধান প্রধান শহরে টাঙানো হয়েছিল। এগুলোতে রুশ সরকারি দোকান থেকে কেনাকাটা, রুশ ব্যাঙ্কের ওপর ভরসা রাখার কথা বর্ণিত থাকত। আরও বলা থাকত ফোটানো জল পানের কথা। এসব সামাজিক সচেতনতামূলক কাজকে কবিতা লেখার সমান প্রয়োজনীয় বলেই মায়াকোভ্স্কি ক্ষান্ত হতেন না, বরং আরও বলতেন যে এসব স্লোগানই তাঁর চমৎকার সব "শিল্প"কে সংগঠিত করেছে। এভাবেই তিনি হয়ে উঠলেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের অন্যতম চালিকাশক্তি। এজন্যই তাঁর "সোভিয়েত পাসপোর্ট" আর স্তুতিমূলক রচনা "ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন" মস্কো থেকে ভ্লাদিভোস্তক অবধি স্কুলে স্কুলে পড়ানো হতো। লেনিনের ওপর রচিত এলিজিতেও হতো সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সাফাই ধ্বনিত। তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, ইতিহাস সৃষ্টির তিনি একজন সাক্ষী। সবসময়ই নিজেকে তিনি একজন বিশাল মানুষ বলে ভাবতেন। তাঁর ছয় ফুটেরও অধিক লম্বা রুশ চাষির মতো অবয়বও এক্ষেত্রে এ ধরনের মনোপ্রবণতা তৈরি করার ইন্ধন জুগিয়েছিল বলে বোধ হয়।

ভ্লাদিমির মায়াকোভ্স্কি জর্জীয় গ্রাম বাগদাদিতে জন্মেছিলেন ১৮৯৩ সালে। তাঁর পিতা ছিলেন গরিব কিন্তু সম্ভ্রান্ত একজন রুশ, যিনি ছিলেন পেশায় বন-সংরক্ষক। যদিও মায়াকোভ্স্কি তাঁর পিতাকে বনে কাজ করার সময় সাহায্য করতেন কিন্তু তাঁর পিতার মতো তিনি কখনোই প্রকৃতপ্রেমী হয়ে ওঠেননি। একবার রাতে বনের ভেতর পিতার সাথে ঘুরতে গিয়ে দেখেন ধাতব তার জোড়া লাগাবার আলোকিত এক ফ্যাক্টরি, আর তা দেখে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েন। বিদ্যুতের এরকম বিশাল উৎপাদন ব্যবস্থা দেখার পর মানুষের উদ্ভাবন ও ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর ভেতরে ভিন্ন বোধের জন্ম হয়, এবং পরে তিনি স্বীকারও করেন যে এরপর প্রাকৃতিক জগতের ব্যাপারটা তাঁর কাছে ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। যৌবনে ঘৃণা করতেন বিদ্যালয়কে, প্রবেশিকা পরীক্ষার ওপরের স্তর পাস করতে পারেননি, কারণ ছিল প্রাচ্য অর্থোডক্স গির্জার পার্বণে অতিব্যবহৃত স্লাভীয় একটি শব্দ ভুল করা, ছিল একরকম উচ্চারণের জর্জীয় শব্দের জন্য। "আমার আমি" প্রবন্ধে তিনি এই ভুলের বিড়ম্বনা নিয়ে বলেন: "সব প্রাচীন, সব ধর্মীয়, সব স্লাভীয় বিষয়ে আমার ঘৃণা ধরে গেল। সম্ভবত এ থেকেই আমার ভবিষ্যদ্‌বাদ, আমার নাস্তিক্যবাদ, আর আমার আন্তর্জাতিকবাদের আবির্ভাব ঘটল।" বারো বছর বয়সের বালক তখন থেকেই বিপ্লবের ধারণায় তাড়িত হয়ে পড়েন এবং পিতার বন্দুক চুরি করে সোশাল ডেমোক্রেটিক রেডিক্যালদের হাতে তুলে দিতে লাগলেন আর স্থানীয় দলনেতা ও তাদের কার্যকলাপের বিশ্বস্ত দূত হয়ে নিজ ক্লান্তিকে ঝেড়ে ফেলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন।

পিতার মৃত্যুর পর পুরো পরিবার যখন চরম দুর্দশাগ্রস্ত, পনেরো বছরের কিশোর মায়াকোভ্স্কি গ্রাম ছেড়ে মস্কোতে চলে আসেন এবং বলশেভিক দলে যোগ দিয়ে রাষ্ট্রবিরোধী পুস্তিকা শ্রমিকদের হাতে তুলে দিতে থাকেন। এ অপরাধের জন্য ১৯০৮ সালে তাঁর এগারো মাসের কারাদণ্ড হয়ে যায়। কারাবাসের অভিজ্ঞতা কাজে লেগে যায়

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর। জেলে তিনি শেক্সপিয়র, বায়রন, আর তলস্তোয় পড়ে শেষ করেন। এই তিন মহান লেখকের মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে রাজনীতি ত্যাগ করে শিল্পের অভিপ্রায়ে মনোনিবেশের শপথ নেন তিনি। শুরু থেকেই তিনি অবশ্য মনে করতেন যে কী অসাধারণ কাজই না তিনি করছেন, আর এই তিন টাইটানকেও তিনি অতিক্রম করে যেতে পারবেন। নিজ আত্মজীবনীতে বড়াই করে তিনি বলেছিলেন: "আমার পড়া এসব লেখকেরা আসলে তথাকথিত বড়ো লেখক, কিন্তু তাঁদের চেয়ে ভালো লেখা কত না সহজ! পৃথিবী সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আমি সত্যিকারের এক দৃষ্টিভঙ্গি রপ্ত করেছি। দরকার কেবল শিল্পের অভিজ্ঞতা।" যদিও কবিতাই ছিল তাঁর প্রথম শৈল্পিক অন্বেষণ, তবু বিমূর্ত শিল্পকলায়ও তিনি হাত মকশো করেছেন। মস্কোর রাস্তায় একবার ভবিষ্যদ্‌বাদী চিত্রশিল্পী ডেভিড বারলিউকের দেখা পেলেন আর তাঁকে বললেন নিজের একখানা কবিতা পড়ে শোনাতে, যদিও তিনি ওই কবিতার স্বত্ব অস্বীকার করেছিলেন। বারলিউক কয়েক পঙ্‌ক্তি পড়েই কবির প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন এবং মায়াকোভ্‌স্কিকে প্রতিভাবান হিসেবে ঘোষণা করলেন। এ অভিজ্ঞতা বিষয়ে মায়াকোভ্‌স্কি লিখলেন: "এই বিশাল ও হঠাৎ প্রাপ্তি আমাকে অভিভূত করল। সেই সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই মনে হলো যে আমি কবি হয়ে গেছি।" মস্কোর শিল্প-সাহিত্যের সকল চক্রে বারলিউকের গমনাগমন ছিল এবং তিনি সর্বত্রই সময়ের প্রধান কণ্ঠস্বর হিসেবে মায়াকোভ্‌স্কিকে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। তিনি তাঁকে আখ্যায়িত করলেন, "আমার বন্ধু, মেধাবী, বিখ্যাত কবি মায়াকোভ্‌স্কি" হিসেবে।

লেখালেখির শুরুতে মায়াকোভ্‌স্কি নিজেকে শামিল করেছিলেন রুশ ফিউচারিজম বা ভবিষ্যদ্‌বাদী আন্দোলনের সাথে। মিলান থেকে মারিনেত্তি সূচনা করেছিলেন এ আন্দোলন, ১৯১০ সালে প্যারিস থেকে তিনি প্রকাশ করলেন *লা ফিউচারিজমে*। এ আন্দোলন ছিল রোম্যান্টিকবাদের ঘোর বিরোধী, প্রথাগত বুর্জোয়া মূল্যবোধ পরিপন্থি। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, প্রচলিত নৈতিকতা, ধর্ম, রাজনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে এ আন্দোলনের অবস্থান ছিল। চরমপন্থি ভবিষ্যদ্‌বাদীরা ব্যাকরণগত বাক্যবিন্যাস থেকে শুরু করে যতিচিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্তির পক্ষে অবস্থান নিতেন। রাশিয়াতেও লাগে এর অভিঘাত। আধুনিকবাদীদের মতো রুশ ভবিষ্যদ্‌বাদীরাও শিল্পে বিপ্লবাত্মক উত্থানকে কামনা করেছিলেন। ১৯১২ সালে মায়াকোভ্‌স্কি এ আন্দোলনের দলীয় ইশতেহারে স্বাক্ষর করেন। ইশতেহারে জোর দেওয়া হয়েছিল এ যাবৎ ব্যবহৃত রুশ ভাষারীতিকে প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে। সব লেখা, সব শৈলীকে ফেলে নতুন শৈলী অনুসন্ধানের বিষয়ে জোর দিয়েছিল এ আন্দোলন। কবির কাজ হবে ভাষাকে আবিষ্কার আর অবাধ এবং উদ্ভূত শব্দাবলি দিয়ে শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা। ভবিষ্যদ্‌বাদীদের হাতে অতীতের সব রুশ টাইটানই নাকাল হয়েছিলেন। পুশকিন, দস্তইয়েফস্কি, তলস্তোয় প্রমুখদের ছুড়ে ফেলে দেবার কথা আর আধুনিকতা থেকে ঝাঁপ দেওয়ার কথা বলেছেন ভবিষ্যদ্‌বাদীরা। অতীত সম্পর্কে মায়াকোভ্‌স্কি সব সময়ই ছিলেন ধৈর্যহীন ও নৈরাজ্যবাদী। পূর্বসূরিদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাদীদের কথাবার্তা অনেকটা অতিশয়োক্তি হলেও মায়াকোভ্‌স্কি

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক্ষেত্রে ছিলেন নরমে গরমে। মর্জিমাফিক কখনও ছিলেন ভক্তিপূর্ণ, কখনও বা বাতিলবাদী। তাঁর লেখায় অনেকেরই প্রভাব ছিল, বিশেষত পুশকিন, লেয়ারমন্তফ, গোগোল, দস্তইয়েফ্স্কি, এবং ব্লোক। কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উচ্চাসনে থাকা লেখকদের ধাক্কা দেওয়া ছিল তাঁর কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভবিষ্যদ্বাদীরা ভালোবাসতেন আঘাত ও ধাক্কা দিতে। ১৯১২ সালের এক ইশতেহারে উল্লেখ আছে যে ভবিষ্যদ্বাদীদের লক্ষ্য ছিল "বিরক্তি আর ধিক্কারকে জাগিয়ে তোলা"। তরুণ হিসেবে, ভবিষ্যদ্বাদীদের প্রচলিত দুরন্ততায়, মায়াকোভ্স্কিও নিজেকে জাহির করতে পছন্দ করতেন। একা বা অন্যদের সমভিব্যাহারে তিনি উদ্ভট পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করতেন, মুখে আঁকতেন রং, আর কবিতা পাঠ, চিত্রকলা প্রদর্শনী ও কনসার্টের বিঘ্ন ঘটাতেন। কারণ এসব অনুষ্ঠানের পবিত্রতা ভবিষ্যদ্বাদীদের উত্তেজিত করত। তাঁরা পছন্দ করতেন পথপার্শ্বে বা পার্কে জনতার ভিড়ে কবিতা পড়তে। স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের আচরণ অন্যদের বিরক্তি উৎপাদন করত। লেখক ইভান বুনিন এসব কারণেই মায়াকোভ্স্কিকে একজন পদ্যকার মাস্তান মনে করে বাতিল করে দেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথা *মেমোরিস অ্যান্ড পোর্ট্রেট*-এ মায়াকোভ্স্কির সাথে একবার এক ফিনিশীয় শিল্পকর্মের পেত্রোগ্রাদ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন: বুনিন, গোর্কি এবং ফিনিশ চিত্রশিল্পী আক্সেল গালেন সবে নৈশভোজে বসেন, এমন সময় মায়াকোভ্স্কি এসে একটি চেয়ার টেনে তাঁদের টেবিলের কাছে এনে পাশে বসে পড়েন এবং আঙুল দিয়ে তুলে তুলে তাঁদের খাবার খেতে থাকেন আর তাঁদের জন্য বরাদ্দকৃত পানীয়ের গ্লাস তুলে নিয়ে ওয়াইনে চুমুক দিতে থাকেন। গালেন এতটাই অবাক হন যে একটি কথাও তিনি বলতে পারলেন না। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে সকলকে আয়োজিত নৈশভোজে পানের আহ্বান জানান। মায়াকোভ্স্কি তখন উঠে মন্ত্রীর টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়ান। তারপর একটি খালি চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে মন্ত্রীকে বসে পড়ার জন্য চেঁচামেচি শুরু করেন। ফরাসি রাষ্ট্রদূত হস্তক্ষেপ না করা পর্যন্ত তা চলতেই থাকে এবং মায়াকোভ্স্কি হম্বিতম্বি করতে থাকেন। চেঁচামেচি চালিয়ে যেতে থাকেন মায়াকোভ্স্কি। তাঁর সাথে প্রদর্শনীতে আসা সাঙ্গপাঙ্গরাও তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল। তারা চিৎকার, হাততালি ও পা দিয়ে মেঝেতে আঘাত করতে লাগল যতক্ষণ না একজন ফিনিশ চিত্রকর তার আসন থেকে কান্না ও আর্তনাদ করে উঠল আর তার কম পুঁজির রুশ ভাষায় বলে উঠল, "অনেক হয়েছে! অনেক হয়েছে! অনেক হয়েছে!"

যাবতীয় শিশুসুলভ আচরণ সত্ত্বেও বোদ্ধাদের মুগ্ধ করার দারুণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। যখন তিনি তাঁর কবিতা পড়তেন, সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনত। শুধু মুগ্ধতা সৃষ্টিই নয়, প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন প্রতিভাবান। বরিস পাস্তেরনাক তাঁর স্মৃতিকথা *সেফ কনডাক্ট*-এ লিখেছেন, "প্রতিভার সাথে তাঁর মুখোমুখিতা কখনও কখনও তাঁর নিজেকে এমনই মুগ্ধ করত যে তা সব সময়ের জন্য তাঁর নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু হয়ে উঠত, আর কোনোরকম সহানুভূতি বা পরিমিতি ছাড়াই তিনি তাঁর সমগ্র সত্তাকে দিয়ে তাকে বাস্তব রূপ দিতেন।" জনতার সামনে কবিতা পড়ার সংরাগকে কখনোই তিনি ছাড়তে

~ www.amarboi.com ~

পারেননি। বলশেভিক বিপ্লবের কিছুদিন আগে, মস্কোর পথে পথে বা বিভিন্ন জনতাসংঘে মেগাফোন দিয়ে তিনি তাঁর কবিতা পড়ে শোনাতেন। তাঁর পরনে থাকত টপকোট আর মাথায় সিল্কের টপহ্যাট, হাতে থাকত সোনার বাটের সরু ছড়ি। ফুলের পরিবর্তে বোতামের গর্তে গোঁজা থাকত বড়ো একটা কাঠের চামচ।

আত্ম-প্রদর্শনপ্রিয়তা ছিল তাঁর জন্মগত বৈশিষ্ট্য, এ কারণেই হয়তো ছিলেন নাটকের প্রতি তীব্র আগ্রহী। তাঁর প্রথম নাটকটি হলো *ভ্লাদিমির মায়াকোভ্স্কি*, একটি ট্র্যাজিডি। এ নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯১৩ সালে সেন্ট পিত্রবুর্গে, আর প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন মায়াকোভ্স্কি স্বয়ং। এ নাটকটি বিশ বছর বয়স্ক কবিকে দিয়েছিল দুর্নাম ও সুনাম, যার জন্য তিনি ছিলেন প্রবলভাবে মুখিয়ে। এ নাটকে তাঁর প্রেমাধিক্য দারুণভাবে প্রকটিত। নাটকের শেষদিকে এক চরিত্র বলে যে, তার স্বপ্ন হলো বিশাল স্তনের, যাতে সমগ্র মানবজাতি তা চুষে খেতে পারে। তাঁর দ্বিতীয় নাটকটি হলো *মিসটারি-বুফে*, যা লেখা হয়েছিল বিপ্লবের উত্তাল দিনগুলোতে আর মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯১৮ সালে।

বিপ্লবের আগেভাগেই কবি ও নাট্যকার হিসেবে তিনি ছিলেন খ্যাতিমান, ফলে সাম্যবাদে তিনি যখন দীক্ষা নিতে চাইলেন, তখন তাঁকে খোলা মনে অভিবাদন জানানো হলো। দলে (যদিও কখনোই তিনি দলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেননি) তাঁর একজনই নিন্দুক ছিল, কিন্তু তা অতি শক্তিশালী একজন—ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। লেনিন ভক্ত ছিলেন রুশ ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যের, ফলে মায়াকোভ্স্কির মতো ভবিষ্যদ্বাদী লেখকদের জন্য ছিল না তাঁর সময়। তিনি মায়াকোভ্স্কির লেখাকে মনে করতেন বিভ্রান্তিকর ও অকার্যকর। প্রশ্ন পর্যন্ত তোলেন, তা কেন সরকারি প্রকাশনা থেকে ছাপানো হয়। তিনি মায়াকোভ্স্কির লেখাকে বর্জন করার কথা বলতে থাকেন এবং গণভোটে পাঠানোর মস্করাও করেন। অন্যদিকে ক্রত্স্কি মায়াকোভ্স্কির ভক্ত ছিলেন। তিনি মায়াকোভ্স্কির কিছু লেখাকে মর্মস্পর্শী ও মহৎ হিসেবে বিবেচনা করলেন এবং বললেন যে, মায়াকোভ্স্কি ভালোবাসাকেই বর্ণনা করেছেন যদিও তা হলো জাতির অভিপ্রয়াণ। নিজের মর্যাদার কারণেই ১৯২৮ সাল পর্যন্ত মায়াকোভ্স্কি দলের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। ১৯২২ সালের শুরুতেই তিনি সোভিয়েত আমলাতন্ত্রের সমালোচনা শুরু করেন এবং তা থেকে পরিত্রাণের জন্য আক্ষেপ জানাতে থাকেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আহ, সব কনফারেন্সের বিমোচনের প্রসঙ্গে আর ঠিক একটির অধিক কনফারেন্স।" সোভিয়েত কর্মকর্তাদের সাথে মাঝেমধ্যেই তিনি ঝাঁক দেখাতেন। ক্রত্স্কি তাঁর *সাহিত্য ও বিপ্লব* বইয়ের জন্য মায়াকোভ্স্কির সাক্ষাৎকার নিতে চাইলে মায়াকোভ্স্কি যথারীতি গণকমিশার দপ্তরে এলেন এবং সাহিত্য কোন পথে যাওয়া উচিত সে বিষয় বর্ণনা করলেন। ক্রত্স্কি তাঁর মতো করে ভিন্নভাবে মায়াকোভ্স্কির কথা বললেন এবং মায়াকোভ্স্কিকে তাঁর ভাবনা সম্পর্কে বলতে অনুরোধ জানান। মায়াকোভ্স্কি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জনপ্রিয় রুশ প্রবাদ "the first pancake falls like a lump"-এর অনুসরণে ব্যঙ্গ করে বললেন, "the first pancake falls like a People's Commissar"।

বিশের দশকের মাঝামাঝিতে সাহিত্যিক নিরীক্ষাধর্মিতার প্রশ্নে সোভিয়েত লেখকদের সমালোচনায় তিনি আক্রান্ত হলেন। তিনি ও তাঁর অন্য ভাবিষ্যদ্‌বাদী বন্ধুরা মিলে প্রতিষ্ঠা করলেন লেফ্‌ট ফ্রন্ট অব লিটারেচার (এলইইফ) নামক সংগঠন। নতুন বিপ্লবী ও প্রযৌক্তিক যুগের উপযোগী একটি লাগসই নতুন শিল্প আঙ্গিকের অন্বেষণে এ সংগঠন থেকে একটি প্রগতিশীল অতি মৌলিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হলো। সংগঠনটির সমালোচনাও হলো অতিমাত্রায়। ফলে বন্ধ হয়ে গেল পত্রিকাটি আর সংগঠনটির দপ্তরে তালা ঝুলল। এমনকি মায়াকোভ্‌স্কিও এই বন্ধ হওয়াকে রোধ করতে পারেননি। এলইইফ বন্ধ হওয়াতে মায়াকোভ্‌স্কি বিরাট আঘাত পেলেন এবং শুরু করলেন তাঁর পশ্চিমের ভ্রমণ। *কোমসোমোলোস্কায়া প্রাভদার* সাংবাদিক হয়ে তিনি পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মানি, মেক্সিকো আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করলেন। যেখানেই গেলেন, সেখানকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নিয়ে লিখলেন, আবার পুঁজিবাদী শোষণ ও সামাজিক অন্যায্যতার কথাও লিখতে পিছ-পা হলেন না। কিন্তু রুশ ছাড়া অন্য ভাষা না জানাতে তাঁকে নির্ভর করতে হলো তাঁর সঙ্গী দোভাষীর ওপর। যা-ই হোক, আমেরিকা ভ্রমণ তাঁকে উত্তেজিত করেছিল, আমেরিকার শহর মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। একজন ভবিষ্যদ্‌বাদী লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন শিল্পায়ন ও নগরায়নের সমর্থক কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল আমেরিকাতে তিনি দেখবেন এর নগ্ন রূপ। নিউ ইয়র্কে এসে তিনি হতচকিত হয়ে পড়লেন, নিউ ইয়র্ক তার জীবনচাপের কারণে তাঁর কাছে অরুচিকর বলে মনে হলো। নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, পিট্‌সবার্গ, এবং ডেট্রয়েট ভ্রমণের বিরাগ অভিজ্ঞতার কারণে পরবর্তী জীবনে তাঁর প্রযুক্তিগত চিন্তার পরিবর্তন হয়। ফলে আমেরিকা থেকে ফেরত আসার পর যান্ত্রিকীকরণ-সংক্রান্ত তাঁর সর্বান্তকরণ সমর্থন ঢিলে হয়ে যায়। তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনি *আমার আমেরিকা আবিষ্কার*-এ লেখেন যে ভবিষ্যদ্‌বাদের মোটেই কাজ নয় প্রযুক্তির স্তব করা, বরং মানবতার খাতিরে তাকে নিয়ন্ত্রণ করাই তার কাজ। অপ্রত্যাশিতভাবে আমেরিকা অপেক্ষা ফ্রান্সকে তাঁর মনে হলো অধিক গ্রহণযোগ্য। অপ্রত্যাশিত, কেননা এর আগে ফরাসি জাতি ছিল তাঁর ক্রমাগত শ্লেষের লক্ষ্যবস্তু। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২৩ সালে লেখা "প্যারিস" কবিতায় তিনি আইফেল টাওয়ারকে নিয়ে বলতে গিয়ে এর গঠনকে ব্যঙ্গ করে ফরাসি দেশের বিপ্লবকে উসকে দেওয়ার কথা বলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে শ্রমিকদের তাঁর পিছু পিছু মস্কোতে চলে আসার কথা বলেন, যেখানে তারা নষ্টভ্রষ্ট ফ্রান্স অপেক্ষা আরামে থাকতে পারবেন। আরও অনেক লেখায় ফরাসি মানুষকে তিনি অবক্ষয়ী, আত্মনিমগ্ন, ঐতিহ্যমুখী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তারপরও *আমার আমেরিকা আবিষ্কার*-এ আমেরিকার সাথে তুলনা করে ফ্রান্সের প্রশংসা করেন তিনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমেরিকা থেকে ফিরেই দেশপ্রেমের চিহ্ন হিসেবে তিনি লেখেন "ঘরে ফেরা!" কবিতা যেখানে স্তালিনের প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্পকে নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে তিনি সমর্থন করেন। একনায়কের প্রতি তাঁর এই দ্বিধাহীন সমর্থন অবশ্য শেষ পর্যন্ত বজায় থাকেনি। ১৯২৭ সালে আবারও এলইএফ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান, কিন্তু প্রলেতারীয় লেখকদের রক্ষণশীল সংঘ আরএপিপি-র বিরোধিতায় তাঁর এ প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। রুশ বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে ভবিষ্যদ্‌বাদীরা, ক্রুত্স্কিপন্থি হিসেবে ভর্ৎসিত হতে লাগলেন। এ সময়ই, ১৯২৮ সালে, মায়াকোভ্‌স্কি লিখলেন তাঁর শ্লেষাত্মক নাটক *ছারপোকা*। নাটকটি রচিত হওয়ার সময় তিনি প্যারিস ভ্রমণ করছিলেন। সেখানেই অষ্টাদশবর্ষী রুশ অভিবাসী তরুণী তাতিয়ানা ইয়াকোভলেভার সাথে তাঁর পরিচয় হয়। খুব তাড়াতাড়িই তিনি তার প্রেমে পড়ে গেলেন। কেতাদুরস্ত চিত্রকর আলেক্সান্দার ইয়াকোভলেভের ভাইঝি তাতিয়ানা ছিলেন সত্যিকারের সুন্দরী, লম্বা ও সুগঠিত। আর ভালোবাসতেন কবিতা যা আকৃষ্ট করেছিল মায়াকোভ্‌স্কিকে। কিন্তু তাতিয়ানার ছিল অনেক ভক্ত, ফরাসি সমাজে ছিল তার সাবলীল মেলামেশা। মায়াকোভ্‌স্কির ইচ্ছা ছিল ফরাসি অবক্ষয়ী সমাজ থেকে বের করে তাকে মস্কোতে নিয়ে আসা যেমনটা অতীতে তিনি চেয়েছিলেন আইফেল টাওয়ারকে নিয়ে আসতে। এক রাতে তিনি লেখেন "তাতিয়ানা ইয়াকোভলেভাকে লেখা পত্র" নামে একটি কবিতা যাতে তিনি তাকে বিয়ে করে মস্কো চলে আসার আকুতি জানান। লেখেন, "মস্কোতে তোমার মতো মানুষেরই আমাদের প্রয়োজন,/ কেননা সেখানে দ্রুতগামী মানুষের রয়েছে অভাব"। তাতিয়ানাকে ছাড়াই মস্কোতে ফিরলেন মায়াকোভ্‌স্কি। তাঁর অবস্থা খাপছাড়া আর হতবুদ্ধিকর। নাটক *ছারপোকা* শেষ করে তাঁর প্রথম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেই তিনি আবার ছুটলেন প্যারিসে। প্যারিস যেন তাঁকে প্রেমে ফেলে দিল। উঁচু সমাজ তাঁকে মুগ্ধ করতে লাগল। তাতিয়ানাকে নিয়ে তিনি ঘুরলেন সমুদ্রপারে। ঘোড়াদৌড় আর জুয়ার টেবিলে টেবিলে কাটতে লাগল তাঁর দিন। কিনলেন দামি স্যুট নিজের জন্য আর লিলি ব্রিকের জন্যও কিনলেন মূল্যবান পোশাক। ১৯২৯ সালের মার্চ, ভিসার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি রয়ে গেলেন ফ্রান্সে। তাতিয়ানাকে মস্কো ফিরে আসার অনুরোধ করে আবারও ব্যর্থ হলেন, বসন্ত আর গ্রীষ্মে তাতিয়ানাকে লিখলেন মিনতিভরা চিঠি। আরেকটি ভ্রমণ-ভিসার জন্য আবেদন করলে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তা না-মঞ্জুর করল। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে তিনি জানতে পারলেন যে তাতিয়ানা এক ফরাসিকে বিয়ে করেছে। রাগে-ক্ষোভে লিখতে শুরু করলেন তাঁর শেষ নাটক *স্নানঘর*, যা ছিল *ছারপোকার* চেয়েও সোভিয়েত পদ্ধতির বিরুদ্ধে অধিক আক্রমণাত্মক লেখা।

মায়াকোভ্‌স্কির শেষ দুটি নাটক ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ দার্শনিক নিকোলাই ফিয়োদোরোভ-এর চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা, যার একমাত্র বই *দ্য কমন কজ* এক প্রজন্মের রুশ লেখিকদের প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে। দস্তইয়েফ্‌স্কিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কারামাজোভ ভাইয়েরা লেখার সময় তাঁর চিন্তার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। ফলে তার ছাপও পড়েছিল ওই উপন্যাসে। ফিয়োদোরোভ মনে করতেন, মানুষ ইত্যবসরে মহাবিশ্বের সব রহস্য বুঝতে পেরেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইতিহাসের সমাপ্তি হলো মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের প্রভুত্ব। মানুষ শুধু দূরবর্তী নক্ষত্রেই ভ্রমণ করবে না, মৃত্যুকেও পরাজিত করবে এবং মৃতদের পুনরুত্থানও ঘটাতে পারবে। মায়াকোভ্স্কি তাঁর বন্ধু শিল্পী ভাসিলি চেকরিগিনের মাধ্যমে নিকোলাই ফিয়োদোরোভের চিন্তার সাথে পরিচিত হন। চেকরিগিন নিজেও ফিয়োদোরোভের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুনরুত্থান সিরিজের ছবি এঁকেছিলেন। এই গ্রন্থাগারিক দার্শনিকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক চিন্তা ভবিষ্যদ্‌বাদী মায়াকোভ্স্কিকে ভাবিয়েছিল, যার কারণে *ছারপোকা* ও *স্নানঘর* নাটকে তা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ছারপোকা নাটকটি সমালোচনার সাথে গৃহীত হলেও *স্নানঘর* দলীয় নেতাদের তাতিয়ে তুলল, সংবাদপত্রও নাটকটিকে এক হাত নিল। মায়াকোভ্স্কির সবচেয়ে বড়ো অপবাদকারী আরআপিপি-র মুখপাত্র ভ্লাদিমির এরমিলোভ *প্রাভদাতে* মায়াকোভ্স্কিকে ক্রুত্স্কিবাদী বলে চিহ্নিত করলেন। মায়াকোভ্স্কি এর প্রতিবাদে এরমিলোভকে বিদ্রূপ করে নাটকটির প্রদর্শনীর স্থান মস্কোর মেইনহোল্ডে ব্যানার টাঙিয়ে দিলেন। এরমিলোভ অভিযোগ করলে আরএপিপি ব্যানার সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিল। মায়াকোভ্স্কি বুঝলেন যে, তিনি ভুল অত্যাচারের সম্মুখীন হচ্ছেন। সংবাদপত্রে তিনি নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঠিক এ সময়েই তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ল। তাঁকে ক্রেমলিন হাসপাতালে ভরতি করানো হলো, সেখানে তাঁর স্নায়ুবিকলনের চিকিৎসা হলো। কয়েক দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে রুশ রুলেত খেলায় মেতে উঠলেন। লেখকেরা সব সময়েই হন দূরদর্শী। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তিনি বহিষ্কৃত হতে যাচ্ছেন। ১৯৩০ সালের ১০ এপ্রিল তাঁর এক বন্ধু মেইনহোল্ড থিয়েটারের লবিতে তাঁকে দেখতে পেয়ে জানালেন যে *প্রাভদায়* সম্প্রতি *স্নানঘর* নাটকের ওপর একটি সহানুভূতিময় সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। শুনে মায়াকোভ্স্কি বললেন, এখন তো বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। চার দিন পর, ১৯৩০-এর ১৪ এপ্রিল সকালে তিনি তাঁর রিভলবারে একটিমাত্র বুলেট ঢুকিয়ে নিলেন, সিলিন্ডার ঘোরালেন, তারপর নিজের হৃৎপিণ্ডের দিকে তাক করে ট্রিগার টানলেন। জীবনে তৃতীয়বারের চেষ্টায় সফল হলেন ছত্রিশ বছর বয়স্ক এই কবি, এর আগে দু-বার চেষ্টা চালিয়েও তিনি বেঁচে যান। খুব ভোরে কবি সেময়োন কিরসানোভ নিজ প্রয়োজনে মায়াকোভ্স্কিকে ফোন করে একজন দর্জির নাম জেনে নিয়েছিলেন। মায়াকোভ্স্কি তাঁর এ সহকর্মীকে বলেছিলেন যে আগামী দিন ওই দর্জির দোকানে তার সাথে দেখা করবেন। তিনি কথা রাখেননি। অতীতে, বন্দুকে কার্তুজ ঢোকানোর আগে তিনি জামা বদল করে নিতেন। পুরোনো রুশ প্রবাদ রয়েছে, মৃত্যুকে বরণ করতে হয় নতুন লিনেনে। আত্মবধের আগে টেবিলে রেখে গিয়েছিলেন কয়েক দিন আগে লেখা একটি চিঠি আর একটি কবিতা। কবিতাটি ছিল এরকম:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

''ঘটনার হলো সমাপ্তি।''
নিয়মরীতির বিপরীতে ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল
প্রেমনৌকা।
জীবনের কোনোকিছুর কাছে আমার নেই ঋণ,
পারস্পরিক আঘাত আর তুচ্ছতাচ্ছিল্যকে গুনে
কোনো লাভ নেই।

লিপিটি ছিল আত্মস্বীকৃতিসূচক, "সকলকে উদ্দেশ" করে তা বলা হয়েছিল:

> আমার মৃত্যুর জন্য কাউকে দোষারোপ করো না আর দয়া করে গুলতানি মেরো না। মৃতরা এ জাতীয় কাজকে অত্যন্ত অপছন্দ করে। মা, বোন, আর সংগ্রামী বন্ধুরা, আমাকে মাপ করে দিয়ো ...আরএপিপি-র সংগ্রমী সাথীরা—ভেবো না আমাকে দুর্বলচিত্তের। সত্যিই বলছি—এ ছাড়া আমি আর কী-ই বা করতে পারতাম। শুভকামনা সকলকে।

কী হতো যদি তিনি আত্মহত্যা না করতেন? ধরেই নেওয়া যায় যে তিরিশের দশকের সোভিয়েত নিপীড়নের তিনি হতেন অন্যতম ভুক্তভোগী। যেমনটা হয়েছিল তাঁর অনেক আপোসহীন বন্ধু ও সহকর্মী, যাদের অনেককে কারাবাস ও নির্বাসনে যেতে হয়েছিল। পরিহাস এই, লুঠতরাজের চলমান মোক্ষম সময়েই স্তালিন এ মৃত কবিকে সম্মান জানালেন, বললেন, "সোভিয়েত যুগারম্ভের সবচেয়ে সেরা ও মেধাবী কবি হিসেবে মায়াকোভ্‌স্কি ছিলেন এবং আছেন। তাঁর স্মৃতি ও কর্মের প্রতি উদাসীনতা এক অপরাধ।" একটি সাবওয়ে স্টেশনের নামকরণ হলো তাঁর নামে, এবং তাঁর দেহচূর্ণ আগের জায়গা থেকে তুলে এনে কবর দেওয়া হলো মস্কোর নোভো-দেভেচি গোরস্তানে, সেখানে করা হলো লাল-কালো মারবেল সৌধ। স্তালিনের হাতে মরণোত্তর উত্থান হলো তাঁর, ফলে তিনি পরিণত হলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের আইকনে। কিন্তু বরিস পাস্তেরনাক এ উত্থানকেই আবার বলেছেন মায়াকোভ্‌স্কির দ্বিতীয় মৃত্যু।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্ত্যভাষ

> সেই দুঃখ বহন করাই সবচেয়ে কঠিন যে দুঃখের কথা
> কখনও বলা হয়নি।
>
> **ফ্রান্সেস রিডলি হ্যাভারগাল**

জীবনাবসানের ব্যাপারটি যখন নিষ্পন্ন করার বিষয় হয়ে ওঠে, স্বেচ্ছাকৃত হয়, তখন স্বাভাবিক মৃত্যুর জায়গায় অন্য মৃত্যুধারণার সূত্রপাত হয়। কীভাবে আমরা মরি এই বিষয়টির দার্শনিকতা প্রাচীনকাল থেকেই চর্চিত। তবে বলা যায়, সেনেকাই প্রথম এ বিষয়ে ভাবেন এবং এতদ্‌বিষয়ক রচনা রেখে গেছেন। স্টোয়িক এই দার্শনিক ও রাষ্ট্রনেতাকে নিরো যখন আত্মহত্যা করতে বলেন, তখন তা করার জন্য তিনি শরীরের শিরা চিরে ফেলেন। তাঁর *মোরাল লেটারস টু লুসিলিয়ুস*-এর ৭০-সংখ্যক পত্রে তিনি বন্ধনমুক্তির জন্য যথার্থ সময়কে বিবেচনার কথা বলেছেন। বেশ কিছু রচনায় সেনেকা মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর চিন্তার কথা লিখে গেছেন যার মর্ম হলো: ১. মৃত্যু খারাপ, ২. আগে মরার চেয়ে পরে মরা ভালো, ৩. স্বল্প জীবনের চেয়ে দীর্ঘ জীবন ভালো, এবং ৪. মৃত্যু হচ্ছে এমন এক ব্যাপার যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, বরং তা ঘটে।

সেনেকার এসব চিন্তা আমাদের কাছে মনে হবে আমাদেরই চিন্তা। কিন্তু তিনি আবার যা বলেছেন তা আশ্চর্যজনক:

> বেঁচে থাকা মানেই ভালো কিছু নয় বরং ভালোভাবে বাঁচতে হবে। জ্ঞানীরা এজন্যই যতদিন বাঁচা উচিত ততদিন বাঁচেন, যতদিন বাঁচা যায় ততদিন বাঁচেন না। তিনি ভেবে দেখবেন কোথায়, কার সাথে, কীভাবে বাঁচবেন, আর কী তার করতে হবে। জীবনকে তিনি সবসময়ই উৎকর্ষের দিক থেকে বিবেচনা করবেন, পরিমাণের জায়গা থেকে নয়। যদি তিনি নানা ধরনের জ্বালাযন্ত্রণার সম্মুখীন হন যা তার প্রশান্তিকে বিঘ্নিত করে, তাহলে তিনি নিজেকে জীবন থেকে মুক্ত করবেন। তিনি শুধু চরম জরুরি পরিস্থিতিতেই তা করবেন না, বরং যখন নিয়তিকে সন্দেহ করা শুরু করবেন ও নিজেকে যাচাই করে দেখবেন তা করা উচিত কি না, তত তাড়াতাড়িই করবেন। ...আগে বা পরে মরা কোনো বিষয় নয়, বিষয় হলো ভালো বা খারাপভাবে মরা। ভালোভাবে মরা মানে খারাপভাবে বাঁচার বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> একটি জাহাজ যেমন আমাকে নিয়ে চলে যায় বা একটি ঘরে আমি বসবাস করি, তেমনি জীবন থেকে মুক্তির জন্য আমি মৃত্যুকে পছন্দ করি। অধিকন্তু, দীর্ঘায়িত জীবন যেমন প্রয়োজনীয়ভাবে ভালো কিছু নয়, তেমনি দীর্ঘায়িত মৃত্যুও ভালো কিছু নয়... একজন মানুষের জীবন যেমন অন্যদের সন্তুষ্ট করে, তার মৃত্যুও তার নিজেকে সন্তুষ্ট করে, আর মৃত্যুবরণের যে ধরন তিনি পছন্দ করেন তা-ই শ্রেষ্ঠ।

স্টোয়িক এই দর্শন আমাদের এ-ই বলে যে, জ্ঞানীরা নিজেদের মৃত্যুর দিনক্ষণ ও ধরন নিজেদেরই নির্ধারণ করা উচিত। খারাপ মৃত্যুতেও আমাদের আপত্তি থাকা উচিত নয়, কিন্তু আমাদের উচিত উত্তম মৃত্যুকে নিশ্চিত করা। যে মৃত্যুর ধরনটি সেনেকা ইঙ্গিত দেন, তা বোঝায় আত্মহত্যা বা সময়োপযোগী আত্মত্যাগ। সেনেকা বলেন যে, এ ধরনের মৃত্যু জীবনের কোনো সংক্ষিপ্তকরণ তো নয়ই বরং পূর্ণতা। এটা জীবনের কোনো কাটছাঁট নয়, বা নয় কোনো অপূর্ণতা, কারণ কল্পিত জীবন তো যাপিত হয়নি। আবার কাটছাঁট হলেও তা পূর্ণ, যদি তা শুভভাবে যাপিত হয়ে থাকে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ হলো মহৎ জীবন, দীর্ঘ জীবন নয়। তার মানে, জীবনকে নিষ্পন্ন করার মুহূর্ত যে-কোনো সময়েই আসতে পারে।

এটাই স্টোয়িক ধারণা। কিন্তু যা সেনেকা বলেছেন, তার বাইরেও বিবেচনা আছে যা স্টোয়িকেরা বলেননি। একজন আত্মহত্যা করলে তার কিছু যায়-আসে না, কিন্তু অন্যের যায়-আসে। আত্মহতের স্বামী/স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তানদের ওপর যে অভিঘাত নেমে আসে, ঘটনা ঘটার পর তাকে বিবেচনায় আনতেই হয়। সহকর্মীদের ক্ষেত্রে বা যৌথ-মূলধনী কারবারে, প্রকল্পে বা সমবায়ে এ ধরনের আত্মহত্যা সৃষ্টি করে ব্যাপক সমস্যা। সমাজে তা সৃষ্টি করে মানসিক স্বাস্থ্যগত অবক্ষয়। সামাজিক পছন্দপ্রক্রিয়ায়ও দেখা দেয় অভারসাম্য। যে-সমস্ত লোক দুর্বল ও সহজেই ভেদ্য, আত্মহত্যার ঘটনায় তারা তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে। কেউ মারা যায়, কেউ বা অসুস্থ হয় যা প্রকারান্তরে সামাজিক ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। কোনো সমাজের কিছু নৈতিক নিয়মকানুন থাকলে আত্মহত্যা তাকে ক্ষুণ্ন করে। আবার ধর্মীয়ভাবে তা অনৈতিক হলে এক্ষেত্রে দেখা দেয় অসম্বদ্ধতা। সেনেকা এসব কিছুকে বিবেচনা করেননি, কিন্তু এখন তা এসেই যায়। আর তখনই শুরু হয় সামাজিক-অর্থনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান। সেনেকা ও তাঁর অনুচিন্তকেরা ভেবেছেন ইচ্ছামৃত্যুর কথা—ঠিক সময়ে, ঠিক কারণে। কিন্তু খ্রিস্টান অনুশাসকেরা বলেছেন, যেখানে মৌলিক ধর্মীয় আইন বলবৎ, সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবনের অবসান ঘটানো পাপ। তার মানে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় মৃত্যু আসবে ও ঘটবে। এর আলোকেই সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস অবতারণা করেন আত্মহত্যার অনৈতিকতার। তিনি তাঁর বিখ্যাত *সাম্মা থিয়োলজিয়া* গ্রন্থে বলেন:

> নিজেকে হত্যা করা তিনটি কারণে মোটের ওপর অন্যায়। প্রথমত, প্রত্যেকেই নিজেকে ভালোবাসে, সুতরাং সবারই উচিত নিজেকে সত্তাতে প্রযুক্ত রাখা এবং যতটা পারা যায় তার অবক্ষয়কে রোধ করা। অতএব, নিজেকে মারার অর্থ প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ, এবং নিজেকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> ভালোবাসার মতো মহানুভবতার বিরুদ্ধে কাজ। সুতরাং আত্মবধ সবসময়ই এক প্রাণঘাতী পাপ, অধিকন্তু তা প্রাকৃতিক নিয়ম ও মহানুভবতার পরিপন্থি।
>
> দ্বিতীয়ত, প্রতিটি বস্তুই এক সমগ্রের অংশ, প্রতিটি মানুষই গোষ্ঠীর অংশ এবং সম্প্রদায়ও সে-রকমই। অতএব, নিজেকে হত্যা করে ওই ব্যক্তি আসলে সম্প্রদায়কেই আক্রান্ত করে...
>
> তৃতীয়ত, জীবন হলো ঈশ্বরের, "যিনি মানুষকে বাঁচান বা মারেন", ক্ষমতার আওতায় মানুষকে প্রদত্ত এক পরমার্থিক উপহার। অতএব, জীবন থেকে যে নিজেকে বঞ্চিত করে, সে ঈশ্বর-অবাধ্যতা-সংক্রান্ত পাপ করে... জীবন ও মৃত্যুর ওপর কর্তৃত্ব একমাত্র ঈশ্বরের...

অ্যাকুইনাসের যুক্তির ধর্মীয় দিকটি বাদ দিলেও তাতে রয়ে যায় আত্মহত্যার বিরুদ্ধে প্রাণযুক্তি। জীবন এক উপহার—এই ধারণাকে অস্বীকার করলেও এটা সত্যি যে অস্তিত্ব এক প্রপঞ্চ যা যতটুকু না স্বাধীন তার চেয়ে বেশি পরাধীন। এই পরাধীনতা সত্তাতাত্ত্বিক। সুতরাং জীবনের অবসান তার মুসকিল-আসান নয় বরং তা সৃষ্টি করতে পারে ঘটনোত্তর-সমস্যার। পশ্চিমের তাত্ত্বিক-দার্শনিকেরা এজন্যই আত্মহত্যা-সমস্যায় দ্বিমুখী অবস্থান করেছেন। ডেভিড হিউম নিয়েছিলেন পক্ষে অবস্থান আবার কান্ট তাকে বাতিল করেছেন। লেখক দ্য স্তাইল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আত্মহত্যার স্বাধীনতার পক্ষে যেমন কলম ধরেছিলেন, তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মন পরিবর্তন করে ধর্মীয় যুক্তিতে আত্মহত্যার বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করেন। নিট্‌শে ছিলেন আবার স্বেচ্ছামৃত্যুর পক্ষে। কখনও কখনও স্বাধীন ও সুচিন্তিত মৃত্যুর প্রয়োজনের কথা তিনি বলেছেন। শোপেনহাওয়ারের মত ছিল সতর্কতামূলক। দ্যুরক্‌হাইম আত্মহত্যাকে নৈতিক বিষয় না ভেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত সমস্যা হিসেবে ভেবেছেন।

নৈতিকতাকে যদি আমরা ধরি শুভত্বের উপস্থিতি, তাহলে আত্মহত্যার সাথে তাকে মিলিয়ে দেখাটা অনেকের কাছে বড়োমাত্রায় গোলমেলে বলে মনে হবে, যদি না আত্মহত্যা হিতকারী হিসেবে দেখা দেয়। সুতরাং প্রথমে দেখতে হবে আত্মহত্যার ভালো-মন্দ কীভাবে লুকিয়ে আছে ব্যক্তি ও সমাজের মনস্তত্ত্বে। আত্মহত্যা যদি ভুল হয় এবং চিরতরে ভুল হয় বা গভীরভাবে নৈতিক ভুল হয় তাহলে আমরা বলতেই পারি যে নৈতিক বিবেচনা এখানে প্রধান হয়ে উঠবেই। কিন্তু যদি আত্মহত্যা কখনও কখনও ভুল না হয় এবং কখনও বা ক্ষমার্হ হয় বা হয় নৈতিকভাবে অনুমোদনীয়, তাহলে নৈতিকতা ও আত্মহত্যার বিষয়টি হয়ে ওঠে আপেক্ষিক ও সম্পর্কবিচারসাপেক্ষ। আত্মহত্যা কি শুধুই ব্যক্তিক কাজ নাকি সামাজিক, এবং তা কি শুধু ব্যক্তির ইচ্ছাতেই সীমাবদ্ধ নাকি মনোশারীরিক কারণের ফল তা, এসব বিষয় নানাভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে প্রপঞ্চটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। ব্যক্তিক স্বাধীনতার সাথে আত্মহত্যার সম্পর্ক কোনো নতুন বিষয় নয়, এবং প্রাচীনকাল থেকেই এ কাজকে পবিত্র দায়িত্ব বলেও অবহিত করা হয়েছে। আত্মহত্যা-বিষয়ে উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ, পাপ-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুণ্যসংক্রান্ত বাস্তব ও আধুনিক বিতর্কগুলো অন্তিম ও দুরারোগ্য অসুস্থতার ক্ষেত্রে ইউথানেজিয়া বা চিকিৎসক-সহায়ক আত্মহত্যা, সামাজিক বিদ্রোহের ক্ষেত্রে আমরণ ধর্মঘট, আত্মবলি ও শহিদত্ব, ধর্মীয় এবং আচারভিত্তিক অনুশীলনগত মৃত্যু, সম্মান ও আনুগত্যজনিত আত্মহত্যা, আত্মঘাতী হামলা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে গড়ে উঠেছে।

মৃত্যু ও মরতে বসা বিতর্কে চিকিৎসক-সহায়ক মৃত্যু বা ফিজিশিয়ান অ্যাসিসটেড ডায়িং-এর যৌক্তিকতা নিয়ে ইদানীং ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। চিকিৎসক-সহায়ক মৃত্যুর আওতায় সংঘটিত ইউথানেজিয়া বা আত্মহত্যার ক্ষেত্রে পাঁচটি কেন্দ্রীয় যুক্তির অবতারণা করা হয়—দুটি পক্ষে আর তিনটি বিপক্ষে। পক্ষের যুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে আত্মসিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা এবং কষ্ট ও ভোগান্তি থেকে মুক্তির করুণা-সংক্রান্ত যুক্তি। অন্যদিকে বিপক্ষের যুক্তির মধ্যে অন্যতম হলো হত্যার অন্তর্নিহিত অন্যায়বোধ, চিকিৎসা পেশার সততা ও অপব্যবহারের আশঙ্কা যাকে বলা হয় slippery-slope argument। যে নৈতিক চিন্তাটি বারে বারে উঠে আসে তা হলো, মৃত্যুগামী রোগীকে সাহায্য করতে চিকিৎসক বাধ্য কি না।

বিবেচনা উঠে এসেছে যে, এসব ক্ষেত্রে মৃত্যু নৈতিক দিক থেকে কতটুকু গ্রহণীয়। বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে, বিশেষত পশ্চিমে ও তার উপনিবেশে, আত্মহত্যাবিষয়ক চিন্তাভাবনা আদর্শগতভাবে অনেকটাই একই প্রস্তরে উৎকীর্ণ। জনসাধারণ থেকে শুরু করে চিকিৎসক, মনোবিশারদ, সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিক, ধর্মীয় মানুষদের কাছেও প্রতিভাত হচ্ছে যে এটা ঘটার পেছনে রয়েছে বৈজ্ঞানিক কারণ। বিশেষত জৈবিক ও বংশগত উপাদান, সামাজিক উদ্বিগ্নতা, ব্যর্থতা, হতাশাগত চরম অবস্থা প্রভৃতি থেকে ঘটে আত্মহত্যা যেগুলো প্রতিকারযোগ্য। দুরারোগ্য রোগের অন্তিম অবস্থায় যে ধরনের আত্মহত্যা বা জীবনাবসান ঘটে, যাদের বলা হয় "মৃত্যুকালীন সহায়তা" বা "মানসম্মত মৃত্যু" তা-ও এখনকার আত্মহত্যাবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হয়ে গেছে।

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে এসব কারণে সাইকোথেরাপি বা উন্নত আত্মহত্যা-নিবারক কর্মসূচি, বা হতাশারোধী অধিক কার্যকর ওষুধ আবিষ্কারের মাধ্যমে আত্মহত্যাকে প্রতিরোধের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পদ্ধতি বের করা হচ্ছে। বস্তুত আত্মহত্যা পুরোপুরিই একটি বিয়োগান্তক ঘটনা যেখানে এর কারণগুলো, যথা মানসিক অসুস্থতা বা হতাশা অনেক সময় এক খেলা। যা-ই হোক, ঐতিহাসিক ও প্রতি-সাংস্কৃতিক চিন্তনের মাধ্যমে আত্মহত্যার রহস্যকে অধিকতরভাবে বোধগম্য ও ব্যাখ্যা করা যায়। ফলে নৈতিকতার জায়গা থেকে বিতর্কগুলো সরে এসে সামাজিক ও মনোচিকিৎসাগত জায়গায় এসে উপনীত হয়। ধারণা গঠিত হতে থাকে যে আত্মহত্যা পছন্দের বিষয় নয় আর, তা আসলে ঘটে। আর এ কারণেই নৈতিকতার নতুন রূপরেখা উদ্ভাসিত হতে থাকে: যদি আত্মহত্যা ইচ্ছাকৃতভাবে পছন্দের ঘটনা না হয়ে থাকে, তাহলে তাকে বলা উচিত হবে না নিন্দনীয় বা দণ্ডনীয়। বলা যাবে না ভুল বা পাপকর্ম বা অপরাধ। মোটের ওপর আত্মহত্যা বিষয়ে ব্যক্তির ভূমিকা ও দায় নিয়ে আলোচনা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলতে থাকে। বিশেষজ্ঞ ও পেশাদারিরা একে মনে করতে থাকেন রহস্যময়, কারণ এর সাথে জড়িত থাকে হতাশা ও মনোরোগবিজ্ঞান। এর কারণ যেহেতু পরিষ্কার হয়নি, তাই এখানে কোনোরকম নৈতিকতার বালাইও নেই।

একই সাথে ইচ্ছাকৃত উপলক্ষ সৃষ্টি করে বা স্বেচ্ছায় আঘাত করে মৃত্যু ঘটানোর ব্যাপারটির সাথে যোগসূত্র রয়েছে ধর্ম ও ভৌগোলিক প্রথার। এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, হিন্দুধর্মের শুরুর সময়টা, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, কনফুসীয়বাদ, প্রাচীন চীনের সময়ে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং জাপানে ছিল এ ধরনের অনেক উপাচার। এগুলো বাহিতও হয়েছে অনেক ধর্মের দ্বারা। এছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে আর্কটিক, আফ্রিকা, ওসেনিয়া, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় বহমান অলিখিত সংস্কৃতিতেও ছিল আত্মহত্যা বা আত্মঘাতী মৃত্যুর সংস্কৃতি। এ বিষয়ক তাদের সাংস্কৃতিক অভিমুখিতা পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষিত সাংস্কৃতিক অভিমুখিতা থেকে একেবারেই আলাদা। কিন্তু লিখিত অপেক্ষা অলিখিত প্রথাভিত্তিক সমাজে ঐতিহাসিক বিষয়াদির সংরক্ষণ অনেকটাই সমস্যাসঙ্কুল, কারণ লিখিত ঐতিহ্যে সব জিনিসের প্রাথমিক প্রমাণাদি সংরক্ষিত থাকে যা অধিকতর প্রামাণিক। অলিখিত ঐতিহ্যনির্ভর সমাজে আত্মহত্যার মতো ব্যাপারটির রীতি, বিশ্বাস ও আচার পশ্চিমাদের চোখ দ্বারা পরিশোধিত হয় কিছুটা। এ সমস্ত অলিখিত ঐতিহ্য যখন মিশনারি বা অভিযাত্রীদের বর্ণনার দ্বারা লিখিত রূপ পায়, তখন তাতে প্রাথমিক মাত্রার পরিবর্তন আসে।

এটা ঠিক, ঐতিহাসিকভাবেই আত্মহত্যা বিষয়ে অনেক সমান্তরাল চিন্তা পরিলক্ষিত। এমনকি একই সময়ে ও সমাজে এর প্রমাণ অনেক মেলে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রিক ও রোমান আমলের স্টোয়িকেরা আত্মহত্যাকে সময়ে সময়ে বিবেচনা করত যৌক্তিক ও সংবেদ্য একটি ব্যাপার হিসেবে, যেমনটা দেখা যেত জাপানের বোশিদু ঐতিহ্যে; আমেরিকা, আফ্রিকা ও ওসেনিয়ার অনেক আদিবাসীর মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে রাজা বা প্রভু মারা গেলে পরকালে তাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য তাদের নিকটজনদের সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করতে হবে বা অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক সমাজে অর্থনীতির ওপর চাপ কমানোর জন্য বৃদ্ধদের মরে যেতে হবে, যা ছিল সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত রীতি। এজন্যই আত্মহত্যার বিষয়টিকে বিবেচনা করতে গেলে জাতিতে জাতিতে, বা ভিন্ন সংস্কৃতির নৈতিকতা, বিশ্বাস, অধিবিদ্যা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিন্নতাকে বিবেচনায় রাখতে হয়।

এছাড়া একই সংস্কৃতি বা অনুসারীদের মধ্যে সাধারণ সমস্যাও রয়েছে বেশ কিছু। রয়েছে ভিন্নার্থ ও ব্যাখ্যা। আদি তালমুদীয় ইহুদিবাদ, সেন্ট ইগনাতিয়ুসের আদি খ্রিস্টানতত্ত্ব এবং পরের তাত্ত্বিকেরা, প্রথাগত ও সমসাময়িক মুসলমানদের মধ্যে আত্মহত্যা এবং শহিদত্ব নিয়ে রয়েছে ভিন্নতা। প্রথমটি নিষিদ্ধ কিন্তু দ্বিতীয়টি অনুমোদিত এবং গৌরবান্বিত বিষয়। মৃতুবরণ করার আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মহত্যার মধ্যেও রয়েছে ভিন্ন মত। সেন্ট পল থেকে ফোলিগনোর অ্যাঞ্জেলা হয়ে মহাত্মা গান্ধি পর্যন্ত এই ব্যাপারটি লক্ষ করা যায়। অনেক সংস্কৃতিতে রোগে পড়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মারা যাওয়াকে হীনিজনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভাইকিং, ইয়োরোবা,

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বোশিদু যোদ্ধা, ইগলুলিক ইনুইটদের কাছে সহিংস পদ্ধতিতে বা আত্মহত্যার মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করা অধিক মহান কাজ। প্লুতার্ক মিলেতাসের অবিবাহিতাদের খামখেয়ালি বন্ধের এক অভিনব পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন, একইভাবে ১৭ শতাব্দীর চীনা প্রশাসক হুয়াং নিউ হাং এবং ১৮ শতাব্দীর মারাত্মক ইংরেজ ভিন্নমতাবলম্বী ক্যালেব ফ্লেমিং উভয়ে মনে করতেন, আত্মহত্যাকারীর নগ্ন মৃতদেহ উন্মুক্ত স্থানে রেখে দেওয়াই হলো সবচেয়ে কঠোর শাস্তি। অনুরূপ কথা বলেছেন মেথডিজমের প্রতিষ্ঠাতা জন ওয়েসলে। তিনি বলেছিলেন, "প্রত্যেক আত্মহত্যাকারী, সে জমিদার বা কৃষক" যা-ই হোক না কেন, তার নগ্ন দেহ প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখাই সমুচিত শাস্তি। কোনো কোনো লেখক, যেমন গ্যোয়েটে বা চিকামাৎসু, প্রেমের ব্যর্থতায় বা পার্থিব জীবনের প্রতি অনাস্থায়, আত্মহত্যার রীতিতে উসকে দিয়েছেন তাঁদের লেখায়। রোমান জেনারেল, জাপানি যোদ্ধা, পলিনেশীয় কুকদ্বীপের মানুষ, বা কামিকাজে পাইলটেরা সামরিক পরাজয়জনিত কারণে আত্মহত্যাকে বেছে নিত। চৈনিক সংস্কৃতি, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, ইনকা সাম্রাজ্য, ভাইকিংনিয়ন্ত্রিত উত্তর ইউরোপ, উপনিবেশ-পূর্ব বা উপনিবেশ সময়ের ভারতে ছিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় স্বেচ্ছায় আত্মদানের রীতি, বিশেষত মৃত স্বামীর সাথে সহমরণে বা সম্ভ্রান্ত রাজাদের মৃত্যুর পর তাদের সাথে গমনের উদ্দেশে আত্মদান।

ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে ও প্রথায় আত্মহত্যা বিষয়ে মিল এবং অমিল দুটিই পরিলক্ষিত হয়। হত্যা আর মরে যাওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য, নিজেকে মেরে ফেলা আর কোনো বিশ্বাসকে অনুসরণ করে মরে যাওয়া, জাতি বা গোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য মৃত্যুতে নিজেকে উৎসর্গ করা, এসব বিষয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নানা বোধ ও ভাবনা কাজ করে। থাকে নানা নীতিগত বাধা ও অনুমোদন। এক্ষেত্রে ইহুদি, খ্রিস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, হিন্দু, বা ভাইকিং অনুশাসন নানা ধরনের হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘটিত আত্মহত্যা পশ্চিম অপেক্ষা পূর্বে বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। এর পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক সংগঠনের ভিন্নতা এবং আত্মদানের ভিন্নতর উদ্দেশ্য। সংস্কৃতি-চিন্তকদেরও রয়েছে নানা অভিমত। অনেকে মনে করে থাকেন, আত্মহত্যা একটি ব্যক্তিগত কৃত্য, উদাহরণস্বরূপ, রোমান দার্শনিক সেনেকার কথা বলা যায় যিনি তাঁর বিখ্যাত পত্রাবলি ৭০-এ লেখেন, "প্রত্যেক মানুষের তার নিজের জীবনকে শুধু নিজের কাছে ছাড়া অন্য সবার কাছে গ্রহণীয় করে তোলা উচিত, কিন্তু তার মৃত্যু শুধু তার কাছেই গ্রহণীয়।" ১৯৪৩ সালে ওরানিয়েনবুর্গ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মারা যাওয়া পাউল লুইস লান্ডসবার্গও মনে করতেন আত্মহত্যা একটি ব্যক্তিগত কৃত্য। জ্ঞাতিবর্গীয় সমাজে যুবক বা মধ্যবয়সিদের আত্মহত্যাকে বিবেচনা করা হয় সামাজিক বিন্যাসের ভাঙচুর হিসেবে। আবার বৃদ্ধদের আত্মহত্যাকে মোটেই তা মনে করা হয় না। এক্ষেত্রে আত্মহত্যা একটি সামাজিক বিবেচনা।

আত্মহত্যা পরিপন্থি বিবেচনাতেও রয়েছে নানা বাছবিচার। দেখা যায় ইতিহাসে রয়েছে যৌথ আত্মহত্যার উদাহরণ, যেমন জোসেফুস বর্ণিত মাসাদায় অনুষ্ঠিত যৌথ আত্মহত্যা বা ৪৭ রনিনদের নিজে নিজে পেট কেঁটে নাড়িভূড়ি বের করা, বা দ্বিতীয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়জনিত কারণে জাপানি যোদ্ধাদের ব্যাপক আত্মহত্যা। কবি নোফালিস বা লেখক এডুয়ার ফন হার্টমান মানব জাতির এক অনিবার্য ব্যাপক আত্মহত্যাকে কল্পনা করেছিলেন। আফ্রিকায় আত্মহত্যাকে মনে করা হয় এক প্রতিশোধমূলক তৎপরতা। আধুনিক সময়ে আত্মঘাতী বোমা হামলাও আত্মহত্যার এক ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈধতার দিককে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, যার সাথে জড়িয়ে আছে আত্ম বা পরার্থবাদী ধারণা।

একটি প্রশ্ন বারে বারে দেখা দিতে পারে, কাকে বলে আত্মহত্যা? সাধারণ ও সংকীর্ণভাবে বলা যেতেই পারে যে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ মৃত্যুর উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ও জ্ঞাতসারে এমন কাজ করে যা সরাসরি ও ইচ্ছাকৃতভাবে তার মৃত্যু ঘটায়, তখন সংঘটিত মৃত্যুকে বলা হয় আত্মহত্যা। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি ফলাফল হিসেবে মৃত্যুকে চিন্তা না করে এ কাজগুলো করে, বা দোনামোনা ইচ্ছায় সংঘটিত আত্মহত্যা বা আধা-দুর্ঘটনাঘটিত আত্মহত্যা বা আত্মক্ষতির পরিণামে চেতনালুপ্তি বা অত্যধিক আত্মনিগ্রহের পরিণামে সংঘটিত মৃত্যু, জেনেশুনে আত্মঘাতী সংঘর্ষে অংশগ্রহণ যেখানে ব্যক্তি মৃত্যুকে কামনা করে না বা আত্মঘাতী খেলাধুলায় নিজেকে নিয়োজিত করা ইত্যাদি কাজ কি আত্মহত্যার সমার্থক হবে? কখনও কখনও অন্তিম অবস্থার হেরফেরও আত্মহত্যার নৈতিকতাকে বৈধতা জোগায়। ইংরেজিতে আত্মহত্যা বা সুইসাইডকে সাধারণভাবে আত্মবলিদান/সেল্ফ সেক্রিফাইজ, শহিদত্ব/মার্টারডোম, মৃত্যুতে মৌনসম্মতি/অ্যাকুইয়েসেন্স ইন ডেথ, সহায়ক মৃত্যু বা এইড-ইন-ডাইং, কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার-ত্বরান্বিত নরহত্যা/ভিকটিম-প্রিসিপিটেটেড, আত্মমুক্তি বা সেল্ফ ডেলিভারেন্স এবং এ সংক্রান্ত অন্য শব্দ বা শব্দবন্ধ থেকে আলাদা করে দেখা হয়। মনে করা হয় যে এ শব্দগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম ধারণাগত পার্থক্য রয়েছে। অনেক লেখক আবার অপ্রচলিত ব্যাখ্যাও আরোপ করে থাকেন, যেমন রোমান খ্রিস্টীয় লেখক লুসিয়ুস লাকতানতিয়ুস স্টোয়িক অনবদ্য আত্মহত্যার উদাহরণ হিসেবে বিখ্যাত কাতোর আত্মহত্যাকে বস্তুত নরহত্যা বলে গুরুত্বারোপ করেছেন, আবার ১৯১৯ সালে সাজানো বিয়েতে অসম্মতির প্রতিবাদে মিজ ঝাও নামের এক নারী চাষির গলা কেটে আত্মহত্যা করাকে মাও জে দং বলেছেন খুন। জন ডানও জিশু খ্রিস্টের অন্যায় সাজার মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করাকে অভিহিত করেছেন আত্মহত্যা বলে।

ভাষাতাত্ত্বিক জায়গা থেকেও এসেছে আত্মহত্যা শব্দটি ব্যবহারে সচেতনতা। বলা হয় "কমিট সুইসাইড" বাংলায় আত্মহত্যা সংঘটন, কিন্তু এর সাথে মিশে আছে অপরাধজনক সংঘটনের গন্ধ। আধুনিক আত্মহত্যাবিজ্ঞানীরা এর পরিবর্তে ব্যবহার করছেন কম কলঙ্কযুক্ত শব্দ, যেমন "আত্মহত" বা ইংরেজিতে "সুইসাইডেড", বা "আত্মহত্যা সম্পাদন" বা "কমপ্লিটেট সুইসাইড", এবং "আত্মহত্যার দ্বারা মৃত্যু" বা "ডাইড বাই সুইসাইড"। আত্মহত্যার নৈতিক ধারণার পরিবর্তনের ফলেই ঘটছে শব্দেরও পরিবর্তন। নৈতিকতা যেহেতু আপেক্ষিক তাই আত্মহত্যার নৈতিকতাও আপেক্ষিক হতে বাধ্য। আবার অন্যভাবে বলা যায়, আত্মহত্যার ক্ষেত্রে নৈতিকতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নৈতিকভাষ্য রচনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তরজমার কারণেও আত্মহত্যার সংজ্ঞার্থ অন্বেষণে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় পরিবর্তন সবসময় সুখকর নয়। ইংরেজিতে আত্মহত্যার কোনো বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দ মধ্য-ষোড়শ শতকের আগে বলতে গেলে ছিলই না, ওয়াল্টার চালটন প্রথম তাঁর *এফিসিয়ান অ্যান্ড সিমারিয়ান ম্যাট্রনস*-এ এই শব্দের ব্যবহার করেন। অন্য সব ভাষাতে এই প্রপঞ্চটির নানামুখী ব্যবহার লক্ষ করা যায়। লাতিন, গ্রিক এবং অন্য ইউরোপীয় ভাষাগুলোতেও এই শব্দটির স্পষ্ট ও বিশিষ্ট পরিভাষা নেই, যদিও তাদের ছিল অনেক ধরনের বাচনভঙ্গি। যা-ই হোক, ইংরেজিতে আদতে একটি পরিভাষাই রয়েছে। কিন্তু জার্মান ভাষায় আত্মহত্যার রয়েছে চারটি পরিভাষা: "Selbstmord", "Selbsttötung", "Suizid", এবং "Freitod" যার মধ্যে প্রথম তিনটির মানে ঋণাত্মক কিন্তু চতুর্থটি ধনাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার মানে হলো, ইংরেজির তুলনায় জার্মান ভাষায় আত্মহত্যার নানা অভিভাবকে বেশি করে প্রকাশ করা সম্ভব।

আত্মহত্যাসম্পর্কিত ধারণা বা বিষয়গুলো কোনো অর্বাচীন কিছু নয়। প্রাচীন ইহুদিধর্মীয় রচনা, বিশেষ করে খ্রিস্টপূর্ব ১২-৯ শতকের হিব্রু বাইবেল থেকে শুরু করে খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতাব্দীতে জুসেফুসের মাধ্যম হয়ে ৩-৬ শতাব্দীর ব্যাবিলনীয় তালমুদ, দশম শতাব্দীর কারাইট লেখক ইয়াকুব আল-কিরকিসানি, ১২-১৪ শতাব্দীর তোসাফিস্ট লেখকেরা, ১৬ শতাব্দীর লুরিয়া, ১৯ শতাব্দীর মারগোলিয়াউথ, ২০ শতাব্দীর সাসমুল জিগাইলবোজম (পোলিশ ইহুদিদের নিধনের প্রতিবাদে যার ১৯৪৩ সালের মে মাসের আত্মহত্যালিপি সাড়া জাগিয়েছিল), জাপানি ঐতিহ্যে মধ্যযুগের বুশিদো যোদ্ধাদের সংস্কৃতি, প্রেমের কারণে আত্মহত্যার চিকামাৎসুর নাটকগুলো, ঠিক আক্রমণে যাওয়ার আগ মুহূর্তে কামিকাজে পাউলটদের চিঠিপত্র আত্মহত্যা-সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রথা, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম, রাজা মিলিন্দর প্রশ্ন যা হয়েছিল বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের সাথে, প্রথম শতাব্দীতে রচিত পদ্মসূত্র প্রভৃতি এক্ষেত্রে আদি উৎস হিসেবে রয়েছে। এক কথায় পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মদর্শনশাস্ত্রেই কোনো না কোনোভাবে আত্মহত্যার বিষয় আলোচিত। এর কারণ হলো, জীবন সমাপ্তির বিষয়টি একাধারে ব্যক্তিগত, আবার সামাজিক। ব্যক্তির জীবন তার নিজের হলেও তা পরমুখাপেক্ষী, আবার ব্যক্তির মৃত্যু শুধু তার নিজের হলেও এর সাথে জড়িয়ে আছে অনেকের জীবনও, জড়িয়ে আছে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নিয়মাচার। এসব কারণে আত্মহত্যার বিষয়টি কখনও বা অতি সমর্থনীয়, কখনও বা অতি নিন্দনীয় হয়ে পড়েছে। রোমান স্টোয়িকদের চিন্তা তাই অতি প্রশংসিত হতে দেখি যেমন লাকতানতিয়ুসের বাড়াবাড়িতে, তেমনি হিন্দুদের প্রথাগুলোকে বাতিল হতে দেখি আল-গাজ্জালির চিন্তায়। আবার দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের মধ্যে দেখি উপোসের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করার জৈন প্রথার প্রশংসা।

প্রায় ৮ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যাবিষয়ক গবেষকেরা অনুমান করেছেন, প্রতিটি সার্থক আত্মহত্যার পর ফল হিসেবে সাত থেকে দশজন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষ গভীরভাবে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে থাকে পিতা-মাতা, সম্পর্কিত ভাই-বোন, কাকা-মামা-কাকি-মামি, পিতামহ-মাতামহ, নাতি-নাতনি, বন্ধু-বান্ধব। এ হিসেবে ৮ লক্ষ আত্মহতের সাথে কমপক্ষে প্রতি বছর ৫০ লক্ষ বেঁচে থাকা মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, আত্মহত্যাকারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসব মানুষ আরও ১৫-২০ বছর বেঁচে থাকবে, তাহলে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৮ কোটি। এই বিপুল সংখ্যক মানুষ সারা জীবন ধরে বয়ে বেড়াবে সেই প্রশ্ন, ''কেন? কেন? কেন?'' অবিরাম উচ্চারিত ''কেন?'' হয়তো এটাই বোঝায় যে আত্মহত্যার পেছনে কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। সুতরাং এই ''কেন?''-র অন্বেষণ জন্ম দেয় ক্ষোভ, উষ্মা ও লজ্জা। এ প্রশ্নও তাই স্বাভাবিক যে একজন মানুষের আত্মহত্যা যদি সাত-আটজন মানুষকে গভীর আস্তিত্বিক সংকটে ফেলে দেয়, তাহলে সেই কাজটি হয়ে পড়ে অমানবিক ও অনৈতিক।

আত্মহত্যার ক্ষেত্রে বেঁচে থাকা মানুষদের জীবন হয়ে ওঠে ভোগান্তির জীবন আর তা হয় তিনভাবে: প্রথমত, এক অনিবারণীয় দুঃখকে তারা বহন করে চলে সারা জীবন; দ্বিতীয়ত, এক ট্রমাটিক অভিজ্ঞতার ভোগান্তি যাকে বলা হয় পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার; তৃতীয়ত, এক ভয়ংকর নৈঃশব্দ্যের অনুভূতি যা আঁকড়ে ধরে রাখে তাদের। পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হলো এমন এক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যখন ব্যক্তির ভেতর পুনঃপুন দেখা দিতে থাকে আত্মহত্যার দুঃস্মৃতি, আত্মহত্যার কল্পনা, আত্মহত্যা সংঘটনের অনুভূতি, নিদ্রাহীনতা, স্মৃতিবিলোপ, বেঁচে থাকার গ্লানি, আবেগহীন অনুভূতি। এই অসুখ স্বল্পকাল থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। বেঁচে থাকা মানুষদের ক্ষেত্রে দেখা দেয় এক ভয়ংকর একাকিত্ব যা তাদের কুঁকড়ে খায়। এর কারণ, তারা বলতে পারে না তাদের অনুভূতির কথা। সাধারণ মৃত্যুর যেমন জানা ইতিহাস ও তথ্য থাকে, আত্মহত্যার তেমনটি থাকে না। ফলে বেঁচে থাকা মানুষেরা অন্যদের কাছ থেকে এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয় যার উত্তর তারা দিতে পারে না। এর সাথে যুক্ত হয় প্রতিরোধ না করতে পারার কারণে নিজেদের অপরাধী ভাবার মানসিকতা। ফলে জন্ম হয় নীরবতার। উত্তরহীন, সমাধানহীন নীরবতার। কিন্তু এই নীরবতা কোনো সমাধান নয়, এটা ব্যথার কোনো উপশমকারীও নয়। ফলে চলতে থাকা এই নীরবতা ক্ষতিগ্রস্ত করে ব্যক্তির জীবনকে। মৌখিক নিষ্ক্রমণ না থাকায় মানুষের মনোশারীরিক ক্ষোভ ও অপরাধবোধ অন্যভাবে প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রেও ঘটতে পারে চূড়ান্ত বিপর্যয়, সংঘটিত হতে পারে অনুবর্তী আত্মহত্যা। সুতরাং এই নীরবতা শোককে জমাটবদ্ধ করে। এই নীরবতা তাই এক ঘাতক।

তলস্তোয় বলেছেন, নীরবতা কোনো রোগকে ভালো করতে পারে না, বরং তা তাকে আরও খারাপই করে ফেলে। আমরা শুনে আসছি যে, সুখ ভাগ করলে তা বেড়ে যায় আর দুঃখ ভাগ করলে তা কমে যায়। যে দুঃখ প্রকাশহীন ও অবরুদ্ধ, তা বহন করা দুঃসাধ্যজনক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থনির্দেশ ও টীকাটিপ্পনী

জীবন ও মৃত্যু

১ টমাস মান তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *দ্য ম্যাজিক মাউন্টেন*-এর পঞ্চম অধ্যায়ের রিসার্চ (Research) অংশে এই প্রশ্ন তুলেছেন একাধিকবার। তিনি বলেছেন What was life? No one know. It was undoubtedly aware of itself, so soon as it was life; but it did not know what it was. Consciousness, as exhibited by susceptibility to stimulus, was undoubtedly, to a certain degree, present in the lowest, most undeveloped stages of life; it was... দ্রষ্টব্য টমাস মান, *দ্য ম্যাজিক মাউন্টেন* (পেঙ্গুইন বুকস ১৯৬০, অনুবাদ: এইচ.টি. লোয়ে-পোর্টার), পৃষ্ঠা ২৭৪-২৭৫।

২ দ্রষ্টব্য স্টিফেন হকিং, *আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম ফ্রম বিগ ব্যাং টু ব্ল্যাক হোলস* (বেনটাম বুকস নিউ ইয়র্ক ১৯৮৮), পৃষ্ঠা ১৪৯।
স্টিফেন হকিং আরও বলেছেন So long as the universe had a beginning, we could suppose it had a creator. But if the universe is really completely self-contained, having no boundary or edge, it would have neither beginning nor end: it would simply be. What place, then, for a creator? দ্রষ্টব্য তদেব, পৃ: ১৪৯।

৩ *ক্রন্দসী* কাব্যের "সৃষ্টিরহস্য" কবিতার পঙ্ক্তি।
দ্রষ্টব্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, *কাব্যসংগ্রহ* (দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ১৯৮৪), পৃষ্ঠা ১০১।

৪ *কড়ি ও কোমল* কাব্যের "প্রাণ" কবিতার পঙ্ক্তি।

৫ "রুদ্ধগৃহ" প্রবন্ধের অংশবিশেষ।

৬ Thanatologist: মৃত্যু-নিকটবর্তী ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক এবং অন্তর্গত অবস্থা ও অভিজ্ঞতার পর্যবেক্ষণকারী বিশেষজ্ঞ।

৭ *নৈবেদ্য* কাব্যের "মৃত্যু" কবিতার পঙ্ক্তি।

৮ তদেব।

৯ "রুদ্ধগৃহ" প্রবন্ধের অংশ।

১০ তদেব।

১১ *উত্তরফাল্গুনী কাব্যের* "দুঃসময়" কবিতার পঙ্ক্তিমালা।

১২ *ক্রন্দসী কাব্যের* "কাল" কবিতার পঙ্ক্তি।

১৩ *ক্রন্দসী* কাব্যের "মৃত্যু" কবিতার স্তবক।

১৪ "*জীবন*" ৩২ কবিতার পঙ্ক্তিমালা। কাব্য *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, জীবনানন্দ দাশ।

~ www.amarboi.com ~

১৫ জীবনানন্দ দাশের *বনলতা সেন* কাব্যের "অন্ধকার" কবিতার অংশবিশেষ।

১৬ টেনিসনের বিখ্যাত কবিতা। এই কবিতায় টেনিসন জীবনকে বন্দরের বন্ধনদশা আর মৃত্যুকে বন্দর ছেড়ে জাহাজের অসীম সমুদ্রে যাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন। মৃত্যু হলো মুক্তি—বন্ধন থেকে মুক্তি :

Sunset and evening star.
And one clear Call for me!
And may there be no moaning of the bar,
When I put out to sea.
I hope to see my pilot face to face
When I have crost the bar.

১৭ রণজিৎ দাশ-এর *ঈশ্বরের চোখ* কাব্যের "অশ্রুহীন একুশদিন" কবিতার অংশবিশেষ। দ্রষ্টব্য রণজিৎ দাশ, *ঈশ্বরের চোখ* (কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৯৯৯) পৃষ্ঠা ৬৪।

১৮ জীবনানন্দ দাশের *মহাপৃথিবী* কাব্যের "নিরালোক" কবিতার পঙ্‌ক্তি।

১৯ *ম্যাজিক মাউন্টেন*-এর প্রথম অধ্যায়ের "আগমন" শিরোনাম অংশের পঙ্‌ক্তি Space, like time, engenders forgetfulness; আরও আছে but it does so by setting us bodily free from our surroundings and giving us back our primitive, unattached state.
দ্রষ্টব্য : টমাস মান, *দ্য ম্যাজিক মাউন্টেন* (পেঙ্গুইন বুকস ১৯৬০), পৃষ্ঠা ৪।

২০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৭।

২১ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৭।

২২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৭।

২৩ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৪।

২৪ জীবনানন্দ দাশের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যের "জীবন" নামক কবিতার অংশ।

অস্তিত্ব ও নিরর্থকতা

১ দ্রষ্টব্য বের্গসন, *ক্রিয়েটিভ ইভলিউশন* (নিউ ইয়র্ক ডোভার পাবলিকেশন্স ১৯৯৮), পৃ. ১।

২ এর লাতিন কথাটি এরকম Cogito ergo sum. দেকার্তের *পদ্ধতি-বিষয়ক আলোচনা* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা আছে।

৩ Parmenides ইলিয়াটিক (Eleatic) মতবাদের প্রধান দার্শনিক, জন্ম সম্ভবত ৫১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। Elea স্থান থেকে Eleatic School-এর উদ্ভব; তাঁর মতবাদ আয়োনীয় মতবাদের বস্তুতান্ত্রিক দর্শন ও হেরাক্লেতাসের চিরন্তন প্রবাহ মতবাদ থেকে ভিন্ন।

৪ Suspension of ethical নৈতিকতার সাময়িক বর্জন: মূলত Teleological suspension of the ethical. কিয়ের্কেগার্দ তাঁর *Fear & Trembling* গ্রন্থে এর অবতারণা করেন।

৫ নিট্‌শে তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *Ecce Homo*-তে "Why I am a destiny" অধ্যায়ে এই Revaluation of all Values-এর কথা বলেছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্রষ্টব্য: Friedrich Nietzsche. *Ecce Homo*, (Penguin Books: 1992) P.96।

৬ দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃষ্ঠা ৯৭।

৭ প্রপঞ্চবিদ্যা ইংরেজি Phenomenology: এর আরেক বাংলা পরিভাষা হলো ঘটনাসারতত্ত্ব, বা অবভাসবিদ্যা। Phenomenon ও logos যুক্ত হয়ে তা গঠিত। গ্রিক ভাষায় যে শব্দ থেকে Phenomenon শব্দটি এসেছে তার অর্থ যা নিজেকে প্রকাশ করে। অতএব Phenomenology হলো প্রকাশিত সত্তাবাদ।

৮ উদ্বিগ্নপ্রযত্ন মানে ইংরেজি Care। এই ধারণা অনেকটা হুসার্লের intentionality-র মতো।
দ্রষ্টব্য: মার্টিন হাইডেগারের সত্তাবাদী দর্শন, মৃণালকান্তি ভদ্র, (*আলোচনা চক্র*, অক্টোবর, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা : ৬১।

৯ অস্তিত্বসূত্র: Existenz: অস্তিত্ব-সম্ভাবনা: মানুষ বিভিন্ন সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সম্ভাবনার মধ্য দিয়েই তার অস্তিত্ব।
দ্রষ্টব্য তদেব।

১০ বাস্তবতা: Facticity: বাস্তবতা বলতে হাইডেগার বাস্তব জগতে মানুষের অবস্থিতিকে বোঝেন।
দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩।

১১ পতনশীলতা: Fallenness প্রাত্যহিক জীবনের ক্লান্তি ও তাকে আঁকড়ে থাকা জীবনের একটি বিশেষ রূপ। তবে এই জীবনাসক্তিই মানুষের পতন ডেকে আনে।
দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃষ্ঠা ৬৩।

১২ ইংরেজি কথাটি হলো: Existentiality is always determined by facticity.

১৩ দ্রষ্টব্য: সার্ত্রের সমাজ ও রাজনীতি দর্শন : মৃণালকান্তি ভদ্র, বিজ্ঞাপনপর্ব, অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫।

১৪ দ্রষ্টব্য: তদেব।

১৫ দ্রষ্টব্য: কিয়ের্কেগার্দ, *আইদার/অর* (পেঙ্গুইন বুকস ১৯৯২), পৃষ্ঠা ৪৭।

১৬ দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃ: ৪৮-৪৯।

১৭ দ্রষ্টব্য: জ্যা-পল সার্ত্র: *বিবমিষা*, অনুবাদ: মৃণালকান্তি ভদ্র, বিজ্ঞাপন পর্ব, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৮।

১৮ দ্রষ্টব্য: তদেব।

১৯ দ্রষ্টব্য: হুমায়ুন আজাদ, *আমার অবিশ্বাস*, (আগামী প্রকাশনী ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ১৭-১৮।

২০ দ্রষ্টব্য: আলব্যের কাম্যু, *দ্য মিথ অব সিসিফাস অ্যান্ড আদার এসেজ* (ভিনটেজ : ১৯৯১), পৃষ্ঠা ১২-১৩।

২১ দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃষ্ঠা ৬।

২২ দ্রষ্টব্য: ফ্রানৎস কাফ্‌কা, *কাফকার মেটামরফসিস ও অন্যান্য* [illegible] (সম্পাদনা রবিন ঘোষ, বিজ্ঞাপনপর্ব [illegible]), পৃষ্ঠা [illegible]।

২৩ দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃষ্ঠা [illegible]

২৪ দ্রষ্টব্য: আলব্যের কাম্যু, *দ্য [illegible] অব সিসিফাস অ্যান্ড আদার এসেজ* (ভিনটেজ: ১৯৯১), পৃষ্ঠা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৫ দ্রষ্টব্য তদেব, ভূমিকা।

২৬ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৪।

২৭ দ্রষ্টব্য আর্থার শোপেনহাওয়ার, *এসেস অ্যান্ড অ্যাফোরিজম* (অনুবাদ ও সম্পাদনা: আর. জে. হোলিংডেল, পেঙ্গুইন বুকস)।

২৮ দ্রষ্টব্য: *দ্য মিথ অব সিসিফাস অ্যান্ড আদার এসেস* (ভিনটেজ ইন্টারন্যাশনাল ১৯৯১), পৃষ্ঠা ৬৪। উল্লেখ্য, *মিথ অব সিসিফাস*-এর এই কথার মিল দেখা যায় তাঁর অন্যত্র লেখায়: We need not banish our melancholy, but we must destroy our taste for difficult and fatal things. Be happy with our friends, in harmony with the world, and earn our happiness by following a path which nevertheless leads to death.

দ্রষ্টব্য Albert Camus, Selected Essays and Notebooks (Penguin Books 1979), P.243.

২৯ দ্রষ্টব্য *দ্য মিথ অব সিসিফাস অ্যান্ড আদার এসেস* (ভিনটেজ ১৯৯১), পৃষ্ঠা ১২৩।

৩০ দ্রষ্টব্য *হ্যামলেট* : প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য।

৩১ দ্রষ্টব্য তদেব, দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য।

৩২ দ্রষ্টব্য আলব্যের কাম্যু; *আগন্তুক*, অনুবাদ মৃণালকান্তি ভদ্র, (বিজ্ঞাপনপর্ব কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০৩), পৃষ্ঠা ৭২।

৩৩ দ্রষ্টব্য সমীরণ মজুমদার (সম্পাদিত), *অ্যাবসার্ড নাটক* (অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ মেদিনীপুর ১৯৯৬), পৃষ্ঠা ৫৪।

৩৪ দ্রষ্টব্য আলবার্ট আইনস্টাইন, *আইডিয়াস অ্যান্ড ওপিনিয়ন* (রুপা অ্যান্ড কো., ২০০৩), পৃষ্ঠা ১১।

৩৫ জীবনানন্দ দাশ-এর "বোধ" কবিতার অংশবিশেষ।

৩৬ তদেব।

৩৭ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের *ক্রন্দসী* কাব্যের "অকৃতজ্ঞ" কবিতার পঙ্‌ক্তি।

৩৮ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের *ক্রন্দসী* কাব্যের "বর্ষপঞ্চক" কবিতার স্তবক।

৩৯ জীবনানন্দ দাশের "নিঃসঙ্গ" কবিতার স্তবক।

মৃত্যু এক আত্মহত্যা।

১ *দ্য মিথ অব সিসিফাস* গ্রন্থে আলব্যের কাম্যু অ্যাবসার্ড ও আত্মহত্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি Absurd Walls অধ্যায়ে বলেছেন কথাগুলো Rising, Streetcar, four hours in the office or the factory, meal, Streetcar, four hours of work, meal, sleep, and Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday and Saturday according to the same rhythm—this path is easily followed most of the time. But one day the "Why" arises... এই কথাগুলোর আগের পঙ্‌ক্তিটি ছিল, "এ-ই ঘটে যে মঞ্চ একসময় ভেঙে পড়ে।"

দ্রষ্টব্য *দ্য মিথ অব সিসিফাস অ্যান্ড আদার এসেজ*, ভিনটেজ ইন্টারনেশান্যাল, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১২-১৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২ রাজা শৌল-এর আত্মহত্যা বর্ণিত আছে ১-শমূয়েল পুস্তকে। দ্রষ্টব্য শমূয়েল ১-৩১ *পবিত্র বাইবেল: পুরাতন ও নূতন নিয়ম*, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটী, ঢাকা; পৃষ্ঠা ৪৭২। রাজা অবিমেলক-এর আত্মহত্যার কাহিনির বর্ণনা আছে *বিচারককর্ত্তৃগণের বিবরণ* ৯-এ; দ্র: তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮৯। অহিথোফল-এর আত্মহত্যা বর্ণিত আছে ২*শমূয়েল*-এ।

৩ জুদাস-এর আত্মহত্যা বর্ণিত আছে *মথি লিখিত সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্য্য*-এ। মথি: ২৭: ৫- এ বলা আছে: "তখন সে ঐ মুদ্রাসকল মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, গিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিল।" *প্রেরিতদের কার্য্য*-এ অবশ্য জুডাসের আত্মহত্যা বিষয়ে অন্যরূপ বলা আছে। *প্রেরিতদের কার্য্য* ১ ১৬-১৮-এ উল্লেখ আছে: "হে ভ্রাতৃগণ, যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল, তাহাদের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল যে যিহুদা, তাহার বিষয়ে পবিত্র আত্মা দায়ূদের মুখ দ্বারা অগ্রে যাহা বলিয়াছেন, সেই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। কেননা সে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে গণিত, এবং এই পরিচর্য্যার অধিকার প্রাপ্ত ছিল।—সে অধর্ম্মের বেতন দ্বারা একখান ক্ষেত্র লাভ করিল; এবং অধোমুখে ভূমিতে পতিত হইলে তাহার উদর ফাটিয়া যাওয়াতে নাড়ী ভুঁড়ী সকল বাহির হইয়া পড়িল।" দ্রষ্টব্য : তদেব।

৪ দেমোসথেনেস (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) বিখ্যাত গ্রিক বাগ্মী। খ্রি.পূ. ৩২৪ সালে দেমোসথেনেসের বিরুদ্ধে, সম্ভবত অন্যায়ভাবে, হার্পালুসের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ আনয়ন করা হয়, যার কাছে ফিলিপের পুত্র মহামতি আলেকজান্ডার বিশ্বাস করে বিপুল ধনরত্ন রেখেছিলেন এবং যে পালিয়ে অ্যাথেন্সে চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর (খ্রি.পূ. ৩২৩) দেমোসথিনেস পুনরায় তাদের মুক্ত করার আবেদন জানান। কিন্তু অ্যাথেনীয় অ্যাসেম্বলি দেশপ্রেমিকদের মৃত্যুদণ্ডের ডিক্রি জারি করলে দেমোসথিনেস কালাউরিয়া দ্বীপে পালিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেন।

৫ স্টোয়িসিজমের জনক হিসেবে পরিচিত জেনো অব সিটিওম (আনুমানিক খ্রি. পূ. চতুর্থ শতাব্দীর শেষ তৃতীয় শতাব্দীর সূচনাকালে)। সাইপ্রাসের সিটিওম-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্রি.পূ. চতুর্থ শতাব্দীর দার্শনিক ক্রেতেস এবং প্লেটোনিস্ট জেনোক্রেতেস-এর ছাত্র ছিলেন। আনুমানিক খ্রি. পূ. ৩০০ সালে তিনি তাঁর দার্শনিক মতবাদ স্টেয়িসিজম-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই মতবাদের নামটির উৎপত্তি stoa Poikite ("Painted Porch") থেকে; যেখানে শিক্ষক ছাত্রদের পড়ায়। জেনোর কোনো লিখিত টেক্সট নেই কিন্তু শিষ্যদের দ্বারা তাঁর মতবাদ পরিবাহিত হয়। দার্শনিক জেনো ছাড়াও আরও দুজন জেনোর অস্তিত্ব আছে: একজন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট জেনো (৪২৬?-৪৯১); অন্যজন ইলিয়াটিক মতবাদের দার্শনিক ও গ্রিক গণিতবিদ জেনো (খ্রি. পূ. পঞ্চম শতাব্দী) যিনি তাঁর দার্শনিক কূটাভাসের জন্য পরিচিত।

৬ ক্লেয়াস্থেস (খ্রি. পূ. ৩৩১-খ্রি. পূ. ২৩২) প্রাচীন গ্রিক কবি ও স্টোয়িক-দার্শনিক, জন্ম এশিয়া মাইনরে। কায়িক শ্রম দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং এই অবস্থাতেই স্টোয়িক-দার্শনিক জেনোর বক্তৃতা শুনতে যেতেন এবং একসময় আনুমানিক খ্রি. পূ.২৬৩ সালের দিকে জেনোর উত্তরসূরি ও স্টোয়িক মতবাদের প্রধান হয়ে ওঠেন। কথিত আছে, তিনি ৫০টির অধিক পুস্তক রচনা করেন কিন্তু রক্ষিত হয়েছে কতিপয় রচনা যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো "জিউসের প্রতি স্তোত্র",

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যার অংশবিশেষ Most glorious of immortal O Zeus of my names, almighty and everlasting, Sovereign of nature, directing all in accordance with Law... Thee all this universe, as it rolls round the earth obeys wheresoever thou dost guide, and gladly owns thy sway.

৭ লাতিন ভাষার মহাকবি ভার্জিল রচিত মহাকাব্যের নাম। এর অন্যতম প্রধান নারী-চরিত্র দিদো আত্মহত্যা করেছিল।

৮ সেনেকা (খ্রি.পূ.৪? ৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) রোমান দার্শনিক, নাট্যকার ও রাষ্ট্রনায়ক, লাতিন সাহিত্যের রৌপ্যযুগের অন্যতম বিখ্যাত লেখক।

৯ পুরো নাম করনেলিউস তোসিতুস, রোমান ইতিহাসবেত্তা, তাঁর রচনার নাম *The Annals of Imperial Rome* যার অল্পকিছু অংশই সময়ের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। এতে খ্রিস্টাব্দ ১৪-এ প্রথম সম্রাট আগস্তাস-এর মৃত্যুর ঠিক আগ থেকে পঞ্চম সম্রাট নিরোর মৃত্যু ৬৮ সাল পর্যন্ত সময়ের যথার্থ ও সম্পূর্ণ সাহিত্যিক রেকর্ড স্থান পেয়েছে। তোসিতুস নিরোর মাকে মারার ষড়যন্ত্রে ফেঁসে গিয়েছিলেন।

১০ লুক্রেতিয়ুস (খ্রি. পূ. ৯৪?- খ্রি. পূ. ৫৫?) রোমান কবি। তাঁর পুরো নাম তাইতুস লুক্রেতিয়ুস কারুস। তাঁর বিখ্যাত উপদেশমূলক কবিতা De-Rerum Natura on the Nature of Things, যা ছয়টি পুস্তকে বিবৃত। এতে তিনি গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস ও ইপিকিউরাস-এর দার্শনিক-বস্তুবাদ এবং ইপিকিউরীয় জ্ঞান ও চিন্তার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। তিনি মৃত্যু ও দেবতাদের ভয় থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছেন এবং তিনি মনে করতেন, এগুলোই মানুষের অশান্তির ও অসুখী হওয়ার কারণ। আদি মানুষের আদিম জীবন ও সভ্যতার বিকাশের বিষয়ই *De-Rerum Natura*-র বিষয়বস্তু।

১১ কাতুল্লুস রোমান কবি; পুরো নাম গাইয়াস ভানেরিসেস কাতুলুস (খ্রি. পূ. ৮৪? -৫৪?)। তাঁকে লাতিন ভাষার শ্রেষ্ঠ গীতিকবি হিসেবে অনেকে বিবেচনা করেন। তাঁর জন্ম ভেরোনাতে, খ্রি. পূ. ৬২-এ তিনি রোমে যান। সেখানে হেলেনীয় যুগের গ্রিক কবিদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ কতিপয় লাতিন তরুণ কবিদের মধ্যে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বিখ্যাত কাজ Lesbia Poems। Lesbia মানে রহস্যময় নারী। ওভিদ ও হোরেসের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। এছাড়া রেনেসাঁ যুগের ইংরেজ কবিদের (১৪ শতাব্দী হতে ১৭ শতাব্দী) মধ্যে রবার্ট হেরিক, বেন জনসন, এডমন্ড স্পেন্সার প্রমুখের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল। ১৮৯১ সালে ইয়েটস ও আর্নেস্ট রিস লন্ডনে "রাইমার্স ক্লাব" প্রতিষ্ঠা করেন যার উদ্দেশ্য ছিল: "যা-কিছু কবিতা নয় তা থেকে কবিতাকে মুক্তি দিতে হবে, লিখতে হবে কাতুলুস, ভেরলেন ও বোদল্যেরের মতো।"

১২ লুক্রেতিয়া রোমের শেষ সম্রাট লুসিয়ুস তারকুইনিয়ুস সুপারবাস-এর ছেলে সেক্সতুস দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার ফলে আত্মহত্যা করেন।

১৩ শেক্সপিয়রের *হ্যামলেট* নাটকের নায়ক হ্যামলেট উন্মাদনাগ্রস্ত। রাজার নজরে আসার পর তিনি হ্যামলেটের দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হ্যামলেটের উন্মাদনার কারণ নির্ণয় করতে বলেন। দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে পোলোনিয়াস বলছে, এ "প্রেমের উন্মাদনা;... আত্মধ্বংসী।" দ্বিতীয় দৃশ্যে আবারও পোলোনিয়াস রাজাকে বলছে, "আপনাদের স্নেহের পুত্রটি উন্মাদ।" তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, হ্যামলেটের স্বগতোক্তি:

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"মৃত্যু, শুধু ঘুম, আর কিছু নয়।" কারও কারও মতে, হ্যামলেটের এই প্রবণতা তার এক ধরনের ভান যাতে রাজা তাকে সন্দেহ না করতে পারে এবং রাজ্য থেকে বাহির করে দিতে না পারে।

১৪ গোস্তাফ ফ্লবের-এর বিখ্যাত উপন্যাস *মাদাম বোভারির* নায়িকা।

১৫ তলস্তোয়-এর বিখ্যাত উপন্যাস *আনা কারেনিনার* নায়িকা। উল্লেখ্য, *আনা কারেনিনার* শেষ অংশ লেখার সময় তল্‌স্তোয় নিজেই মুখোমুখি হয়েছিলেন গভীর বিষাদের, যা তাঁকে ভাবিয়েছিল আত্মহত্যা সম্পর্কে।

১৬ ফিউদর দস্তইয়েফ্‌স্কির শেষ ও বিখ্যাত উপন্যাস *ব্রাদার্স কারামাজোভ*-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার তিন ছেলে; দমিত্রি বা মিতিয়া, আইভান বা ভানিয়া, অ্যালেক্সি বা আলোয়শা। তার এক অবৈধ পুত্র স্মেরদিয়াকভ বাড়ির চাকরের কাজ করে। সে মানসিক উদ্বেগ ও অস্বস্তিতে ভুগছিল। মধ্যম ভাই ভানিয়া বাবার মৃত্যু কামনা করায় সে-কথা শুনে অসুস্থ মনের প্রতিক্রিয়ায় স্মেরদিয়াকভ কারামাজোভকে হত্যা করে।

১৭ বিখ্যাত লেখক টমাস মান-এর নভেলা *ডেথ ইন ভেনিস* (জার্মান নাম *ডেয়ার টড ইন ভেনেডিগ*) ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই গল্পের প্রধান চরিত্র গুস্তাফ ফন আশেনবাখ এক মনস্তাত্ত্বিক মৃত্যু-বাসনায় প্লেগ দেখা দেওয়ার পরও ভেনিসে থেকে যান, যে "জানল না, তার সত্য বাসনা মৃত্যুর জন্য।"

দ্রষ্টব্য বুদ্ধদেব বসু (অনুঃ), *শাল বোদলেয়ার* তাঁর কবিতা (দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ১৯৮৮), পৃষ্ঠা ৩০। বুদ্ধদেব বসু একে বলেছেন, "অতল ও নামহীন লিপ্সা।" (দ্রষ্টব্য তদেব, পৃ: ৩০)।

১৮ টমাস মান-এর *দ্য ম্যাজিক মাউন্টেন*-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র; উপন্যাসের শুরুতে নায়ক হ্যান্স কাসটোর্প হামবুর্গ থেকে রেলগাড়িতে করে সুইটজারল্যান্ডের দাবোস-এ যায় জাদুপাহাড়ে তার কাজিন জোয়াশিমকে দেখতে, যে যক্ষ্মায় ভুগছে এবং দাবোস পাহাড়ের ওপর বেয়ার্গহোফ স্যানাটোরিয়ামে রয়েছে। কাসটোর্পের রেলভ্রমণ তাকে সমভূমি থেকে উঁচুভূমিতে নিয়ে যায়—পৃথিবীর স্বাভাবিক সময় থেকে নতুন এক ধরনের সময়ে নিয়ে যায়। সেখানে তার আত্মঅনুধ্যান হয়। তার তিন সপ্তাহের অবস্থান সম্প্রসারিত হয় সাত বছরে। মান ভাবিত হয়েছিলেন আইনস্টাইনের "স্পেসটাইম কনটিনাম" দ্বারা এবং বইটির শুরুতেই দেখা যায় স্থান নিজেই কালের এক রূপ হয়ে যায়। মান বলছেন, "স্থান, কালের মতোই বিস্মরণের জন্ম দিচ্ছে।" লেখক আরও বলছেন, "আর এটা হয় আমাদের শারীরিকভাবে চতুষ্পার্শ হতে মুক্ত করে আর আমাদেরকে পুনঃ আমাদের আদিম ও অসত্যায়িত অবস্থায় নিয়ে গিয়ে।" মান তাঁর এই উপন্যাসটির ওপর আমেরিকায় বক্তৃতাকালে বলেছিলেন যে, "*দ্য ম্যাজিক মাউন্টেন*-এর অন্যতম প্রধান ভাব হলো সময়ের রহস্য।" মান এই উপন্যাসে আরও বলছেন, সময় হলো লিথি (গ্রিক পুরাণের বিস্মরণের নদী)।

দ্রষ্টব্য: *দ্য ম্যাজিক মাউন্টেন*, অনু. এইচ. টি. লোয়ে-পোর্টার, পেঙ্গুইন বুকস ১৯৬০, পৃ ৪। কাসটোর্প এক অজানিত অভাবিত মৃত্যু-অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় দাবোস-এ।

১৯ ফ্রানৎস কাফকার বিখ্যাত গল্প *মেটামরফসিস*-এর নায়ক গ্রেগর জামজা একদিন সকালে উঠে দ্যাখে যে সে একটি কীটে রূপান্তরিত হয়েছে।

২০ মনস্তাত্ত্বিক আত্মহত্যা বলতে বোঝানো হয় কবি-শিল্পীদের এমন এক বেপরোয়া

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধ্বংসমুখিতাকে যখন জ্ঞানতই একজন নিজ অস্তিত্বকে মৃত্যুমুখিতায় ঠেলে দেয়। আত্মহত্যা না করেও বেপরোয়া জীবন-যাপন, আত্মবিধ্বংসী ফ্যাশন ও সংরাগ, মাদকাসক্তি, অ্যালকোহলিজম প্রভৃতির দ্বারা মৃত্যুকে স্বাগত করাকে বলা যায় "মনস্তাত্ত্বিক আত্মহত্যা।"

২১ আত্মহত্যা-সম্পর্কিত গ্যোয়েটের চিন্তাভাবনা বিষয়ে অধিক জানা যাবে Albert Bielschowsky রচিত *The life of Goethe*, Vol. 1 (New York Haskell House Publishers, 1969) পৃষ্ঠা ১৮৪-১৮৭।

২২ ডাওসন সম্পর্কে আলোচনা আছে চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় রচিত *সোনার আলপনা* বইটিতে। প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৬০, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৯।

২৩ রুশ কবি ও ঔপন্যাসিক; মস্কোতে জন্ম, মস্কো ইউনিভারসিটিতে ও সেন্ট পির্তরবুর্গ সামরিক স্কুলে লেখাপড়া। ১৮৩৭ সালে কবি আলেকজান্দার পুশকিনের মৃত্যুতে প্রতিবাদস্বরূপ "অন্য দ্য ডেথ অব আ পোয়েট" নামীয় একটি এলিজি জারকে শুনিয়ে তিনি প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। এই কবিতায় লেয়ারমন্তফ জারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও শিল্পকে দমনের অভিযোগ আনেন। ফলে তাঁকে ককেসাসে নির্বাসনে যেতে হয়। ১৮৩৮ সালে নির্বাসন থেকে ফিরে এসে তিনি একটি কাব্য প্রকাশ করেন এবং তাঁর বিখ্যাত আত্মজৈবনিক উপন্যাস *আমাদের সময়ের নায়ক* (১৮৪০) লেখেন। স্বাধীনতা ও ধর্মবিরুদ্ধ প্রবণতার জন্য তাঁর লেখা সে-সময়ে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে বর্ণনামূলক কবিতা—*দ্য ভিশন* (১৮২৯-৪১), *ককেশিয়ান বয় (১৮৪০)*।

২৪ জন ডেভিডসনের এই চিন্তার সাথে ফ্রয়েডের চিন্তার সাদৃশ্য রয়েছে। ফ্রয়েডও বলেছেন যে প্রতিটি বস্তুই তার আদি অবস্থায় ফিরে যেতে চায়। ডেভিডসনও বলেছেন, মানুষ তার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যেতে চায়। ডেভিডসনের নাটকেও তাঁর দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়।

২৫ দ্রষ্টব্য *পবিত্র বাইবেল : নতুন নিয়ম, যোহন :* ১৮ ৩৮-৪০, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটী, পৃ ১৯৭।

২৬ দ্রষ্টব্য যোহন ১৯ ৪।

২৭ দ্রষ্টব্য যোহন ১৯ ১২।

২৮ রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান ধর্ম ছিল মিথ্রাস বা জুপিটারের পূজা; ক্রিশ্চিয়ানিটিকে ইহুদিদের একটি শাখা হিসেবে দেখা হতো। মূলত সম্রাট কনস্তান্তিন খ্রিস্টান হওয়ার পরই রোমান সাম্রাজ্যে ক্রিশ্চিয়ানিটির প্রভাব বাড়তে থাকে। বলা হয় যে খ্রিস্টান ধর্ম কনস্তান্তিন গ্রহণ না করলে বর্তমান ইউরোপের প্রধান ধর্ম হতো প্যাগানিজম ও প্রধান দেবতা হতো জুপিটার বা মিথ্রাস।

২৯ এর কবীর চৌধুরী কৃত অনুবাদ *একটি অতি সহজ মৃত্যু*, যা সময় প্রকাশন থেকে ২০০৩-এ বের হয়েছে।

৩০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮০।

৩১ দ্রষ্টব্য *গ্লিম্পস অব দ্য গ্রেট*, এডিটেড বাই ক্রি[illegible] সিলভেস্টার, পেঙ্গুইন ১৯৯৪।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মহত্যা : কৃষ্ণগহ্বর ও তার নিখিল উদ্ভাসন

১ বাংলায় একে বলা হয় বিষাদ যা এক মানসিক রোগ, যা থেকে দেখা দেয় Psychosomatic disorder বা শরীর ও মনের অসুস্থতা। ডিপ্রেসিভ ব্যক্তি থাকে বিষাদগ্রস্ত, দুঃখভারাক্রান্ত, ক্লান্ত। বেঁচে থাকা তার কাছে অর্থহীন। এই রোগে শারীরিক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় ক্ষুধাহীনতা, অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি। ডিপ্রেশনের তিনটি স্তর আছে সাধারণ বিষাদ, তাৎক্ষণিক (Acute) বিষাদ ও জড় বিষাদ (Depressive stupor)। প্রথমটির লক্ষণ বিষাদভাব দিয়ে: নিজেকে হতাশ ও অর্থহীন মনে করা। দ্বিতীয় স্তরে প্রথম স্তরে আবির্ভূত লক্ষণগুলি বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় স্তরে ব্যক্তির জড়ভাব পরিদৃষ্ট হয়—অলীক-ভাবনা ও ভ্রান্তিতে আক্রান্ত হয় রোগী।

২ Bipolar disorder : ম্যানিক ও ডিপ্রেশনের যৌথ অসুস্থতা।

৩ এটা এক সাইকোটিক রোগ। সাইকোটিক রোগে বাস্তবতাবোধ লুপ্ত হয়, ব্যক্তিত্ব অবিন্যস্ত ও অব্যবস্থিত হয়। সাইকোটিক রোগের মধ্যে স্কিটসোফ্রেনিয়ার সংখ্যাই সর্বাধিক। এই রোগে সম্পূর্ণ নিরাময়ের সম্ভাবনা কম। এই রোগের লাতিন নাম ছিল "দিমেনশিয়া প্রিকক্স" (Dementia Preacox); ১৯১১ সালে ইউজেন ব্লুলার (Euzen Blueler) এই রোগের নাম দেন স্কিট্সোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)। "দিমেনশিয়া প্রিকক্স"-এর অর্থ "চিত্তভ্রংশী ব্যাকুলতা"। এই রোগে ব্যক্তিত্বের বিশ্লিষ্টতা দৃষ্ট হয়। এছাড়া নির্বিকার ভাব, ভ্রান্তি, বিভ্রম, অমূলপ্রত্যক্ষণ, আবেগে স্খলিতভাব, অন্তর্বৃত মনোবৃত্তি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

৪ একে মনোবিজ্ঞানে বলা হয় Anxiety Reaction। এটি একটি নিউরোটিক রোগ। এই রোগে কিছু আতঙ্ক-লক্ষণ দেখা দেয়। চিত্তদুর্বলতা এই রোগের অন্যতম লক্ষণ। নিউরোটিক আতঙ্কগ্রস্ত রোগী মানসিক চাপের মধ্যে থাকে।

৫ ফ্রয়েড বলেছেন, শিশুকালে স্নেহ-আদর থেকে বঞ্চিত হলে পরবর্তীকালে মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে। একান্ত আপনজনদের কাছ থেকে আঘাত/প্রত্যাখ্যান/বঞ্চনা পেলে সৃষ্ট অভিমান বিষাদে পরিণত হয়।

(দ্রষ্টব্য Freud. S.*Mourning and Melancholia in Collected Papers, Vol.4.*)। তিনি বলেছেন ইদ্ ও সুপার ইগোর দ্বন্দ্বের ফলে বিষাদগ্রস্ততা আসে।

৬ আমেরিকান মনোচিকিৎসক Karl Menninger-এর মতে সকল আত্মহত্যার তিনটি সম্পর্কিত ও অবচেতনগত মাত্রা আছে। revenge/hate (a wish to kill), depression/hopelessness (a wish to die), and guilt (a wish to be killed).

৭ Masada হিব্রু অর্থ নগরদুর্গ, জেরুজালেম থেকে ৪৮.৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত, যেখানে রোমান-শাসনের (৬৬ খ্রিস্টাব্দ-৭৩) বিরুদ্ধে ইহুদি জিলোটরা (ইহুদি ধর্মীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠী) এক অয়োময় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। খ্রি. পূ. প্রথম শতাব্দীতে, জুদীয় রাজা হেরোদ কর্তৃক এখানে দুটি প্রাসাদ-দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল। হেরোদের মৃত্যুর পর মাসাদা রোমান কর্তৃক দখল হয় ও সৈন্যাবাসে পরিণত হয়।

৬৬ সালে আবার তা জিলোটদের পুনর্দখলে যায়। কিন্তু ৭০ সালে জেরুজালেম রোমান সাম্রাজের অধিকারে গেলে এখানে ১০০০ নারী, পুরুষ, শিশু, নেতা এলিয়াজার বেন জায়ের-এর নেতৃত্বে এক প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং রোমান দশম

~ www.amarboi.com ~

লিজন (সৈন্য বাহিনী) দুই বছর তা ঘিরে রাখে। ৭৩ সালে চূড়ান্তভাবে দুর্গের পতন হলে ৭ জন ছাড়া সবাই আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মহত্যা করে। ইসরায়েলের পুরাতত্ত্ববিদ ইজায়েল ইয়াদিন ১৯৬৩-৬৫ সময়ে এর পুনর্খনন করেন। এখন তা এক পর্যটন ও পবিত্র স্থান।

৮ Termination behavior আচরণের হঠাৎ নাটকীয় এবং অব্যাখ্যাত পরিবর্তনের লক্ষণসমূহ।

৯ Assisted Suicide অন্য ব্যক্তির সহায়তা নিয়ে কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত মৃত্যুবরণ করা; সাধারণত ব্যক্তি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে তীব্র ও অসহ্য শারীরিক কষ্টে নিপতিত হলে এরূপ মৃত্যুকে আবাহন করে।

১০ ব্রিটেন ও আমেরিকায় এ জাতীয় অনেক সংগঠন আছে যারা "Right-to-die"-এর জন্য আন্দোলন করে। যেমন ব্রিটেনের Exit এবং যুক্তরাষ্ট্রের Hemlock Society, যারা অসুস্থ রোগীদের শেষ সময়ের অসহ্য কষ্ট থেকে রেহাই পাবার উপায় হিসেবে আত্মহত্যাকে বরণ করার অধিকারকে সমর্থন করে, এবং এই অধিকারের জন্য আন্দোলন করে।

১১ বিভ্রম হলো Delusions বা মিথ্যা বিশ্বাস; সাইকোটিক রোগীর মধ্যে এটা থাকে। পাঁচ ধরনের ডিলিউশন দেখা যায় নির্যাতনমূলক, যৌনমূলক, ধর্মমূলক, মহনীয়মূলক, দৈনিক পরিবর্তনমূলক। সাধারণ সুস্থ মানুষের মধ্যেও এই অলীক কল্পনা কাজ করে, তবে সুস্থ মানুষ এই কল্পনায় বেশিক্ষণ থাকে না; অন্যদিকে রোগী একেই সত্য মনে করে। সার্ভেন্তিস-এর বিখ্যাত উপন্যাস *দন কিহোতো*-এ নায়ক দন কিহোতোর আচরণে এই অলীক কল্পনার প্রকাশ দেখা যায়। নায়ক কল্পনার আবেগে উইন্ডমিলকে দৈত্য, সরাইখানাকে প্রাসাদ, ভেড়ার পালকে শত্রুসৈন্য ভাবে।

১২ ফ্রয়েড বলেছেন, ম্যানিক স্তরে "ইদ্" দমিত ও শক্তিহীন থাকে এবং "ইগো" শক্তিমান হয়। ফলে আত্মকেন্দ্রিকতা ও মুক্ত ভাবের প্রকাশ দেখা দেয়। "ইগো" দ্বন্দ্বের বাইরে থাকে ফলে ডিপ্রেসিভ রোগী আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। আবার "সুপার ইগো"র প্রভাব এই রোগে প্রাধান্য পায় বলে রোগীকে বাধা-নিষেধ ও আত্মসংযমের মাঝ দিয়ে যেতে হয়। "সুপার ইগো"র কর্তৃত্ব ও "ইগো"র বিরামহীন শাসনে "ইদ্" দুর্বল হয় ক্রমশ, রোগী বিষাদগ্রস্ত হয়।

দ্রষ্টব্য *মনঃস্বাস্থ্য বিজ্ঞান*, মঞ্জরী সেনগুপ্ত (দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৪), পৃ. ১০১।

১৩ "Learned helplessness"—বলেছেন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী Martin Seligman, যার অর্থ, এমন এক অর্জিত বিশ্বাস যে একজন কোনোভাবেই ঘটনার আবির্ভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

১৪ ব্যক্তিত্ববর্ধক Personality enhancer; সাধারণত এ জাতীয় ওষুধ হলো Selective serotonin reuptake inhibitors যার মধ্যে রয়েছে? Fluoxetine (Prozac), Sertraline (Zoloft)। এর মধ্যে Prozac সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এন্টিডিপ্রেসেন্ট। ১৯৮০-এ প্রস্তুতকারক এলি লিলি অ্যান্ড কোম্পানি কর্তৃক এই ওষুধ বাজারে আসার পর তা কার্যকরি ওষুধ হিসেবে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। ডিপ্রেশনের বিরুদ্ধে কার্যকরি ওষুধ হিসেবে এর ব্যবহার ব্যাপক। অনেকে আবার বলেন যে প্রোজেক (Prozac)

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মবিশ্বাস, আশা, শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্বকে পরিণত করে। তবে মানসিক চিকিৎসা-বিশারদেরা, বিশেষত চিকিৎসাগত ডিপ্রেশন ছাড়া, শুধু সাধারণ ক্ষেত্রে "ব্যক্তিত্ববর্ধক" হিসেবে Prozac-এর ব্যবহারের বিষয়ে মারাত্মক নৈতিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

১৫ ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস হলো আনন্দ-বেদনার দোলাচল। ম্যানিক হলো উত্তেজিত অবস্থা অতিকার্যকরী এক উতলিত মানসিক অবস্থা। ডিপ্রেসিভ হলো বিষাদাবস্থা। ম্যানিয়ার তিন অবস্থা হাইপোম্যানিয়া বা অল্প ম্যানিয়া, মারাত্মক ম্যানিয়া, অত্যধিক ম্যানিয়া; বিষাদেরও তিন অবস্থা বা স্তর সাধারণ বিষাদ, বিষাদগ্রস্ততা, বিষাদগ্রস্ত জড়ত্ব।

দ্রষ্টব্য মঞ্জরী সেনগুপ্ত, *মনঃস্বাস্থ্য বিজ্ঞান* (দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০০৪), পৃ: ৯৮-৯৯।

১৬ Cyclothymic একসময় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ম্যানিক ডিপ্রেসিভ রোগকে আবর্তিত উন্মাদনা (Circular insanity) নামে ডাকা হতো। কারণ, তা ম্যানিয়া এবং ডিপ্রেশনে আবর্তন ও প্রত্যাবর্তন করত। জার্মানির কার্ল কাহ্‌লবম এই রোগের নাম দেন সাইক্লোথিমিয়া।

১৭ গগাঁর ছবিটির ইংরেজি নাম *Where do we come from? What are we? Where are we going?*

১৮ হ্বিটগেনস্টাইনের উক্তিটি হলো "to kill oneself is always a dirty thing to do.... ।

দ্রষ্টব্য *আলোচনা চক্র*, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৯৭-এ প্রকাশিত শেফালী মৈত্র-এর প্রবন্ধ "হ্বিটগেনস্টাইন : জীবন ও দর্শন", পৃষ্ঠা : ৩৯।

১৯ দ্রষ্টব্য এমিল দ্যুরকহাইম, *দ্য সুইসাইড* (রাউটল্যাজ ২০০২), পৃষ্ঠা ৯-১১।

২০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃ. ৫৪।

২১ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃ. ১২৬।

২২ Altruistic Suicide দ্রষ্টব্য ওই পৃ. ১৭৫।

২৩ Bartholin *De Causis contemptae mortis a Danis.*

২৪ দ্রষ্টব্য সুইসাইড, পৃ. ১৭৭।

২৫ হারা-কিরি (Hara-Kiri) জাপানে প্রচলিত এক বিশেষ ধরনের আত্মহত্যা যেখানে ব্যক্তি ছুরি দিয়ে নিজের পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলে।

২৬ Kamikaze pilots Kamikaze-এর জাপানি অর্থ Divine Wind। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির এক মাস আগে জাপানি বিমানবাহিনী কর্তৃক এই আত্মঘাতী স্কোয়াড গঠন করা হয়। তারা বিস্ফোরকসহ বিমান নিয়ে সরাসরি যুদ্ধজাহাজে ঢুকে যেত। এভাবে এই স্কোয়াড ৪০টি আমেরিকান জাহাজ ডুবিয়ে দেয়।

২৭ দ্রষ্টব্য *বাইবেল : যাত্রাপুস্তক* : ২০ ১৩।

২৮ দ্রষ্টব্য সুইসাইড, পৃ. ১৭৬।

২৯ দ্রষ্টব্য *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, তৃতীয় ভাগ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১), ধারা ১১৫৯, পৃ. ৩৩২।

৩০ সুরা বনি ইসরাইল

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩১ সুরা আন-নিসা ২৯।

৩২ দ্রষ্টব্য *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, তৃতীয় ভাগ, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১), পৃষ্ঠা : ৬৩৩।

৩৩ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃ. ৬৩৩।

৩৪ দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃ. ৬৩৪।

৩৫ দ্রষ্টব্য তদেব, ধারা ১১৫৮, পৃ. ৬৩০।

৩৬ দ্রষ্টব্য রাজশেখর বসু (সারানুবাদ), *মহাভারত* (এমসি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৩৯৪), অশ্বমেধিক পর্ব, পৃষ্ঠা ৬৩৬।

৩৭ গাজী শামসুর রহমান, *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, (খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৮), পৃ. ৬৯৮।

৩৮ হুমায়ুন আজাদ, *আমার অবিশ্বাস*, (ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭). পৃ. ২০।

৩৯ আর্নল্ড টয়েনবি ও দাইসাকু ইকেদা, *সৃজনমূলক জীবনের দিকে*, (ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮), পৃ. ১৩২।

৪০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃ. ১৩২।

ইতিহাস ও পটভূমি

১ দ্রষ্টব্য *ভিনসেন্ট*, সংকলন ও সম্পাদনা: অনির্বাণ রায় (হাওড়া একাডেমী থিয়েটার, ১৯৯৮), পৃষ্ঠা ৭৮।

২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮২।

৩ Lrnst Ludwig Kirchner জন্ম ১৮৮০, মৃত্যু ১৯৩৮; জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। নাৎসি বাহিনী তাঁর ৬০০টি ছবি বাজেয়াপ্ত করছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।

৪ Francois Le Moyne ফরাসি চিত্রশিল্পী, জন্ম ১৬৮৮–মৃত্যু ১৭৩৭। ১৭১৮ সালে তিনি ফরাসি আকাদেমির সদস্য হন এবং মৃত্যুর আগে Painter to the king হিসেবে নিয়োজিত হন। ভার্সেই-এ Vault of the Salon d' Hercules-এর (১৪২টি ছবির) সজ্জিতকরণের জন্য তিনি স্মরণীয়। আত্মহত্যার ঠিক আগে আঁকেন ছবি Time Revealing Truth.

৫ Francesco Borromini ১৬৬৭ সালের ২ আগস্ট আত্মহত্যা করেন।

৬ President Ngo Dinh Diem ১৯৫৫-৬৩ পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বৈরশাসক ছিলেন।

৭ দ্রষ্টব্য Sir James Frazer, *The Golden Bough A Study in Magic and Religion (1922),* Wordsworth Reference:1993।

Page :354-355: Odin was Called the lord of the Gallows or the God of the Hanged, and he is represented sitting under a gallows.

৮ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড আ স্টাডি অব সুইসাইড* (লন্ডন: ব্লুমসবেরি ২০০২), পৃষ্ঠা ৭৩।

৯ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন: ব্লুমসবেরি: ২০০২), পৃষ্ঠা : ৬৪।

১০ Plataea থিবিসের দক্ষিণে গ্রিসের প্রাচীন নগর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১১ Libanius : বিখ্যাত বাগ্মী, জন্ম ৩৪০-মৃত্যু ৩৮০।

১২ দ্রষ্টব্য : আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন: ব্লুমসবেরি ২০০২), পৃষ্ঠা ৭৯।

১৩ Tullius Servius রোমের ষষ্ঠ রাজা বলে কথিত; শাসনকাল খ্রি.পূ. ৫৭৮-৫৩৫ খ্রি.পূ.।

১৪ দ্রষ্টব্য : আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন: ব্লুমসবেরি ২০০২), পৃষ্ঠা : ৬৫।

১৫ দ্রষ্টব্য এমিল দ্যুরকহাইম, *সুইসাইড* (লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক রাউটলেজ ২০০২), পৃষ্ঠা ২৯২।

১৬ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৯২।
সিদ্ধান্তটি ছিল Victims of Suicide would be "honored with no memorial in the holy sacrifice of the mass, and the singing of psalms should not accompany their bodies to the grave."

১৭ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৩।

১৮ এ জাতীয় আত্মহত্যাকারীকে Felon (felo de se) বা দুর্বৃত্ত বা জঘন্য অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং তার সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হতো।
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৩।

১৯ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৩।

২০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৩-২৯৪।

২১ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৪।

২২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৪। এখানে বলার অপেক্ষা রাখে যে দ্যুরকহাইম-এর বইটি ১৮৯৭ অব্দে প্রথম প্রকাশিত, তাঁর বিবেচনা ও তথ্যাবলির কাল ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। বর্তমানে তা ভিন্ন হতে পারে।

২৩ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৪।

২৪ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন : ব্লুমসবেরি ২০০২), পৃষ্ঠা : ৬৭।

২৫ *Religio Medici* Religion of a Doctor, ইংরেজ চিকিৎসক ও প্রাবন্ধিক স্যার টমাস ব্রাউন (১৬০৫-১৬৮২)-এর লিখিত প্রথম গ্রন্থ যা সম্ভবত ১৬৩৫ সালে লেখা হয়। গ্রন্থে সন্দেহবাদ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ বিশ্বাস ও প্রকাশিত বাক্যের সাথে বিমিশ্রিত হয়।

২৬ Samuel Johnson (১৭০৯-১৭৮৪), ইংরেজ লেখক ও প্রথম ইংরেজি ভাষার অভিধান রচয়িতা। সমসাময়িকেরা তাঁকে ডা. জনসন নামে ডাকত। তিনি, ১৭৫৫-এ, *Dictionary of the English Language* প্রকাশ করেন। এতে ৪০,০০০ ভুক্তি সন্নিবেশিত হয়। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তি। স্কটিশ লেখক ও তাঁর বন্ধু জেমস বসওয়েল (James Boswell) তাঁর জীবনী *Life of Samuel Johnson* রচনা করেন ১৭৯১ সালে যা শ্রেষ্ঠ জীবনী হিসেবে বিখ্যাত হয়।

২৭ দ্রষ্টব্য আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (ব্লুমসবেরি: ২০০২), পৃষ্ঠা ৬৮। আলভারেজ উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে এই শব্দগুলো: Self-murder, self destruction, self killing, self-homicide, self-slaughter.

২৮ Tertullian (১৬০?-২২০?) আদি যাজকদের অন্যতম; প্রথম লাতিন যাজক-লেখক। তাঁর বিখ্যাত রচনা Aplogeticus সম্ভবত ১৯৭ অব্দে লিখিত।

২৯ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন ব্লুমসবেরি: ২০০২), পৃষ্ঠা : ৬৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩০ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন : ব্লুমসবেরি ২০০২), পৃষ্ঠা : ৬৯।

৩১ Phaedo প্লাতোন লিখিত টেক্সট যেখানে সোক্রাতেসের মৃত্যু-দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। এই ব্যাপারে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ আছে বারট্রান্ড রাসেল-এর *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*-এর "অমরত্ব-বিষয়ক প্লাতোনের তত্ত্ব" অধ্যায়ে। রাসেল সেখানে বলেছেন "ফায়েইদো বলে যে আলাপচারিতা প্রচলিত তা কতকগুলি কারণে কৌতূহলোদ্দীপক। এই কথোপকথন সোক্রাতেসের জীবনের অন্তিম মুহূর্তের বর্ণনা: হেমলক পানের আগ থেকে তাঁর চৈতন্য বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত।"

৩২ রাসেল তাঁর *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস* গ্রন্থের "পিথাগোরাস" অধ্যায়ে বার্নেট-এর উদ্ধৃতির মাধ্যমে পুথাগোরাসের এ সংক্রান্ত ভাবনার কথা জানান: "এই পৃথিবীতে আমরা আগন্তুক আর দেহ আত্মার সমাধিমন্দির, আর আমরা কখনোই আত্মহত্যার মাধ্যমে পলায়নের পথ খুঁজতে পারি না; কারণ, আমরা ঈশ্বরের অস্থাবর সম্পত্তি, তিনি আমাদের নেতা আর তাঁর আদেশ ছাড়া পলায়নের কোনো অধিকার নেই আমাদের।

দ্রষ্টব্য বারট্রান্ড রাসেল, *হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলোসোফি* (রাউটলেজ লন্ডন: ১৯৬৬), পৃষ্ঠা ৫২।

৩৩ রাসেল তাঁর *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস* গ্রন্থের "অমরত্ব-বিষয়ক প্লাতোনের তত্ত্ব" অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত সোক্রাতেসের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন ফায়েদ্রুস-বিষয়ক আলোচনায়: সোক্রাতেস বলতে লাগলেন, যদিও দর্শনাক্রান্ত মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় না বরং মৃত্যুকে সাদর আহ্বান জানায়, তবু সে-ব্যক্তি নিজ জীবন হরণ করেন না, কারণ, তা বেআইনি বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁর বন্ধুরা প্রশ্ন করলেন কেন আত্মহত্যা বেআইনি, এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর উত্তর অর্ফীয় ভাবধারায় কোনো খ্রিস্টানের সম্ভাব্য বক্তব্যের মতো: "একটি মতবাদ গোপনে কানে ধ্বনিত মানুষ এক বন্দি, দরজা খুলে পলায়নে তার ক্ষমতা নেই ..."

দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৮।

৩৪ Spartacus স্পার্তাকাস মৃত্যু ৭১ (খ্রি. পূ.)। রোমান দাস এবং গ্লাদিয়েতর, জন্ম থ্রেস-এ। রোমান সৈন্যবাহিনী থেকে পালিয়ে রোমান দাস-বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন যা তৃতীয় সারভাইল যুদ্ধ বলে পরিচিত; সেই যুদ্ধে তিনি দুটি রোমান সৈন্যদলকে পরাজিত করেন। খ্রি.পূ. ৭২-এ তিনি আরও তিনটি রোমান বাহিনীকে পরাজিত করেন। খ্রি. পূ. ৭১-এ রোমান অধিনায়ক মার্কুস লিসিনিয়ুস ক্রাস্পুস-এর সাথে যুদ্ধে তিনি মারা যান।

৩৫ দ্রষ্টব্য স্যার জেম্‌স ফ্রেজার, *দ্য গোল্ডেন বাও আ স্টাডি ইন ম্যাজিক অ্যান্ড রিলিজিয়ন* (ওয়ার্ডসওয়ার্থ রেফারেন্স ১৯৯৩), পৃষ্ঠা : ৩৫৫।

৩৬ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন: ব্লুমসবেরি ২০০২), অধ্যায়: দ্য বেকগ্রাউন্ড, পৃষ্ঠা : ৭৪।

৩৭ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা [illegible]।

৩৮ Lacedaemo[illegible] Sparta[illegible]

৩৯ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন: ব্লুমসবেরি ২০০২), পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪০ Catana Catania: দক্ষিণ ইতালির একটি শহর।

৪১ দ্রষ্টব্য : আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন: ব্লুমসবেরি ২০০২), পৃষ্ঠা ৭৭।

৪২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৭৭।

৪৩ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন: ব্লুমসবেরি ২০০২), পৃষ্ঠা : ৭৮-৭৯।

৪৪ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৭৯।

৪৫ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮০। এর সমান্তরাল আরও অনেক উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে, যেমন এপিকুরেসের উক্তি: আমাদের নিকট মৃত্যু কিছুই নয়, কারণ যা বিশিষ্ট হয় তার থাকে না কোনো অনুভূতি আর যার অনুভূতি থাকে না তার সাথে আমাদের কোনো যোগসূত্র নেই।

দ্রষ্টব্য *বারট্রান্ড রাসেল, হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলোসোফি*, (রাউটলেজ: লন্ডন: ১৯৯৬), পৃষ্ঠা ২২৫। স্টোয়িক মার্কুস আরেলিয়ুস তাঁর *মেডিটেশন*-এ বলেছেন মর্ত্যমানব: তুমি এই বিশাল নগরের একজন নাগরিক, পাঁচ বা পঞ্চাশ বছর—তাতে তোমার কী আসে যায়? তার আইন সব মানুষের জন্যই সমান।

দ্রষ্টব্য শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী, *আমার দেবোত্তর সম্পত্তি*, (কলকাতা: আনন্দ পা. প্রা. লি. দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫), পৃষ্ঠা ২৭৬।

৪৬ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৮০।

৪৭ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৮১।

৪৮ Cato the Elder রোমান লেখক ও কূটনীতিজ্ঞ, জন্ম খ্রি. পূ. ২৩৪, মৃত্যু খ্রি. পূ. ১৪৯। পুরো নাম Marcus Porcius Cato.

Cato the Younger : পূর্বজনের নাতি, তিনিও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং সততার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। জন্ম খ্রি.পূ. ৯৫, মৃত্যু খ্রি. পূ. ৪৬।

৪৯ Hannibal জন্ম খ্রি. পূ. ২৪৭-এ, মৃত্যু খ্রি. পূ. ১৮৩। বিখ্যাত কাথাজিনীয় (Cathaginian) জেনারেল। ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে আলপ্‌স্ পেরিয়ে ইতালি আক্রমণ করে রোমান সৈন্যদের পরাজিত করেছিলেন।

৫০ পুরো নাম: Marcus Cocceius Nerva জন্ম আনুমানিক ৩৫ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু ৯৮-এ। রোমান সম্রাট, শাসনকাল ৯৬-৯৮ খ্রিস্টাব্দ। প্রথম সদাশীল সম্রাট হিসেবে স্বীকৃত।

৫১ Publius Papinius Statious লাতিন গীতিকবি।

৫২ অ্যাসিরিয়ার শেষ রাজা; তিনি মিডাস দ্বারা ঘেরাও হলে রাজপ্রাসাদে নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন।

৫৩ দ্রষ্টব্য : আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন: ব্লুমসবেরি : ২০০২), পৃষ্ঠা : ৮২।

৫৪ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৮৩।

৫৫ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৮৪।

৫৬ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৮৪।

৫৭ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা [illegible]

৫৮ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৮৬

৫৯ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৮৬

৬০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬১ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮৭।

৬২ Donatists Donatism ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর ধর্মচ্যুতি-সংক্রান্ত খ্রিস্টান আন্দোলন যারা দাবি করত যে আধ্যাত্মিকতার বৈধতা মন্ত্রীদের নৈতিক চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল।

৬৩ দ্রষ্টব্য Edward Gibbon, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Volume:* I, Penguin Books 1995, Edited by David Womensley P. 823.

৬৪ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮২৩।

৬৫ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, দ্য স্যাভেজ গড (লন্ডন ব্লুমসবেরি ২০০২), পৃষ্ঠা ৮৮।

৬৬ উত্তর-পশ্চিম পর্তুগালের একটি শহর। প্রাচীন নাম Bracara Augusta।

৬৭ Toledo স্পেনের শহর।

৬৮ *Summa Contra Gentile* সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা ১২৫৯-৬৪ সময়ে লিখিত হয়। বইটিতে খ্রিস্টান ধর্মের সত্যকে যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর আরেকটি গ্রন্থ: *সাম্মা অ্যাপোলোজিয়া*।

৬৯ Canon Law গ্রিক Kanon থেকে এসেছে যার অর্থ বিধি বা নিয়ন্ত্রণ। খ্রিস্টীয় চার্চের গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত বিধি-বিধান।

৭০ দ্রষ্টব্য: আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন : ব্লুমসবেরি : ২০০২), পৃষ্ঠা : ৯২।

ভ্রান্তি, বিবেচনা ও যুক্তিসূত্র

১ দ্রষ্টব্য: আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন: ব্লুমসবেরি ২০০২). পৃষ্ঠা ৯৯।

২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০১।

৩ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০১-১০২।

৪ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০২।

৫ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০৩।

৬ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০৩।

৭ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ১০৩।

৮ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০৪।

৯ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ১০৬।

১০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০৮।

১১ দ্রষ্টব্য এমিল দ্যুরকহাইম, *সুইসাইড* (রাউটলেজ : লন্ডন: ২০০২) পৃষ্ঠা ১০।

১২ দ্রষ্টব্য: আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন : ব্লুমসবেরি : ২০০২), পৃষ্ঠা ১০৮।

১৩ দ্রষ্টব্য এমিল দ্যুরকহাইম, *সুইসাইড* (রাউটলেজ লন্ডন: ২০০২) পৃষ্ঠা XXI; এক্ষেত্রে স্টাইনমেট্জ-এর উক্তিও জিলবোর্গের মতকে সমর্থন করে। স্টাইনমেট্জ বলেছেন: "প্রাপ্ত উপাত্ত, যা আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা থেকে সম্ভাব্য প্রতীয়মান হয় যে, সভ্য মানুষকুল অপেক্ষা বন্য মানুষকুলের মধ্যে আত্মহত্যার অধিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।" দ্রষ্টব্য ওই।

১৪ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৫ দ্যুরকহাইম তাঁর গ্রন্থের "পুস্তক-২" অংশে "সামাজিক কারণ ও সামাজিক প্রকারভেদ" অধ্যায়ে এর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০৫-১২৬।

১৬ আলব্যের কাম্যু, *দ্য মিথ অব সিসিফাস অ্যান্ড আদার এসেজ* (ভিনটেজ নিউ ইয়র্ক ১৯৯১), পৃষ্ঠা : ৪।

১৭ Anomic গ্রিক anomia হতে উদ্ভূত যার অর্থ Lawlessness। চেম্বার্স ডিকশানারিতে Anomic বলতে বলা হয়েছে a condition of hopelessness caused or Characteristics by breakdown of rules of conduct and loss of belief and sense of purpose.

১৮ দ্রষ্টব্য এমিল দ্যুরকহাইম, *সুইসাইড* (রাউটলেজ লন্ডন নিউ ইয়র্ক ২০০২), পৃষ্ঠা ২০৭।

১৯ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২০৭।

২০ Anomy.

২১ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২১৯। দ্যুরকহাইম বলেছেন Anomy, therefore, is a regular and specific factor in suicide in our modern societies; one of the springs from which the annual contingent feeds.

২২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২১৯।

২৩ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২১৯।

২৪ Catch 22.

২৫ দ্রষ্টব্য: আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন ব্লুমসবেরি ২০০২), পৃষ্ঠা ১১৫।

২৬ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১১৭।

২৭ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১১৮।

২৮ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১১৮।

২৯ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১১৮।

৩০ দ্রষ্টব্য আলব্যের কাম্যু, *দ্য মিথ অব সিসিফাস অ্যান্ড আদার এসেজ* (ভিনটেজ নিউ ইয়র্ক ১৯৯১), পৃষ্ঠা ৪-৫।

৩১ দ্রষ্টব্য: আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন: ব্লুমসবেরি : ২০০২), পৃষ্ঠা : ১২৩।

৩২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১২৩।

৩৩ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১২৩।

৩৪ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১২৫।

৩৫ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১২৫-১২৬।

৩৬ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১২৭।

৩৭ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৩২।

৩৮ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৬।

৩৯ দ্রষ্টব্য ভলত্যার, *কাঁদিদ* (অনুবাদ অরুণ মিত্র সাহিত্য অকাডেমি: দিল্লি, প্রথম সংস্করণ ১৯৭০, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০১), পৃষ্ঠা ৩৯

৪০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪১ দ্রষ্টব্য আল-বিরুনি, *ভারত* (অনুবাদ প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট নয়াদিল্লি: ১৯৯৮), পৃষ্ঠা ২০৯।
৪২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২০৯।
৪৩ দ্রষ্টব্য: আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন: ব্লুমসবেরি ২০০২), পৃষ্ঠা ১৪৫।
৪৪ আলব্যের কামু্য, *দ্য মিথ অব সিসিফাস অ্যান্ড আদার এসেজ* (ভিনটেজ : নিউ ইয়র্ক ১৯৯১), পৃষ্ঠা : ১০৫।
৪৫ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০৬।
৪৬ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০৮।
৪৭ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন ব্লুমসবেরি ২০০২), পৃষ্ঠা ১৪৯।
৪৮ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৯।
৪৯ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৯।
৫০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৫০।
৫১ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৫০।
৫২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৪।
৫৩ দ্রষ্টব্য মার্ক সাইনফেল্ট, *ফাইনাল ড্রাফ্‌টস* (প্রমিথিউস বুকস : নিউ ইয়র্ক ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ২১৫।

মাত্রামানব ও ইচ্ছামৃত্যুর কথকতা

১ "সাইকোলজি অ্যান্ড লিটারেচার" প্রবন্ধে কার্ল গুস্তাফ ইয়ুং এ কথা বলেছেন "human psyche is the womb of all the arts and science." মনোবিজ্ঞানের সাথে শিল্পের সহ-সম্পর্কতা সূত্রে তিনি এ কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, মনোবিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব-পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিধায় তা সাহিত্যকেও তার বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করে।
দ্রষ্টব্য কার্ল গুস্তাফ ইয়ুং, *দ্য স্পিরিট ইন ম্যান, আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার*, (রাউটলেজ, ২০০৩) পৃষ্ঠা ১০০।

২ "অ্যানলাইটিক্যাল সাইকোলোজি অ্যান্ড পোয়েট্রি" নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে ইয়ুং একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, শিল্প, অন্য অনেক মানবীয় তৎপরতার মতোই, মন-তৎপরতা থেকে উদ্ভূত, যা মনোবিজ্ঞানের জন্য এক যথাযথ বিষয়।
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০৪।

৩ "সাইকোলজি অ্যান্ড লিটারেচার" প্রবন্ধে ইয়ুং একথা বলেছেন।
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০৪।

৪ উপরোল্লিখিত প্রবন্ধের "শিল্পী" অধ্যায়ে ইয়ুং এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে এ সত্ত্বেও আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ শিল্পীর ও শিল্পের সমস্যা নিয়ে [illegible] থেকে নিবৃত্ত হয় না।
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১১৭।

৫ উল্লিখিত একই প্রবন্ধে ইয়ুং এসব কথা বলেছেন। তিনি উপসংহারে বলেছেন যে, এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে একজন শিল্পী, একজন মনোবিজ্ঞানীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য, বিশেষত এক আকর্ষণীয় নমুনা।

~ www.amarboi.com ~

তিনি আরও বলেছেন, শিল্পীর জীবন এক নিরন্তর দ্বন্দ্ব ছাড়া অন্য কিছু নয়; দুই শক্তি তার মধ্যে যুদ্ধাবস্থায় বিরাজিত এক দিকে সুখ, সন্তুষ্টি, নিরাপত্তার জন্য সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষাবোধ, আর অন্যদিকে, সৃষ্টির জন্য এক নির্মম সংরাগ যা ব্যক্তিক ইচ্ছাকে পদদলিত করে যায়।

৬ আত্মহত্যাস্পৃহা দীর্ঘদিন ধরে অবদমিত অবস্থায় থাকতে পারে ব্যক্তির মনে; ব্যক্তি কখনও মন্দ কাজ ভেবে আত্মহত্যা করা থেকে বিরত থাকতে পারে কিন্তু পুনরায় তা ফিরে আসতে পারে তার মধ্যে। এমিল দ্যুরকহাইম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *সুইসাইড*-এ এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। "Melancholy suicide" আলোচনায় তিনি এই পুনরাবির্ভাব বিষয়ে বলেছেন। "Malancholy suicide" বিষয়ে তিনি বলেছেন যে, কোনো ক্ষেত্রে আত্মহত্যাস্পৃহার পুনরাবির্ভাব ঘটে অন্য উদ্দেশ্য বা motive থেকে। দ্রষ্টব্য: এমিল দ্যুরকহাইম, *সুইসাইড*, (রাউটলেজ লন্ডন : ২০০২), পৃষ্ঠা : ১০।

৭ উল্‌ফ বলেছিলেন "the one experience I will never describe"; তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন তাঁর সঙ্গী স্যাকভিলি ওয়েস্টকে। এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে Quentin Bell-এর Virginia Woolf *A Biography* (New York Harcourt, Brace and Jovanovich, 1972)-এ এবং *Final Drafts*-এ (মার্ক সাইনফেল্ট, *ফাইনাল ড্রাফ্‌টস*, (প্রমিথিউস বুক্‌স, নিউ ইয়র্ক: ১৯৯৯) পৃষ্ঠা : ১৫৩।

৮ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৮৪।
ইংরেজিটি এরকম "Sometimes this genius goes, dark and sinks down into the bitter well of the heart"—এই উক্তিটি নেওয়া হয়েছে জন ফেলস্টাইনার-এর *পাউল সেলান: পোয়েট, সারভাইবার, জিউ* (নিউ হ্যাভেন অ্যান্ড লন্ডন: ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫) থেকে, পৃষ্ঠা ২৮৭।

৯ গ্রোডেক একটি জায়গার নাম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। এই নামে তাঁর একটি কবিতাও আছে যা তাঁর রচিত শেষ কবিতা। এর কয়েকটি লাইন:

O prouder grief ! O altars of brass
The searing flame of the spirit is fed by a mighty
sorrow today,
The grandchidren not to be born.

১০ দ্রষ্টব্য *ফাইনাল ড্রাফ্‌টস* (১৯৯৯), পৃষ্ঠা : ৮৬।

১১ এছাড়াও তাঁর "লেডি ল্যাজারাস" কবিতায় তিনি বলেন যে প্রতি দশ বছরে কমপক্ষে একবার জীবন শেষ করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ভেতর দেখা দিত এবং তা এত শক্তিশালী ছিল যে তিনি এই তাড়নাকে কোনোভাবেই প্রতিহত করতে পারতেন না, ফলে আত্মহত্যার চেষ্টা চালাতেন। "লেডি ল্যাজারাস"-এ তিনি লেখেন:

I have done it again
One year in every ten
I manage it...

কাকতালীয় হলেও সত্যি যে তাঁর প্রথম আত্মহত্যা প্রচেষ্টার দশ বছর পর ঘটে তাঁর সার্থক-সফল আত্মহত্যা : ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩; অবশ্য "লেডি ল্যাজারাস"-এ তিনি বলেন যে প্রথম আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ছিল দশ বছর বয়সে এবং তা ছিল নিছক এক দুর্ঘটনা।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

১২ তাঁর পিতা ক্লারেন্স হেমিংওয়েও বন্দুক দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেছিলেন। মৃত্যুর সময় ক্লারেন্স বহুমূত্র এবং আনজিনা পেকটোরিস রোগে ভুগছিলেন; আর তা ছিল কষ্টকর ও অনিদ্রাকর।

১৩ তাঁর স্ত্রীদের নাম হ্যাডলি রিচার্ডসন, পাউলিন ফেইফার, মার্থা গেলহর্ন, মেরি ওয়েল্‌শ। এসব নারীদের সাথে হেমিংওয়ের সম্পর্ক ছিল সংঘর্ষমূলক ও অশান্তিময়। প্রথম তিন স্ত্রীর সাথেই তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছিল।

১৪ তাঁর সব কবিতাতেই এক মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষার অন্বেষণ দেখা যায়। "দ্য অ্যাডিক্ট" কবিতায় সেক্সটন নিজেকে বলেছেন এক "ঘুমবিক্রেতা" এবং এক "মৃত্যুবিক্রেতা"। তিনি যে কাব্যের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পান তার নাম *বাঁচা অথবা মরা*। নিজের জীবনের অবসান নিয়ে তিনি মুহুর্মুহুভাবে অনুধ্যানে ছিলেন, পরিকল্পনা করেছেন মরণোত্তর কবিতা-সংকলন নিয়ে; চূড়ান্তভাবে প্ররোচিত হয়েছেন *দ্য ডেথ নোটবুক* প্রকাশ করতে। কবিতায় দুর্মরভাবে প্রকাশ করেছেন বিস্মৃতি আর বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে। "মৃত", "মৃত্যু", "মরা" আর "আত্মহত্যা" অনবরতই কবিতার নাম হিসেবে দেখা দিয়েছে, যেমনটি দেখা দিয়েছে কবিতার শিরোনাম হিসেবে "মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা", "মৃতই সত্য জানে" "আত্মহত্যালিপি", "গডফাদার ডেথ", "পিতার মৃত্যু", "মি. মরণের জন্য, যে তার দরজা খোলা রেখে দণ্ডায়মান"। *বাঁচা অথবা মরা* কাব্যের অন্তর্ভুক্ত, ১৯৬৬ সালে লিখিত "মরার ইচ্ছা" কবিতায়ও তাঁর মৃত্যু-অভীপ্সার তুমুল প্রতিফলন দেখা যায়। মৃত্যু তাঁকে অধিকার করেনি, মৃত্যু ছিল তাঁর অধিকৃত।

১৫ তাঁর বিখ্যাত উক্তি Times a liar/And space a trick। প্রস্তাবিত ট্রিলজি *God and Mammon*-এ কথাগুলো আছে।
দ্রষ্টব্য John Davidson, *God and Mammon. Mammon and His Message* (London :G.Richards, 1908) পৃষ্ঠা ৫৫।

১৬ তাঁর অনেক গল্প-উপন্যাস, নাটকে এই ধারণার প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর উপন্যাস *কনফেশনস অব আ মাস্ক* ও *প্রেমের তৃষ্ণায়* এর বিকাশ লক্ষণীয়।

১৭ ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা জাপানি সাহিত্যের প্রথম নোবেল লরিয়্যাট। তাঁর নোবেল লরিয়্যাট হিসেবে প্রদত্ত বক্তৃতার শিরোনাম ছিল, "আমি ও সুন্দর জাপান।" এই ভাষণটি পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। কাওয়াবাতা বলেন, "সারাজীবন ধরে আমি সুন্দরের জন্য সংগ্রাম করেছি, আর মৃত্যু পর্যন্ত তা বজায় থাকবে।"
দ্রষ্টব্য মার্ক সাইনফেল্ট, *ফাইনাল ড্রাফট্‌স*, প্রমিথিউস বুকস, নিউ ইয়র্ক ১৯৯৯।

১৮ কাওয়াবাতা আত্মহত্যা করেছিলেন কিন্তু নোবেল লরিয়্যাটের ভাষণে তিনি আত্মহত্যাকে নিন্দা জানিয়েছেন: "...Suicide is not a form of enlightenment. However admirable he may be, the man who commits Suicide is far from the realm of the saint"
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৫।

১৯ তাঁর পিতা জন অ্যালিন স্মিথ ১৯২৬ সালের ২৬ জুন আত্মহত্যা করেছিলেন। এ সময় তাঁর (বেরিম্যান) বয়স ছিল এগারো। তাঁর তখন নাম ছিল জন অ্যালাইন স্মিথ জুনিয়র। সারাজীবন পিতার আত্মহত্যা তাঁর মনে অবদমিতভাবে কাজ করছিল। পিতার আত্মহত্যাকে নিয়ে কবিতাও লিখেছেন: তাঁর *ড্রিম সংস্*-এ তা রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেখানে তিনি যুক্তি দেখান যে পিতার মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বার্থপর মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ।

২০ এই সময়ের অনেক কবিতায় তাঁর নিজেকে হত্যার আকুতি ধরা পড়ে, তবে "অব স্যুইসাইড" কবিতাটি খুবই তীক্ষ্ণ এ বিষয়ে। একই সাথে মৃত্যুর প্রতি তাঁর চিরন্তন আকর্ষণ ও তার প্রতিরোধ ধ্বনিত কবিতাটিতে। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি:

Reflexions on suicide, and on my father possess me.

I drink too much. My wife threatens seperation.

She won't `nurse' me. She feels `inadequate'.

We don't mix together.

কবিতাটির শেষ দিকে তিনি লিখলেন, "of suicide I continually think." কিন্তু প্রথম দিকের একটি পঙ্‌ক্তি "I haven't made up my mind."—এতে মৃত্যুর প্রতি আকর্ষণ ও আত্মহত্যা বিষয়ে মনের অস্থিরতা ধরা পড়েছে বলে মনে হয়।

২১ ক্লাউস মান-এর আত্মহত্যার সংবাদ যখন টমাস মান পান তখন তিনি ভাষণ প্রদানরত অবস্থায় ছিলেন। তিনি খবর পাওয়ার পরও তাঁর চলমান ভাষণ বন্ধ করতে অস্বীকার করেন। পিতা-মাতা বা আদরের ভগিনী—কেউই তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নেননি। শুধু ছোট ভাই মাইকেল মান পরিবারের প্রতিনিধি হয়ে অংশ নিয়েছিলেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। এবং তাঁর আগমনও উপস্থিত সকলকে আশ্চর্যান্বিত করেছিল। ক্লাউস মানের আত্মহত্যার কিছুদিন পরই, হারমান হেস-কে লেখা এক চিঠিতে টমাস মান স্বীকার করেন যে, ক্লাউসের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল কঠিন এবং অপরাধবোধযুক্ত; তিনি আরও লেখেন for my very existence cast a shadow over him from the start" [দ্রষ্টব্য সম্পাদনা অ্যানি কার্লসন অ্যান্ড ফোলকার মিশেলস, *দ্য হেসে/মান লেটার্স*, অনুবাদ: রাল্‌ফ ম্যানহাইম, (নিউ ইয়র্ক: হার্পার অ্যান্ড রো ১৯৭৫), পৃষ্ঠা ১৩৬]। এই কথাটি বোধহয় সর্বৈব ঠিক নয়, কারণ, ক্লাউস মান, প্রায় সারাজীবনই মনে করতেন যে তিনি তাঁর পিতার এক নিমজ্জিত তরলিত প্রতিরূপ। টমাস মান ক্লাউসকে সবসময় আন্তরিকতাহীনভাবেই বিবেচনা করতেন। সম্পর্ক ছিল বরফশীতল ও ছলনাময়। এর অন্যতম কারণ হয়তো এই, একজন বিখ্যাত লেখকের পুত্র হিসেবে ক্লাউস-প্রতিভা ছিল পিতাকে অনুকরণসর্বস্ব ও সে-কারণে হাস্যকর। টমাস মান, প্রথম থেকেই, নিজেকে ভাবতেন গ্যোয়েটের আধুনিক প্রতিপক্ষ হিসেবে। অন্যদিকে, ছেলে পিতাকে গ্যোয়েটে নয়, বিতর্কিত জার্মান-প্রতিভা রিচার্ড হ্বাগনারের সাথে মেলাতে পছন্দ করতেন; এ বিষয়ে ১৯৩৭ সালে রচিত নভেলা *Barred Window*-তে ক্লাউস বলেছেন। হ্বাগনারের "লাইটমোটিভ" টমাসকে শিখিয়েছিল শব্দ গঠনের কৌশল। টমাস মানের সন্তান হিসেবে সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই ছিল। টমান মান ছিলেন না প্রতিপালনধর্মী ব্যক্তিত্ব। দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সন্তানরা পিতার সাক্ষাৎ পেত। ক্লাউসের ছোট ভাই গোলো তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "আমরা প্রায় সবসময়ই সকালের দিকে চুপচাপ থাকতাম, কারণ বাবা তখন কাজ করত; বিকেলেও তাই থাকতে হতো, কারণ তিনি প্রথমে বই পড়তেন তখন, তারপর ঘুমাতে যেতেন; সন্ধ্যায় তিনি আবার নিবিড়ভাবে কাজ করতেন। গোলমাল করলে তাঁর ফল হতো ভয়ঙ্কর।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্রষ্টব্য: মার্ক সাইনফেল্ট, *ফাইনাল ড্রাফ্‌ট্‌স*, (প্রমিথিউস বুক্‌স, নিউ ইয়র্ক: ১৯৯৯) পৃষ্ঠা ২০২-২০৪।

২২ ক্লাউস মান জুলাই ১১, ১৯৪৮-এ ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টামনিকাতে, রেজার দিয়ে হাতের কবজি চিরে, ঘুমের বড়ি খেয়ে, তারপর গ্যাস দ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। বন্ধু-বান্ধবরা সে যাত্রায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে পাকস্থলী পাম্প করে রক্ষা করেন। এই আত্মহত্যাচেষ্টার প্রাথমিক কারণ ছিল সে-সময়ের প্রেমিকের অবিশ্বস্ততা।

দ্রষ্টব্য তদেব, পৃ: ২০১।

২৩ যুবক বয়স থেকেই জীবনব্যাপী এক মৃত্যুমোহ ও মৃত্যুআশিষ্টতা তাঁর মধ্যে কাজ করত। কিন্তু যৌবনে তা ছিল অনেকটা ভঙ্গিমাময়, রোম্যান্টিক আবেগউদ্ভূত। মৃত্যু ছিল তাঁর কাছে দুঃখকষ্টের অবসান, শান্তি আর বিস্মরণময়তা। ১৯৩০ সালে লিখিত রচনা *Selbstmorder*-এ তিনি লেখেন বিভিন্ন আত্মহত্যা সম্বন্ধে।

২৪ এ বিষয়ে, ঠান্ডা লড়াই প্রসঙ্গে, মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর রচনা *দ্য আগোনি অব দ্য ইউরোপিয়ান মাইন্ড*-এ তিনি লিখেছেন: "no room for inettlectual independence and hope. তিনি ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের আত্মহত্যা-ঢেউ সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানান যাতে জনগণের মধ্যে তা সাড়া তোলে।

দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২০২।

২৫ এই আমেরিকান মহিলার নাম তিনি বলেননি, শুধু সংক্ষেপে "সি—" হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। পর জানা যায় তিনি হলেন কনস্টানস ডাওলিং নামীয় এক দ্বিতীয় সারির হলিউড অভিনেত্রী, ১৯৫০ সালে যার সাথে লেখকের দেখা হয়েছিল ইতালিতে।

২৬ এই কথাগুলো ডায়েরিতে তিনি লিখেছিলেন লিখিত-শব্দের প্রাণবন্ততা হারিয়ে মৃত্যুন্মুখ হয়ে। তিনি লিখেছিলেন "যতই দুঃখ বাড়ে পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্টভাবে, ততই জীবনের প্রবৃত্তি নিজেকে বেশি করে জাহির করে আর আত্মহত্যার চিন্তা অপসৃত হয়। আমি যখন তা চিন্তা করি তখনই তা সহজভাবে প্রতীয়মান হয়। দুর্বল মহিলারা তা করে। এটার জন্য প্রয়োজন গর্ব নয় অবমাননা। এই সবে আমি অসুস্থবোধ করি। শব্দ নয়। কাজ। আমি আর কোনো কিছু লিখব না।"

দ্রষ্টব্য আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড*, পৃ. ১৩৬।

২৭ হান্স কাসটোর্প ২১ দিনের জন্য গিয়ে ৭ বছর সেখানে কাটান। জ্যাকসন সেখানে যতদিন ছিলেন ততদিন কাটান শেক্‌সপিয়র, প্রুস্ত, বিখ্যাত রুশ লেখকদের লেখা এবং বাইবেল পড়ে। সেখানে কিছু লেখালেখির মকশোও করেন আর সুস্থ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসেন।

২৮ তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন লিথুয়ানিয়ায়, ৮ মে, ১৯১৪ সালে।

২৯ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বুদাপেস্টে, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫-এ।

৩০ তিনি যদি আত্মহত্যা না-ও করতেন, তবু স্বাভাবিকভাবেই খুব তাড়াতাড়ি তাঁর মৃত্যু হতো, কারণ পারকিনসন ও লিউকোমিয়া রোগে তিনি মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি "right-to-die" আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন যার লক্ষ্য ছিল অসুস্থতার শেষ সীমানায় উপনীত ব্যক্তিদের আত্মহত্যার অধিকার দান এবং শেষ দিনগুলিতে অনাকাঙ্ক্ষিত যন্ত্রণা থেকে উপশম প্রদান করা। তিনি ও তাঁর স্ত্রী এ

~ www.amarboi.com ~

জাতীয় সংগঠন *Exit*-এর সাথে যুক্ত ছিলেন।

৩১ ক্লদিও দ্য সুজা ছিলেন ব্রাজিলের পেন ক্লাবের সভাপতি।

৩২ এই চিঠিটির নীচে তারিখ ছিল ২২.২.১৯৪২ সম্ভবত এটিই তাঁর শেষ চিঠি, কারণ, তারপরই তাঁরা (তাঁর স্ত্রীসহ) আত্মহত্যা করেন। চিঠিটির শুরুটি ছিল এরূপ: "জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার আগে, মুক্তইচ্ছা আর পরিষ্কার মনে, জরুরিভাবেই আমি আমার শেষ কর্তব্যটি পূর্ণ করতে চাই: আমি এই আশ্চর্য সুন্দর দেশ ব্রাজিলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যা আমার ও আমার কাজকে, আতিথেয়তায় আমার অবসরকে মনোহর করেছে।"

দ্রষ্টব্য *ফাইনাল ড্রাফ্টস*, পৃ. ১৬৫।

৩৩ *দ্য রয়েল গেম* ৎসভাইগ-এর শেষতম লেখা নভেলা, যা ১৯৪৪-এ বের হয়। অনেক সমালোচক এটিকে তাঁর সবচেয়ে চমৎকার লেখা বলে মতামত দিয়েছেন।

৩৪ স্যুইসাইড-নোট পাওয়া গিয়েছিল তাঁর কাজগপত্রের মধ্যে; তাতে লেখা ছিল I'm going to put myself to sleep now for a bit longer than usual. Call the time Eternity."

দ্রষ্টব্য তদেব, পৃ. ৩৭২।

৩৫ প্রেস রিলিজে তাঁর স্ত্রী এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু অনেকে ভিন্নমত দিয়েছেন এই ক্ষেত্রে। কোসিনস্কির বন্ধু টালেস (Talese) বিশ্বাস করেননি যে তাঁর বন্ধু অবসাদে ভুগছিলেন। তিনি বলেছেন, "তাঁর ব্যবহারে এমন কিছুই ছিল না যাতে মনে হতে পারে যে তিনি অবসাদগ্রস্ত...।" টালেস কোসিনাস্কির আত্মহত্যাকে বলেছেন "অব্যাখ্যাত"।

দ্রষ্টব্য তদেব, পৃ. ৩৭২।

৩৬ এটি তাঁর শেষ উপন্যাস, মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

৩৭ সোফিয়া তলস্তোয়, তলস্তোয়ের নাতনি।

৩৮ শার্লট মিউ-ও প্রেমে পড়েছিলেন একবার, কে ছিল সেই জন জানা যায়নি। এমিলি ডিকিনসনও প্রেমে পড়েছিলেন, প্রথমে বেনজামিন নিউটন নামীয় যুবকের, পরে পাদরি ওয়াডস্‌ওয়ার্থের সাথে। দুজনের কেউ-ই বিয়ে করেননি।

৩৯ তাঁর সর্বশেষ কাব্য; তাঁর প্রথম কাব্য *দ্য ফার্মারস ব্রিজ* ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৪০ মৃত্যুর পর প্রকাশিত এবং পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস।

৪১ কবিতাটির নাম "খুন" বা "Assassin"।

৪২ ইংরেজিটি এরকম :

They were lovely and pleasant in their lives
And in their death they were not divided.

দ্রষ্টব্য *American Literary almanac*, ed. Kaven L. Rood (New York. Oxford Bruccoli clark, Layman. Inc.Facts on File, 1988), P.356.

৪৩ এটা হলিউডের বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির লেখা প্রথম স্মৃতিচারণ ও স্বীকারোক্তিমূলক গ্রন্থ।

৪৪ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিখ্যাত অভিনেত্রী মেরিলিন মনরোর আত্মহত্যা। ৩৬ বছর বয়সে তাঁর ব্রেন্টউড হোমে দরজাবন্ধ অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে তিনি আত্মহত্যা

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

করেন। আগের দিন শনিবার বিকেল ৫-১৫টায় মনোরোগ চিকিৎসককে বাসায় ডেকে এনে তিনি জানিয়েছিলেন যে তাঁর ঘুম হচ্ছিল না।

৪৫ অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা ছিল পূর্ব ৬২ স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক। তাঁর সাথে বসবাস করতেন অ্যালেন ক্যাম্পবেল। তিনি তখন হলিউডে ছিলেন।

৪৬ এর সাথে সাথে টাবে যখন রেজার-ব্লেড পাওয়া যায় তখন সে-প্রসঙ্গে ক্যাম্পবেল জোক কেটে বলেন যে, I'm surprised that they didn't find a pair of shoes."
দ্রষ্টব্য *ফাইনাল ড্রাফ্‌টস* (১৯৯৯), পৃ. ৪০৯।

৪৭ আসলেই হেগেনের আত্মহত্যা ছিল হতবুদ্ধিকর, কারণ আর্থিক অসুবিধা তাঁর ছিল না, ব্যক্তিগত জীবনেও তখন ছিলেন মুক্ত, কারণ তিনি তাঁর স্ত্রী ক্যারোল লিন গিলমারকে তালাক দিয়েছিলেন।

৪৮ ১৯৫০ সালের ৩১ মার্চ তিনি আত্মহত্যা করেন।

৪৯ রাসেল চেনির সাথে তাঁর পরিচয় হয় ১৯২০-এর মধ্যসময়ে, যখন জাহাজে করে তিনি আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছিলেন। পরবর্তী বিশ বছর যাবৎ তাঁদের সম্পর্ক ছিল ঝঞ্ঝাক্রান্ত ও সমস্যাসঙ্কুল। ১৯৩৮ সালে তিনি একবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন। রাসেল চেনির মৃত্যুর পর তিনি একাকিত্বে আক্রান্ত হন। রাশিয়া ও আমেরিকার ঠান্ডা-লড়াইও তাঁকে আলোড়িত করেছিল। পৃথিবীর এই বিরাজমান অবস্থা ক্লাউস মানের মতোই তাঁকে তাড়িত করেছে। মানের আত্মহত্যার এক বছরের মধ্যেই তিনি আত্মহত্যা করেন।
তাঁর অবসাদগ্রস্ততার জন্য শেষ এক বছর তাঁর বন্ধু তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছিল।
দ্রষ্টব্য *ফাইনাল ড্রাফ্‌টস* (১৯৯৯) পৃ. ৪১১।

৫০ আরও লিখেছিলেন: স্প্রিংফিল্ড কবরখানায় মার কবরের পাশে যেন আমাকে কবর দেওয়া হয়, এই। আমার বোন... এ বিষয়ে জানাবে ।
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃ. ৪১২।

৫১ Ambrose Bierce জন্ম ১৮৪১, মৃত্যু ১৯১৩? এই ছোটগল্প লেখককে সর্বশেষ দেখা যায় ১৯১৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর ম্যাক্সিকোর চিহোয়াহোয়াতে, তারপর তিনি চলে যান ম্যাক্সিকোর মরুভূমিতে, আর কখনও তাঁকে দেখা যায়নি।

৫২ T.E. Lawrence জন্ম ১৮৮৮-মৃত্যু ১৯৩৫। ১৯৩৫ সালের ১৩ মে এক মটর সাইকেল দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। কিন্তু পরবর্তী সময়ে চাক্ষুষ বর্ণনায় জানা যায়, তিনি হতাশায় আক্রান্ত হয়ে বেপরোয়াভাবে মটর সাইকেল চালিয়ে আত্মহত্যা করেন। যদিও লরেন্সের জীবনীকাররা তাঁর মৃত্যুকে দুর্ঘটনা মর্মেই বিবেচনা করেছেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে, ১৯৯৬ সালে তাঁর লেখা ছয়টি চিঠি—যা তিনি দুর্ঘটনার ঠিক আগে লিখেছিলেন—লেখক পল ম্যারিয়ট (Paul Marriott) আবিষ্কার করলে চিঠিপত্রের মর্ম থেকে অনুমান করা হয় যে লরেন্স আত্মহত্যা করেছেন।

৫৩ Jammes Weldon Johnson আফ্রিকান-আমেরিকান কবি (১৮৭১-১৯৩৮)। ছিলেন লেখক, সংগীত-রচয়িতা, শিক্ষাবিদ, মানবাধিকার আন্দোলনকারী; দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুকে অনেকে বলেছেন আত্মঘাতী।

৫৪ John Horne Burns আমেরিকান ঔপন্যাসিক, জন্ম ১৯১৬-মৃত্যু ১৯৫৩, ৩৬ বছর বয়সে, সূর্যস্নান করার সময় অজ্ঞান হয়ে ৬ ঘণ্টা পর সেরিব্রাল হ্যামোরেজে মারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যান। মনে করা হয় তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

৫৫ Randall Farrell আমেরিকান কবি, জন্ম টেনিসির নাসভিলে, ১৯১৪ সালে। ১৯৬৫ অব্দের ১৫ অক্টোবর গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি বিকেলে ভ্রমণে বেরিয়ে হাইওয়েতে চলন্ত গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন বলে সংশ্লিষ্ট গাড়ির চালক জানান। এর নয় মাস আগে, জানুয়ারি ১৯৬৫-এ, তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।

৫৬ Seth Morgan আমেরিকান লেখক, জন্ম ১৯৪৯-এ। তাঁর পিতাও ছিলেন নামকরা কবি: ফ্রেডারিক মর্গান। ১৯৯০ সালের ১৭ অক্টোবর গার্লফ্রেন্ড সুজি লেভিনকে নিয়ে বেপরোয়া মটর সাইকেল চালিয়ে রাস্তার ৪৫ ফুট নীচে পড়ে মারা যান। তাঁর রক্তে অ্যালকোহলের মাত্র ছিল .৩ যা স্বাভাবিকের চেয়ে তিন গুণ বেশি। লেভিনের তা ছিল .২৮। তাঁর মৃত্যুকে সন্দেহ করা হয় আত্মহত্যা বলে।

৫৭ Eugene Izzi আমেরিকান ডিটেকটিভ-থ্রিলার লেখক, জন্ম ১৯৫৩ সালে; ১৯৯৬ সালের ৭ ডিসেম্বর মারা যান। তাঁর মৃত্যুকে পুলিশ বলেছে নরহত্যা আর শিকাগো মেডিক্যাল-পরীক্ষক বলেছেন আত্মহত্যা।

৫৮ Goius Cornelius Gallus রোমান কবি ও রাজনীতবিদ, জন্ম ৬৯? —মৃত্যু ২৬ খ্রি. পূ., লাতিন প্রেমের এলিজির জনক। তিনি মিশরের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু সম্রাটের আনুকূল্য হারালে তাঁকে ডেকে এনে নির্বাসনে পাঠানো হয় এবং তিনি তখন আত্মহত্যা করেন।

৫৯ Louis Adamic লুইস অ্যাডামিক (১৮৯৯-১৯৫১), আমেরিকান লেখক, নিউজার্সিতে আত্মহত্যা করেন।

৬০ Aleksandr Aleksandrovich Fadeyev সোভিয়েত ঔপন্যাসিক, জন্ম ১৯০১; ১৯৫৬ সালের মে মাসে তিনি আত্মহত্যা করেন।

৬১ Thomas Lovell Beddoes ইংরেজ চিকিৎসক, কবি, নাট্যকার; জন্ম ১৮০৩ সালে। তাঁর নাটকের নাম *Death's Jest-Book*। তিনি শেলির অনুরাগী ছিলেন। ১৮৪৮ সালে তিনি নিজ পা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান; ফলে পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে ১৮৪৯ সালে তিনি মারা যান।

৬২ Mariano Jose de Larra জন্ম ১৮০৯—মৃত্যু ১৮৩৭, স্পেনিশ প্রাবন্ধিক। অসুখী বিয়ের জন্য আত্মহত্যা করেন।

৬৩ Henry Carey জন্ম ১৬৮৭(?), ইংরেজ কবি-নাট্যকার-সংগীতজ্ঞ ও রম্যলেখক, ১৭৪৩ সালে আত্মহত্যা করেন।

সংরাগ ও সৌন্দর্য

১ বইটির জার্মান নাম : *Mein Kampf*।

২ দ্রষ্টব্য *ওভিদ, মেটামরফসিস* (লন্ডন : ওয়ার্ডসওয়ার্থ ক্লাসিক্স: ১৯৯৮), পৃষ্ঠা : ১০৬। পঙ্ক্তিগুলোর ইংরেজি রূপ এরকম

The whiteness of the mulberry soon fled
And rip'ning, sadden'd in a dusky red:
While both their parents their lost Children mourn,
And mix their ashes in one urn.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩ দ্রষ্টব্য *পবিত্র বাইবেল* (বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটী ১৯৮৬?), মথি ২৬: ২০-২১, পৃষ্ঠা ৫১।
৪ দ্রষ্টব্য তদেব, মথি ২৬: ২৫, পৃষ্ঠা ৫১।
৫ দ্রষ্টব্য তদেব, মথি ২৭: ৪-৫, পৃষ্ঠা ৫৪।
৬ দ্রষ্টব্য : তদেব, মথি ২৭: ৫, পৃষ্ঠা ৫৪।
৭ দ্রষ্টব্য প্রেরিতদের কার্য্য ১ ১৮, পৃষ্ঠা ২০৪।
৮ দ্রষ্টব্য তদেব, ১ শমূয়েল : ৩১, পৃষ্ঠা ৪৭২।
৯ দ্রষ্টব্য সফোক্লিস, *রাজা ঈদিপাস*, অনুবাদ খোন্দকার আশরাফ হোসেন (বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা : ১৯৯৬), পৃষ্ঠা ৬৩।
১০ দ্রষ্টব্য লিয়েফ তলস্তোয়, *আনা কারেনিনা* (পেঙ্গুইন বুকস: ১৯৭৮), অনুবাদ: রোজমেরি এডমন্ডস। ৭ম অংশ ২৮ অধ্যায়; পৃষ্ঠা ৭৮৯।
১১ দ্রষ্টব্য তদেব, অধ্যায় : ৩১, পৃষ্ঠা : ৮০২।
১২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮০২।
১৩ দ্রষ্টব্য *কাফকার মেটামরফসিস ও অন্যান্য গল্প*, অনুবাদ মৃণালকান্তি ভদ্র, রবিন ঘোষ সম্পাদিত (বিজ্ঞাপনপর্ব: ২০০১)।
১৪ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৩।
১৫ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৪২।
১৬ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৯।
১৭ দ্রষ্টব্য *বাল্মিকী রামায়ণ, সারানুবাদ*: রাজশেখর বসু (এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. ১৯৯৬), পৃষ্ঠা ৪৬৮।
১৮ দ্রষ্টব্য তদেব পৃষ্ঠা ৪৬৮।
১৯ দ্রষ্টব্য তদেব পৃষ্ঠা ৪৬৮।
২০ দ্রষ্টব্য *মহাভারত*, সারানুবাদ: রাজশেখর বসু (এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. ১৩৯৪), পৃষ্ঠা ৪০৬।
২১ দ্রষ্টব্য: ম্যালকম ব্র্যাডবারি, দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড টেন গ্রেট রাইটার্স, (পেঙ্গুইন বুকস), পৃষ্ঠা ১০৪।
২২ সোফোক্লিস, *আন্তিগোনে*, (অনুবাদ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সাহিত্য অকাদেমি: ২০০২), পৃষ্ঠা ৩২।
২৩ দ্রষ্টব্য *পবিত্র বাইবেল*, (বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটী, ঢাকা ১৯৮৬?), *বিচারককর্ত্তৃগণের বিবরণ*: ৯, পৃষ্ঠা ৩৮৭।
২৪ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৮৯।
২৫ দ্রষ্টব্য তদেব, ২ শমূয়েল ১৭: ২৩, পৃষ্ঠা ৫০৩।

মাত্রামানব : ধ্রুপদি বিষণ্নতা বা সেই চমৎকার পাগলামো

১ আল আলভারেজ Al Alvarez কবি, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, সংকলক; তাঁর গ্রন্থগুলো হলো *দ্য বিগেস্ট গেম ইন টাউন, লাইফ আফটার ম্যারেজ, ফিডিং দ্য রেট, বাফ্‌স অ্যান্ড বেড বিট্‌স,* আর তাঁর আত্মজীবনী: *হোয়ার ডিড ইট অল গো রাইট্‌স ?* তাঁর বিখ্যাত পেঙ্গুইন সংকলন *দ্য নিউ পোয়েট্রি*। আত্মহত্যার ওপর তাঁর

~ www.amarboi.com ~

বিখ্যাত গ্রন্থ: *দ্য স্যাভেজ গড* (*The savage God: A study of Suicide*)। তিনি লন্ডনে বসবাস করছেন।

২ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (লন্ডন ব্লুমসবেরি, ২০০২), পৃষ্ঠা ২৫৮।

৩ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃ: ২৫৯।

৪ "The God-touched and Muse-kissed"

৫ ঋণাত্মক মহনীয়তা Negative grandeur : নিজেকে অভিশাপগ্রস্ত ভাবা।

৬ হাইপোকন্ড্রিয়া হলো, সর্বদা নিজেকে রোগগ্রস্ত ভাবা। প্রাচীনকালে চিকিৎসাশাস্ত্রে মানসিক অবসাদ বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হতো। বিখ্যাত ফরাসি লেখক মার্সেল প্রুস্ত তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের কথা এবং তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা সবাইকে বলে বেড়াতেন কিন্তু দেখা যায়, বলার দীর্ঘ বাইশ বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের অসুস্থতার কথা বলে অন্যদের সহানুভূতি নিতে চায়।

৭ দ্রষ্টব্য: ডি. জাবলো হার্শম্যান অ্যান্ড জুলিয়ান লাইভ, *ম্যানিক ডিপ্রেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি* (আমহার্স্ট, নিউ ইয়র্ক: প্রমিথিউস বুক্‌স, ১৯৯৮) পৃষ্ঠা : ৮।

৮ হিপ্পোক্রাতেসেরও আগে, প্রাচীনকালে, চিকিৎসকরা ম্যানিয়া ও মেলানকলিয়ার মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক লক্ষ করেছেন, কিন্তু হিপ্পোক্রাতেস ও আরিতিউস প্রথম ম্যানিয়া ও ডিপ্রেশনকে চিকিৎসাগত সমস্যা মর্মে স্বীকৃতি দেন।

৯ ষষ্ঠ শতাব্দীতে আলেকজান্ডার ট্রেলিয়ানাস ঘোষণা করেন যে একই মানুষের মধ্যে দুই বিপরীতধর্মী রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে। আরিতিউস বলেছিলেন, "Mania and depression could alternate in the same person.

দ্রষ্টব্য ডি. জাবলো হার্শম্যান অ্যান্ড জুলিয়ান লাইভ, *ম্যানিক ডিপ্রেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি* (আমহার্স্ট, নিউ ইয়র্ক: প্রমিথিউস বুক্‌স, ১৯৯৮) পৃষ্ঠা : ১২।

১০ বিষাদ ইংরেজি Melancholia, বিমর্ষতা Spleen বা বলা যায় বিতৃষ্ণা। বিষাদ, বিতৃষ্ণা বা মানসিক অবসাদের অর্থে Spleen-এর ব্যবহার "আধুনিক ইংরেজিতে লুপ্তপ্রায়; এখন ইংরেজরা Spleen বলতে বোঝে ক্রোধ অথবা বদমেজাজ; 'Splenetic' বিশেষণেরও মানে দাঁড়িয়েছে 'খিটখিটে'। কিন্তু ফরাসিরা এই শব্দটিকে পরম বিতৃষ্ণার অর্থে ইংরেজি থেকে চয়ন করে নিয়েছে; বোদলেয়ার একে বিখ্যাত করেছেন।"—বলেছেন বুদ্ধদেব বসু।

দ্রষ্টব্য *শার্ল বোদলেয়ার তাঁর কবিতা*, অনু. বুদ্ধদেব বসু. (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা: ১৯৮৮, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ), পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৮।

আল আলভারেজ তাঁর *দ্য স্যাভেজ গড* গ্রন্থে বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মেলানকলি তুলনামূলক কম তীব্ররূপে ও ভিন্ন নামে থেকে যায় যা হয় স্প্লিন-এ। দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড আ স্টাডি অব সুইসাইড*, (লন্ডন ব্লুমসবেরি ২০০২), পৃষ্ঠা ১৯৩। শেক্‌সপিয়রের *দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস*-এর প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে অ্যান্টনিও বলছে: In sooth, I Know not why I am so sad; It wearies me.

১১ হার্সম্যান অ্যান্ড লাইভ, *ম্যানিক ডিপ্রেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি*, পৃ : ৯।

১২ ক্যাটাটোনিয়া: Catatonia স্কিট্‌সোফ্রেনিয়ার এক রূপ। ১৮৬৮ সালে জার্মান চিকিৎসক কার্ল কহল্‌বম ক্যাটাটোনিক স্কিট্‌সোফ্রেনিয়ার বর্ণনা দেন।) তাঁর মতে এই রোগ হলো

~ www.amarboi.com ~

"টেনশন ইনসেনিটি" বা "মানসিক চাপজনিত উন্মত্ততা"। এই রোগে রোগী কখনও কখনও জড়বৎ হয়ে থাকে, আবার কখনও বা অত্যধিক অস্থির বা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

১৩ কথাটি ভ্যান গঘের Death is hard but life is still harder.

১৪ দ্রষ্টব্য অনির্বাণ রায়, *ভিনসেন্ট*, (একাডেমী থিয়েটার হাওড়া ১৯৯৮), পৃ. ৭৯-৮০।

১৫ দ্রষ্টব্য এমিল দ্যুরকহাইম, *সুইসাইড* (রাউটল্যাজ ২০০২), পৃষ্ঠা সম্পাদকের ভূমিকা ২১-২২।

১৬ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃ. ওই ২২।

১৭ নিউরোসিসকে সাইকোনিউরোসিসও বলা হয়। এর প্রধান ভাগ হলো: নিউরেস্থেনিয়া, সাইকোস্থেনিয়া, হিস্টিরিয়া। নিউরোসিস মানসিক রোগ, তবে সুস্থ মানুষের মধ্যেও কম-বেশি নিউরোটিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। স্কটল্যান্ডের চিকিৎসক উইলিয়াম কুলিন (অষ্টাদশ শতাব্দী) প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। ফ্রয়েড একে জনপ্রিয় করেন। নিউরোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারে কিন্তু সাইকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তি তা পারে না।

১৮ জো অ্যান সি. গুটিন, *দ্যাট ফাইন ম্যাডনেস*, (ডিসকোভার ম্যাগাজিন, অক্টোবর, ১৯৯৬।

১৯ দ্রষ্টব্য তদেব।

২০ দ্রষ্টব্য তদেব।

২১ দ্রষ্টব্য সোরেন কিয়ের্কেগার্দ, *আইদার/অর*: আ ফ্র্যাগমেন্ট অব লাইফ (পেঙ্গুইন বুকস ১৯৯২), পৃষ্ঠা ৪৪।

কবি : আত্মপ্রেমী ও আত্মবিনাশী অর্ফিক

১ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়: খ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশপাথর/ মাথায় বৃহৎ জটা/ধুলায় কাদায় কটা/মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণ কলেবর। রবীন্দ্রনাথের "পরশপাথর" কবিতায় অংশ যা তাঁর *সোনার তরী* কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। কবি-প্রকৃতির এক উৎকেন্দ্রিক অনন্য অবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যার অর্থময়তা বোঝায়, খেলাতেই তার অন্বেষণ ও প্রাপ্তি, ফলে নয়।

২ টমাস লাভ পিকক (১৭৮৫-১৮৬৬) লিখিত এই প্রবন্ধটি (দ্য ফোর এজেস অব পোয়েট্রি) তুলনামূলকভাবে কম আলোড়িত কিন্তু এটা যে টেক্সটের জন্ম দিয়েছে তা খুব বিখ্যাত সেটা হলো শেলির লিখিত "আ ডিফেন্স অব পোয়েট্রি" যা ১৮২১ সালে লিখিত। কিন্তু কবিতার মূল্যায়ন নিয়ে পিককের শ্লেষ-উৎপাদনকারী মূল্যায়নটি বেশ আকর্ষণীয়। পিকক শেলির বন্ধু ছিলেন; ১৮১২ সালে তাঁদের প্রথম দেখা হয়। প্রথম দিকে তাঁরা পরস্পরের কাজকে সমর্থন করতেন কিন্তু পরে তাঁরা বন্ধুসুলভ বিরোধিতায় চলে যান। সমসাময়িক কবিতাকে পিকক আক্রমণ করেছিলেন। শেলির মৃত্যুর পর পিকক তাঁর সাহিত্যিক-নির্বাহক হয়েছিলেন। ১৮২০ সালে পিকক এই প্রবন্ধে বলেন: "আমাদের সময়ের একজন কবি সভ্য সমাজে একজন অর্ধ-বর্বর। সে বাস করে এক চলে-যাওয়া দিনে। তার চিন্তা, ভাবনা, অনুভূতি, অনুষঙ্গ সবকিছুই বর্বরোচিত ধরনের, সেকেলে প্রথানুগ, আর পরিত্যক্ত কুপ্রথানির্ভর। আর তার

~ www.amarboi.com ~

বৌদ্ধিকতার অগ্রগমনও কাঁকড়ার মতো পশ্চাৎগামী।" এর উত্তরে শেলি ১৮২১ সালে লেখেন তাঁর বিখ্যাত ''আ ডিফেন্স অব পোয়েট্রি'' যার সমাপ্তি পঙ্‌ক্তিটি হলো: "কবি হলো বিশ্বের অঘোষিত আইনপ্রণেতা।" এই প্রবন্ধে শেলি আরও লেখেন: "কবিতা বস্তুতপক্ষে স্বর্গীয় একটা কিছু", যার সাথে মিল আছে স্যার ফিলিপ সিডনি-র "আন অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি"র উক্তি—কবিতা "এক স্বর্গীয় দান।"

৩ কাম্যুর *ক্যালিগুলা* নাটকের প্রথম অঙ্কে ক্যালিগুলা চেরিয়াকে বলছে: ''সাহিত্যের লোকদের আমি পছন্দ করি না, আর মিথ্যে আমার সহ্য হয় না।'' উত্তরে চেরিয়া বলে, '' আমরা যদি মিথ্যে বলিও, প্রায়ই তা না জেনে।''

৪ গ্রিক দার্শনিক প্লাতোন বলেছেন এ ধরনের কথা। আরও বলেছেন, "শিল্পসৃষ্টি সত্য থেকে তিন প্রস্থ দূরে অবস্থিত।" "তাহলে বিষাদাত্মক কবি, যার কৌশল হচ্ছে সত্যের প্রতিসৃষ্টি রচনা করা তার অবস্থানও সত্য থেকে তিন প্রস্থ দূরত্বে।"
"হোমার থেকে শুরু করে কবিকুলের কারোরই সত্যের যথার্থ জ্ঞান নেই। যে বিষয়ে তারা আলোচনা করে তার অগভীর প্রতিরূপই মাত্র তারা সৃষ্টি করতে সক্ষম।"
দ্রষ্টব্য *প্লেটোর রিপাবলিক*, অনুবাদ: সরদার ফজলুল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৪৭৭।

৫ কবিদের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ অনেক আগ থেকেই আনয়ন করা হচ্ছে। গিওভানি বোক্কাচিও (১৩১৩–১৩৭৫) তাঁর *Genealogy of the Gentile Gods* গ্রন্থে এর পক্ষে যুক্তির অবতারণা করেন। ১৩৫০-১৩৬২ সময়ে লেখা এই গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে কবিরা প্রায়শই দুর্বোধ্য—এর পক্ষে তিনি মতামত দেন। তিনি বলেন যে, কবিরা দুর্বোধ্য হলে দার্শনিকেরাও—যেমন প্লাতোন, আরিস্তোতল—দুর্বোধ্য, কারণ তাঁরা কোনো স্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ প্রদান করেন না। পবিত্র শাস্ত্রগুলোও দ্ব্যর্থক ও কঠিন বাক্যে পরিপূর্ণ বলে তিনি বলেন।
দ্রষ্টব্য *দ্য নর্টন অ্যান্থোলজি অব থিয়োরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজম*, ডব্লিও ডব্লিও নর্টন অ্যান্ড কোম্পানি নিউ ইয়র্ক, ২০০১, পৃষ্ঠা ২৬০-২৬১।

৬ থামাইরিস, গ্রিক কবি ও সংগীতজ্ঞ। জিয়াস-কন্যা এথেনাকে প্রতিভায় অতিক্রম করে যাবেন মর্মে তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেবী অ্যাথেনা তাঁর এই দুঃসাহসের জন্য তাঁর সুরকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেন। অন্যত্র আছে যে, মিউজদের অবজ্ঞা করায় মিউজরা তাঁকে অন্ধ ও স্মৃতিশক্তি লোপ করে দেয়।

৭ রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ছিন্নপত্রাবলী*র ৮০-সংখ্যক পত্রে এ কথাগুলো বলেছেন। (দ্র: *ছিন্নপত্রাবলী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, নতুন সংস্করণ: চৈত্র ১৩৯৯, পৃষ্ঠা ১২৩)। *ছিন্নপত্রাবলী*র অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের কথা বলেছেন "আমাদের দুটো জীবন আছে—একটা মনুষ্যলোকে, আর একটা ভাবলোকে।" (পত্র সংখ্যা-১৪০)।

৮ বুদ্ধদেব বসুর *কঙ্কাবতী* কাব্যগন্থের অন্তর্ভুক্ত "কবি" কবিতার অংশ। দ্রষ্টব্য বুদ্ধদেব বসুর *রচনাসংগ্রহ*, অষ্টম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

৯ "অন নাইভ অ্যান্ড সেন্টিমেন্টাল পোয়েট্রি" নামের প্রবন্ধটি শিলার লেখেন ১৭৯৫-৯৬-এ, "সেন্টিমেন্টিভ"কে রিফ্লেকটিভ বিশেষণেও বলা হয়। মূল জার্মান শব্দ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Sentimentalishch-এর অবিকল অনুবাদ এগুলি নয়। প্রবন্ধে প্রাচীন ও আধুনিকদের পার্থক্যকে শিলার দেখিয়েছেন প্রকৃতির প্রতি তাঁদের ভিন্ন প্রবণতা, কবিতায় তাদের সম্পাদন ইত্যাদি বিবেচনায়। শিলার বলেছেন, আধুনিক কবিরা, কখনোই নাইভ বা সারল্যকে পুনরর্জন করতে পারবে না, অর্থাৎ নিকটবর্তী ও অবচেতনগতভাবে প্রকৃতির সাথে কবিতার সম্পর্ক প্রাচীনকালের কবিরা উপভোগ করত, তা আধুনিকরা কখনোই আর অর্জন করতে পারবে না। শিলার মানা না-মানা নিয়মকানুনের ওপরেই গুরুত্ব দেননি, তিনি চেতনার বিভিন্ন ধরনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

১০ কার্ল গুস্তাফ ইয়ুং-এর রচনাটির নাম "অন দি রিলেশন অব আনালাইটিক্যাল সাইকোলজি অব পোয়েট্রি" যা তাঁর গ্রন্থ *দ্য স্পিরিট ইন ম্যান, আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার*-এ (রাউটল্যাজ, ২০০৩, অনুবাদ: আর এফ সি হুল, পৃষ্ঠা: ৭৫) অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবন্ধটি ১৯২২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এই প্রবন্ধে ইয়ুং সূত্রপাত ঘটান যে, তিনি, শিল্পের কাজের প্রকৃতি নিয়ে একমাত্র নয় বরং শৈল্পিক সৃষ্টির-পদ্ধতি নিয়ে ব্যবস্থিত। তিনি দেখিয়েছেন যে, দুই ধরনের শৈল্পিক সৃষ্টি রয়েছে: ইনট্রোভার্টেড (Introverted) ও এক্সট্রাভার্টেড (extraverted). extraverted একই অর্থসম্পন্ন extroverted-এর বিকল্প রূপ। ইয়ুং এই প্রবন্ধে বলেছেন, "অতএব যখন আমরা শিল্পের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব, তখন আমাদের অবশ্যই এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সৃষ্টিভাবকে মনের রাখতে হবে। কারণ এই পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে একটি শিল্প-কর্মকে মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা হলো এমন একটি শিলার আগেই বোধ্যগম্য করেছেন "সেন্টিমেন্টাল" ও "নাইভ" হিসেবে ভাগ করে। মনোবিশেষজ্ঞরা "সেন্টিমেন্টাল" শিল্পকে বলতে পারে ইনট্রোভার্টেড আর নাইভ-কে বলতে পারেন এক্সট্রাভার্টেড। ইয়ুং প্রবন্ধটির শেষ দিকে বলেছেন যে এই শিল্প-কর্মের প্রতীকী উৎস কবির ব্যক্তিক অবচেতনে (Personal unconscious) নয়, বরং রয়েছে যৌথ অবচেতনে (Collective unconscious) যার মধ্যে আছে অবচেতনিক পৌরাণিক মণ্ডল যার আদি প্রতিরূপ মানবতার সাধারণ উত্তরাধিকার।

১১ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের *তন্বী* কাব্যের অন্তর্ভুক্ত "কবি" কবিতার প্রথম চার পঙ্‌ক্তি; এর পরের দুটি পঙ্‌ক্তি:

দিনের আলো যার ফুরাল, স্মরণনিবিড় সন্ধ্যা এল,
মাটির দীপে সলতে দেবার মানুষ তবু নাই যে পেল;

আত্ম-জৈবনিক নৈঃশব্দ্যের ও ফলহীনতার কথা বলেছেন কবি। আরও অনেক কবিতায় এ ধরনের উদ্ভাসন দেখা যায়, "১৯৪৫" কবিতায় তিনি বলেছেন:

শূন্যে ঠেকেছে লাভে লোকসানে মিলে,
ক্লান্তির মতো শান্তিও অনিকাম।

১২ উদ্ধৃতিটি কনরাডের *লর্ড জিম* উপন্যাসে রয়েছে।
দ্রষ্টব্য: ম্যালকম ব্র্যাডবারি, *দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড টেন গ্রেট রাইটার্স*, (পেঙ্গুইন বুকস: ১৯৮৯)-এর জোসেফ কনরাড-সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লিখিত।

১৩ ইয়ুং তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "সাইকোলজি অ্যান্ড লিটারেচার" প্রবন্ধে (প্রথম প্রকাশ ১৯৩০) এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সবসময়ই এক ধাঁধা, আমরা যাকে বিভিন্নভাবে উত্তর দিতে সচেষ্ট হই কিন্তু সবসময়ই ব্যর্থ হই।" প্রতিটি সৃষ্টিশীল ব্যক্তিই পরস্পরবিরোধী গুণাবলির এক দ্বৈততা বা সংশ্লেষণ। একদিকে সে ব্যক্তিগত জীবনে একজন মানুষ, আবার অন্যদিকে তাঁর নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টিশীলতা। মানুষ হিসেবে সে হতে পারে সুস্থ বা রুগ্ণ, আর তার ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব ব্যক্তিগত ভাষায় বা বিবেচনায় ব্যাখ্যা করা যায় বা তা-ই হওয়া উচিত। কিন্তু একজন শিল্পী হিসেবে একমাত্র সৃষ্টিশীল অর্জন দ্বারাই তাকে বোঝা উচিত হবে।"
[দ্রষ্টব্য *দ্য স্পিরিট ইন ম্যান, আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার*, রাউটলেজ ২০০৩]

১৪ হারবার্ট রিড তাঁর "আর্ট অ্যান্ড অ্যালিনেশন"-এ বলেছেন Art remains a distinct entity।
দ্রষ্টব্য *ব্যক্তি প্রগতি সুধীন্দ্রনাথ*, জহর সেনমজুমদার, রত্নাবলী, কলকাতা ২০০৩; পৃষ্ঠা ৭০।

১৫ এই কথাটিরই সমতুল্য ও ব্যাপৃত কথা বলেছেন ইয়ুং: "প্রতিটি শিল্পীই নার্সিসিস্ট"; তিনি আরও বলেছেন, "নিজ লক্ষ্যাভিমুখী প্রতিটি ব্যক্তিই একজন নার্সিসিস্ট।"
দ্রষ্টব্য অ্যানলাইটিক্যাল সাইকোলজি অ্যান্ড পোয়েট্রি *দ্য স্পিরিট ইন ম্যান, আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার*, রাউটলেজ ২০০৩, পৃষ্ঠা ৭৯। এর সাথে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে সিলভিয়া প্লাথের উক্তিতে। ৩০ অক্টোবর, ১৯৬২-এ, পিটার অর-এর নেওয়া সাক্ষাৎকারে সিলভিয়া প্লাথ বলেছিলেন যে, লেখক ও শিল্পীরা সবচেয়ে নার্সিসাস-আক্রান্ত মানুষ।
[দ্রষ্টব্য: *টোয়েনটিথ সেনচুরি পোয়েটট্রি পোয়েটিক্স*, ৪র্থ সংস্করণ, সম্পাদনা: গ্যারি গেডেস, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, কানাডা: ১৯৯৬, পৃষ্ঠা : ৮৮০।]

১৬ জার্মান কবি রাইনের মারিয়া রিলকের "অরফিয়ুসের প্রতি সনেট" কবিতার ৮ম সংখ্যক কবিতার পঙ্‌ক্তি বিশেষ। অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু। দ্রষ্টব্য রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা, অনুবাদ ভূমিকা টীকা বুদ্ধদেব বসু, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১।

মৃত্যু ও যৌক্তিক আত্মহত্যা : ইভান ইলিচ ও কিরিলোভ

১ দ্রষ্টব্য *সোরেন কিয়ের্কেগার্দ, আইদার/অর আ ফ্রেগমেন্ট অব লাইফ*, (পেঙ্গুইন বুকস লন্ডন ১৯৯২), পৃষ্ঠা ৪৪।

২ দ্রষ্টব্য আলব্যের কাম্যু, *সিলেকটেড এসেস অ্যান্ড নোটবুকস*, (পেঙ্গুইন বুকস লন্ডন : ১৯৭৯), পৃষ্ঠা ২৫৩।

৩ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৪৩।

৪ দ্রষ্টব্য ভলত্যের, কাঁদিদ (অনুবাদ: অরুণ মিত্র, সাহিত্য অকাদেমি: দিল্লি প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০১), পৃষ্ঠা ৩৯।

৫ দ্রষ্টব্য *শার্ল বোদলেয়ার তাঁর কবিতা*, অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু (দে'জ পাবলিশিং কলকাতা দে'জ ২য় সংস্করণ : ১৯৮৮), পৃষ্ঠা : [illegible]

৬ দ্রষ্টব্য *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ দশম* খণ্ড (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা; প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৮), পৃষ্ঠা ১৪৪।
মূলত "রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী" প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু গ্যোয়েটের উক্তিটি উদ্ধৃত

~ www.amarboi.com ~

করেছেন আমাদের মনে প'ড়ে যায় দেবতাপ্রতিম গ্যোটের অন্তিম ও ভীষণ স্বীকারোক্তি; 'জীবনে একদিনের জন্য আমি সুখী হ'তে পারি নি।'

৭ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (ব্লুমসবেরি লন্ডন: ২০০২), পৃষ্ঠা : ২৪২-২৪৩।

৮ দ্রষ্টব্য লিয়েফ্ তল্‌স্তোয়, *শ্রেষ্ঠ গল্প* (সম্পাদনা হায়াৎ মামুদ, অবসর ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৩, গল্পের অনুবাদ সমর সেন), পৃষ্ঠা : ৬৮।

৯ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৬৯।

১০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৭২।

১১ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮০।

১২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮০।

১৩ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮২।

১৪ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮৫।

১৫ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৬১।

১৬ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৬৮।

১৭ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮৩।

১৮ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮৭।

১৯ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৪৬।

২০ আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (ব্লুমসবেরি লন্ডন : ২০০২), পৃষ্ঠা ২৩৬।

২১ *সোরেন কিয়ের্কেগাদ জার্নালস অ্যান্ড পেপারস*, সম্পাদনা ও অনুবাদ এইচ. ভি. অ্যান্ড ই. এইচ. কং, ব্লুমিংটন : ইন্ডিয়ানা ১৯৬৭ এবং লন্ডন ১৯৬৮, পৃষ্ঠা : ৩৪৫।

২২ দ্রষ্টব্য কিয়ের্কেগার্দ, *আইদার/অর* (পেঙ্গুইন বুকস লন্ডন ১৯৯২), পৃষ্ঠা ৫৬।

২৩ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (ব্লুমসবেরি লন্ডন ২০০২), পৃষ্ঠা ২৩৭।

২৪ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৩৭।

২৫ দ্রষ্টব্য আলব্যের কাম্যু, *দি আউটসাইডার* (অনুবাদ মৃণালকান্তি ভদ্র, বিজ্ঞাপনপর্ব কলকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০৩), পৃষ্ঠা ৭১।

২৬ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৭০।

২৭ দ্রষ্টব্য: আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড*, (ব্লুমসবেরি লন্ডন ২০০২), পৃষ্ঠা: ২৩৮।

২৮ আলব্যের কাম্যু, *দ্য মিথ অব সিসিফাস অ্যান্ড আদার এসেস* (ভিনটেজ বুকস: ১৯৯১), পৃষ্ঠা: ১০৮।

২৯ দ্রষ্টব্য: আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড*, (ব্লুমসবেরি লন্ডন: ২০০২), পৃষ্ঠা: ২৩৯।

সুইসাইড নোটটি ছিল এরকম আমি নিচ্ছি এক দীর্ঘ ভ্রমণ। যদি ব্যর্থ হই, তাহলে মানুষকে এক বোতল ক্লিকোয়ট নিয়ে আমার পুনরুত্থানের আনন্দে সমবেত হতে দিয়ো। যদি সার্থক হই, তবে জানিয়ে রাখলাম, আমি সর্বতোভাবে মারা যাওয়ার পরই কেবল আমাকে সমাহিত করা হবে, যেহেতু মাটির ভেতরে কফিনে জেগে ওঠা অশোভনীয়। এটা সুরুচিপূর্ণ নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩০ দ্রষ্টব্য: আলব্যের কাম্যু, *দ্য মিথ অব সিসিফাস অ্যান্ড আদার এসেস* (ভিনটেজ বুকস: ১৯৯১), পৃষ্ঠা ১১১।

৩১ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড*, (ব্লুমসবেরি লন্ডন ২০০২), পৃষ্ঠা ২৪০।

৩২ আলব্যের কাম্যু, *দ্য মিথ অব সিসিফাস অ্যান্ড আদার এসেস* (ভিনটেজ বুকস: ১৯৯১), পৃষ্ঠা ১০৬।

৩৩ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০৬।

৩৪ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড*, (ব্লুমসবেরি লন্ডন: ২০০২), পৃষ্ঠা ২৪১।

৩৫ দ্রষ্টব্য আলব্যের কাম্যু, *দ্য মিথ অব সিসিফাস অ্যান্ড আদার এসেস* (ভিনটেজ বুকস: ১৯৯১), পৃষ্ঠা ১০৬।

৩৬ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড*, (ব্লুমসবেরি লন্ডন ২০০২), পৃষ্ঠা ২৪১।

সাহিত্য ও আত্মহত্যা

১ দ্রষ্টব্য বারট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস* (রাউটলেজ লন্ডন ২০০২), পৃষ্ঠা ৩৫৪।

২ আর্পি গ্রিক ও রোমান পুরাণের দানবী, যাদের রূপ নারীমুখ ও পাখির দেহবিশিষ্ট।

৩ দ্রষ্টব্য দান্তে আলিগিয়েরি, *দিব্যাভিসার*, অনুবাদ: শ্যামলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়;সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ: ২০১১, পৃষ্ঠা: ২৫।

৪ Mid-life crisis—এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Elliot Jaques, 'Death and the Mid life crisis'. *International Journal of psycho-Analysis*, Vol. 46, 1965, Page.502-14.
এছাড়া আংশিক বর্ণনা আছে আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড*, (ব্লুমসবেরি লন্ডন: ২০০২), পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭০।

৫ দ্রষ্টব্য স্যার টমাস মোর, *ইউটোপিয়া*, (অনুবাদ ও সম্পাদনা মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান, প্যাপিরাস ঢাকা ২০০৩), পৃষ্ঠা : ১০৩-১০৪।

৬ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড*, (ব্লুমসবেরি লন্ডন: ২০০২), পৃষ্ঠা ১৮১।

৭ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৯১।

৮ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৯৪।

৯ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২১০।

১০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২২৩।

১১ দ্রষ্টব্য: রিচার্ড ফ্রাইডেনথাল, গ্যোয়েটে: তাঁর জীবন ও সময় (লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক ১৯৬৫) পৃষ্ঠা : [illegible]

১২ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড*, (ব্লুমসবেরি লন্ডন: ২০০২), পৃষ্ঠা ২৩৩।

১৩ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৪ অনুবাদ হুমায়ুন আজাদ; দ্রষ্টব্য হুমায়ুন আজাদ, *আমার অবিশ্বাস*, (আগামী প্রকাশনী: ঢাকা: ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ৬১।

১৫ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড*, (ব্লুমসবেরি লন্ডন: ২০০২), পৃষ্ঠা ২৫০।

১৬ দ্রষ্টব্য মানিক গ্রন্থাবলী তৃতীয় খণ্ড, (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৮৭), পৃষ্ঠা ৯১।

১৭ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৯১।

১৮ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৯৯-১০০।

১৯ দ্রষ্টব্য বারট্রান্ড রাসেল, *আত্মজীবনী* (রাউটলেজ লন্ডন ২০০২), পৃষ্ঠা ৩৯৩।

২০ দ্রষ্টব্য টি. এস. এলিঅট, *পোড়ো জমি ও চৌতাল*, অনুবাদ জগন্নাথ চক্রবর্তী. (সাহিত্য অকাদেমি: দিল্লি; প্রথম প্রকাশ ১৯৯১), পৃষ্ঠা ৭৯। জে. অ্যালফ্রেড প্রুফ্রকের প্রেমগীতি কবিতার অংশবিশেষ।

২১ জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলতে চেয়েছেন কেউ কেউ; যেমন সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছেন "আমার মনে হয় জীবনানন্দ ঠিক ট্রাম-দুর্ঘটনায় মারা যাননি। যদিও এই কথাটাই সর্বত্র বলা হয়ে থাকে এবং আমরা দেখেছি, তথাপি আমার ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন।" দ্রষ্টব্য *বিভাব: জীবনানন্দ দাশ: জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা*-১৪০৫/১৯৯৮-এর অন্তর্ভুক্ত "জীবনানন্দ এবং আরও কয়েকজন" শীর্ষক অরবিন্দ গুহ-র লেখা প্রবন্ধ। পৃষ্ঠা ৫১৫।

এছাড়া জীবনীকার সিলিও লিখেছেন যে জীবনানন্দ দাশ কোনো বিস্মরণে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন রাস্তার ওপর A Streetcar approached from the west as Jibanananda began to cross the road, and, for some reason oblivious he stepped in front of it."

দ্রষ্টব্য: ক্লিনটন বি. সিলি, *আ পোয়েট অ্যাপার্ট*, (ডেলাওয়ার লন্ডন টরোন্টো ১৯৯০), পৃষ্ঠা ২৭১।

২২ "অহিফেন-ক্রিয়া" কবিতায় শেষাংশ; দ্রষ্টব্য অনন্য রায়, *নির্বাচিত কবিতা*, সম্পাদনা মনীন্দ্র রায়, তুষার চৌধুরী, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়; (এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স (প্রা.) লি. কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৯।

২৩ কবিতা "সনেট: ৮" ; দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭।

২৪ কবিতাটির নাম "আমি আছি শেষ মদ" দ্রষ্টব্য আবুল হাসান, *রচনা সমগ্র* (বিদ্যাপ্রকাশ: ঢাকা ১৯৯৪), পৃষ্ঠা ১২৭।

২৫ "অসুখ" কবিতার পঙ্‌ক্তিবিশেষ, দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ১৩২।

২৬ দ্রষ্টব্য *ভিনসেন্ট এক অবিস্মরণীয় জীবন*, সংকলন ও সম্পাদনা: অনির্বাণ রায়, (একাডেমী থিয়েটার কলকাতা ১৯৯৮) পৃষ্ঠা ৮০।

২৭ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮৩।

২৮ এই উক্তিটি নেয়া হয়েছে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্রনাথ, 'নির্জনের প্রিয় বন্ধু' আমিয়েল" প্রবন্ধ থেকে। দ্রষ্টব্য *পশ্চিমবঙ্গ*: রবীন্দ্র-সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৮৫৪।

২৯ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী* (বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ: কলকাতা; নতুন

~ www.amarboi.com ~

সংস্করণ: ১৩৯৯), পৃষ্ঠা ১৮৪ ১২০-সংখ্যক পত্র।

৩০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৮: ১১৭-সংখ্যক পত্র।

৩১ দ্রষ্টব্য *পশ্চিমবঙ্গ* রবীন্দ্র-সংখ্যা (এপ্রিল ১৯৯১: বৈশাখ ১৩৯৮), এর অন্তর্গত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথ, নির্জনের প্রিয় বন্ধু আমিয়েল", পৃষ্ঠা : ৮৬২।

৩২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৮৬২।

৩৩ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী* (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ: কলিকাতা: ১৩৯৯), পৃষ্ঠা ৩৪ ১৩-সংখ্যক পত্র।

৩৪ এ ব্যাপারে ব্যাপক ও নিবিষ্ট আলোচনা করেছেন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *আদরের উপবাস: রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে। বইটির শেষ অধ্যায় "উন্মুক্ত অসভ্যতা চাইলেন"-এ লেখক এ বিষয়ে অন্তর্বীক্ষণঋদ্ধ আলোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *আদরের উপবাস: রবীন্দ্রনাথ* (গাঙচিল কলকাতা প্রথম প্রকাশ ২০০৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৯)।

৩৫ দ্রষ্টব্য এমিল দ্যুরকহাইম, *সুইসাইড : আ স্টাডি অব সোসাওলজি*, অনুবাদ: জন এ. স্পাউলডিং ও জর্জ সিম্পসন, (রাউটলেজ লন্ডন: নিউ ইয়র্ক : ২০০২) পৃষ্ঠা : ২২০।

৩৬ দ্রষ্টব্য ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *অন্তঃশীলা* (পূর্ব্বাশা কলকাতা তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮২), পৃষ্ঠা ১।

৩৭ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৭।

৩৮ মূল শব্দটি হলো ইংরেজি Atimia যা Atimy- থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ Loss of honour in ancient Athens বা Loss of civil rights: Public disgrace। শব্দটি এসেছে গ্রিক Atimia থেকে। দ্রষ্টব্য Chambers 20th Century Dictionary.

৩৯ দ্রষ্টব্য ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *অন্তঃশীলা* (পূর্ব্বাশা কলকাতা ১৯৮২), পৃষ্ঠা ৯-১০।

৪০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৫।

৪১ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (ব্লুমসবেরি লন্ডন ২০০২), পৃষ্ঠা ৩০৬-৩০৭।

৪২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৩০৭।

৪৩ কবিতাটির নাম "পথের কিনারে"। দ্রষ্টব্য *জীবনানন্দ সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড*, সম্পাদক দেবেশ রায়, (প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা: দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০০ প্রথম প্রকাশ ১৩৯২), পৃষ্ঠা ১৫১।

সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও বঙ্গীয় কয়েকজন অন্ধকার

১ হিপ্পোক্রাতেস ওথ I will give no deadly medicine to anyone if asked, nor suggest any such counsel...

২ গল্পটির নাম "আত্মহত্যার অধিকার"। কিন্তু গল্পের শেষে নীলমণির মতো লেখকও ভেবেছেন যে, জীবনের সংগ্রাম ফুরিয়ে যায় না।

৩ দ্রষ্টব্য ২২ মার্চ ২০০৫ *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত "টেরিকে বাঁচার অধিকার দিল একটি আইন" শিরোনামের খবর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪ দ্রষ্টব্য *জীবনানন্দ দাশ সমগ্র*, সম্পাদক : দেবেশ রায়, প্রতিক্ষণ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৯২, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৪০০, পৃষ্ঠা ১৪০।

৫ দ্রষ্টব্য জীবনানন্দ দাশের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যের "জীবন" নাম কবিতায় পঙ্‌ক্তি।

৬ দ্রষ্টব্য *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* "মধ্যাহ্নের অলস গায়ক রোম্যানটিক বহিরস্থিত রবীন্দ্রনাথ" হুমায়ুন আজাদ; ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ২৬।

৭ আবুল হাসানের ছোটোগল্প "অভাবিত "-এর সমাপ্তি-পঙ্‌ক্তি।
দ্রষ্টব্য *আবুল হাসান রচনা সমগ্র* (ভূমিকা শামসুর রাহমান), বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৩৩৯।

৮ দ্রষ্টব্য *দেশ* : কলকাতা, বই সংখ্যা ২০০৫, ২ ফেব্রুয়ারি, পৃষ্ঠা ৪১।

৯ আবুল হাসানের ছোটোগল্প "নির্বাসনায় মাইল মাইল"-এর পঙ্‌ক্তি।
দ্রষ্টব্য *আবুল হাসান রচনা সমগ্র* : বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা : ৩৫৫।

১০ আবুল হাসানের "গ্রীষ্মকাল তোমার মৃত্যুর অনুভূতি" কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা।
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬।

১১ আবুল হাসানের "যা কিছু জন্মায় আমি ঘৃণা করি, তোমাকেও" কবিতার পঙ্‌ক্তি।
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২২৩।

১২ দ্রষ্টব্য *আমার অবিশ্বাস* হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭; পৃষ্ঠা ২০।

১৩ *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* : "মধ্যাহ্নের অলস গায়ক রোমানটিক বহিরস্থিত রবীন্দ্রনাথ" ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৮; পৃষ্ঠা ২৬।

১৪ *গীতবিতান*-এর বিচিত্র পর্যায়ের ৬৮ সংখ্যক গানের অংশ।

১৫ দ্রষ্টব্য *আমার অবিশ্বাস* : হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী ১৯৯৭; পৃষ্ঠা ২০।

১৬ দ্রষ্টব্য *হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা* : আগামী প্রকাশনী: ১৯৯৩; পৃষ্ঠা ২৭-২৮।

১৭ জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত "আট বছর আগের একদিন" কবিতার পঙ্‌ক্তি।

১৮ তদেব।

১৯ দ্রষ্টব্য *হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা* আগামী প্রকাশনী: ১৯৯৩: পৃষ্ঠা ২৮-২৯।

২০ দ্রষ্টব্য *আমার অবিশ্বাস* : হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী ১৯৯৭; পৃষ্ঠা ২০।

২১ *পেরোনোর কিছু নেই* "মানুষের সঙ্গ ছাড়া" হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী ঢাকা: ২০০৪; পৃষ্ঠা ২২।

২২ ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা।

২৩ দ্রষ্টব্য প্রথম আলো: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

২৪ দ্রষ্টব্য তদেব ২ জুলাই ২০০৫।

২৫ দ্রষ্টব্য তদেব ৩০ মার্চ ২০০৫।

২৬ দ্রষ্টব্য *সুইসাইড*, এমিল দ্যুরকহাইম, (রাউটল্যাজ লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক ২০০২), পৃষ্ঠা ২০১।

২৭ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য সেভেজ গড* (ব্লুমসবেরি লন্ডন: ২০০২), পৃষ্ঠা ৫৭।

২৮ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৫৭।

২৯ দ্রষ্টব্য *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার*, রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স এন্ড

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোং: ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৭৯, পৃষ্ঠা ১৭৫। পঙ্‌ক্তিদ্বয় *মহাপৃথিবী* কাব্যগ্রন্থের "নিরালোক" কবিতার অংশ।

৩০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫৩। *বেলা অবেলা কালবেলা* কাব্যের "হে হৃদয়" কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা।

৩১ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ৪৬৪। "যাত্রী" কবিতার স্তবক।

৩২ "আট বছর আগের একদিন" কবিতার পঙ্‌ক্তি।

৩৩ দ্রষ্টব্য ওই।

৩৪ দ্রষ্টব্য *কায়েস আহমেদ সমগ্র*, ভূমিকা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা; প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০১; পৃষ্ঠা ভূমিকাংশ।

৩৫ দ্রষ্টব্য: তদেব।

৩৬ দ্রষ্টব্য তদেব।

৩৭ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (ব্লুমসবেরি : লন্ডন: ২০০২), পৃষ্ঠা : ৫৩।

৩৮ দ্রষ্টব্য *কায়েস আহমেদ সমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩ (দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০০১); পৃষ্ঠা : ভূমিকাংশ।

৩৯ দ্রষ্টব্য তদেব।

৪০ "আরো এক টুর্নামেন্ট" কবিতার পঙ্‌ক্তি।
দ্রষ্টব্য *শামীম কবীর সমগ্র*, (দ্রষ্টব্য : ঢাকা, ১৯৯৭); পৃষ্ঠা ৩২।

৪১ "১৯ এপ্রিল" কবিতার পঙ্‌ক্তি।
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৮।

৪২ *রোগশয্যার আলোবাদ্য কাব্যের* "রক্ত" কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা।
দ্রষ্টব্য : তদেব, পৃষ্ঠা : ৯০।

৪৩ "শিরোনামহীন" কবিতাবলির ৩১ সংখ্যক কবিতা।
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৪৫।

৪৪ "স্বীকারোক্তি, ইকারুস" কবিতার সমাপ্তি পঙ্‌ক্তিদ্বয়।
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২১৭।

৪৫ "মশলা-ঘরে মৃত্যু ভালো" কবিতার পঙ্‌ক্তি।
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০৬।

৪৬ রাত্রির স্তোত্র *Hymn of the Night: His Hymnen on die Nacht.*

৪৭ রাত্রির স্তোত্র কবিতার পঙ্‌ক্তি।
দ্রষ্টব্য: *দ্য পেঙ্গুইন বুক অব জার্মান ভার্স*, ভূমিকা ও সম্পাদনা: লিওনার্ড ফরস্টার (পেঙ্গুইন বুকস: লন্ডন: ১৯৫৭: ১৯৫৯), পৃষ্ঠা : ৩০৫।

৪৮ "ম্যান সাইজ আরশি কিংবা আত্মহত্যা বিষয়ে গল্প" কবিতার সমাপ্তি ঘোষণা।
দ্রষ্টব্য *শামীম কবীর সমগ্র*, দ্রষ্টব্য : ঢাকা ১৯৯৭; পৃষ্ঠা : ২৬৩।

৪৯ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৬০-৬১।

৫০ সিলভিয়া প্লাথের "লেডি ল্যাজারাস" কবিতার বিখ্যাত লাইন।

৫১ দ্রষ্টব্য *শামীম কবীর সমগ্র*, (দ্রষ্টব্য ঢাকা: ১৯৯৭); পৃষ্ঠা ২৬১।

৫২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৫।

৫৩ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫৪ ডায়েরিতে তিনি লিখেছেন "বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আমি ক্রমশঃ একা হ'য়ে গেছি।"
দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৩।

৫৫ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৮২।

৫৬ পঙ্‌ক্তিটি কবি অনন্য রায়-এর। "মৃত্যুর খসড়া" কবিতার সূচনা-পঙ্‌ক্তি।
দ্রষ্টব্য *নির্বাচিত কবিতা*, অনন্য রায় (এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স: কলকাতা: প্রকাশকাল: ?), পৃষ্ঠা : ৩০।

৫৭ দ্রষ্টব্য আল আলভারেজ, *দ্য স্যাভেজ গড* (ব্লুমসবেরি লন্ডন: ২০০২), পৃষ্ঠা ২৪৮।

৫৮ দ্রষ্টব্য *শামীম কবীর সমগ্র*, (দ্রষ্টব্য ঢাকা: ১৯৯৭); পৃষ্ঠা ২৩৫।

৫৯ মার্টিন হাইডেগার, *বিইং অ্যান্ড টাইম*, ইংরেজি অনুবাদ: জোয়ান স্ট্যামবাউ, (স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক প্রেস: আলবানি: ১৯৯৬), পৃষ্ঠা ২২৯।
উল্লেখ্য, উল্লিখিত গ্রন্থের "The Possible Being-a-Whole of Da-sein and Being-toward-Death" শিরোনামের অধ্যায়ে মৃত্যু-সংক্রান্ত হাইডেগারের চিন্তা বিস্তৃতভাবে বিধৃত হয়েছে।

৬০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ২৬৪।

৬১ দ্রষ্টব্য: *দুঃখ ধরার ভরাস্রোতে*, সুনীল সাইফুল্লাহ্, (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ: ১৯৮২), পৃষ্ঠা ১০।

৬২ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ০৯।

৬৩ গ্রন্থটির সম্পাদক এমন কথাই বলেছেন। শুরুতে "সম্পাদকের কথা" অংশে তিনি (সম্পাদক) বলেছেন "আত্মহত্যার আগে প্রায় দুই মাস ধরে দিনরাত পরিশ্রম করে সুনীল সাইফুল্লাহ্ তাঁর কবিতার সংশোধন করেছিলেন: এটা তাঁর মৃত্যুর প্রস্তুতি—তখন আমরা বুঝতে পারিনি।"

৬৪ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০।

৬৫ অডেন এই প্রবন্ধে লিখেছেন "উনবিংশ শতাব্দী সৃষ্টি করেছে এক কল্পকথার, তা এই যে, শিল্পী বীর, শিল্পী হলেন এমন একজন যিনি শিল্পের জন্য সকল সুখ ও নিজ স্বাস্থ্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন আর এর বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে চেয়েছেন সামাজিক দায়দায়িত্ব ও প্রচলিত আচরণিক প্রথা থেকে অব্যাহতি পেতে।"
দ্রষ্টব্য: পোয়েটস অন পেইন্টারস, সম্পাদক: এফ. ডি. ম্যাকক্ল্যাচি, ইউনিভারসিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস: ক্যালিফোর্নিয়া: ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১২৮।

৬৬ দ্রষ্টব্য *দুঃখ ধরার ভরাস্রোতে*, সুনীল সাইফুল্লাহ্ (জাকসু ১৯৮২), পৃষ্ঠা : ১২।

৬৭ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা : ৩০।

৬৮ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৫।

৬৯ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৫।

৭০ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১৬।

৭১ দ্রষ্টব্য তদেব, পৃষ্ঠা ১০-১১।

৭২ দ্রষ্টব্য *দ্য মিথ অব সিসিফাস অ্যান্ড আ[illegible]র এসে[illegible]* ([illegible] ১৯৯১), পৃষ্ঠা ১৫।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৭৩ দ্রষ্টব্য *দুঃখ ধরার ভরাস্রোতে*, সুনীল সাইফুল্লাহ্, (জাকসু ১৯৮২), পৃষ্ঠা ২৪।

৭৪ উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর *কপালকুণ্ডলা*র অষ্টম পরিচ্ছেদে রয়েছে।

৭৫ এই শব্দবন্ধটিও প্রাগুক্ত উপন্যাসের একই পরিচ্ছেদের। সম্পূর্ণ বাক্যটি এরকম "যখন মানুষহৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্য সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।"

৭৬ দ্র. *আলেখ্য: জীবনানন্দ*, ভূমেন্দ্র গুহ,অবসর, ঢাকা ২০১১, পৃষ্ঠা : ১২-১৩।

৭৭ জীবনানন্দ দাশ-এর পুনশ্চ কাব্যের "মৃত্যু" কবিতার পঙক্তি-স্তবক।

৭৮ জীবনানন্দ দাশ-এর *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যের "জীবন" কবিতার অংশ।

৭৯ দ্রষ্টব্য *দ্য পেঙ্গুইন বুক অব জার্মান ভার্স*, ভূমিকা ও সম্পাদনা: লিওনার্ড ফরস্টার, পেঙ্গুইন বুকস: লন্ডন ১৯৫৭: ১৯৫৯।

৮০ *শূন্য তাপাঙ্কের নীচে*, (সমকালীন ১৪ ফরাসি কবির কবিতা), সম্পাদনা; তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী, কবিতা পাক্ষিক: কলকাতা: ২০০৫, পৃষ্ঠা ৩১। কবিতাংশটি ফরাসি কবি আল্যাঁ বস্কে-র "বোজঁ হাসপাতাল" কবিতার।

৮১ দ্রষ্টব্য বিং অ্যান্ড টাইম: মার্টিন হাইডেগার, অনুবাদ: জোয়ান স্ট্যামবাও,(স্টেট ইউনিভারসিটি অব নিউ ইয়র্ক প্রেস আলবানি: ১৯৯৬), পৃষ্ঠা ৩৮৭। এ সম্পর্কিত ব্যাপক আলোচনা রয়েছে গ্রন্থটির "Within-Timeness and the Genesis of the Vulgar concepts of Time" শিরোনামের ৮১তম অধ্যায়ে।

সময়-সংক্রান্ত অনেক কথার মধ্যে কিছু চৌম্বক উক্তি Times is understood as a sequence, as the "Flux" of nows, as the " course of time

Every last now, as a now, is always *already* a right-way that is no longer-Every last now, *as a now*, is always *already* a right-away that is no longer, thus it is time in the sense of the no-longer-now, of the past. Every first now is always a just-now-not-yet, thus it is time in the sense of the not-yet-now, the"future" Time is thus endless "in both directions."

৮২ দ্রষ্টব্য *দ্য স্যাভেজ গড*, আল আলভারেজ, (ব্লুমসবেরি লন্ডন ২০০২), পৃষ্ঠা ১৯৯-২০০।

৮৩ তাঁর নামের প্রথম অংশ মারিয়া না মারিনা এ বিষয়ে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা যায়। কেতকী কুশারী ডাইসন তাঁর *ভাবনার ভাস্কর্য* গ্রন্থের সূচিতে প্রবন্ধের নাম হিসেবে লিখেছেন "মারিয়া ৎস্‌ভেতায়েভা, এডিট স্যোডারগ্রান দুই অদম্য শিল্পীসত্তা", কিন্তু গ্রন্থের ভেতরে মূল প্রবন্ধের শিরোনাম দিয়েছেন, "মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভা, এডিট স্যোডারগ্রান দুই অদম্য শিল্পী-সত্তা", প্রবন্ধের ভেতরেও তিনি লিখেছেন মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভা। আবার আলভারেজ তাঁর *দ্য স্যাভেজ গড*-এ লিখেছেন মারিয়া ৎস্‌ভেতায়েভা (Maria Tsvetaeva)।

দ্রষ্টব্য ক. *ভাবনার ভাস্কর্য*, কেতকী কুশারী ডাইসন, (দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ১৩৯৬), পৃষ্ঠা সূচি ও ৩১১।

খ. *দ্য স্যাভেজ গড*, পৃষ্ঠা ২৫৮, ২৬৯।

৮৪ দ্রষ্টব্য *শার্ল বোদলেয়ার অনন্য দ্রষ্টা*, সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, (দে'জ পাবলিশিং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কলকাতা ১৯৯২), পৃষ্ঠা ৯।

৮৫ ফ্রয়েডের উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে অমল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "জাক লাঁকা বা পিতৃনামের পরাক্রম" প্রবন্ধ থেকে।
দ্রষ্টব্য এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৮; পৃষ্ঠা ১০০-১০১।

৮৬ দ্রষ্টব্য বিং অ্যান্ড টাইম মার্টিন হাইডেগার, অনুবাদ জোয়ান স্ট্যামবাও, (স্টেট ইউনিভারসিটি অব নিউ ইয়র্ক প্রেস আলবানি ১৯৯৬), পৃষ্ঠা ২৩৭।

৮৭ দ্রষ্টব্য *দ্য স্যাভেজ গড*, আল আলভারেজ, (ব্লুমসবেরি লন্ডন ২০০২) পৃষ্ঠা ১৭৪।

৮৮ দ্রষ্টব্য *পোড়া জমি ও চৌতাল*, টি. এস. এলিঅট, অনুবাদ জগন্নাথ চক্রবর্তী, (সাহিত্য অকাদেমি : নতুন দিল্লি ১৯৯১); পৃষ্ঠা ১৭।

৮৯ রাইনের মারিয়া রিলকের *দ্য বুক অফ ইমেজ* কাব্যের "অটাম" কবিতার চুম্বক-শব্দ। পুরো পঙ্‌ক্তিটি এরকম : "all have this falling-sickness none withstands."
দ্রষ্টব্য: *নির্বাচিত কবিতা*, রিলকে, অনুবাদ ও ভূমিকা: জে. বি. লিশম্যান, (পেঙ্গুইন বুকস ইংল্যান্ড ১৯৮৩) পৃষ্ঠা ২৫।

৯০ *দ্য স্যাভেজ গড*, আল আলভারেজ, (ব্লুমসবেরি লন্ডন ২০০২) পৃষ্ঠা ২৬৮।

৯১ দ্রষ্টব্য *ঐতিহ্যের বিস্তার* : শঙ্খ ঘোষ, প্যাপিরাস কলকাতা ১৮৮৯; পৃষ্ঠা : ৫৮।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্ঘণ্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অয়ুরদিকে, ১৫৮
অগাস্তিন, সেন্ট, ৭৪, ৮৩, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১৯৬
অডেন, ডব্লিও এইচ., ১৯, ২০৪
অয়দিপুস, ৪৮, ৫৫, ৮৯, ১২৬, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৭
"অধ্যাত্ম-অহংবাদী আত্মহত্যা" ২০৮
"অন্তিক আচরণ" ৬১
অরফিয়ুস, ১৫৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৩
অবিমেলক, ৪৮, ৮৫, ১৫৯
"অবধারণবাদী বিষাদ-তত্ত্ব", ৬৭
অমূলপ্রত্যক্ষণ, ৬৬, ৬৯
"অলট্রোয়াইস্টিক আত্মহত্যা" ১০৭
অহিথোফেল, ৪৮, ৮৫, ১৫৯
অ্যাকুইনাস, সেন্ট টমাস, ৯৮, ১৯৪, ৩১১, ৩১২
অ্যাজাক্স, ৫৯
অ্যাডলার, আলফ্রেড, ১১১, ১২৩
অ্যাডামিক, লুইস, ১৪৫
অ্যানডিক্‌স, মার্গারিট ফন, ১৬ ১১০
অ্যানড্রিয়াসেন, ন্যান্সি, ১৭০, ১৭১, ১৭২
অ্যানড্রিয়াসেন, রোখেনবার্গ, ১৭১
"অ্যানোমিক আত্মহত্যা", ১০৭, ১০৮
অ্যান্তিওপি, ১৫৯
অ্যাপোলো, ৪৮, ১৬০
"অ্যাবসলিউট বিইং", ৩০
"অ্যাবসার্ড চক্র" ৩৯, ৪০
অ্যাম্ফিয়ন, ১৫৯, ১৬০,
অ্যালসিওন, ১৫৯
অ্যাঞ্জেলা, ফোলিগনোর, ৩১৪
অ্যালেক্সি, ১৬০
অলফঁস, ২৪২
অভেন, এরিকা, ১৩৩
অর্জুন, ১৫৬
অবীনাদক, ১৫০
আরিস্তিউস, ১৮২
অ্যাকিলিস, ৪৮, ১৫৯
"অকার্যকর সংরাগ", ৩৫
"অকার্যকর সংলাপ", ৬৫
"অহংবাদী আত্মহত্যা", ১০৭, ১০৮
"অস্তিত্বসূত্র", ৩৪
"অদিসি" ২৭
অবশালোম, ১৫৯
আইভান, ১৬০
আরিয়াদানি, ১৪৮
আকুতাগাওয়া, রাইয়ুনোসুকে, ১৪৪
আন্তনি, মার্ক, ৯২, ১৫৬
আজাদ, হুমায়ুন, ৩৮, ৭৬, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫
আন্তোনিয়ুস, মার্কুস অরেলিয়ুস, ৮০, ৯২
আরিস্তোতল, ৯০, ৯৮, ১৭০
আগামেমনন, ১৫৯
আত্তালুস, ৯২
আথেনি, ১৫৯
আতলাস, ১৫৯
''আচ্ছন্ন আত্মহত্যা'', ১৮৩
আদামভ, আর্থার, ৪০
আর্তেমিস, ১৪৮, ১৬০
আর্তাও, আঁতেনি, ১৯৫, ২০৭
আন্তিগোনি, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৮
আব্রাহাম, ৩২, ১৬৬
আব্রামসন, নিল, ৬৭
আমিয়েল, আঁরি ফ্রেদরিক, ২১৩, ২১৪, ২১৬
আফ্রোদিতে, ১৬২
আপডাইক, জন, ৩৮
"আবেশিত আত্মহত্যাস্পৃহা", ১৮৩
আলভারেজ, আল, ৪৯, ৫১, ৮৫, ৯১, ৯৪, ৯৫, ১০৩, ১০৪, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৫, ১১৭, ১২০-১২২, ১৬২, ১৬৪, ১৯০, ১৯১, ১৯৬, ২০২, ২০৪, ২০৮, ২১৬, ২২৯, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০
আহমেদ, কায়েস, ২২৯, ২৩০, ২৪৩
আইনস্টাইন, আলবার্ট, ২১, ৩৮, ৪৫, ৫৩
"আলগোর মার্টিস", ২৫
আরিস্তোদেমুস, ৮২, ৯২
আল-বিরুনি, ১১৯, ১২০
আলোয়শা, ৩৮
আইসোক্রাতেস, ৯২
আলবার্টো, ১৫২
আলোয়শা, ১৬০
আয়োল, ১৬০
আন্টসাল, পাউল, ২৮০
আরিস্তরচাজ, ৯২
আরবিতের, পেত্রোনিয়ুস, ৯২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আরাকনি, ১৫৯
আরিতিউস, ১৬৪
"আংশিক আত্মহত্যা", ১৬৭
"আস্তিত্বিক চক্র" ৭৬
আইলিন, ২৬৪, ২৬৫
আপলিনের, গিয়ম, ২৮০
আশেনবাখ, গুস্তাফা ফন, ৫০, ১৫৭
"আস্তিত্বিক পাপ" ২২৩
"আর্পি", ১৯৭
আন্টারম্যায়ার, লুই, ২৯০

"ইউথানেজিয়া", ৬১
ইউলিসিস, ২৭
ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, ২২৯
ইউরিদাইস, ১৮২
ইউসিবিয়ুস, ৫৪
ইওস, ১৪৭
ইকারুস, ২৩১
ইকো, ১৬২
ইক্সটাব, ৮১
"ইন্টারপার্সোনাল থেরাপি", ৬৭
"ইগোইস্টিক সুইসাইড" ৭১
"ইগলুলিক এস্কিমো", ৮১, ৯৬
ইজিউস, ৮৯, ১৪৮
ইজ্জি, ইউজিন, ১৪৫
ইঙ্গস্ট্রান্ড, স্টুয়ার্ড, ১৩৭, ১৩৮
ইথ্রা, ১৪৮
ইনজে, উইলিয়াম, ১৩৮
ইনিয়ুস, ১৫০
ইলিচ, ইভান, ১৮৭-১৮৯
ইকোভ্লিয়া, তাতিয়ানা, ৩০১
ইয়াকোভলেভা, তাতিয়ানা, ৩০৭
ইমলে, ক্যানটেন গিলবার্ট, ৬৮
ইয়েটস, ডব্লিও. বি., ২৪৪, ২৫৭
ইয়াসপাস, কার্ল, ৩১
ইয়োকাস্তা, ৪৮, ৮৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৩
ইয়োনেস্কো, য়্যাজেন, ৩৮, ৪০, ৪৫
ইয়ুং, কার্ল, গুস্তাফ, ১২৬, ১৭৬
"ইলিয়াটিক মতবাদ", ৩০
ইস্কারিয়োত, জুদাস, ৯৮
ইলেকত্রা, ১৫৯
ইসোক্রাতেস, ৯২
ইসহাক, ৩২
ইতিওক্লেস, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৮
ইগনাতিয়ুস, সেন্ট, ৩১৪

"ঈশ্বরের মৃত্যু", ৩৩

"ঋণাত্মক মহনীয়তা", ১৬৩

"উদ্বেগজনিত সমস্যা", ৫৯
"উদ্বেগজনিত আত্মহত্যা" ৭০
"উদ্বিগ্ন-প্রযত্ন", ৩৪
''উন্নত সভ্যতার সূচক'', ৮৮
উল্ফ, ভার্জিনিয়া, ১৬, ৪৩, ১২৭, ১৪৬, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৯৫, ২৪৬-২৫৪, ২৮৭, ২৯৩
উলফলিন, ১৭৬
উলসন, কনস্টানস, এফ, ৫০, ১২৮
উইভিল, ডেভিড, ১২৯, ১৫৬
উইভিল, আসিয়া, ১২৯, ২৫৬
উইলবারফোর্স, ডা., ২৫৩
উইনটার্স, ইওভর, ২৯৪

এরমিলোভ, ভ্লাদিমির, ৩০৮
এলিঅট, জ্যাকস, ১৯৮
এমার্সন, ২৯৪
এডিসন, জোসেফ, ২০৩
এডওয়ার্ড, রাজা, ৮৪, ৯৬
এমপেদক্লেস, ৩০
এরিগোনে, ৮৯
এরস, ১৫৭
এলিঅট, টি. এস., ১৪০, ২৪৪, ২০০, ২৯০, ২৯১, ২১০
এসলিন, মার্টিন, ৪০
এসেনিন, সের্গেই, ১২৯, ১৩৬, ৩০০

"ঐকতান বহির্ভূত", ৪০

ওয়েসলে, জন, ৩১৫
ওপিক, জেনারেল, ২৪২
ওয়েরে, মৌর হাইওয়ার্ড, ১৩৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওয়ার্ডসওয়ার্থ, উইলিয়াম, ১৬৫, ২০৫
ওয়েস্ট, পাউল, ২৮৫
ওডিন, ৮০, ৮১
ওতো, ৯২
ওফেলিয়া, ৭৪, ১৫০, ১৫৮, ১৯৯, ২০০
ওভিদ, ১৪৯
ওলস্টোনক্রাফ্‌ট, মেরি, ৬৮
ওসেনুস, ১৫৯
"ওরা", ৪০
ও'নিল, ইউজিন গ্ল্যাডস্টোন, ৫৩, ১৪৫, ১৬৯, ২৯৪
ওয়ালপোল, হোরেস, ২০৪
ওথেলো, ২০১
ওদুসসেউস, ২৭, ১৫৯
ওয়াটস, ক্যাপটেন, ৮১
ওয়ালডো, ২৯১
ও'ক্লিফ, জর্জিয়া, ১৬৯

"কগনিটিভ-বিহেভিওয়াল থেরাপি", ৬৭
কনরাড, জোসেফ, ৫১, ১৭৯
কবির, শামীম, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৪৩, ২৪৪
কাউপার, উইলিয়াম, ২৪০, ২৪১, ২৪২
কান, অটো, ২৮৯
কিরসানোভ, সেময়োন, ৩০৮
ক্যাম্পবেল, অ্যালেন, ১৪২
কাউলি, পেগি, ২৯২, ২৯৬
কাহলার, এরিখ, ২৮৫
কারেনিনা, ঘানা, ৫০, ১৫২
কাতেরিনা, ১৬০
কুমিন, ম্যাক্সিন, ১৩০
ককেরাল, স্যার সিডনি, ১৩৭
কোনেল, হেলেন, ১৩৮
কাওয়াবাতা, ইয়াসুনারি, ১৩২, ১৬৫
কাতো, ৭৯, ৯০, ৯২
কাফকা, ফ্রানৎস, ৩১, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ১০৯, ১৫৪, ২৯৫, ২৩৪, ২৮৩
কাভাফি, ১৭৭
কাম্যু, আলব্যের, ১৬, ১৯, ২০, ২৯-৩১, ৩৬, ৩৮-৪৪, ৪৭, ৫৭, ১০৭, ১১১, ১১২, ১২০, ১৪৬,১৬১, ১৬৩, ১৬৪, [illegible]
১৯৪, ২৩৫
কান্ট, ইম্মানুয়েল, ৩০, ৩৩, ৩৪
কাতুল্লুস, ৪৯, ৭৯, ২৯৪
কাসটোর্প, হান্স, ২৮, ৫০, ১৩৪
কাসকা, পাবলিয়ুস সারভিলিয়ুস, ৭৯
কাসিয়ুস, ৯২
কামবাইসেস,২য়, ৮০
কারামাজোভ, ৫০, ১৬০
"কামিকাজে পাইলট" ৭৩, ৩১৫
কির্শনার, লুডভিগ, ৭৮
কিয়ের্কেগার্দ, সোরেন, ২০, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ১৭০, ১৭২, ১৭৩, ১৮৪, ১৯০, ২২১, ২৭৩,
কিটস, জন, ৪৩, ৫২, ১৬৫, ১৬৯, ২০৫, ২০৭, ২১২, ২৬৬
কিরিলোভ, ১২০, ১৬০, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫
কে., জোসেফ, ৪১, ৪২
কেভোরকিয়ান, জ্যাক, ৬২, ৬৩
কোদরুস, ৪৮, ৮৯, ৯২
কেইন, ১৩৩
কোলাতিনুস, ৪৯
ক্যাপোট, ট্রুম্যান, ৫৩
কেসেল, ড. নিল, ১২৪
কারে, হেনরি, ১৪৫
কুইরোগা, হোরাসিয়ো, ১৪৪
কোয়েস্টলার, আর্থার, ১৩৪, ১৩৫, ১৬৫
কপাল কুণ্ডলা, ২৩৮
ক্রসবি, হ্যারি, ২৯১, ২৯২
কাউল, ম্যালকম, ২৮৮
কারেনিনা, আনা, ৫০
কারামাজোভ, ৫০
ক্রেইন, মিসেস, ১১৬
কোসিনস্কি, জার্জি, ১৩৫, ১৩৬
কোলরিজ, এস, টে., ১৬৪, ২০৫
ক্লেয়াস্থেস, ৪৯, ৯১, ৯২
ক্লেওপাত্রা, ১৬, ৯২, ১২৪, ১৫৬
ক্লাইভ, রবার্ট, ৫৫
ক্লাইস্ট, হাইনরিশ ফন, ৫০, ১৪০
ক্লিওমব্রোতুস, ৯০, ৯২
কালিপসো, ২৭
ক্রসবি, হ্যারি, [illegible], ১৬৫

~ www.amarboi.com ~

ক্রামস, ৯২
ক্রেন, হার্ট, ১২৮, ১৯৫, ২৪৬, ২৮৬–২৯৬
ক্রেয়ন, ১৫৩, ১৫৮
"ক্যাচ-২২", ১০৯
"ক্যানন ল", ৯৯
ক্যালিগুলা, ৩৬, ৪১
ক্লদিয়া, ৪৯
ক্রেন, গ্রেস হার্ট, ২৮৭
ক্রেন, ক্লেরেন্স, হার্ট, ২৮৭
"ক্যাটাটোনিয়া", ১৬৫
"কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট", ২২
ক্রোলো, কার্ল, ২৮৩
"ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন" ৬৫
ক্যালিওপি, ১৮২

খ্রিস্ট জিশু, ১৭, ৫৪, ৮৫, ৯৮, ১৪৯, ১৯৫, ৩২৬,
খগেন, ২১৫

গ্রুশেঙ্কা, ১৬০
গগাঁ, পল, ৬৮, ১৬৯, ১৯৮
গ্রাস, গুন্টার, ২৭৫
গাল্লুস, গেইয়ুস কর্নেলিয়ুস, ১৪৫
গ্রিন, রবার্ট, ৫১
গিবন, এডওয়ার্ড, ৯৬, ৯৭
গুটিন, জো অ্যান সি, ১৬৮
গেরিকল্ট, থিওডর, ১৬৯
গোর্কি, ম্যাক্সিম, ৩৮, ১৬৯, ৩০৪
গোর্কি, আর্শাইল, ৭৮
গ্যারি, রোঁমা, ১৩৪, ১৬৫
গ্রেটে, ১৫৪
গালেন, আক্সেল, ৩০৪
গোগল, নিকোলাই, ৩০৪
"গোদো", ৪০
গল, ইভান, ২৮৩, ২৮৪
গাঁ, জোসেফ, ১৬৩
গ্রাউটোফ, ক্রিশ্চিয়ানা, ১৩৭
গোয়েনশ্চ, অটো, ১৪৭
গান্ধি, মহাত্মা, ৩১৪
গ্যোয়েটে, জে. ডব্লিও ফন, ৫০, ৫৩, ১২৪, ১৫২, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৫, ১৭৬, ১৮৬, ২০৬, ২৮৫, ৩১৫
গোয়েবল্‌স, ইয়োসেফ, ১৪৭
গোয়েবল্‌স, মাগদা, ১৪৭
গোস্বামী, জয়, ২২১
গুহ, ভূমেন্দ্র, ২৩৮

চেকরিগিন, ভাসিলি, ৩০৮
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ২১৮, ২৩৮
চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, ১৭৯, ২৮৭
চাইকোভ্‌স্কি, পিটার ইলিচ, ১৬৭
চান্ডলার, রেমন্ড, ৫৩
চারোনদাস, ৮৯, ৯২
"চিকিৎসক-সহায়ক-আত্মহত্যা", ৬১, ৬৩, ৬৪
চ্যাটারটন, টমাস, ৫০, ১১৭, ২০৪, ২০৫, ২০৯
চোপিন, ফ্রেডারিখ, ১৬৪, ১৯৮
চট্টোপাধ্যায়, স্নেহলতা, ২২৮
চার্লস, ৫ম, ৮৮
চেনি, রাসেল, ১৪২
চিকামাৎসু, ৩১৫

"ছদ্মবেশী আত্মহত্যা", ৪৮

জব, ১৬৩
জনসন, ড. স্যামুয়েল, ৮৫, ২০৫
জনসন, ফ্রাঙ্ক, ১৬৯
জনসন, জেম্‌স ডব্লিও, ১৪৫
জামিসন, কে., ১৬২, ১৬৯, ১৭০, ১৭১
জারা, ত্রিস্তাঁ, ২০৮
জারেল, রান্ডাল, ১৪৫, ১৬৫
জাস্টিনিয়ান, ৯৩
জিউস, ১৫৯, ১৭৪
জিলবোর্গ, গ্রেগরি, ১০৬, ১০৭, ১৬৬
জেমস, হেনরি, ২০, ২৬৬
জুদাস, ৮৫, ১৪৯, ১৫০
জর্জ, স্টিফেন, ২৭৫
জয়েস, জেমস, ১৩৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯
জাম্‌জা, গ্রেগর, ৪১, ৫০, ১৫৪
জুনিয়র, জেম্‌স ট্রিপলি, ১৪৩
জুনিয়র, লিউস বি পুলার, ১৪৩
জুপিটার, ১৫০
জুসেফুস, ফ্লাবিয়ুস, ৫৪, ৩১৫
জ্যাকসন, চার্লস, ১৩৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জেনে, জ্যাঁ, ৩১, ৩৮, ৪০
জেনো, ৪৯, ৯১, ৯২
জোলা, এমিল, ২৮০
জোনস, জিম, ৬০
জুনো, ১৫০
"জ্ঞাতিত্ব বন্ধন", ১০৮
জোসিমা, সন্ত, ১৯৫
জেফারসন, রবার্ট, ২৬১
জেফারিস, সিনথিয়া, ১৩৪
জুলিয়েট, ১৫৩, ১৫৪, ২০১

ঝাও, মিজ, ৩১৬

টেট, অ্যালেন, ২৯৪, ২৯৫
টমসন, ফ্রান্সিস, ৫১
টমাস, ডিলান, ৫৩, ১৯৫, ২৯৪
টয়েনবি, আর্নল্ড, ৫৭, ৭৬
টুল, থেলমা ডুয়োকোয়িং, ১৩৯
টিসডাল, সারা, ১৩৩
টোলার, আর্নেস্ট, ১৩৭, ১৬৫
টুল, জন কেনেডি, ১৩৯, ১৪০
ট্রাকল, গেয়র্গ, ৪৩, ১২৭, ১৬৫, ২৪৬, ২৭০-২৭৯
ট্রাকল, মারিয়া হালিক, ২৭৫, ২৭৬
টোরিয়াস, ২৭৫

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৫, ২৩, ২৬, ৩৮, ১৭৫, ১৭৮, ১৮০, ১৮২, ২১৩-২১৫, ২২১-২২৩, ২২৭, ২৮১

ডগলাস, ডি., ১০৯
ডরিস, মাইকেল, ১৩৯
ডাওসন, আর্নেস্ট, ৫১
ডানকান, ইসাডোরা, ১২৯, ১৩৬
ডান, জন, ১৭, ৫০, ৭৭, ৮৫, ৯২, ৯৯, ১০১, ২০২, ২০৩, ২৪০, ২৯৩, ৩১৬
ডায়াগ্রে, ১৫৯
ডারউইন, চাল্‌স, ৫৩
ডিকিনসন, এমিলি, ১৩৭, ১৬৯, ১৮
ডিকেন্স, চার্লস, ১৬৪, ১৯৯
ডেলামেয়ার, ওয়াল্টার,

ডেভিডসন, জন, ৫৩, ৫৫, ১৩১, ১৩২
"ডোনাটিস্ট", ৯৬, ৯৭
"ড্রুইড", ৮০
ডিডেলাস, স্টিফেন, ২৫০
ডেম্বো, ২৯১
ড্যালোয়ে, ক্ল্যারিসা, ২৪৭
ডাকওয়ার্থ, ২৫১
"ডিসথিমিয়া", ৬৫
"ডোপামিন", ৬৬
ডওলিং, ১২২

তলস্তোয়, লিয়েফ, ৫০, ৬৮, ১৩৬, ১৫০, ১৫২, ১৬৯, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯-১৯১, ১৯৫, ৩০৪
তেরতুলিয়ান, ৯৬
তুর্গেনিয়েভ, ইভান, ৫২
তোসিতুস, ৪৯, ৯২
তেরেন্স, ৪৯, ১৪৫
তান্তালাস ১৬০
তলেমি, ৯২
তাদৎসিও, ১৫৭
তাগেত, ১৫৯
ত্রুত্‌স্কি, ৩০৫-৩০৮

ৎসভাইগ, স্টেফান, ৫৩, ১৩৫, ১৬৫
ৎসভেতায়েভা, মারিনা, ২৪২

থামাইরিস, ১৭৪
থিসিউস, ৪৮, ৩৯, ১৪৮
থিসবি, ১৪৮, ১৪৯
"থ্যানাটোলজিস্ট", ২৪

দং, মাও জে, ৩১৬
দেবী, কাদম্বরী, ২১৪, ২২২
দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, ২৪৫
দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ১৭৯, ১৮০
[illegible], জীবনানন্দ, ২৭, ২৮, ৪৩, ৪৬, ১৪৫, ১৭২, ১৭৮, ১৭৯, ২১০, ২১১, ২১৬, ২১৭, ২২০, ২২৪, ২২৮, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৩
দমিত্রিয়াস, ৯৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দস্তইয়েফস্কি, ফিউদর, ৩০, ৩১, ৩৭, ৩৮, ১২০, ১৬০, ১৬৪, ১৮২, ১৮৪, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ২৭৩, ২৯৯, ৩০৪, ৩০৮
দান্তে, আলিগিয়েরি, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯
দাজাই, ওসামু, ১৪৩
দায়েম, ৭৮
দিদো, ৪৯, ১৫০
দিয়ানাইরা, ১৬০
দিয়োজেনুস, ৯২
দ্যুরকহাইম, এমিল, ৬০, ৬৮-৭৩, ৮১, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৭-১০৯, ১১৪, ১১৭, ১২৩, ১৬১, ২১৫, ২২৬, ২২৭, ৩১২
দুমনা, জুলিয়া, ৮০
দেকার্ত, রনে, ২৯, ৩০, ৩১
দেমোক্রেতুস, ৩০, ৪০, ৯২
দেমোসথেনেস, ৪৮
দাউদ, রাজা, ১৫৯
দমিত্রি, ১৬০
দিয়োনিসুস, ১৮২
"দ্রোহচক্র", ৩৯
দেবী, কাদম্বরী, ২১৪

"ধর্মীয় আত্মহত্যা", ৯৬

"নন-অবজেকটিভ আর্ট", ১৮১
নাইওবি, ১৬০
"নার্ভাস ব্রেকডাউন", ৩৫
নিকোলাস, ২৫৬
নর্টন, ডিক, ২৫৭
নেলসন, আর্নেস্ট, ২৯১
নিকোলসন, নিগেল, ১৬৮
নেরভা, মার্কুস কোসিইয়ুস, ৯২
নার্সিসাস, ১৬২
"নিউকর্টেক্স", ২৪
নিউটন, আইজাক, ১৬৪
নিট্‌শে, ফ্রিডরিখ, ১৭, ৩১, ৩৩, ৩৮, ১৩০, ১৭৬, ২৭৩, ২৭৭, ৩১২
নিরো, ৪৯, ৭৯, ৯১, ৯২
"নিউরোট্রান্সমিটার", ৬৬, ৬৭
নেরভাল, জেরার দ্য, ৫০, ১৪৫
"নেবুলার হাইপোথিসিস" ৫৪
নেমোস্থেনেস, ৯২
"নৈতিক বর্জন", ৩২
নোফালিস, ৩১৬, ২৩১, ২৩৯
নেপোলিয়ঁ, ২০৬
"নান্দনিক হতাশা" ৪৩, ১৭২
নেসাস, ২৬০
"নোরেপাইনেফ্রিন", ৬৬, ৬৭

"পতনশীলতা" ৩৪
"পরার্থবাদী আত্মহত্যা" ৭২, ৮১
পাসকাল, ব্লেজ, ৩১, ১৯৮
পাইরামাস, ১৪৮, ২৪৯
পাউলিনা, ৯২
পার্কার, ডরোথি, ৫৩, ১৪২
পার্কার, চার্লি, ১৬৯
পাস, অক্তাবিয়ো, ১৭৮
পারমেনাইদস, ৩১
পার্সি, ওয়াকার, ৩৮, ১৩৯
পাভেজে, চিজারে, ১১২, ১১৭, ১২১, ১২২, ১২৩, ১৬৫
পিকক, টমাস লাভ, ১৭৪
পিনটার, হ্যারোল্ড, ৫০
পলিনেইসিস, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৮
প্যাসোস, জন ডোস, ২৪৯
পোর্টার, ক্যাথারিন অ্যান, ২৯২
প্লাথ, অরেলিয়া শোবার, ২৫৫
প্লাথ, অটো এমিল, ১২৯, ২৫৫
প্লুতার্ক, ৩১৫
পল, সেন্ট, ৩১৪
পাস্তেরনাক, বরিস, ২৯৭, ৩০৪, ৩০৯
পুথাগোরাস, ৩০, ৮৬, ৯০
প্রিয়াম, ৪৮
পিল, জর্জ, ৫২
পিলাত, পন্তিয়ুস, ৫৪, ৫৫
পেসোয়া, ফের্নান্দো, ১৪৩
পুশকিন, আলেকজান্দার, ৫২, ৩০৪
পুলার, লুইস, ১৬৫
পেত্রোনিয়ুস, ৪৯, ১৪৫
পোলক, জ্যাকসন, ৭৮, ১৬৭
পো, এডগার অ্যালেন, ৫১
প্লাত্তিনাস, ৩০

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্লাতোন, ১৭, ৩০, ৩১, ৩২, ৮৬, ৯০, ৯১, ৯৮, ১৫৭, ১৭০
প্লাথ, সিলভিয়া, ৪৩, ১১৩, ১১৫, ১১৭, ১২৬, ১২৯, ২২৭, ২২৯, ২৪৬, ২৫৫-২৬০
পাত্রোক্লাস, ৪৮
প্লিইআদিজ, ১৫৯
"প্রপঞ্চবিদ্যা", ৩৫
প্রক্রিস, ৪৭, ১৪৮
প্রোতিয়োস, ২৯৬

ফিয়োদোরোভ, নিকোলাই, ৩০৮
ফ্রানৎস, ইয়োসেফ, ২৮৫
ফ্রস্ট, রবার্ট, ২৪৩
ফ্রেইডেনথাল, রিচার্ড ২০৬
ফায়েদ্রস, ১৫৭
ফ্রাঙ্গিস, কে, ১৪১
ফ্রেন্স, নোরামে, ১৪০
ফাউস্ট, ১২৭
ফোগেল, হেনরিয়েটা, ৫০
ফকনার, উইলিয়াম, ৫৩
ফুলবেক, ৮১
ফিট্সজেরাল্ট, এফ. স্কট, ৫৩
ফ্রিডম্যান, আলেকজান্দার, ২২
ফিকার, লুডভিগ ফন, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯
ফনভিজিন, ১৯৫
ফ্রেদেরিকো, ১৯৭
ফ্রাই, রজার, ২৪৮, ২৫২
ফ্রয়েড, জিগমন্ট, ১৯, ৪৭, ৪৮, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬৬, ৮৯, ১০৯, ১১১, ১১৩-১১৬, ১১৮, ১৩৯, ১৬৬, ১৬৭, ১৮১, ২৪৩
ফ্রেজার, জেমস, ৮০, ৮৭, ৯৪
ফ্রাউন হোফার, ফন, ১৩৬
ফিলিপস, টমাস, ২০৫
ফেদিয়েভ, আলেকজান্দার, ১৪৫
ফ্লেমিং, ক্যালেব, ৩১৫
ফ্রেন্স, নোরা মে, ১৪০
বন্দোপাধ্যায়, শরদিন্দু, ১৭৩
বসু, বুদ্ধদেব, ১৭৫, ১৮৫
বেকন, ফ্রান্সিস, ১৯৯
বেকেট, স্যামুয়েল, ৩৮, ৫০
বাখ, ইয়োহান খ্রিস্টিয়ান
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, ২০৮, ২১৮, ২১৯
বেল, ভ্যানেসা, ২৪৮, ২৪৯, ২৫২
ব্লুম, লেপোল্ড, ২৪৯
বুশ, প্রেসিডেন্ট, ২২০
বেল, ক্লাইভ, ২৪৮
বায়ার্ড, মেগি, ২৮৮
বায়নার, উইটার, ২৯২
বাক্কাস, ২৯৫
ব্রিক, লিলি, ২৯৭, ২৯৮, ৩০১
ব্রিক, অসিপ, ২৯৭
বারলিউক, ডেভিড, ৩০৩
ব্লোক, ৩০৪
বুনিন, ইভান, ৩০৪
বায়ার্স, অ্যামব্রোস, ১৪৫, ১৬৫
বার্নস, জন হর্ন, ১৪৫
বিটোফেন, লুডহ্বিগ ফন, ১৬৪, ১৭৫, ১৯৯
বাল্মীকি, ১৫৫
বাকুনিন, মাইকেল, ১৪৬
বোকেজ, লুইস কলিন-বারবি দ্যু, ১৪২
বালজাক, ১৩৫
বার্কলি, জর্জ, ৩০
বার্থ, জন, ৩৮
বায়রন, লর্ড, ৫২, ১৬৫, ১৬৭, ২০৫
বের্গসন, অরি, ২৩, ২৯
বেক, অ্যারোন, ৩৭
বেজুখোভ, পিয়ারে, ৫০, ১৫২
বেরিম্যান, জন, ৪৩, ১১৩, ১১৭, ১৩২, ২৪৬, ২৬০-২৭০
বেনজোনি, গিরোলামো, ৮৯
বেভেস, টমাস লভেল, ৪৫
ব্লেইক, উইলিয়াম, ১৬৯, ১৭৭, ২৯৩
বেহান, ব্রেন্ডান, ১৯৫
"বিশ্বাসের জন্য পদক্ষেপ", ৩৩
"ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞান", ১১৩
বেটেলহাইম, ব্রুনো, ১৩৯
বোদল্যের, শার্ল, ৪৩, ৫৭, ১৬৩, ১৮৫, ২০৫, ২৪২, ২৭৪, ২৯৩, ২৯৫
বোভারি, মাদাম, ৪৯, ১৫১
বোরোমিনি, ফ্রন্সেসকো, ৭৮
বোয়াদিসিয়া, ৯২
বোর্হেস, হোর্হে লুইস, ১২৬, ২৩৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বোক্কাচিও, গিয়োভানি, ১৭৩
ব্রাউন, স্যার টমাস, ৮৫
ব্রাউন, ফেনি, ৫২
ব্রাউন, ইভা, ১৪৭
ব্রুতাস, মার্কুস জুনিয়ুস, ৯২
ব্রটিগান, রিচার্ড, ১৩৮
ব্রুনো, সেন্ট, ৯৮
ব্রুনহিল্ড, ১৫৯
বোভোয়া, সিমন দ্য, ৫৫
ব্রেতঁ, আর্দ্রে, ২০৭, ২০৮
"ব্যক্তিত্ববর্ধক", ৬৭
ব্ল্যাকমোর, আর, পি, ২৯৪
ব্ল্যাকমুর, রিচার্ড, ২৬৫
ব্ল্যাকমুর, হেলেন, ২৬৫
বেন, গটফ্রিড, ২৭৩
বুশব্যাক, এরহার্ট, ২৭৭
ব্রিল, ১৬৬
ব্রন্টি, শার্লোট, ১৬৪
ব্ল্যাকস্টোন, ৮১
বার্টন, রবার্ট, ২০৩
বাজেল, ইউস্টেস, ২০৩
বার্থোলিন, ৭২
বুদ্ধ, গৌতম, ৭৫
বেলো, মল, ১৩৯
বিগেলো, জোসেফিন রোচ, ১৪০
"বোশিদু", ৩১৪, ৩১৫
"বাইপোলার সমস্যা/ডিসঅর্ডার", ৫৯, ৬৫, ৬৭, ৬৮

ভলত্যের, ৮৪, ১০০, ১১৮, ১১৯, ১৮৫, ২০৩
ভালেরি, পল, ১৭৫, ২৮৪
ভ্যান গঘ, ভিনসেন্ট, ৭৭, ৭৮, ১৬৪, ১৬৫, ১৯৫, ২১২, ২৩৪
ভারুস, পাবলিয়ুস কুইনতিলিয়ুস, ৭৯
ভার্গুস, গেতুলিও ভরনেলেস, ৮০, ১৩৫
"ভাইকিং", ৮০, ৯৬, ৩১৫
"ভালহাল্লা", ৮০, ৯৬
ভিনিয়ে, পিয়ের দেল্লে, ১৯৭
ভিগনি, দ্য, ২০৫
ভীষ্ম, ১৫৬,
ভেরলেন, পল, ৫১,
ভিনাস, ১৫০
ভ্রোনস্কি, ৫০, ১৫২
ভার্জিল, ভিগিনিয়াস, ১৫০, ১৯৭, ২৯০,
ভারনিউইল, লওইস, ১৪২
ভানিয়া, ১৬০
ভারতচন্দ্র, ১৭৪
ভাশে, জাক, ২০৭, ২০৮, ২৩৩
"ভিলিফ্রাঙ্কি", ৫১
ভিয়েরেক, জর্জ সিলভেস্টার, ৫৬

"মধ্য-জীবনের সংকট", ১৯৮
"মন্দের সমাপ্তি", ৪৯
'মনস্তাত্ত্বিক আত্মহত্যা", ৫০, ১৬৭
ম্যাটৎজারেথ, অস্কার, ২৭৫
মিশো, অঁরি, ২৮৪
"মরণের নৃত্য", ৮৭
মরটিমার, স্টানলি, ১৪০
মেফেয়াব, মিটজি, ১৪১
মেরোপি, ১৫৯
মেইনহোল্ড, ৩০৮
মুর, মারিয়ান, ২৮৪
মিডলটন, জো., এ., ২৮৩
মলকীশূয়, ১৫০
মিল্টন, জন, ২৮৬, ২৮৭, ২৯০
মানসন, গোরহাম, ২৯৩
মওরার, আলফ্রেড হেনরি, ৭৮
মঁতেসকিও, বারোন দ্য, ৮৪, ১০৫, ১১২, ২০৩
মঁতেন, ২০, ৯২, ২৪৪
মথি, ৯৮
মর্গান, সেথ, ১৪৫
মরসেল্লি, হেনরি, ৯৯
"মনোম্যানিয়া(ক)", ৬৯, ৭০
মঁতেরলাঁ, অঁরি দ্য, ১৩৮, ১৯৬
মারিয়ুস, ৯২
মান, টমাস, ২১, ২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৫৭, ২৩৭
মাইনস, ১৪৮
মান, ক্লাউস, ১৩৩, ১৩৭, ১৬৫
মান, কাতিয়া, ১৩৩
"মানব দাসত্ব", ৫১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্সেল, গাব্রিয়েল, ৩১
মার্লো, ক্রিস্টোফার, ৫২
মার্কস, কার্ল, ৫৩
মাঞ্চ, এডভার্ড, ১৬৯
মাসাদা, ৬০, ৯২
মারকিউস, ১৩৭
"মারকুইসাস দ্বীপপুঞ্জ", ৮১
মারমোল, ৩৯, ৪৪, ১৯১, ১৯২
মার্সেল্লেনুস, ৯২
মাটথিইসেন, এফ. ও., ১৪২
মাইয়া, ১৫৯
মিথরিদাতেস, ৯২
মিশিমা, ইউকিয়ো, ১৩০, ১৩২, ১৬৫
মিলার, নরমান, ৩৮
মিউ, শার্লট, ১৩৭
ম্যাগি, ১৩১
ম্যাকমিন, ১৩৩
মেরিনো, এমিলিয়া, ১৩৪
মেফিস্টোফেলিস, ১২৭
মরিক, ২৭৫
মিতিয়া, ১৬০
মিকেলেঞ্জেলো, ১৬৯
মান্দেলস্তাম, ওসিপ, ১৯
মালরো, আর্দ্রে, ৩৮
মায়াকোভ্স্কি, ভ্লাদিমির, ৪৩, ১১৩, ১১৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৬, ১৬৫, ১৯৬, ২৪২, ২৪৩, ২৪৬, ২৯৬, ৩০৯
মাসলোভা, কেতারিনা, ৫০, ১৫২
মেরোপি, ১৫৯
মেনিংগার, কার্ল, ৬০, ১৬৬
মোৎসার্ট, ডবিও. আমাডিয়াস, ১৭৫, ১৯৮
মোপাসাঁ, গি দ্য, ৫০, ৫২, ৬৮
মোর, স্যার টমাস, ৫১, ১৯৯, ২০১, ২০২
মোদিল্লেয়ানি, আমাদেয়ো, ৭৮, ১৬৭
মোঁয়ে, ফাঁসোয়া লা, ৭৮
মৌর্য্য, চন্দ্রগুপ্ত, ৮০
মিলার, আর্থার, ৩৮
মিল, জন স্টুয়ার্ট, ১৭৭
মিস্ত্রাল, গাব্রিয়েলা, ৫[illegible]
"মূল্যবোধের পূনর্মূল্যায়ন", ৩৩
মুস্যে, আলফ্রেদ দ্য, ৫১, [illegible]
ম্যাকহাল, টম, ১৪২
মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, ২১৫
মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ২১৪
মুসোলিনি, ১২২
মিউজ, ১৭০
মার্গারিট, ২৭৪, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯
মোর, জিওফে, ২৬৬

যিরুব্বাল, ১৫৯
"যৌক্তিক আত্মহত্যা", ১৬০
যোনাথন, ১৫০
যাদব, ২০৮, ২০৯
যিহুদা, ১৪৯

য়েফ্রেন, সোর্জেই, ২৪২

"রনিন, ৪৭", ৩১৫
রাফায়েল, ১৯৮
রোমিও, ১৫৩, ১৫৪
র‍্যাবো, আর্তুর, ১৭৮, ১৯৫, ২৩৫, ২৭৪, ২৮৪, ২৯৫
রফিক, মোহাম্মদ, ২৩৭
রিচার্ডস, গ্র্যান্ড, ১৩১
রুজভেল্ট, ১৩৭
রুয়ো, এমা, ১৫১,
রোদলফ, ১৫১
"রেকুইয়াম ম্যাস", ৭৪, ২০০
রায়, তুষার, ২১০
রায়, অনন্য, ২১০, ২১৮
রিলকে, রাইনের মারিয়া, ৪৩, ১৭২, ২৪৫, ২৭১, ২৭২, ২৮৫
রিয়ো, বেরনার, ৪০
রোঁকেতঁ, আঁতোয়ান, ৩৭
রোথকো, মার্ক, ৭৮, ১৬৯
রোডরিগিউজ, স্যু, ৬৩
রোলেবোঁ, মার্কি দ্য, ৩৭
রোথেনবার্গ, ১৭১
রোবেক, জন, ১১৮, ১১৯
রোসেটি, দান্তে গাব্রিয়েল, ৫১, ১৩৩, ১৯৮
রুফুস, কোরেলিয়ুস, ৯৩
রুসো, জ্যাঁ জ্যাক, ৮৬, ১৬৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাসেল, বারট্রান্ড, ২১০
রাচমানিনোফ, সের্গেই, ১৬৭
"রিগোর মার্টিস", ২৫
রিচার্ডসন, জোনাথান, ১৭১
রিগাও, জাক, ২০৮
রামচন্দ্র, ১৫৫
রায়া, মাথা, ১৪১

লওয়েল, রবার্ট, ১২৩
লুকাস, জে. অ্যান্থনি, ১৪৩
লেতো, ১৬০
লের্টাস, ৪৪, ২০০, ২০১
লওরি, ম্যালকম, ১৩৬, ১৬৫
লরেন্স, টি.ই., ১৪৫, ১৬৫
লকরিজ, রোজ, ১৩৩, ১৩৪
লি-পো, ২৯৫
লেনিন, ভ্লাদিমির ইলিচ, ৩০৫
লান্ডসবার্গ, পাউল লুইস, ৩১৫
লকরিজ, ভারনিস, ১৩৪
লরেন্স ফ্রায়ার, ১৫৪, ২০১
লাস্ট্রানজ, গিসলি, ২৮০, ২৮২
লন্ডন, জ্যাক, ১৩৬
ল্যাম, চার্লস, ৫২, ১৭০
লাইকুরগুস,৪৮, ৮৯, ৯২
লাইবেনিয়ুস, ৮২
"লাসিদেমেনিয়ান", ৮৯
লাবিয়েনুস, ৯২
"লাঞ্ছিত আত্মসম্ভ্রম", ১১১
লারা, মাবিয়ানো হোর্হে দ্য, ১৪৫
লাইকাওন, ৪৮
লাইভ, জুলিয়ান, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪
লেনার্ড, ১৬৮, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০-২৫৪
লিয়ান্দার, ১৪৯
লিউকাকুস, ৪৮
"লিভোর মার্টিস", ২৫
লিটম্যান, ডা., ১১৪
লিন্ডসে, ভ্যাশেল, ১৩৩
লেভিন, ৫০
লেয়ারমন্তফ, ইউরিভিচ, ৫২, ৩০৪
লেয়াস, ১৫০, ১৫১
লেভি, প্রাইমো, ১৩৮
লেভিস, ক্যারোল, ১৪১
লুডভিগ, আর্নল্ড, ১৭১
লুকান, ৪৯, ৯২, ১৪৫
লুক্রেতিয়া, ৯৭, ১৯৬, ১৯৯
লুক্রেতিয়ুস, ২৬, ৪৯, ৯২, ১৪৫
লোট্টে, ১৫২, ২০৬
লোরকা, ফেদেরিকো গরসিয়া, ২৭২
লিনাও, নিকোলাস, ২৭৪
লাসকার-সুলার, এলস, ২৭৮
লাকতানতিয়ুস, লুসিয়ুস, ৩১৬
লাইসিডাস, ২৮৬

শাগাল, মার্ক, ২৮৩
শার, রেনে, ২৮৪
শান্তনু, ১৫৬
শিখণ্ডী, ১৫৬
শিলার, ফ্রিডরিখ, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭
"শিক্ষিত অসহায়তা", ৬৭
শেক্‌সপিয়র, উইলিয়াম, ৫১, ৭৪, ১২৯, ১৫০, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৮, ১৭০, ১৭৬, ১৯৯, ২০১, ২০৩, ২৬৭, ২৯০, ৩০৩
শেলি, পার্সি বিসি, ৪৩, ১৬৫, ১৬৯, ১৭২, ১৭৪, ২৯৪
শেলি, মেরি, ১৩৯, ২০৫
শোপেনহাওয়ার, আর্টুর, ৩০, ৩৬, ৪২, ১০০, ৩১২
"শোক ও বিষণ্নতা", ১১৪
শৌল, ৪৮, ৮৫, ১৫০
শুবার্ত, ফ্রানৎস পেটার, ১৯৮
শ্রোয়েডিঙ্গার, এলভিন, ২২
শমূয়েল, ১৫০, ১৫৯
শার্ল, ১৫১
শিয়োভো, টেরি, ২১৯, ২২০
শোয়ার্জ, ডেলমোর, ২৬৫
শশী, ২০৮, ২০৯

সোক্রাতেস, ১৬, ৩০, ৩১, ৪৯, ৮৬, ৯০, ৯৩, ১৫৩, ১৫৭
সন্টাগ, সুসান, ১৬৯
সার্ত্রে, জ্যা-পল, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮
সা-কর্নাইরু, মারিউ দ্য, ১৪৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাফো, ১৪৫
সেলান, পাউল, ৪৫, ১২৭, ২৪৬, ২৮০-২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬
সেনেকা, ১৫, ৪৯, ৯০, ৯২, ৯৪, ১৪৫, ১৬১, ৩১০, ৩১১, ৩১৫
সেলিগম্যান, মার্টিন, ৬৭
সেনসবারি, পিটার, ১১০
সিলভা, হোর্হে আসুনশিয়ন, ৫০, ১৪৫
সিরাজ-উদ-দৌলা, ৫৫
সিথিয়া, ৮১
সিফালাস, ৪৭, ১৪৮
সাইরাস, ৮০
সায়ভিয়ুস, ৮৩
সেবার্গ, জ্যা, ১৩৪
সুজা, ক্লদিও দ্য, ১৩৫
স্তাভরোগিন, ১৯২
সাবিত্রী, ২১৫, ২১৬
সিম্পসন, লেসলি, ২৮৮
সোমার্স, উইলিয়াম, ২৯১
সিলি, ক্লিন্টন বি, ২১১
সিবেলিয়ুস, জে., ১৯৮
সিলেনুস, ৯২
সারদানাপালাস, ৯২
সিজার, ওক্তাভিয়ুস, ৭৯, ১৫৬
সিসিফাস, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৪৭, ১৬৬
সীতা, ১৫৫
"সুস্পষ্ট অসমর্থতা", ২২
সুইফ্‌ট, জনাথন, ১৬৪, ১৭০
''সুইসাইডোলজি'', ১০২
"সুইসাইড ব্রিজ", ১১৬, ১১৭
"সুইসাইড মেশিন", ৬২
সাইফুল্লাহ্ ,সুনীল, ২৩৩-২৩৭, ২৪৩, ২৪৪
সেলিনো, ১৫৯
"সেপ্পুকু", ১৩২
সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ, ১৮০
সেভারাজ, লুসিয়ুস সেপতিমিয়ুস, ৭৯, ৮০
সেক্সটন, অ্যান, ৪৩, ৫৭, ১৩০, ১৬৭, ১৬৯, ২৬৭
"সোফিস্ট মতবাদ" ৩০
সোফোক্লেস, ১৫০, ১৫৭
স্টার্লিং, জজ, ১৪০
"স্কিট্‌সোফ্রেনিয়া", ৫৯, ৬৮, ১৬৬, ১৭০
স্টিভেনসন, রবার্ট লুইস, ১৬৯
স্টিন্ডবার্গ, ১৯৫
"সহায়ক-আত্মহত্যা", ৬১, ৬২, ৭৪
"সমর্পণধর্মী আত্মহত্যা", ১৯৩
স্টেকেল, ডব্লিও, ১১৩
স্কট, উইনফিল্ড টাউনলি, ৮১, ১৪২
স্টার্ন, ড্যানিয়েল, ৭৭
স্পার্তাকাস, ৮৭
স্টেডনার, আর্নেস্ট, ২৭৩
সুপারভ্যেল, জুল, ২৮৫
স্পেংলার, অসওয়াল্ড, ২৯১
স্মেরদিয়াকভ, ৫০, ১৬০
সোয়ার্জন, বারবারা, ১৩০
স্যাকভিলে-ওয়েস্ট, ভিটা, ২৫১, ২৫২, ২৫৪
স্টিফেন, ল্যাসলি, ২৫১
স্মিথ, জন অ্যালাইন, ১৩২, ২৬০
স্মিথ, মার্থা, ২৩১
সিম্পসন, লুইস, ২৯৪
স্তাতিয়ুস, ৯২
স্টাইনমেট্জ, ১০৭
স্তেইল, নিকোলাস দ্য, ৭৮
স্তেরোপি, ১৫৯
স্পেন্ডার, স্টিফেন, ১৭৪
"সাইক্লোথাইমিক", ৬৮
স্লেগেল, ১৭৬
"সাইকোডাইনামিক থেরাপি", ৬৭
স্টেনগেল, আরউইন, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১১০
"সামুরাই", ৫৯, ৭৩
সাইরেস, ৮০
স্যামসন, ৮৫
স্যাডওয়েল, টমাস, ৫১
স্যান্ড, জর্জ, ৫১
স্রেডম্যান, এডউইন, ৩০
"সানহিদ্রিন", ৫৪
সোফিয়া, ১৩৭
স্টেইচার, গুস্তাফ, ২৭৭
স্টাইনার, গেয়র্গ, ২৮৪
স্তাইল, দ্য, ৩১২
"স্ব-জন্য-সত্তা", ৩৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"স্ব-স্থিত-সত্তা", ৩৫
সিরেস, আনা মারিয়া, ১৪৪
"সেরোটোনিন", ৬৬, ৬৭
"সামাজিক নিয়তিবাদ", ১১৪
সুশিমা, শুজি, ১৪৩

হকিং, স্টিফেন, ২২
হফ্‌মানস্টাল, হুগো ফন, ৫৩, ২৭৫
হাইডেগার, মার্টিন, ২৫, ২৬, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ২৩৩, ২৩৯, ২৪৪, ২৭৩,
হার্ডি, টমাস, ১৩৭
হাইয়াদিস, ১৫৯
হারকিউলিস, ১৬০
"হারা-কিরি", ৭২, ৭৩
"হাইড্রোকর্টিশন", ৬৬
হান্নিবাল, ৯২
হুইটম্যান, ওয়াল্ট, ২৯৪
হ্যাভারগাল, ফ্রান্সেস রিডলি, ৩১০
হার্টমান, এডুয়ার ফন, ৩১৬
হাবামাল, ৮৭
হ্যারিসন, রেক্স, ১৪১
হাওয়াড, রবার্ট ই., ১৪১
হেলেন, ১৭৭
হেরাক্লেতাস, ২৮১
হর্টন, ফিলিপ, ২৮৭
হাসান, আবুল, ২১২, ২২১
হার্সম্যান, ডি. জাবলো, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪
হিরো, ১৪৯
হিউম, ডেভিড, ১৮, ৮৬, ২০৩, ৩১২
হিউজ, টেড, ১২৯, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০
হিটলার, আডোল্‌ফ, ১৩৭, ১৪৬, ১৪৭, ২৮২
হিপ্পোক্রাতেস, ১৬৪, ২১৮, ২১৯
হেগেন, টি.ও., ১৬৫
হেগেন, টি.ও., ১৪১
হোমার, ৮৯, ১৭৬
হ্যান্ডেল, ১৬৯
হুসার্ল, এডমন্ড, ৩৪, ৩৫
হেগেল, ফ্রিডরিখ, ৩৪, ৩৫, ২২৫
হেদিস, ৩৮, ৩৯, ১৬৬
হেসে, হেরমান, ৫০
হেগেসিয়ুস, ৯২
হেলিকোন, ৩৬
হেমিংওয়ে, আর্নেস্ট, ৫০, ১২৩, ১২৭, ১৩০, ১৬৫, ১৬৭
হ্যামলেট, ৪৩, ৪৪, ৪৯, ৭৪, ১২০, ১৫৮
হ্যোল্ডারলিন, ক্রিশ্চিয়ান ফ্রিডরিশ, ১৭২, ২৭৫, ২৮০, ২৮৫, ২৯৬
হ্বাগনার, রিচার্ড, ১৬৪, ২৯০
হ্বিটগেনস্টাইন, লুটভিগ, ১৯, ৬৮, ১৯৪, ২৭২, ২৭৮, ২৭৯ ২৭২, ২৭৮, ২৭৯
হ্বের্টের, ১৫২, ২০৬
হিরাওকা, কিমিতাকে, ১৩২
হাতসুয়ো, ১৪৪
হাইমোন, ১৫৩, ১৫৮
হ্বেরফেল, ফ্রানৎস, ২৭৩
হেউড, ভিভিয়ান হে, ২১০
হাং, হুয়াং নিউ, ৩১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও